দুই পলাশী
দুই মীরজাফর

কে এম আমিনুল হক

কে এম আমিনুল হক ১৯৫৩ সালে কিশোরগঞ্জ জেলার অষ্টগ্রামের আলীনগর মাতুলালয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা মরহুম কে এইচ এম এ গণি শাহ সর্বজন শ্রদ্ধেয় কামেল বুজর্গ হিসেবে পরিচিত ছিলেন। তার দাদা কে এম আলীমুদ্দিন শাহসাহেব এবং প্রপিতামহ কে এম আশরাফুদ্দিন শাহ সাহেব ও প্রপিতামহী খন্দকার মুহাম্মদ আমিনা খাতুন শাহ সাহাবা তৎকালে আরবী-ইসলামী শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত ছিলেন। উভয়ে ছিলেন হাফেজে কুরআন। পুরুষানুক্রমে এই বংশের উর্ধতন মহান ওলীয়ে কালেমগণ দ্বীনী খেদমতে নিবেদিত ছিলেন। তাঁদের কর্মপ্রবাহ ছিলো ঢাকা, নরসিংদী, কিশোরগঞ্জ, ব্রাহ্মণবাড়িয়া, হবিগঞ্জ ব্যাপক এলাকার ধর্মপ্রাণ সাধারণ মানুষের মধ্যে বিস্তৃত।

আমিনুল হক দ্বীনী ঐতিহ্যের ধারক এই পরিবারের সন্তান হিসেবে বেড়ে ওঠার কালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপণ করেন নিজ এলাকায়। অতঃপর ভৈরব কে, বি, স্কুলে মাধ্যমিক ও ভৈরব হাজী আছমত কলেজে উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে অধ্যয়ন করেন। কলেজ জীবনে তিনি সাংবাদিকতার সাথে জড়িত হন এবং ভৈরব প্রেসক্লাবের সদস্য ছিলেন। শৈশব থেকেই তিনি একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে সুখ্যাতি অর্জন করেন। '৭১-এর উত্তাল সময়গুলো এসে যাওয়ায় পরীক্ষায় অংশগ্রহণ সম্ভব হয়নি। তিনি সে সময় পাকিস্তানকে অনিবার্য ধ্বংস থেকে রক্ষার জন্য বিবেকের তাড়নায় সক্রিয় অবস্থান নেন।

'৭১-এর ডিসেম্বরে তাকে বিপর্যকর পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। ধারাবাহিক জুলুম-নির্যাতন ও কারাদন্ড পরিণত হয় তার ভাগ্যলিপিতে। কারাবাস কালে গ্রন্থকার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে গ্রাজুয়েশন ডিগ্রী লাভ করেন। ১৯৮১ সালে তিনি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মুক্তি পান।

১৯৮২ সালে তিনি রাষ্ট্রীয় মেহমান হিসেবে ইরান সফর করেন এবং একই বছর পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন। এছাড়া পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান সফরের অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার। তিন সন্তানের জনক আমিনুল হকের স্ত্রী আনোয়ারা খন্দকার ঢাকার একটি হাইস্কুলে সহকারী শিক্ষিকার দায়িত্ব পালন করছেন।

www.pathagar.com

'১৯৭১ সালে পাকিস্তান যখন অস্তিত্বের সংকটে নিপতিত হয়েছিল তখন যারা বিচ্ছিন্নতাবাদের সমর্থন করতে পারেনি, পরবর্তীকালে তাদের ঢালাওভাবে দালাল এবং দেশদ্রোহী বলে অপবাদ দেওয়া হয়। এই অভিযোগে অনেকে নিহত হয়েছে এবং যারা প্রাণে বেঁচেছে তাঁরাও কারাভোগ করেছে। গৃহযুদ্ধ বাধলে এরকমই ঘটে, যারা বিজয় লাভ করে, তারা ইতিহাসের উপর ছেড়ে দিতে কেউ রাজী নয়।

বাংলাদেশের অভ্যুত্থানের পর ১৯৭১ সালের যুদ্ধ সম্বন্ধে বইপত্র লিখিত হয়েছে- প্রচুর না হলেও বেশ কিছু, কিন্তু এ সবই একতরফা। তথাকথিত দালালদের কোন বক্তব্য থাকতে পারে এ কথা কেউ যেন শুনতেই নারাজ। সেদিক থেকে কে, এম, আমিনুল হকের লেখা "আমি আলবদর বলছি" একটি বলিষ্ঠ প্রতিবাদ। পাকিস্তান নামক মুসলিম জাতীয়তার ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালে অনেক যুগের সাধনার পর যে রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, তাকে সর্বশক্তি দিয়ে রক্ষা করতে যারা এগিয়ে এসেছিলেন, তাদের রাজনৈতিক বিচার শক্তি হয়ত আপেক্ষিক ভাবে দুর্বল ছিল, কিন্তু তাদের দেশদ্রোহী বলতে গেলে শব্দের অপব্যবহার করা হয় মাত্র। নিশ্চিত পরাজয়ের ভয়ে যদি কেউ রাষ্ট্র ও স্বাধীনতা রক্ষায় এগিয়ে না আসে তাহলে বিশ্বাস করতে হয় যে, কোন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কোন দল বিদ্রোহ ঘোষণা করা মাত্র পূর্বের জাতীয়তাবোধ সব মিথ্যে হয়ে ওঠে।

অনাত্মীয় পরিবেশের মধ্যে সাহসিকতার সঙ্গে আমিনুল হক তার বক্তব্য উপস্থাপিত করতে পেরেছেন দেখে অত্যন্ত খুশী হয়েছি।'

www.pathagar.com

"তোমাদের কি হলো যে, তোমরা সংগ্রাম করবে না আল্লাহর পথে এবং অসহায় নর-নারী ও শিশুদের জন্য? যারা বলে, হে আমাদের প্রতিপালক! এ জনপদ যার অধিবাসী জালিম, তা হতে আমাদেরকে অন্যত্র নিয়ে যাও; তোমার নিকট থেকে কাউকেও আমাদের অভিভাবক করো এবং তোমার নিকট থেকে কাউকেও আমাদের সহায় করো।"

(সূরা নিসা : ৭৫)

www.pathagar.com

দুই পলাশী
দুই মীরজাফর

কে এম আমিনুল হক

www.pathagar.com

প্রকাশক | **কে এম আমিনুল হক**
সাবিয়ানগর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ

সর্বস্বত্ব | প্রকাশক কর্তৃক সংরক্ষিত

প্রথম প্রকাশ | ৪ মে ২০০৭

মূল্য | **তিনশত টাকা মাত্র (সাদা)**
চারশত টাকা মাত্র (অফসেট)

Dui Polasi Dui Mirzafar
Written and Published by K M Aminul Hoque
Sabianagar, Austagram, Kishorganj
First Edition 4 May 2007
Price: Taka 300/- US$20 £15 (White)
Taka 400/- US$25 £ 20 (Offset)

www.pathagar.com

আওলাদে রসূল (সাঃ)
সৈয়দ মোস্তফা আল মাদানী (রঃ)
সাবেক পূর্ব পাকিস্তানের গভর্ণর
শহীদ আব্দুল মোনয়েম খান এইচ পিকে
এবং
১৫ আগস্ট ১৯৭৫ জাতীয় বীর কর্নেল সৈয়দ ফারুক
রহমান ও সহসাথী বীরদের উদ্দেশ্যে

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

খন্দকার এম আমিনুল হক একজন সাহসী দেশপ্রেমিক ব্যক্তি। এর আগে কয়েক বছর আগে তিনি 'আমি আলবদর বলছি' বইখানি লিখে এবং তা প্রকাশ করে সেই দুঃসাহসেরই প্রমাণ দিয়েছিলেন। ঐ বইখানির তিনি অতি সম্প্রতি দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশ করেছেন। এই সাম্প্রতিক সংস্করণে তিনি আমার একখানা পত্র সংযুক্তিতে দিয়েছেন। পত্রখানা আমি তাকে ঢাকায় লণ্ডন থেকে লিখেছিলাম, বস্তুতঃ সেই প্রথম সংস্করণের বইখানা লণ্ডনে পাবার পর একটি প্রাপ্তি স্বীকার স্বরূপ।

২০০৭ সালের শুরুতে তিনি যখন তার আর একখানা বই 'দুই পলাশী দুই মীরজাফর' এর পাণ্ডুলিপিটি আমাকে দেখার জন্য দেন, তখন আমি এটি পড়ে দেখি। কিছু পরামর্শও দেই। সেসব পরামর্শের কিছু কিছু তিনি গ্রহণ করেন। আমি এজন্য খুশী হয়েছি। কেননা ১৭৫৭ সালের পলাশীর চরম বিপর্যয়ের সাথে বাংলাদেশের দ্বিতীয়বারের স্বাধীনতার 'নায়ক বলে পরিচিত' খল নায়কটির হুবহু মিল যে আছে, তা অনেক ঐতিহাসিকই স্বীকার করেন। জনাব হকের মত আমি নিজেও করি।

'দুই পলাশী দুই মীরজাফর' এর পাণ্ডুলিপিটি বই এর আকারে প্রকাশিত করতে যে উদ্যোগ তিনি নিয়েছেন, তা তার সৎসাহস গভীর দেশপ্রেম এবং মুসলিম জাতিসত্ত্বার অব্যাহত অগ্রগতির প্রতি তার চরম আদর্শিক কমিটমেন্ট এর একটি অনুকরণযোগ্য বাস্তব নমুনা বটে। দুনিয়াব্যাপী মুসলমানদের এই অতি দুঃসময়ে এমন ভাল কাজ-কাম যারা করেছেন বা করতে পারেন, তারা যে নিজ নিজ দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে ইমানদারীর ও নিষ্ঠার উজ্জল স্বাক্ষর রাখছেন বা রাখবেন তাতে আমার তিলমাত্রও সন্দেহ নাই। স্মরণযোগ্য যে দুনিয়ার মানবকুল দুর্ভাগ্যজনকভাবে দুটি ভাগে বিভক্ত। একটি হচ্ছে গোমরাহীর ও অন্যটি হচ্ছে– মানবতার সঠিক মুক্তির ও সঠিক অর্থেই আজাদীর। জনাব আমিনুল হকের আগের এবং এখনকার কাজটি গোমরাহীর বিরুদ্ধে এবং মানবতার আজাদীর পক্ষের এক একটি মহান অবদান বলেই আমি বিশ্বাস করি। বাংলাদেশের মানুষের সার্বিক আজাদীর লক্ষ্যে তার এই কাজটিও যে ইতিহাসে একটি মাইলফলক হয়ে থাকবে তাতে আমার কোনই সন্দেহ নাই। এদেশের মুসলিম জাতিসত্ত্বার স্বরূপ নিয়ে যারা দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভোগে তাদের জন্য আমিনুল হকের এই বইটি যে একটি সঠিক দিক নিদের্শনা দিতে পারে, তা বোধ করি বলাই বাহুল্য।

পরিশেষে আমি মহান আল্লাহ্‌র কাছে মোনাজাত করি, লেখকের সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সার্বিক সামর্থ্যের জন্য যা দিয়ে তিনি আরো অনেক ভাল কাজ-কাম করার সুযোগ পান। সেই সাথে অতি গুরুত্বপূর্ণ এই বইখানির মুখবন্ধটি লিখে দেয়ার জন্য তিনি আমাকে যে সুযোগ দিয়েছিলেন, সেজন্য তাকে এইসাথে আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই।

তারিখ : ০৪ ফেব্রুয়ারী, ২০০৭ইং

মোহাম্মদ তাজাম্মুল হোসেন
৭৯৫/২ ইব্রাহিমপুর, ঢাকা-১২০৬

www.pathagar.com

অভিমত

স্নেহাস্পদ কে, এম, আমিনুল হক আমাকে তাঁর একখানি পুস্তিকার পাণ্ডুলিপি **"দুই পলাশী দুই মীরজাফর"** পড়ে অভিমত লিখে দেওয়ার জন্য অনুরোধ জানালেন। আমি এর আগেও তাঁর প্রকাশিত দু'টি বই পড়েছি। দেখেছি তাঁর সাহসিক সিদ্ধান্ত সঠিক চিন্তার বহিঃপ্রকাশ। একজন মুজাহিদের জান বাজি দেশপ্রেমের ঈমানি দায়িত্ব সর্বপরি নিজ জন্মভূমির অখন্ডতা রক্ষাসহ শির অবনত না করার মহান প্রত্যয়ে তাঁর অকপট স্বীকারোক্তি।

কলেজ জীবনে যখন ধাপে ধাপে অল্প বয়সে অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন বিলাসী আগ্রাসী ভারত দ্বারা তিনদিকে বেষ্টিত নিজ দেশের ভূ-প্রকৃতিগত রাজনৈতিক অবস্থান বিষয়ে সুদূরপ্রসারী দূরদৃষ্টি থাকা অনেকটাই বিস্ময়ের। আজ দেশের ১৪ কোটি মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে– বুঝে ফেলেছে '৭১ সালে কি ঘটেছিল এবং কি খেলা চলেছে এ দেশটা নিয়ে এখনোবধি। "আমি আলবদর বলছি" বইখানিতে দু-টা দিক দেখেছি একটি হলো দেশের সংঘাতে বিবাদমান দুটি আদর্শের ঐতিহাসিক লড়াই। অন্যটি হলো এতে তাঁর আত্মজীবনের চিত্র ফুটে উঠেছে। তাই ঐ বইখানিকে ইতিহাসের অপর দিকে বলা চলে নবাব সিরাজের উপর ডাহা মিথ্যা অত্যাচার অনাচারের দোষারোপ করে ১৭৫৭ সালের পলাশির যুদ্ধ এবং পরবর্তী ২১৪ বছর পর ১৯৭১ সালে এককালের পূর্ব-পাকিস্তান বর্তমান বাংলাদেশের ভিতরে যে ঘটনা প্রবাহ ঘটেছিল তার ঐতিহাসিক মিল, সাজুস্য ও উদ্দেশ্য খুজে পেয়ে বর্তমান প্রজন্মের সহ ভবিষ্যতের ইতিহাস সমৃদ্ধির ফসল রেখেছেন কে এম আমিনুল হক আমার ধারণা।

১৯০ বছর ধরে গোলামী করার পর সকল ষড়যন্ত্র ঘাত-প্রতিঘাত মোকাবিলা করে একটি মহান জাতি যখন নতুন করে মেরুদণ্ড খাড়া করে মাথা উঁচু করে দাঁড়াবার একটা ঠাঁই অর্জন করল তখন থেকেই আরম্ভ হলো আর এক নতুন ষড়যন্ত্র। ১৭৫৭ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত ছিল ২টা বৈরী জাতি ইংরেজ ও ভারতীয় ব্রাহ্মণ্যবাদী শোষক দল। ১৯৪৭ পরবর্তীতে একমাত্র বৈরীশক্তি হলো হিন্দুস্তানের ব্রাহ্মণ্যবাদী শাসককূল। আর দেশের অভ্যন্তরে রইলো তাদের সক্রিয় অনুচর তাবেদার। রাজনৈতিক পরিভাষায় যাদের বলা হয় ৫ম বাহিনী। এটা পরিষ্কারভাবে লেখক ইতিহাসের অকাট্ট প্রমাণ সাপেক্ষে তুলে ধরেছেন।

লেখকের সিদ্ধান্ত ও মত ৭১' এর সংঘাতে ভ্রান্ত না অভ্রান্ত তা বুঝা যায় পাকিস্তানের ২৪ বছরের ইতিহাস থেকে। সামান্য কথায় যদিও বলা যায় না। আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা যে বানোয়াট মিথ্যা নয় তা শেখ মুজিব ১৯৭২ সালের ১০ জানুয়ারী পাকিস্তানের কারাগার থেকে দেশে ফিরে এসে রমনা রেসকোর্স ময়দানের জনসভায় স্বীকার করে সদর্পে ঘোষণা করে বলেন তিনি নাকি ১৯৪৮ সাল থেকেই এ দেশকে পাকিস্তান থেকে আলাদা করতে চেষ্টা করছিলেন।

www.pathagar.com

এটা আরো স্পষ্ট হয়েছে ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর পাকিস্তানের পূর্বাঞ্চল আজকের বাংলাদেশ এর পতনের পর দিল্লীর লাল কিল্লার জনসভায় আগ্রাসি ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরাগান্ধীর ঘোষনায় তিনি উল্লাসে ফেটে পড়ে দম্ব বরে বলেন– হ্যাঁম "হাজার সালোকা বদলা লে লিয়া"। হাজার সালোফা স্বপ্না সফল হুয়া। ১০০০ বছরের প্রতিশোধ নাকি নিয়েছেন হিন্দুস্তান। তাদের স্বপ্নও নাকি সফল হয়েছে।

"মুক্তিযুদ্ধে চেতনায় নিষিক্ত ও মুক্তিযুদ্ধের চেতনার কেন্দ্র বিন্দু" শেখ মুজিবের নেতৃত্বাধীন সরকারের নতজানু, নির্লিপ্ত ও নীরব ভূমিকায় বর্গীবেশে ভারতীয় সৈন্যের অবাধ লুণ্ঠনসহ ভারতীয় শকুন মাওয়ারীদের লুটতরাজে ২৪ বছরের সঞ্চিত এদেশের সম্পদ লোপাট হলো– নেমে এলো '৭৪-এর দুর্ভিক্ষ। ১০ লক্ষাধিক মানব সন্তানের অকাল মৃত্যু হলো। গাইবান্ধা রেল ষ্টেশনে সে সময়ে একদিন একজন মানুষের বমি নিয়ে মারামারি করে দু'জন ক্ষুধার্ত মানব সন্তানের ভাগ করে খাওয়ার কথাও ইতিহাসে সাক্ষী হয়ে আছে।

বাপ-মায়ের একমাত্র পুত্র সন্তান কে এম আমিনুল হক দশ বছর কারাঅন্তরিক-এর কারণে স্নেহময়ী মাতা-পিতার মৃত্যু শয্যা পাশে থাকতে পারেননি। এ করুন ঘটনায় তিনি মনের দৃঢ়তা হারাননি। বন্দিকারা থেকেই তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডিগ্রী লাভ করেন। জেল থেকে ১৯৮১ সালে মুক্তি পেয়ে তিনি দেখতে পান মা-বাপের শূন্য বিছানা। যে মহীয়ান মাতা- কামেল পিতা মরহুম কেএইচএম এ গনিশাহ্ তাঁদের একমাত্র সন্তান ও ওয়ারিশকে দেশের ক্রান্তি কালে দেশের জন্য উৎসর্গ বা হাদিয়ায় ওয়াক্ফ করে দিতে পারেন– এমন দৃষ্টান্ত দুনিয়ায় বিরল। মহামহিময় আল্লাহ্ নিশ্চয়ই তাঁদের মাগফেরাত কবুল করেছেন বা করবেন। ছুম্মা আমিন!

তারপরেও তার জেহাদি চেতনার কমতি নেই। তিনি জাতীয় সংসদ নির্বাচন করেন দু'বার। রাষ্ট্রীয় মেহমান হয়ে তিনি ইরানের মহান ইসলামী বিপ্লব দেখার জন্য ইরান সফর করেন। এ সালেই তিনি বাংলাদেশের হাজী সমিতির সেক্রেটারী হিসেবে সভাপতি কাজি আজিজুলহকসহ পবিত্র হজ্বব্রত পালন করেন এবং পবিত্র মক্কা শরীফে মুসলিম বিশ্বের ঐক্য ও ইহুদী-খৃস্টান চক্রের বিরুদ্ধে ইরান, বাংলাদেশসহ বিশ্বের ৯৩ হাজার হাজির প্রতিবাদ মিছিলে নেতৃত্ব দিতে গিয়ে সৌদী পুলিশের দ্বারা অত্যাচারিত হন।

আমিনুল হক এর অসামন্য পরিশ্রমের ফসল পুস্তক দুটি নিশ্চয় দেশবাসীর জন্য বিশেষ অবদান রাখবে বলে আমি বিশ্বাস করি। তাঁর মঙ্গলজনক সাফল্য-সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করি।

এম, এ, তাহের

কলাম লেখক, সাহিত্যিক, ইতিহাস গবেষক, সমাজসেবক

www.pathagar.com

গ্রন্থকারের কথা

এদেশে জাতিসত্তার বিভাজন চলছে। বাংলাদেশের সূচনা পর্ব থেকে আজ অবধি তিন তিনটা যুগ অতিবাহিত হলেও এদেশে বিভাজন প্রক্রিয়া থেমে থাকেনি। কারণটা কি?

ভারতের জাতিসত্তায় সম্ভাব্য শতাধিক ভাঙনের চিড়ধরে আছে। কিন্তু এর উৎকট প্রকাশ উচ্চকিত হয় না কখনো। সেখানকার সংবাদ মাধ্যমে সাংস্কৃতিক আচরণে অথবা রাজনৈতিক কর্মসূচীতে সরব ভাঙন প্রক্রিয়া অনুপস্থিত যদিও সসস্ত্র স্বাধীনতা সংগ্রাম অব্যাহত রয়েছে।

কিছু অসংলগ্ন অভিব্যক্তির গুঞ্জন আবর্তিত হওয়া সত্বেও প্রত্যেকটি জাতিসত্তায় ঐক্যের অনুরনন পলিক্ষিত হয়। কিন্তু কি দুর্ভাগ্য আমাদের পঞ্চম বাহিনী বিশ্বাস ঘাতকরা জাতি সত্তা বিভাজন প্রক্রিয়ার বিশেষ বিশেষ দিবসের সুনির্দিষ্ট ল্যাণ্ডমার্কসমূহ উচ্চকিত করে বছরে কয়েক মাস ব্যাপী অপপ্রচারের জোয়ার আনে এবং দেশপ্রেমিক জনগোষ্ঠীর একাংশকে অপশক্তি হিসাবে চিহ্নিত করে জাতি সত্তাকে অনৈক্যের আবর্তে নিক্ষেপ করে চলেছে প্রতিনিয়ত পরিকল্পিত ভাবে। কিন্তু কেন? এই কেন? এ উত্তর অনুসন্ধানের আকাঙ্খা কারো কারো মধ্যে পরিলক্ষিত হয়না এমনটি নয় কিন্তু পঞ্চম বাহিনী ও তাদের সহযোগী শক্তি সমূহের সমস্বর কলকাকলি সরব উল্লাস ও আবেগময় উচ্ছসিত প্রচারণার তোড়ে অনুসন্ধানীদের আকাঙ্খা হারিয়ে যায় অপমৃত্যুর অতল গহ্বরে। একারণে আজকের ইতিহাস একপেশে। এই একপেশে ইতিহাসে পঞ্চম বাহিনী বিশ্বাসঘাতকদের আজ জাতীয় বীর হিসাবে আর দেশপ্রেমিকদের অপশক্তি ভিলেন হিসাবে চিহ্নিত করেছে।

ভারতে যারা বহিরাগত তারা ভূমি সন্তানদের মাথার ওপর ছড়ি ঘুরাচ্ছে। ১৫ শতাংশ বহিরাগত ৮৫ শতাংশ ভূমি সন্তানদের ওপর প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে। ভারতের ১৫ শতাংশ ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারতের ৮৫ শতাংশ সম্পদ কুক্ষিগত করে রেখেছে বহুকালে ধরে এখানকার ৮৫ শতাংশ মানুষ নিপিড়ীত হয়ে চলেছে এবং নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছে আজ অবধি।

শতাব্দীর পর শতাব্দী এই বহিরাগত ব্রাহ্মণ্যবাদীরা তাদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত করে রেখেছে। এই আধিপত্যবাদী শক্তির কায়েমী স্বার্থ ক্ষুণ্ন হবার সম্ভাবনা যেমন উপাদানে নিহিত রয়েছে সেসব উপাদানের শক্তি ও সামর্থ ফোকালা করে দেয়ার জন্য নিত্য নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয় তাদের নিজেদের আধিপত্য বাদী কায়েমী স্বার্থ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য।

এখন কিছু জিজ্ঞাসা উপ্ত হওয়ার স্বাভাবিক বহিরাগত প্রতিরোধকামী সংখ্যাগুরু ভূমি সন্তানদের পর্যুদস্ত হয়েছিল কিভাবে? কিভাবে আজো তারা ভূমি সন্তানদের মাথা তোলার সাহস কেড়ে নিয়ে বিশাল জনগোষ্ঠীকে দুর্বল দলিত করে রেখেছে? আমরা জানি না। কিভাবে প্রগতিশীল শক্তি বৌদ্ধ বাদীদের উত্থান হয়েছিল? শতাব্দীর পর শতাব্দী ভারত শাসন করা সত্বেও কিভাবে তাদেরকে ভারত ভূমি থেকে উৎখাত ও

www.pathagar.com

বিতাড়িত হতে হয়েছিল আমরা তা জানিনা। কিভাবে এই ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি প্রবল প্রতাপশালী মুঘলদের কুড়ে কুড়ে নিঃশেষ করে বৃটিশ বেনিয়াদের হাতে তুলে দিয়েছিল আমরা তা জানিনা। কিভাবে বাংলার মুসলমানদের শৌর্য বীর্জ কেড়ে নিয়ে একবারে লাঙ্গলের পেছনে ঠেলে দিয়ে পর্যুদস্ত ব্রাহ্মণ্য শক্তির উত্থান ঘটিয়ে ছিল আমরা তা জানিনা। আমরা জানিনা বৃটিশ শাসন অবসানে সর্বভারতীয় মুসলমানদের সংগ্রামের ইতিহাস আমরা জানিনা কায়দে আজমের দূরদৃষ্টি ও অনমনীয় নেতৃত্বে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের অক্টোপাশ ছিন্ন করে ভারতের মানচিত্র ভেঙে মুসলিম ভুখণ্ড পাকিস্তানের অভ্যুদয় উপমহাদেশ এবং দুনিয়ার মুসলমানদের জন্য আশির্বাদ ছিল কিনা আমরা জানিনা। আমরা জানিনা বাংলা খণ্ডিত হওয়ার ব্যাপারে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের ইতিবৃত্ত। আমরা জানিনা সাত চল্লিশে মুসলিম বাংলার নব উত্থান, অতঃপর আবারো স্বাধীনতা মুক্তি ও তথা কথিত সোনার বাংলার আদলের নবতর বিপর্যয়। সমৃদ্ধির পথ থেকে পদস্খলন এবং আবারো তলাবিহীন ঝুরিতে পরিণত হওয়ার সত্যিকার ইতিহাস। এসব ইতিহাসের বড় বড় বাঁকগুলোকে আমাদের দৃষ্টি সীমানা সরিয়ে রাখার অদম্য প্রয়াস চলছে তত্ত্ব ও ইতিহাস বিকৃতির মধ্যদিয়ে। অপ্রাসঙ্গিক ও আবেগ নির্ভর বিষয়গুলোর অবতারণা করে বিভাজন প্রক্রিয়া অব্যাহত রেখে জাতিসত্তাকে ভাঙতে ভাঙতে শক্তিহীন নিষ্ক্রিয় করে ফেলেছে আমরা স্বপ্নাবিষ্ট হয়ে আমরা নেশাগ্রস্থের মত ঢুলছি।

ইতিহাসের সত্যিকার উপলব্ধি থেকে আমরা অনেক দূরে। আমি আমার অনুভব ও গভীর উপলব্ধি দিয়ে ইতিহাস হাতিয়ে যা পেয়েছি সেই বিচ্ছিন্ন বিক্ষিপ্ত তত্ব ও উপাও দিয়ে সত্যিকার গণবিরোধী শক্তি এবং দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার বিপর্যয়কর সব ঘটনার নেপথ্য শক্তি ও একটি সুসংগঠিত ও চতুর প্রতিক্রিয়াশীল চক্রকে চিহ্নিত করার চেষ্টা করেছি চলমান এই গ্রন্থে। আমার এই ছোট্ট প্রয়াস হাজার হাজার বছরের বহমান ইতিহাসের মূল্যায়ন হিসাবে যথেষ্ট নয়। এক্ষেত্রে কোন বিজ্ঞ ইতিহাসবিদ যদি বিস্তৃত আলোচনার অবতারণা করে বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত এ জাতিকে মূল্যবান গ্রন্থ দেবার উদ্যোগ নেন তাহলে আমি সবচেয়ে খুশী হব। আমার ছোট্ট গ্রন্থের ক্ষুদ্র পরিসরে বিস্তৃত আলোচনার অবকাশ অতি অল্প। আমার এই গ্রন্থটি বহমান একটি বিশাল ইতিহাসের আউট লাইন মাত্র।

আমার এই মহৎ প্রয়াসে অনিচ্ছাকৃত ত্রুটির জন্য আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি। ক্ষমা প্রার্থী তাদের কাছেও এ গ্রন্থটি যদি কারো মানসিক যন্ত্রণার কারণ হিসাবে বিবেচিত হয়। কোন মনোযোগী পাঠক যদি এই গ্রন্থ পাঠে চলমান বিভ্রান্তি সম্মোহন ও নেশার ঘোর থেকে বেরিয়ে আসে তাহলে তার প্রতি আমি আমৃত্যু কৃতজ্ঞ থাকব। ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ !

সাবিয়া নগর, অষ্টগ্রাম, কিশোরগঞ্জ — বিনীত

তাং : ৪-০৫-০৭ইং — **কে এম আমিনুল হক**

www.pathagar.com

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা নং

উপক্রমনিকা ❑ ১৫

প্রথম অধ্যায়

ভারত থেকে বৌদ্ধ উৎখাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র ❑ ১৭
বাংলায় ১৪ শতকের অভিজ্ঞতা ❑ ২২
উপমহাদেশ প্রসঙ্গ ❑ ২৫
তিন প্রজন্ম প্রকল্প ❑ ২৬
বাস্তবায়ন শুরু ❑ ২৬

দ্বিতীয় অধ্যায়

পলাশী বিজয়ের পটভুমি ❑ ২৯
বৃটিশ শাসনের পূর্বে সুবাহ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ❑ ৩৪

তৃতীয় অধ্যায়

পলাশী নাটকের গ্রীন রুমে ❑ ৩৮
ইংরেজদের সাথে বিরোধের সূচনা ❑ ৪১

চতুর্থ অধ্যায়

পলাশীর পরে ❑ ৪৯
ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি ❑ ৫৩
মিরণ ❑ ৫৩
মুহাম্মদী বেগ ❑ ৫৪
মীর জাফর ❑ ৫৪
জগৎশেঠ মহাতাপ চাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপচাঁদ ❑ ৫৫
রবার্ট ক্লাইভ ❑ ৫৫
ইয়ার লতিফ খান ❑ ৫৫
মহা রাজা নন্দ কুমার ❑ ৫৬
রায় দুর্লভ ❑ ৫৬
উমি চাঁদ ❑ ৫৬
রাজা রাজ বল্লভ ❑ ৫৭

www.pathagar.com

দানিশ শাহ বা দানা শাহ্ ❑ ৫৭
ওয়াটস্ ❑ ৫৭
স্ক্রাফটন ❑ ৫৭
ওয়াটগণ ❑ ৫৮
মীর কাসেম ❑ ৫৮

পঞ্চম অধ্যায়

কোম্পানীর রাজস্ব নীতি ❑ ৫৯
চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ❑ ৬১
মহাজনের অত্যাচার ❑ ৬৪
নীলকরদের অত্যাচার ❑ ৬৫
লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত ❑ ৬৫

ষষ্ঠ অধ্যায়

শতাব্দী কালের প্রতিরোধ যুদ্ধ অতঃপর হতাশা ❑ ৭০

সপ্তম অধ্যায়

সিপাহী বিদ্রোহের পর কেড়ে নেয়া হল মুসলমানদের মুখের ভাষা ❑ ৭৪
শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছ হটিয়ে দেয়া হল ❑ ৭৫
বৃটিশ ও বর্ণ হিন্দুদের উদ্যোগে ধ্বংস করা হল বাংলার শিল্প ❑ ৭৭

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্গভঙ্গ ও মুসলমানদের নব চেতনার উন্মেষ ❑ ৮১
সর্বশেষ সতর্ক সংকেত ❑ ৮৪

নবম অধ্যায়

পাকিস্তান প্রস্তাব ও মুসলমানদের নবযাত্রা ❑ ৮৮
বাংলা বিভক্তির ষড়যন্ত্র ❑ ৮৯
বাংলা খণ্ডিত হল বর্ণ হিন্দু ষড়যন্ত্রে ❑ ৯০
কোলকাতা নিয়ে বৃটিশ হিন্দু যড়যন্ত্র ❑ ৯১
পাকিস্তান দাবীর প্রেক্ষিতে হিন্দু নেতৃবৃন্দ ❑ ৯১
সম্ভাবনাহীন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু ❑ ৯২
হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা ❑ ৯২

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা ❑ ৯৫
পাকিস্তান আমলে পূর্ব বাংলার অগ্রগতি ❑ ১০১
বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ ❑ ১০৫
ওরা জানতো বিচ্ছিন্ন হলে কি ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে ❑ ১০৯

একাদশ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র ❑ ১১৩

দ্বাদশ অধ্যায়

যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে ❑ ১৩৩
হক সাহেবের মতিভ্রম ❑ ১৩৫
পাগলা-গারদে পরিণত হল পরিষদ কক্ষ ❑ ১৩৯
বিচ্ছিন্নতাবাদী বাম তৎপরতার সাথে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ ❑ ১৪১
প্রয়োজন হল একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব ❑ ১৪৪
স্বায়ত্ব শাসন দাবীড় আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন ❑ ১৪৫
বিচ্ছিন্নতাবাদে মার্কিন ইন্ধন ❑ ১৪৬
সংহতির পক্ষে সোহরাওয়ার্দী ❑ ১৪৭

ত্রয়োদশ অধ্যায়

বিচ্ছিন্নতাবাদের বিদেশী ইন্ধন ❑ ১৫৬
মুজিবের চাতুরীপূর্ণ অবস্থান ❑ ১৫৯
৬ দফার প্রতিক্রিয়া ❑ ১৬১
ইসলাম পন্থীদের সু-সময় ❑ ১৬২
আগড়তলা ষড়যন্ত্র উদঘাটন ❑ ১৬৪

চতুর্দশ অধ্যায়

মুজিবের প্রতারণার ফাঁদে ইয়াহিয়া ❑ ১৭১
ইয়াহিয়ার অঙ্গীকার ❑ ১৭৪
গভর্ণর আহসানের দুরভিসন্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পালে হাওয়া ❑ ১৭৪
নির্বাচনের পর মুজিব ভুট্টো ❑ ১৭৬

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৈষম্য দূরীকরণে ইয়াহিয়ার উদ্যোগ ❑ ১৭৮
আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা ❑ ১৭৯
হিন্দুস্থানের সবুজ সংকেত ❑ ১৮০
ইয়াহিয়ার সদিচ্ছার অভাব ছিল না ❑ ১৮২
পূর্ব পাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসনের অচলাবস্থা ❑ ১৮৫

ষষ্টদশ অধ্যায়

গনেশ উল্টে দে মা লুটে পুটে খাই ❑ ১৮৯
দিল্লীর সক্রিয় অবস্থান ❑ ১৯১
দায়ী কে? ❑ ১৯০
বিপর্যয় এড়ানো যেত ❑ ১৯৫

সপ্তদশ অধ্যায়

প্ররোচিত যুদ্ধাবস্থা ও কূটনৈতিক উদ্যোগ ❑ ১৯৭
ইয়াহিয়ার সর্বশেষ উদ্যোগ ❑ ২০২
রুশ ভারত সখ্যতার পটভূমি ❑ ২০৩

অষ্টদশ অধ্যায়

স্বাধীনতার দৃশপট ❑ ২০৫
নির্বাচনী ওয়াদা ছিল পাকিস্তানের সংহিতর সপক্ষে ❑ ২০৬
স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা হয়নি ❑ ২০৭
স্বাধীনতার পর নির্বিচার লুণ্ঠন ❑ ২০৯
শিল্প সেক্টর ধ্বংস করা হল ❑ ২১২
শ্রমিক শ্রেণীকে প্রভাবিত করার জন্য মুজিববাদের অবতারণা ❑ ২১৭
স্বজন প্রীতির প্লাবন ❑ ২১৯
আওয়ামী লীগের ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম বৈরিতা ❑ ২২০
বাক স্বাধীনতায় হস্তেক্ষেপ সংবাদ পত্রের কণ্ঠবোধ ❑ ২২২
মন্বন্তরের ছোবল ❑ ২২৬
মুজিবের নির্বাচন প্রহসন ❑ ২৩০
বাকশাল গঠন ও গণতন্ত্রের অপমৃতু ❑ ২৩৩
রক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাস ❑ ২৩৭

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

দুঃশাসনের যবনিকাপাত ❑ ২৪০
আগস্ট বিপ্লবের পটভূমি ❑ ২৪৩
১৫ আগস্টের বিপ্লবী তৎপরতার
অধিনায়ক কর্নেল ফারুকের টেস্টামেন্ট ❑ ২৪৮
কেন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫? ❑ ২৪৮
ভবিষ্যত কোন্‌দিকে? ❑ ২৫১
বাংলাদেশ ❑ ২৫৩
পাকিস্তান ❑ ২৫৪
ভারত ❑ ২৫৫
রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবিদের প্রবণতা ❑ ২৫৭
কোন দেশের রাজনীতিতে কূটনীতিকদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ নেই ❑ ২৫৯
ভারতের প্রত্যাশা ও বাংলাদেশের পানি সংকট ❑ ২৬০
হুমকির মুখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা ❑ ২৬২
বাংলাদেশ বিরোধী তৎপরতা ❑ ২৬৩
ভঙ্গ ভূমি গঠনের ষড়যন্ত্র ❑ ২৬৫
সীমান্তে বিএসএফ এর অপতৎপরতা ❑ ২৬৬
উপসংহার ❑ ২৬৮

পরিশিষ্ট

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি ❑ ২৭৮
মীরজাফরের চুক্তি ❑ ২৮২
৭১'-এর স্মৃতি প্রসঙ্গে ❑ ২৮৩
গণ জিজ্ঞাস ❑ ২৮৫
ম্যাসেজ ❑ ২৮৬
যে সত্যের মৃত্যু নাই ❑ ২৮৬
শেখ মুজিবুর রহমান ❑ ২৮৭

www.pathagar.com

উপক্রমণিকা

গ্রন্থের শুরু করছি একটি জিজ্ঞাসা দিয়ে– ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হয় কি-না? অনেকেই হয়তো বলবেন হয় না, আবার কেউ কেউ বলবেন হতে পারে। দুটোর কোনটিকে তুড়ি মেরে উড়িয়ে দেয়া যাবে না। কেননা উভয়েই তাদের দাবীর পক্ষে ঐতিহাসিক তত্ত্ব ও তথ্যসমৃদ্ধ দলিল উপস্থাপন করতে পারবেন বলে আমি মনে করি। তবে আমার মনে হয় ইতিহাসের আনুসংগিক উপাদানগুলোর মধ্যে যদি সাদৃশ্য থেকে থাকে তাহলে অবশ্যই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি হতে পারে। তবে হ্যাঁ স্থান কাল পাত্র ভেদে আক্ষরিক আবর্তন নাও হতে পারে। অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে যদি কেউ ইতিহাস বিশ্লেষণ করে। যদি কেউ ইতিহাসের গতি প্রকৃতি ও চরিত্র সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করে তাহলে দুটো ইতিহাসের সাদৃশ্য তিনি অনুভব করতে পারেন। তবে সকলেই সেসব অনুধাবন করতে সক্ষম নাও হতে পারেন।

আমার অনুভব দিয়ে পলাশীর বিপর্যয় ও একাত্তরের তথাকথিত বিজয়ের মধ্যে যে আক্ষরিক সাদৃশ্য লক্ষ্য করেছি সেটারই চিত্রায়ন করব এই গ্রন্থে। আমার হৃদয়ের প্রতিধ্বনি কারো অন্তরে বাজুক অথবা না-ই-বাজুক, ইতিহাসের গভীরে হারিয়ে যাওয়া অনাবিস্কৃত সত্যগুলো টেনে তুলে মুক্তোর দানার মত যদি আমি দৃশ্যমান করে তুলি তাহলে সে সবের পুনর্মূল্যায়ণ আপত্তিকর বলে মনে করা সঙ্গত হবে কি? হবে না। অধিকাংশ মানুষ আমার সাথে সহমত পোষণ করলেও আমি জানি আমাদের একটা বিরাট অংশ ঝড় তুলবেন চায়ের আড্ডা থেকে পত্রিকার দপ্তর পর্যন্ত। এদের যারা সচেতনভাবে দালাল ক্রীড়নক হিসাবে জাতীয় স্বার্থকে জলাঞ্জলি দেয়ার জন্য এবং সাম্রাজ্যবাদী লক্ষ্য অর্জনের জন্য এখনো সক্রিয় তাদের সোচ্চার দাপটে আমার অস্তিত্ব বিপন্ন হওয়ার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও আমি সঠিক চিত্র উপস্থাপনের ব্যাপারে কুণ্ঠিত হব না। গুটি কতক উপনিবেশিক দালালদের ঔদ্ধত্বের সম্মুখে সহমত পোষণকারী আমার সংখ্যাগরিষ্ট দেশবাসী নির্বাক হয়ে নীরবে অশ্রু বিসর্জন করবেন হয়তো। ঔপনৈবেশিক চক্রে সৃষ্ট রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আবহ এখনো বিদ্যমান। আমি জানি এই বিদ্যমান পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়িয়ে থাকা কোন মহল থেকে

www.pathagar.com

প্রতিবাদ অথবা প্রতিরোধের ব্যাপারে একটি শব্দও উচ্চারিত হবে না। তবু অনাগত ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহী চেতনাকে শানিত করার জন্য রহস্য উদঘাটনের এমন একটি নয় অসংখ্য উদ্যোগ জরুরী। তা নাহলে আধিপত্যবাদী ব্রাহ্মণ্য চক্র সৃষ্ট ধুয়াশায় নিমজ্জিত রয়ে যাবে আগামী প্রজন্ম এবং এ ভূখণ্ডে আগামী অনন্ত কাল ধরে অব্যাহত থাকবে আত্মঘাতী ষড়যন্ত্র।

উপমহাদেশের সবচেয়ে বড় সমস্যা হল ব্রাহ্মণ্যবাদ এবং এর ধারক ব্রাহ্মণ সমাজ। এ সমস্যা আজকে প্রকট হয়ে দেখা দিয়েছে এমনটিও বলা যাবে না এ সমস্যা শতাব্দী কালেরও নয় সহস্র সহস্রাব্দ আগে থেকে উপমহাদেশকে জ্বালিয়ে পুড়িয়ে নিঃশেষ করছে। ব্রাহ্মণরা হল উপমহাদেশে বহিরাগত আর্য। যারা ছলেবলে কৌশলে উপমহাদেশের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছে। সেটা যেমন রাজনৈতিক অনুরূপ সাংস্কৃতিক সামাজিক ও অর্থনৈতিকও বটে। দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা ধীর বাস্তবায়নের মধ্যে দিয়ে তারা তাদের অভীষ্ট লক্ষে পৌঁছে গেছে।

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ভারত থেকে বৌদ্ধ উৎখাতে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র

বর্তমান ভারতের কর্তৃত্ব যাদের হাতে রয়েছে সেই ব্রাহ্মণজনগোষ্ঠী ভারতের ভূমি সন্তান নয়। এরা আর্য। আর্যরা ভারতের ভূমি সন্তান নয়– বহিরাগত। তারা অভাব দারিদ্র খাদ্য সংকট প্রাকৃতিক বিপর্যয় অথবা যুদ্ধজনিত কারণে বিতাড়িত হয়ে দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দিকে নতুন আশ্রয়ের সন্ধানে আসে। আর্যদের আগমন সম্পর্কে সাম্প্রতিক ধারণা হল খৃষ্টপূর্ব ৩ হাজার বছরের দিকে মধ্য অথবা পূর্ব ইউরোপের অংশে অথবা রাশিয়ার উরাল পর্বতমালার সমতল ভূভাগে ইন্দো ইউরোপীয় অথবা আর্য জাতির উদ্ভব হয়। অত্যাধিক শীতের জন্য হোক অথবা অন্য জাতির আক্রমনের ফলেই হোক এ আর্যরা পিতৃভূমি হতে দক্ষিণ পশ্চিমে ছড়িয়ে পড়তে বাধ্য হয়। সভ্যতার দিক দিয়ে এরা খুব উন্নত ছিল এমনটি নয়। এ ব্যাপারে শ্রী অমিত কুমার বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন– 'খৃস্টের জন্মের দু' হাজার বৎসর পূর্বে অর্থাৎ আজ হইতে প্রায় ৪, হাজার বৎসর পূর্বে ভারত বর্ষের উত্তর পশ্চিম সীমান্তের কাছে আর্য জাতির এক শাখা পশ্চিম পাঞ্জাবে উপনিবিষ্ট হন। তাহাদের পূর্বে এদেশে কোল ভিল সাত্ততাল প্রভৃতি অসভ্য জাতি এবং দ্রাবিড় নামক প্রধান সুসভ্য জাতি বাস করিত।'

এই দ্রাবিড়রাই ছিল ভারতের ভূমি সন্তান। এদেশে আগমনের পর দ্রাবিড়দের সাথে আর্যদের সংঘাত শুরু হয়। পর দেশে তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠিত করার জন্য আর্যদের সংগ্রাম শুরু হয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে আর্যদের সাথে দ্রাবিড়দের সংঘাত অব্যাহত থাকে। দূর দেশ থেকে ভয়সংকুল পথ অতিক্রম করার মধ্য দিয়ে সংকটের মধ্যে নিজেদের টিকিয়ে রাখার কৌশল অর্জন করে আর্যরা। দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার জাতিগত সংকটে একারণে তারা দক্ষতার সাথে দ্রাবিড়দের মুকাবিলা করতে সক্ষম হয়। এক পর্যায়ে তারা ভূমি সন্তান দ্রাবিড়দের উপর বিজয়ী হয়। কালক্রমে দ্রাবিড়দের সভ্যতা ও সাংস্কৃতি আর্যরা রপ্ত করে নেয় দুই সভ্যতার মিশ্রণে নতুন সাংস্কৃতিক ধারা এবং ধর্মীয় অনুভবের সূচনা হয়। ওদিকে পরাজিত দ্রাবিড়রা বনে জঙ্গলে আশ্রয় নেয় অথবা আর্যদের

www.pathagar.com

অধীনে লাঞ্ছিত হতে থাকে। আর্যরা পরাজিত দ্রাবিড়দের ওপর তাদের নির্দেশনা চাপিয়ে দেয়। আর্যদের প্রতিষ্ঠিত জাতিভেদ প্রথার সর্বনিম্ন স্তরে দ্রাবিড়দের স্থান দেয়া হয়। পিরামিডের শীর্ষে স্থান নেয় আর্যরা। সর্ব নিম্নে অবস্থান হয় দ্রাবিড়দের। পিরামিডের স্তর বিন্যাস হয় বিভিন্ন শ্রেণীর মানুষ দিয়ে পুরো পিরামিডের ভার বহন করতে হয়– দ্রাবিড়দের। পর্যায়ক্রমে দ্রাবিড়রা আর্যদের বিন্যাস্ত সমাজে হারিয়ে যায়। রুশ ঐতিহাসিক এ জেড ম্যানফ্রেডের মতে– সে যুগে ব্রাহ্মণদের কোন কর দিতে হত না। ক্ষত্রিয় শুদ্র প্রভৃতি জাতিকে ছোট লোক শ্রেণীর ধরা হত। নব্বই বছরের বৃদ্ধ ক্ষত্রিয়কে নয় বছরের ব্রাহ্মণের পদ সেবা করতে হতো। ব্রাহ্মণ ছাড়া অন্য জাতির কাছে তাদের উৎপাদনের ৫ অথবা ৬ ভাগের এক ভাগ কর আদায় করা হত। নর হত্যা করলে শিরোচ্ছেদ হতো বটে কিন্তু কোন ব্রাহ্মণ যদি শুদ্রকে হত্যা করতো তাহলে শুধু মাত্র সামান্য জরিমানা দিলেই চলতো। যেমন পোষা কুকুর মেরে ফেলার শাস্তিস্বরূপ কিছু জরিমানা হয়। এইভাবে নিম্নস্তরের অবস্থানকারী সমগ্র জনগোষ্ঠীর অধিকাংশ মানুষের জীবন দুর্বিসহ হয়ে ওঠে। আর্যরা সমকালীন সমাজ বিন্যাস্ত করে ধর্মীয় আবেশ সৃষ্টি করে। সে সময় বিবেক বহির্ভূত অন্ধ আবেগের দ্যোতনা সৃষ্টি করে নিত্য নবনব নিপিড়নমূলক ব্যবস্থা চাপিয়ে দেয়া হয় সাধারণ মানুষের ওপর। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে সাধারণ মানুষকে ব্রাহ্মণ্যবাদী নির্যাতন মুখ বুজে সহ্য করতে হয়।

অন্ধকারের পর যেমন আলো দেখা যায়, গ্রীষ্মের পর যেমন বর্ষা আসে অনুরূপ নির্যাতনমূলক ব্যবস্থা সম্বলিত সমাজে নির্যাতন বিরোধী প্রতিরোধ শক্তির সভ্যুদয় হয়। ইতিহাসের অমোঘ নিয়মে নিপিড়নমূলক ব্যবস্থার ধারক ব্রাহ্মণ্য সমাজে জন্ম নেয় গৌতম বুদ্ধ। রাজকীয় সুখ সাচ্ছন্দ এবং প্রভূত্বের ব্যঞ্জনা তাকে আটকে রাখতে পারল না। যুগ যুগান্তর ব্যাপী দক্ষিণ এশিয়ায় মানবতার লাঞ্ছনা এবং সাধারণ মানুষের মধ্যকার পুঞ্জিভূত দুঃখ ক্লেশ অসম্মান ও অবমাননা তার মধ্যে ভাবান্তরের সূচনা করে। তিনি রাজকীয় সুখ সম্ভোগের মোহ পরিত্যাগ করে দেশান্তরিত হন। এবং প্রচলিত নির্যাতনমূলক ব্যবস্থার বিপরীতে নতুন কোন ব্যবস্থার ছক অর্জন না হওয়া পর্যন্ত একনিষ্টভাবে চিন্তার গভীরে ডুব দিয়ে থাকেন। অতঃপর যখন নতুন ব্যবস্থার সূত্রসমূহের আবিষ্কার তার সন্তোষ্টির সীমায় এসে পড়ে তখন তিনি তার মত প্রচারে আত্মনিমগ্ন করেন। সমকালীন ঘুণে ধরা নিবর্তনমূলক সমাজ কাঠামোর বিপরীতে তার নতুন চিন্তা শোচিত

www.pathagar.com

বঞ্চিত নির্যাতীত জনগোষ্ঠীর মধ্যে নবতর এক বিপ্লবের বার্তা হয়ে অনুরনিত হয়ে থাকে। পর্যায়ক্রমে বৌদ্ধবাদ সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে। ফলে শোষণ ও বিবর্তনমূলক সমাজ কাঠামোর ধারক কায়েমী স্বার্থবাদী শক্তি তাদের প্রভূত্ব হারানোর ভয়ে ভীত হয়ে পড়ে এবং দক্ষিণ এশিয়ায় মানবিক বিপ্লব প্রতিহত করার জন্য বৌদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হয়। বৌদ্ধদের ধর্মবিরোধী নাস্তিক এবং বিদ্রোহী শক্তি হিসেবে চিহ্নিত করে বৌদ্ধ বিরোধী উম্মাদনা সৃষ্টি করে বৌদ্ধদের উৎখাতে সার্বিক উদ্যোগ গ্রহণ করে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা।

ভারত জনের ইতিহাসে বিনয় ঘোষ লিখেছেন– 'বেদের বিরুদ্ধে বিরাট আক্রমণ হয়েছিল এক দল লোকের দ্বারা। তাদের বলা হতো লোকায়ত বা চার্বাক। বৌদ্ধগ্রন্থে এদের নাম আছে। মহাভারতে এদের নাম হেতুবাদী। তারা আসলে নাস্তিক। তারা বলতেন পরকাল আত্মা ইত্যাদী বড় বড় কথা বেধে আছে কারণ ভণ্ড ধুর্ত ও নিশাচর এই তিন শ্রেণীর লোকরাই বেদ সৃষ্টি করেছে, ভগবান নয়। বেদের সার কথা হল পশুবলি। যজ্ঞের নিহত জীবন নাকি স্বর্গে যায়। চার্বাকরা বলেন যদি তাই হয় তাহলে যজ্ঞকর্তা যা জজমান তার নিজের পিতাকে হত্যা করে স্বর্গে পাঠান না কেন...

'... এই ঝগড়া বাড়তে বাড়তে বেদ ভক্তদের সংগে বৌদ্ধদের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায় ঝাপ দিতে হয়। বৌদ্ধ ধর্মাবালম্বীরা যে নাস্তিক চার্বাকদের উক্তিতেই প্রমাণ রয়েছে। অতএব বৌদ্ধরা মূর্তিপূজা যজ্ঞবলি বা ধর্মাচার নিষিদ্ধ করে প্রচার করছিল পরকাল নেই জীব হত্যা মহাপাপ প্রভৃতি। মোটকথা হিন্দু ধর্ম বা বৈদিক ধর্মের বিপরীতে জাতি ভেদ ছিল না।'

গতিশীল বৌদ্ধবাদ যখন জন সাধারণের গ্রহণযোগ্যতা পেতে শুরু করল তখন থেকে শরু হল ব্রাহ্মণ্যবাদের সাথে বৌদ্ধবাদের বিরোধ। সংঘাত ক্রমশ তীব্র থেকে তীব্র হয়ে উঠল। উভয় পক্ষই পরস্পরকে গ্রাস করতে উদ্যত হল। হিন্দুরা তাদের রাজশক্তির আনুকুল্য নিয়ে বৌদ্ধদের উৎখাতের প্রানন্ত প্রয়াস অব্যাহত রাখে। কখনো কখনো বৌদ্ধরা রাজশক্তির অধিকারী হয়ে তাদের মতবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার সর্বাত্মক প্রয়াস নেয়। বৌদ্ধবাদ কেন্দ্রীক নিপিড়ীত জনগোষ্ঠীর - ভাঙন সৃষ্টির জন্য হিন্দুরা চানক্য কৌশল অবলম্বন করে। বৌদ্ধদের মধ্যকার অধৈর্যদের ছলেবলে কৌশলে উৎকোচ ও অর্থনৈতিক আনুকুল্য দিয়ে বৌদ্ধবাদের চলমান স্রোতের মধ্যে ভিন্ন স্রোতের সৃষ্টি করা হয় যা কালক্রমে বৌদ্ধদের বিভক্ত করে দেয়। বৌদ্ধবাদকে যারা একনিষ্ঠভাবে আঁকড়ে থাকে তাদেরকে বলা হতো

www.pathagar.com

হীনযান। আর হিন্দু ষড়যন্ত্রের পাঁকে যারা পা রেখেছিল যারা তাদের বুদ্ধি পরামর্শ মত কাজ করছিল তাদেরকে ব্রাহ্মণ্য সমাজ আধুনিক বলে অভিহিত করে। এরা মহাযান নামে অভিহিত। এরাই প্রকৃত পক্ষে পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়। মহাযান নতুন দল হিন্দুদের সমর্থন প্রশংসা পৃষ্ঠপোষকতা পেয়ে বৌদ্ধবাদের মূল আদর্শ পরিত্যাগ করে মূর্তিপূজা শুরু করে। ফলে বৌদ্ধ ধর্মের ভিত্তিমূল ও নড়ে যায়। বৌদ্ধদের এই শ্রেণীকে কাজে লাগিয়ে প্রথমত নির্ভেজাল বৌদ্ধবাদীদের ভারত ভূমি থেকে উৎখাত করে এবং পরবর্তীতে মহাযানদের উৎখাত করে। কিন্তু যারা একান্তভাবে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের আশ্রয় নিয়ে বৌদ্ধ আদর্শ পরিত্যাগ করে হিন্দু সভ্যতা ও সাংস্কৃতির মধ্যে তাদের জাতি সত্তাকে বিসর্জন দেয় তারাই টিকে থাকে। সে কারণে আজ বৌদ্ধের সংখ্যা বৌদ্ধবাদের জন্মভূমিতে হাতে গোনা।

কোন জাতি তার আদর্শ ও মূলনীতি পরিত্যাগ করে অপর কোন জাতির সভ্যতা ও সংস্কৃতির মধ্যে অবগাহন করলে সেই জাতিকে স্বাতন্ত্রবিহীন হয়ে ধ্বংসের অতল গহ্বরে নিক্ষিপ্ত হতে হয়। ছয়শতকে যখন আরবে জাহেলিয়াতের অন্ধকার বিদীর্ণ করে ইসলামের অভ্যুদয়– হয়েছে সে সময় বাংলায় চলছিল বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞ। ৬০০ থেকে ৬৪৭ সাল পর্যন্ত বাংলার শিবভক্ত রাজা শশাঙ্ক বাংলা থেকে বৌদ্ধ ধর্মকে উৎখাতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছিলেন বুদ্ধদেবের স্মৃতি বিজড়িত গয়ার বোধিদ্রুম বৃক্ষ গুলি নিয়ে সমূলে উৎপাটন করেন। যে বৃক্ষের উপর সম্রাট অশোক ঢেলে দিয়েছিলেন অপরিমেয় শ্রদ্ধা সেই বৃক্ষের পত্র পল্লব মূলকাণ্ড সবকিছু জালিয়ে ভস্মীভূত করা হয়। পাটলিপুত্রে বৌদ্ধের চরন চিহ্ন শোভিত পবিত্র প্রস্তর ভেঙে দিয়েছিলেন তিনি। বুশিনগরের বৌদ্ধ বিহার থেকে বৌদ্ধদের বিতাড়িত করেন। গয়ায় বৌদ্ধ মন্দিরে বৌদ্ধদেবের মূর্তিটি অসম্মানের সঙ্গে উৎপাটিত করে সেখানে শিব মূর্তি স্থাপন করেন। অক্সফোর্ডের Early History of India গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে রাজা শশাঙ্ক বৌদ্ধ মঠগুলি ধ্বংস করে দিয়ে মঠ সন্নাসীদের বিতাড়িত করেছিলেন। গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান নেপালের পাদদেশ পর্যন্ত বৌদ্ধ নিধন কার্যক্রম চালিয়েছিলেন কট্টর হিন্দু রাজা শশাঙ্ক। 'আর্য্যা মুখশ্রী মূলকল্প' নামক গ্রন্থে বলা হয়েছে শুধুমাত্র বৌদ্ধ ধর্ম নয় জৈন ধর্মের ওপরও উৎপীড়ন ও অত্যাচার সমানভাবে চালিয়েছিলেন তিনি।

জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের সাংস্কৃতিক চেতনা একই রকম। উভয় ধর্মে জীব হত্যা নিষেধ। আল্লাহ সম্বন্ধে তাদের ধারণা নেতিবাচক। এসত্ত্বেও ভারত থেকে বৌদ্ধ

www.pathagar.com

ধর্মকে উৎখাত করা হল এবং বৌদ্ধদের নিহত অথবা বিতাড়িত হতে হল অথচ মহাবীরের ধর্ম জৈন আজো ভারতে টিকে রয়েছে। এটা বিস্ময়কর মনে হলেও এর পেছনে কারণ বিদ্যমান রয়েছে। সেটা হল বৌদ্ধরা শুরু থেকে হিন্দুদের দানবীয় আক্রমণ প্রতিরোধ করেছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী তারা প্রতিক্রিয়াশীল-চক্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে। পক্ষান্তরে জৈনরা হিন্দুদের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় অবতীর্ণ হয়নি। হিন্দুদের সাথে সহঅবস্থান করেছে তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি সভ্যতা সাংস্কৃতি জলাঞ্জলি দিয়ে। তারা মেনে নিয়েছে হিন্দুদের রীতিনীতি ও সাংস্কৃতি তারা ব্যবসায়ের হালখাতা গনেশ ঠাকুরকে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন দুর্গাকালি স্বরস্বতী পূর্জা পার্বন হিন্দুদের মত উদযাপন করতে শুরু করে। ভারত জনের ইতিহাসে উল্লেখ রয়েছে– 'হিন্দু মতে যদিও জৈন ও বুদ্ধ উভয়ে নাস্তিক তাহা হইলেও হিন্দু ধর্মের সহিত উভয়ের সংগ্রাম তীব্র ও ব্যাপক হয়নি। হিন্দুদের বর্নাশ্রম হিন্দুদেব দেবী এবং হিন্দুর আচার নিয়ম তাহারা অনেকটা মানিয়া লইয়াছেন এবং রক্ষা করিয়াছেন।'

আজকের হিন্দু ভারত তাদের পূর্ব পুরুষদের কৃতকর্ম মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়ে নিজেদের ধুয়া তুলসী পাতা হিসাবে উপস্থাপন করার অপচেষ্টায় লিপ্ত রয়েছে। নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশ দ্বারে একটি মিথ্যা বানোয়াট ও অমার্জনীয় তথ্য ঝুলিয়ে রাখা হয়েছে। এতে বলা হয়েছে যে... বিশ্ববিদ্যালয়টি ১১০০ খৃস্টাব্দে বখতিয়ার খিলজি ধ্বংস করেছেন। ভারতীয় ও প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ বখতিয়ারের এই আক্রমনের তারিখ দিয়েছে ১১০০ খৃস্টাব্দ। অথচ স্যার উলসলি হেগ বলছেন বখতিয়ার উদন্তপুরী আক্রমণ করেছেন ১১৯৩ খৃস্টাব্দে আর স্যার যদুনাথ সরকার এই আক্রমণের সময়কাল বলছেন ১১৯৯ খৃস্টাব্দ। মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দুভারত মুসলিম বিজেতাদের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য ইতিহাসের তথ্য বিকৃত করতে করতেও কুণ্ঠিত নয়।

প্রকৃত ঘটনা হল একজন ব্রাহ্মণ কর্তৃক সম্রাট হর্ষবর্ধনকে হত্যা তারপর ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ক্ষমতা দখল করেন। এই সময় ব্রাহ্মণদের নেতৃত্বে একদল উগ্রবাদী ধর্মোন্মাদ হিন্দু নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় ধ্বংস ও ভস্মীভূত করে। ৪০০ খৃষ্টাব্দে চীনা পর্যটক ফাহিয়েন যখন গান্ধারা সফর করেন তখন উত্তর ভারতে বিকাশমান বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবোজ্জল অধ্যায় দেখতে পান। কিন্তু ৬২৯ খৃস্টাব্দে অপর একজন চীনা বৌদ্ধ সন্নাসী ১২০ বছর পর নাটকীয় পরিবর্তন লক্ষ করেন। ৬২৯ সালে আর একজন চীনা পর্যটক গান্ধারা সফর করে বৌদ্ধবাদের করুণ পরিণতি দেখে মানসিকভাবে বিপন্ন হন। বখতিয়ার বৌদ্ধদের ওপর কোন ধরনের

www.pathagar.com

নির্যাতন করেছেন এমন কথা ইতিহাস বলে না বরং বৌদ্ধদের ডাকে বঙ্গ বিজয়ের জন্য বখতিয়ার সেনা অভিযান পরিচালনা করেন। এমনকি বিজয়ান্তে তিনি বৌদ্ধদের কাছ থেকে জিজিয়া কর আদায় থেকে বিরত থাকেন।

বাংলায় ১৪ শতকের অভিজ্ঞতা

১২ শতকে বাংলার ইতিহাসের দিকে চোখ ফেরালে আমরা দেখতে পাব ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির উত্থান। ১৩ শতকের প্রথম দিকে ইখতিয়ার উদ্দিন মোহাম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ের মধ্য দিয়ে বাংলায় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার দুশ' বছরের মধ্যে মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বিধ্বস্ত হিন্দু শক্তির উত্থান সম্ভব হয়নি। কিন্তু ১৫ শতকে রাজাগনেশ আকস্মিক উত্থান কিভাবে সম্ভব হল? এ জিজ্ঞাসার জবাব পেতে সমকালীন ইতিহাস বিশ্লেষণের প্রয়োজন হবে।

উপমহাদেশের বৌদ্ধবাদের উৎখাতের পর বহিরাগত আর্য অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যবাদীরা এখানকার মূল অধিবাসীদের উপর একচ্ছত্র আধিপত্য বিস্তারে সক্ষম হলেও অপরাজেয় শক্তি হিসাবে মুসলমানদের উপস্থিতি তাদের স্বপ্ন গুঁড়িয়ে দেয়। মুসলমানরা বহিরাগত ব্রাহ্মণ সৃষ্ট বর্ণবাদের শিকার এদেশের সাধারণ মানুষকে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার সুযোগ করে দেয়। বিদ্ধস্ত অবস্থায় ছোট ছোট অবস্থানে হিন্দু শক্তি তার বিক্ষত অস্তিত্ব কোন মতে ধরে রাখলেও বৃহত্তর পরিসরে শেষ পর্যন্ত বাংলাই ছিল ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তির দৃশ্যমান সর্বশেষ দূর্গ। সব শেষে বাংলা থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি উৎখাতের পর তাদের প্রাধান্য বিস্তারে রাজনৈতিক কাঠামো ভেঙে পড়ে। এসত্বেও তাদের পুনরুত্থানের আকাঙ্খা চূড়ান্তভাবে বিলুপ্ত হয়নি। সংগ্রাম সংঘাতের মধ্য দিয়ে আধিপত্য বিস্তারের ব্যাপারে কয়েক সহস্রাব্দের অভিজ্ঞতা ও কৌশল পূঁজি করে দুর্দমনীয় মুসলিম শক্তি বিনাশের জন্য সময় ও সুযোগের অপেক্ষা করতে থাকে। সেই সুযোগটা এসে যায় ইলিয়াস শাহী সালতানাতের মুসলিম শক্তি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রবণতার মধ্য দিয়ে। মোহাম্মদ তুগলকের শাসনামলের শেষ পর্যায়ে উপমহাদেশের মুসলিম শক্তি কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে বাংলার ইলিয়াস শাহী সালতানাতকে ভয়ঙ্কর সংকটের সম্মুখীন হতে হয়। যুদ্ধ ও অবরোধের মুকাবিলায় ব্যর্থ হয়ে ইলিয়াস শাহকে বিপর্যস্ত হতে হয়। এই বিপর্যয়কর অবস্থার মধ্যে নিজস্ব শক্তি পূনর্গঠন ও সুসংহত করার জন্য সুলতানকে স্থানীয়ভাবে সৈন্য সংগ্রহ করতে হয় হিন্দু জন গোষ্ঠীর মধ্য থেকে। এ কারণে

www.pathagar.com

হিন্দু প্রধানদের সদিচ্ছা ও সমর্থনের প্রয়োজন হয়ে পড়ে এবং রাষ্ট্রীয় নীতি কৌশল পূনর্বিন্যাসের হিন্দু প্রধানদের স্বার্থ বিবেচনায় আনতে হয়।

আর এ সময়ই রাজা গনেশ সুলতানের দরবারে স্থান করে নেয়। শুধু গনেশই নয়, এই সাথে আরো কতিপয় প্রভাবশালী হিন্দু ইলিয়াস শাহের দরবারে সংশ্লিষ্ট হয়। মুহাম্মাদ শাহের পুত্র ফিরোজশাহ তুগলক বাংলা পুনরুদ্ধার প্রয়াসে বিহার আক্রমণ করার ফলে ইলিয়াস শাহ এবং তার পুত্র সিকান্দার শাহ যে করুন অবস্থার সম্মুখীন হন সেটা অবলোকন করে রাজা গনেশ তার উজ্জ্বল ভবিষ্যতের ব্যাপারে আশাবাদী হয়ে উঠেন এবং গভীর মনোযোগী হয়ে উপমহাদেশের সার্বিক পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করতে থাকেন। ফিরোজ শাহ তুগলকের মৃত্যুরপর দিল্লীর কর্তৃত্ব অস্বীকার করে বেশ কটি স্বাধীন সালতানাতের অভ্যুদয় এবং তৈমুর লং কর্তৃক দিল্লী লুণ্ঠনসহ বেশ কিছু ঘটনাপ্রবাহ বাংলায় কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার সুপ্ত আকাঙ্খা ব্রাহ্মণ্য জনগোষ্ঠীর মধ্যে বহমান হয়ে উঠে। সালতানাতের রাজনীতির সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে রাজা গনেশের নেতৃত্বে হিন্দু রাজন্যবর্গ তাদের কুট কৌশল প্রয়োগ করে শাহী দরবারের সভাসদদের পারস্পরিক দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে ঠেলে দেয়। গিয়াস উদ্দিন আযম শাহের শাসনামলের ঔদার্যের ফলে রাজা গণেশ প্রাধান্যে এসে যায়। সুলতানের মৃত্যু অথবা অপমৃত্যুর স্বল্প সময়ের ব্যবধানে সালতানাতের সবচেয়ে বিচক্ষণ মন্ত্রী খানজাহান ইয়াহিয়ার হত্যাকান্ড সংঘটিত হওয়ার পর ১৪১১-১২ সাল নাগাদ রাজা গনেশ সালতানাতের রাজনীতির পুরো ভাগে এসে পড়ে। ধারণা করা হয় যে এসব অপমৃত্যু ও হত্যা কাণ্ডের অন্তরালে রাজা গনেশের চক্রান্ত বিদ্যমান ছিল। সাইফ আল দ্বীন হামযার স্বল্পকালীন শাসনামলে পরিস্থিতি আরো ভয়াবহ হয়ে ওঠে। হামযা শাহকে কোন এক পর্যায়ে রাজা গণেশ ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করেন। ইতিপূর্বে রাজা গণেশ হামযা শাহকে নামে মাত্র ক্ষমতাসীন রেখে সমস্ত ক্ষমতা নিজে কুক্ষিগত করে রাখেন। এমন অরাজক পরিস্থিতির মধ্যে হামযা শাহ এর গোলাম শিহাব সাইফুদ্দিন রাজা গণেশের গভীর ষড়যন্ত্র অনুধাবন করেন এবং প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নেন। শিহাব সাইফুদ্দিন রাজা গণেশের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে এবং রাজাকে সাময়িকভাবে স্তব্দ করে দিতে সক্ষম হন। অতঃপর সিহাব সাইফুদ্দিন বায়জিত শাহ নাম ধারণ করে ক্ষমতা দখল করেন। কিন্তু বৈদিক চক্রের কাছে অবশেষে তাকে পরাজিত হতে হয়। রাজা গনেশ তাকে ক্ষমতাচ্যুত এবং হত্যা করেন। বাইজীদ-এর সন্তান আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ গনেশের

www.pathagar.com

অপকর্মের বিরুদ্ধে শক্তিশালী অবস্থান নেন এবং প্রতিরোধ গড়ে তুলেন। ক্ষমতার এই টানা পোড়ন ৪ বছর স্থায়ী হয়। রাজা গনেশের কুট চক্রের কাছে অবশেষে আলাউদ্দিন ফিরোজ শাহ পরাস্ত হন এবং রক্তাক্ত পরিণতি তার ভাগ্যে জুটে।

ক্ষমতার একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে রাজা গনেশ মুসলমানদের উচ্ছেদ করার মহা পরিকল্পনা গ্রহণ করেন। প্রথমে তিনি তাদের প্রতি খরগ হস্ত হয়ে উঠেন যারা মোটামুটি জনগণের সাথে সম্পৃক্ত ছিল। অতি ঠাণ্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে মুসলিম নিধন শুরু করা হয় এবং বহু জ্ঞানী-গুণীদের হত্যা করা হয়। সমকালীন প্রভাবশালী মাশায়েক শেখ বদরুল ইসলাম এবং তার পুত্র ফাইজুল ইসলাম রাজাকে অভিনন্দন জানাতে অস্বীকার করলে তাদেরকে দরবারে উপস্থিত হওয়ার নির্দেশ দেয়া হয়। রাজা গনেশ তার শ্রেষ্ঠত্বকে অস্বীকার করার অপরাধে পিতা পুত্রকে মৃত্যুদণ্ড প্রদান করেন। একই দিনে রাজার নির্দেশে অসংখ্য গুণি জ্ঞানী মানুষকে নৌকা ভর্তি করে মাঝ দরিয়ার ডুবিয়ে হত্যা করা হয়। হেমিলটন বুকানন লিখেছেন নির্যাতন ও নিষ্পেষনের চূড়ান্ত পর্যায়ে বাংলার নেতৃস্থানীয়রা শেখের চত্তরে ভিড় জমায়। নূর কুতুবুল আলম দ্বিরুক্তি না করে জৌনপুরের সুলতানের প্রতি বিপর্যস্ত মুসলিম জনগোষ্ঠীকে উদ্ধারের আমন্ত্রণ জানান। জৌনপুরের সুলতান ইব্রাহিম সসৈন্যে ফিরোজপুর উপকণ্ঠে এসে ডেরা গাড়লেন। রাজা গণেশ মুসলিম সৈন্যদের প্রতিরোধের দুঃসাহস করলেন না। রাজা গনেশ নুর কুতুবুল আলমের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করলেন। শেখ বললেন রাজা গণেশের ইসলাম গ্রহণ ছাড়া জৌনপুরের সেনাবাহিনী প্রত্যাহৃত হবে না। প্রথমত রাজা গণেশ সম্মত হলেও তার স্ত্রীর প্ররোচনায় ইসলাম গ্রহণের ব্যাপারে পিছিয়ে গেলেন। বিনিময়ে তার পুত্র যদুকে ইসলামে দাখিল করলেন। শায়েখ যদুকে ইসলামে দীক্ষিত করে নতুন নাম দিলেন জালাল উদ্দিন। জালাল উদ্দিন মোহাম্মদ শাহকে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করে জৌনপুরের সৈন্যরা বাংলা ত্যাগ করে। বাংলা থেকে জৌনপুরের সৈন্য প্রত্যাহারের পর রাজা গনেশ পুনরায় স্বরূপে আবির্ভূত হলেন নতুন করে শুরু হল মুসলিম নিপিড়ন। রাজা গনেশ তার ধর্মান্তরিত সন্তান যদুকে ব্রাহ্মণদের পরামর্শে প্রায়শ্চীত্য প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে স্বধর্মে প্রত্যাবর্তন করানোর উদ্যোগ নেন। তার মুসলিম বিরোধী কর্মকাণ্ড এমনই ভয়ংকর হয়ে উঠে যে নুর কতুবুল আলমের পুত্র শেখ আনোয়ারকে ফাসীতে ঝুলানো হয়। এই একই দিনে গনেশ বিরোধী ক্ষোভ তীব্র হয়ে এমন ভয়াবহ

www.pathagar.com

রূপ নেয় যে তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ ও অভ্যুত্থান সংঘটিত হয়ে গনেশ উল্টে যায়। রাজা গণেশ শুধু উৎখাতই হলেন না তাকে হত্যা করা হল এবং জালাল উদ্দিন মুহাম্মদের হাতে ক্ষমতা তুলে দেয়া হল। রাজা গণেশের পুত্র নব দিক্ষীত মুসলমান জালাল উদ্দিন দক্ষ সুলতান হিসাবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন। তিনি পুনরায় বাংলার সালতানাতকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর দাঁড় করালেন। বাংলার ভিন্নমুখী স্রোত আগের মতই প্রবাহিত হতে শুরু করে।

উপমহাদেশ প্রসঙ্গ

১১৯৭ থেকে ১৫৫২ সাল পর্যন্ত তুর্ক আফগান মুসলমানরা সমগ্র উপমহাদেশে তাদের আধিপত্য বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু যখন তাদের ভোগ বিলাস ঘিরে ধরে তখনই তারা দুর্বল হয়ে পড়েন এবং অনৈক্য ও ভ্রাতৃঘাতী লড়াইয়ের মধ্য দিয়ে বিপর্যস্ত হতে থাকেন। মুসলিম শক্তির হাতে মার খাওয়া মধ্য ও উত্তর ভারতের হিন্দু রাজা মাহারাজারা সংঘবদ্ধ হতে থাকে মুসলিম শক্তিকে পর্যুদস্ত করার জন্য। ওদিকে মধ্য এশিয়ার সংগ্রামী পুরুষ যে তার রাজ্য সমরখন্দও বোখারা হারিয়ে নিরাশ্রয় ভবঘুরের মত পথে পথে ঘুরছিলেন, নিজের শক্তি সামর্থ অর্জন করে তিনি পুনরায় মধ্য এশিয়ায় নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেন। সেই জহির উদ্দিন মোহাম্মদ বাবর ভারত পর্যন্ত ধেয়ে আসেন। ১৫৬২ সালে তিনি পানিপথের প্রথম যুদ্ধে ইবরাহিম লোদীকে পরাজিত করে দিল্লী দখল করেন। দিল্লীতে তখনও তিনি পরিপূর্ণ শিকড় গাড়তে সক্ষম হননি। দিল্লী দখলের ১ বছরের মাথায় রাজপুত নামালব ও মধ্য ভারতের ১২০ জন রাজা মহারাজা সংঘবদ্ধভাবে মুসলিম শক্তি উৎখাতের জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করেন। তাদের ৮০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫শ' রণহস্তী এবং অসংখ্য পদাতিক বাহিনীর মুকাবিলায় বাবরের মাত্র ১০ হাজার সৈন্য মরণপন লড়াই করে আগ্রার অদুরে খানুয়ার যুদ্ধে সংঘবদ্ধ হিন্দু শক্তি বিদ্ধস্ত হওয়ার পর শক্তি দিয়ে মুসলমানদের মুকাবিলার উচ্চাশা ব্রাহ্মণ্যবাদীদের মন থেকে উধাও হয়ে যায়। অতঃপর তারা ভিন্ন কৌশল অবলম্বন করতে শুরু করে। তাদের পরিক্ষিত কৌশল তিন প্রজন্ম প্রকল্প বাস্তবায়ণে অধিক মনোযোগী হয়। এ প্রকল্প আর কিছু নয় তিন প্রজন্মের মধ্যে মুসলমানদেরকে বিপথগামী করে নিজেদের সহায়ক শক্তিতে পরিণত করা। তিন প্রজন্ম প্রকল্প সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হল।

www.pathagar.com

তিন প্রজন্ম প্রকল্প

প্রথম প্রজন্মে একজন ১০০% মুসলমান পুরুষের সাথে একজন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিতে হবে তাদের মিলনে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে ৫০% মুসলমান এবং ৫০% হিন্দু। দ্বিতীয় প্রজন্মে সেই ৫০% মুসলমানের ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে হলে যে শংকর সন্তান জন্মাবে সে হবে ১৭% মুসলমান ও ৮৩% হিন্দু। এবং তৃতীয় প্রজন্মে সেই ১৭% মুসলমানের সাথে কোন ১০০% হিন্দু নারীর বিয়ে দিলে পরবর্তী প্রজন্মের সন্তানটি সামাজিক সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় জীবনে হবে ৯৩% হিন্দু এবং ৭% মুসলমান। অর্থাৎ তিন প্রজন্ম শেষ হতে না হতেই মুসলমানিত্ব শেষ হয়ে যাবে। (ইতিহাসের অন্তরালে ঃ ফারুক মাহমুদ, পৃ.১৯৭)

বাস্তবায়ন শুরু

শেষ অবধি ব্রাহ্মণ্য সমাজ ও হিন্দু রাজন্যবর্গ সম্মুখ সমর পরিহার করে মুসলমানদের চরিত্র হননের বিস্তৃত পরিকল্পনা গ্রহণ করে। সেই চরিত্র হনন প্রক্রিয়া শুরু হয় হুমায়ুনের শাসন কাল থেকে। হুমায়ুন শের শাহর কাছে পরাজিত হয়ে পলাতক জীবন যাপনকালে হিন্দু রাজা মহারাজাদের সাহচর্যে এবং ইরানে আশ্রিত জীবন যাপন কালে শরাব সাকী এবং হেরেম জীবনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েন। তার দিল্লী পুনর্দখলের পর হেরেম জীবনের সুখানুভূতির আকাঙ্ক্ষা তীব্র হয়ে ওঠে। পিতা বাবরের সংগ্রামী জীবনের পথ পরিহার করে অবশেষে হুমায়ুন ভোগ বিলাসী জীবন যাপনের দিকে প্রবলভাবে ঝুঁকে পড়ে। রাজপুত ও হিন্দু রাজা মহারাজা এবং উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা সে সময় যাবতীয় প্রমোদ উপাচার সুরা এবং নৃত্য গীত পটিয়সী সুন্দরী সরবরাহের যোগানদার হয়ে উঠে। তাদের সরবরাহকৃত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত চতুর রমনীরা তাদের সুনিপূণ অভিনয় ও চাতুরী দিয়ে শুধু মুঘল সম্রাটই নয় আমীর ওমরাহদের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং পরবর্তীতে মুঘল রাজনীতিকে পঙ্কিলতার আবর্তে নিক্ষেপ করে। অবশেষে হুমায়ুনের মৃত্যু ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীদের জন্য বড় রকমের সুযোগ এনে দেয়। ১৩ বছরের কিশোর আকবর তখনো যার মধ্যে ভাল মন্দ উপলব্ধি করার শক্তি সুসংহত হয়নি এমন একজন অশিক্ষিত নাবালক ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলেন। এই অশিক্ষিত কিশোর সম্রাটকে রাজপুত হেরেম বালারা তাদের রূপ যৌবন ছলাকলা দিয়ে বিভ্রান্তির দিকে টেনে নিয়ে চলে সফলভাবে। হিন্দু দর্শন ও জীবনাচার

www.pathagar.com

আকবরের মন মগজকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। রাজা মহারাজাদের অনেকেই আকবরের হাতে ভগ্নী ও কন্যা সম্প্রদান করে মুঘল পরিবারের আত্মীয়তার সম্পর্ক গড়ে তুলে। জয়পুরের রাজা বিহারী মল (মান সিংহের পিতামহ) তার কন্যা জয়পুরী বেগমকে বিয়ে দেন ১৯ বছরের তরুণ সম্রাট আকবরের সাথে। এই আত্মীয়তার সুবাদে পিতা পুত্র এবং পৌত্র যোগ দান করেন আকবরের সেনাপতি পদে। বিকানীর ও জয়সলমীরের রাজারাও আকবরকে কন্যা দান করেন। মানসিংহ তার বোন রেবা রানীকে বিয়ে দেন জ্যেষ্টপুত্র ভাবী সম্রাট জাহাঙ্গীরের সাথে এবং কন্যাকে বিয়ে দেন সম্রাট জাহাঙ্গীরের জ্যেষ্ট পুত্র ভাবী সম্রাট খসরুর সাথে। (An Advanced history : Re Mayodan, P-441-43)

উত্তর মধ্য ভারতের অন্যান্য রাজা মহারাজারা ও এই মহাজন পন্থা অনুসরণ করে মূঘল যুবরাজ ও ওমরাহদের আত্মীয়ভুক্ত হন। অতঃপর নিকটাত্মীয়ের দাবীতে মুঘল বাহিনীর প্রায় সবগুলো গুরুত্বপুর্ণ সেনাপতির পদগুলো ব্রাহ্মণ্যবাদীদের করায়ত্ত হয়। তারা সোয়া তিনশত বছর ধরে সারা ভারতে জেঁকে বসা তাদের পুরানো শত্রু তুর্ক আফগান মুসলমানদের নির্মূল করেন মুঘলদের সাথে নিয়ে। রাজ দরবারে ফৈজী আবুল ফজল প্রমুখ আমীর ওমরাহের প্রতিপক্ষে বীরবল ও টোডর মল হিন্দু সভাসদবর্গ আসন গ্রহণ করে। (ইতিহাসের অন্তরালে ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ১৯৭)

জাহাঙ্গীরের সময় নুরজাহান এবং আসফ জাহর রাজনৈতিক তৎপরতা এবং শায়েখ আহমদ শরহিন্দের বলিষ্ট ভূমিকায় ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের দূর্নিবার অগ্রযাত্রা অনেকখানি ব্যাহত হলেও মুঘল প্রাসাদে আকবরের আমলে যে বিষ বৃক্ষ রোপিত হয়েছিল সেটা ইতিমধ্যে মহীরুহে পরিণত হয়ে গেছে। ভোগ বিলাসী আত্ম সর্বস্ব যুবরাজ ও আমীর ওমরাহ প্রাসাদ ষড়যন্ত্র ও আত্মঘাতী সংঘাতের মধ্য দিয়ে আত্মবিনাশের জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। এই সুযোগে মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করে হিন্দু সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার জন্য হয়ে ওঠে তৎপর রাজপুত, জাঠ ও শিখ সম্প্রদায়। এর পেছনে সক্রিয় ছিল বর্ণ হিন্দুরা। যে ভাবে বৌদ্ধ ধর্মালম্বীদেরকে ভারতের মাটি থেকে উৎখাত করা হয়েছিল অনুরূপ পন্থায় মুসলিম শক্তিকে উৎখাত করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। 'মারাঠারা সমগ্র মধ্য ভারত জয় করে। দিল্লী শহর লুণ্ঠন করে। মারাঠা রাজপুত জাঠ শিখদের বিভিন্ন সসস্ত্র বাহিনী, উপবাহিনী সমগ্র মধ্য পশ্চিম ও উত্তর ভারতের মুসলিমদের অসংখ্য মসজিদ ধ্বংস করে, সম্পদ লুণ্ঠন করে এবং তাদেরকে

www.pathagar.com

দলে দলে হত্যা করতে থাকে।' কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুঘলদের প্রাসাদ ষড়যন্ত্র থেমে থাকেনি। তারা এবং আমীর ওমরাহ সকলে নিজেদের নিয়ে বিব্রত হয়ে পড়ে। উপমহাদেশের মুসলমানদের এই নিরূপায় অবস্থায় দিল্লীর মুজাদ্দিদ শাহ ওয়ালিউল্লাহ দেহলভীর আহ্বানে আফগান বীর আহমদ শাহ আবদালী পর পর ৯ দফা ভারত আক্রমণ করে মারাঠাদের ঔদ্ধত্য গুড়িয়ে দেয়। দিল্লীর সন্নিকটে একটি রণ ক্ষেত্রে ১ লক্ষ মারাঠা সৈন্য প্রাণ হারায়। কিন্তু এসত্ত্বেও তাদের মুসলিম বিধ্বংসী তৎপরতা অব্যাহত থাকে। তবে আগের দুর্নিবার গতি অনেকটা হ্রাস পায়। কিন্তু সুবাহ বাংলায় সেই একই তৎপরতা প্রচ্ছন্নভাবে সমান গতিতে এগিয়ে চলে। নবাবদের পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় তাদের অজ্ঞাতে তাদের উৎখাতের ষড়যন্ত্র ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে উঠে। একদিকে পর্যায়ক্রমিক ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র উত্তরোত্তর শক্তি সঞ্চর করে, অন্যদিকে 'দক্ষিণের পথ ধরে বর্গী বলে অভিহিত মারাঠা বাহিনী সুবাহ বাংলা অবধি লুটতরাজ চালায়। তাদের শিকার হয়েছিল সুবাহ বাংলার সম্পদশালী মুসলিম পরিবারগুলো।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়

পলাশী বিজয়ের পটভূমি

পলাশী বিপর্যয়ের মূল নায়ক মীরজাফর নয় মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের স্বৈরাচার শোষণ, লুণ্ঠণ এবং আধিপত্যের অবসান হয় মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার পর। তাদের লুপ্ত শক্তি পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ ইতিহাসে আমরা স্পষ্ট দেখতে পাই কখনো প্রকাশ্যে আবার কখনো নেপথ্যে। সম্মুখ সমরে মুসলমানদের পরাস্ত করার সর্বশেষ প্রয়াস ছিল আগ্রার অদূরে খানুয়ায় বাবুরের সাথে যুদ্ধ। উত্তর ও মধ্য ভারতের হিন্দু রাজা ও মহারাজাদের সম্মিলিত বাহিনীর ৮০ হাজার অশ্বারোহী এবং ৫০০ রণ হস্তী সম্রাট বাবুরের ১০ হাজার সৈন্যের প্রতিরোধের মুখে বিদ্ধস্ত হওয়ার পর ব্রাহ্মণ্যবাদীরা সম্মুখ সমর পরিহারের নীতি অবলম্বন করে। অভীষ্ট লক্ষে পৌছানোর জন্য তারা অতি ধৈর্য্য সহকারে নেপথ্য ষড়যন্ত্রের পথে এগুতে থাকে। তোষণ ও আনুগত্যের অভিনয় করে এক দিকে যেমন সংশ্লিষ্ট শাসকদের আস্থা অর্জন করে, অন্যদিকে অনুরূপ ষড়যন্ত্রের নিত্য নব নব কৌশল অবলম্বন করে অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের জন্য মরিয়া হয়ে উঠে।

এই কর্ম প্রয়াস শুরু হয় উপমহাদেশের সর্বত্র। যেমন মুর্শিদাবাদে শুরু হয় মুর্শিদকুলিখানের শাসনামলে। আমি আগেই উল্লেখ করেছি পলাশী ট্রাজেডীর মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। মীরজাফর ছিলেন শিখণ্ডী, পুরানের ভাষায় অধৈর্য্য। ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রতিপক্ষের প্রভাবশালী অধৈর্য্য ব্যক্তিত্বকে অর্থবিত্ত এবং ক্ষমতায়নে প্রলুব্ধ করে এবং তাকে সামনে রেখে ষড়যন্ত্রকে সর্বব্যাপী করে তুলে।

জগৎশেঠ পরিবারের প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন হীরানন্দ সাহা তিনি মারোয়ারের নাগর থেকে পাটনায় এসে সুদের কারবার শুরু করেন। ১৭১১ সালে তাঁর মৃত্যুর পর তার জ্যেষ্ঠ পুত্র মানিক চাঁদ সুদের কারবার শুরু করেন। তিনি দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত মুর্শিদ কুলিখানের আস্থাভাজন হয়ে উঠেন। মুর্শিদ কুলিখান তার দিওয়ানী দপ্তর মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত করার সাথে সাথে মানিক চাঁদও ১৭১২ সালে মুর্শিদাবাদে এসে পড়েন। একই বছর তিনি নবাব কর্তৃক নগর শেঠ

www.pathagar.com

উপাধিতে ভূষিত হন। ১৭১৪ সালে মানিক চাঁদের মৃত্যু হলে তার ভাগিনা ফতেহ চাঁদ সাহা তার উত্তরাধিকারী হন। মুর্শিদ কুলিখানের সুপারিশে ফতেহ চাঁদ দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক জগৎশেঠ অর্থাৎ বিশ্ব ব্যাঙ্কার উপাধিতে ভূষিত হন। তুর্ক আফগান সামন্তদের বিদ্রোহের আশংকায় মুর্শিদ কুলিখান তার কৌশল পরিবর্তন করে বর্ণ হিন্দু রাজা মহারাজাদের অতিরিক্ত সুবিধা দিতে শুরু করেন এবং তাদের প্রতি নির্ভরশীল হয়ে পড়েন। নবাব মুসলিম মুদ্রা ব্যবসায়ীদের ব্যবসা ত্যাগে বাধ্য করেন। ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন একচেটিয়া মুদ্রা ব্যবসা ও সরকারী টাকসালে বিদেশী বণিকদের স্বর্ণতাল ও মুদ্রা তৈরীর একচ্ছত্র ক্ষমতা শুধু জগৎশেঠকে প্রদান করা হয়। মুর্শিদকুলি খানের উড়িষ্যার নায়েব সুবাদার সুজাউদ্দিন ছিলেন ভোগ বিলাসী চরিত্রহীন। অপূত্রক নবাব তার নাতি অর্থাৎ সুজাউদ্দিনের পুত্রকে তার উত্তরাধিকারী মনোনীত করেন এবং দিল্লীস্থ তার প্রতিনিধি বালকিষানকে বাদশাহর স্বীকৃতি আদায়ের দায়িত্ব অর্পণ করেন। শুরু হয় ষড়যন্ত্র নাটক। নবাবের আস্থাভাজন জগৎশেঠ ফতেহ চাঁদ নবাবের ঘোষিত ইচ্ছার বিরুদ্ধে অতি গোপনে সুজাউদ্দিনকে প্ররোচিত করেন এবং যাবতীয় প্রয়োজনীয় তথ্য সরবরাহ ও সমর্থন দিয়ে সুজাউদ্দিনের প্রত্যাশা ও অবস্থানকে সুদৃঢ় করেন। এমনকি পরবর্তীতে নবাব হিসাবে স্বীকৃতি লাভের ব্যাপারে দিল্লীর দরবারকে প্রভাবিত করেন। নবাব মুর্শিদকুলির নিজের প্রতিনিধি বাল বালকিষেন বাবু তার উত্তরাধিকারী মনোনয়ন সংক্রান্ত প্রস্তাব গোপন রেখে তার প্রেরিত নজরানা উপঢৌকন ব্যবহার করেই সুজাউদ্দিনের পক্ষে দিল্লীর দরবারে তদবীর করেন এবং মুর্শিদ কুলীর ইচ্ছার বিরুদ্ধে সুজা উদ্দিনের নামে পরবর্তী নবাবীর সনদ সংগ্রহ করেন। [তারিখে বাংলা পৃঃ ১২৪, উদ্ধৃতি মোহর আলী : হিষ্ট্রি অব দি মুসলিম অব বেঙ্গল]

মুর্শিদকুলীখানের শয্যা পাশে বসে জগৎশেঠ সুজাউদ্দিনকে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের সংকেত পাঠান। সুজাউদ্দিনের সৈন্যরা মুর্শিদাবাদ অবরোধ করে। নবাব পত্নীও তার কন্যা সুজাউদ্দিনের স্ত্রীর হস্তক্ষেপে মনোনীত নবাব সরফরাজ খান পিতা সুজাউদ্দিনকে নবাব হিসাবে মেনে নেন। সুজাউদ্দিন জগৎ শেঠকে তার অতি বিশ্বস্ত এবং ঘনিষ্টজন হিসাবে গণ্য করেন এবং ৪ সদস্য বিশিষ্ট প্রশাসনিক পরিষদের অন্তর্ভূক্ত করে নেন।

১৭২৭ সালে বিশ্বাসঘাতকতার সাফল্য জগৎশেঠ এবং তার সহযোগীদের অতি উৎসাহী করে তুলে। মুসলিম শাসনকে দুর্বল করে তোলা এবং বৈষয়িক ফায়দা অর্জনের জন্য ব্রাহ্মণ্য চক্র আর এক নতুন খেলা শুরু করলেন মুর্শিদাবাদের

www.pathagar.com

নবাবী নিয়ে। জগৎশেঠ আলম চাঁদ বাবুকে নিয়ে হাজী আহমদ ও আলীবর্দী খানের সাথে ষড়যন্ত্র শুরু করেন। এদের লক্ষ্য ছিল আলীবর্দীখানকে মুর্শিদাবাদের নবাব হিসাবে প্রতিষ্ঠিত করা। সেটা আলীবর্দীর প্রতি দুর্বলতার কারণে নয়, বরং তাদের উদ্দেশ্য ছিল সুসংহত মুসলিম শক্তিকে ভ্রাতৃঘাতী যুদ্ধের মধ্য দিয়ে আত্মবিনাশের দিকে ধাবিত করানো এবং সংঘর্ষ, ষড়যন্ত্র ও যুদ্ধের ডামাডোল পরিস্থিতির মধ্যে নিজেদের অর্থনৈতিক ও বৈষয়িক স্বার্থ হাতিয়ে নেয়া।

যাইহোক মুর্শিদাবাদের নবাব সুজাউদ্দিনের যখন মৃত্যু হল সে সময় নাদির শাহ দিল্লী দখল করে নেয় এবং সুবাহ বাংলার আনুগত্য ও রাজস্ব দাবী করে। নাদির শাহ মুর্শিদাবাদের নবাবের নিকট চিঠি লেখেন। নাদির শাহের পত্র পাওয়া মাত্র সরফরাজ খানের অনুমতি নিয়ে ব্যাঙ্কার জগৎশেঠ তাৎক্ষনিকভাবে রাজস্ব পরিশোধ করে দেন। কুচক্রী জগৎশেঠ এবং বাবু আলম চাঁদের পরামর্শে সুজাউদ্দিন অতিরিক্ত আনুগত্য প্রকাশের জন্য নাদির শাহের নামে খুতবা পাঠ করেন এবং মুদ্রা প্রচলন করেন। এটাও ছিল জগৎশেঠ গংদের ষড়যন্ত্র। ওদিকে কয়েক মাসের মধ্যে নাদির শাহ দিল্লী ত্যাগ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে মুহাম্মদ শাহ তার সিংহাসনে পুনরারোহন করেন। এই সুযোগে দিল্লীর আনুকুল্য পাবার প্রত্যাশায় জগত শেঠ গোপনে তথ্য প্রমাণ সরবরাহ করে দিল্লীর দরবারকে জানিয়ে দেন যে সরফরাজ খান বিদ্রোহী। (তারিখে বাংলাহ পৃঃ ১৫৫-৫৬)। ব্রাহ্মণ্য চক্র এখানেই থেমে থাকল না। সরফরাজ খানের বদলে আলীবর্দী খানকে বাংলার সুবাদার করার ব্যাপারে দিল্লীর দরবারকে প্রভাবিত করলো। অবশেষে তারা আলীবর্দীর নামে সনদ সংগ্রহ করতে সক্ষম হলেন। এই বাবু গোষ্ঠী ব্রাহমণ্যবাদী চক্রের পরামর্শে সরফরাজ খান তার সেনাবাহিনীর অর্ধেক হ্রাস করলেন। ওদিকে ব্যাঙ্কার জগত শেঠ ২৫ লক্ষ টাকা অর্থাৎ বর্তমান মুদ্রামানে ৫ শত কোটি টাকা আলীবর্দী খানের নিকট প্রেরণ করেন সুজার বরখাস্তকৃত সৈন্যদের তার সেনা বাহিনীতে নিয়োগ দেয়ার জন্য। অন্যদিকে বিহারের হিন্দু জমিদারদের আলীবর্দী খানকে নৈতিক ও বৈষয়িক সমর্থন দানের জন্য প্ররোচিত করেন। আলীবর্দী খানের সব ধরনের প্রস্তুতি সম্পন্ন হলে জগৎশেঠ তাকে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের আহ্বান জানায়।

সামরিক গুরুত্বপূর্ণ গিরিপথ তেলিয়া গিরি অতিক্রম করে আলীবর্দীখানের বাহিনী মুর্শিদাবাদের ২২ মাইল দুরত্বে অবস্থান নেয়। নবাব সরফরাজ খান আকস্মিক অবরোধে কিছুটা বিচলিত হলেও তাৎক্ষনিকভাবে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে ফেলেন।

www.pathagar.com

এই অবরোধে তার আমাত্যবর্গের যোগ সাজস সম্পর্কে তার ধারণা বদ্ধমূল হয়। তার সন্দেহ বহুলাংশ সঠিক হলেও পঞ্চম বাহিনীর মূল হোতাকে তিনি চিনতে ভুল করলেন। জগৎশেঠের বদলে তিনি হাজী আহমদকে বিশ্বাস ঘাতকতার জন্য কারারুদ্ধ করলেন। পঞ্চম বাহিনীর দুই হোতা বাবু আলম চাঁদ ও জগৎশেঠের সাথে সরফরাজ খানের সম্পর্ক আরো নিবিড় হয়ে উঠল। এই দুই কুচক্রী পরামর্শক হিসাবে সরফরাজ খানের যুদ্ধ যাত্রার সঙ্গী হলেন। প্রথম দিনের যুদ্ধে আলীবর্দী খানের পরাজয় নিশ্চিত হয়ে উঠল। নিশ্চিত পরাজয় থেকে বাবু আলম চাঁদ আলীবর্দী খানকে উদ্ধার করলেন সরফরাজ খানকে যুদ্ধ মূলতবী ঘোষণার পরামর্শ দিয়ে। যুদ্ধের মোড় ফিরিয়ে নেয়ার জন্য বাবু আলম চাঁদ এবং জগৎশেঠ বিভিন্নভাবে যোগসাজস সলাপরামর্শ করে এবং সরফরাজ খানের সেনাপতিদেরকে মুচলেকা অর্থ বিত্তের বিনিময়ে পক্ষ ত্যাগে প্রলুব্ধ করলেন। পরদিন পূর্বাহ্নের যুদ্ধে সরফরাজ খানের বিজয় নিশ্চিত হয়ে উঠলে বাবু আলম চাঁদ তাদের ষড়যন্ত্র ফাঁস হয়ে গেছে মনে করে আত্মহত্যা করলেন। ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক জগৎশেঠ ধরা ছোয়ার বাইরে রয়ে গেলেন শেষ অবধি। এমতাবস্থায় জগৎশেঠ তার নেপথ্য ষড়যন্ত্র আরো জোরদার করলেন। দুপুরের পর যুদ্ধ পরিস্থিতি বদলে গেল। অবশেষে সরফরাজ খান নিহত হলেন। জগৎশেঠ সাদর সম্ভাষন জানিয়ে বিজয়ী আলীবর্দী খানকে রাজধানীর অভিমুখে নিয়ে চললেন। বিশ্বাসঘাতকদের রক্তাক্ত আঙ্গিনা পেরিয়ে আলীবর্দী খান ক্ষমতাসীন হলেন। সম্ভবত সেদিনই সবার অলক্ষ্যে আর এক মর্মান্তিক বিপর্জয়ের ইতিহাস নিয়তির অদৃশ্য কাগজে লেখা হয়েছিল, লেখা হয়েছিল আলীবর্দীর বিশ্বাসঘাতকতা ও অপরাধের অনিবার্য্য পরিণতি হিসেবে।

এরপর জগৎশেঠ মুর্শিদাবাদের দরবারে সবচেয়ে প্রতাপশালী ব্যক্তিত্বে পরিণত হন। মুসলমানদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ডেকে আনার জন্য জগৎশেঠ নতুন প্রেরনায় নবতর চক্রান্ত জাল বিস্তারের জন্য উন্মাতাল হয়ে উঠেন।

১৭৪০ সালে আলীবর্দীখান নবাব হলেন ষড়যন্ত্র ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে। কিন্তু তার ক্ষমতারোহনের ৩৩ বছর আগে থেকে উত্তর-মধ্য পশ্চিম ও দক্ষিণ ভারত ছিল অস্থির। ব্রাহ্মন্যবাদী ষড়যন্ত্র এগিয়ে চলছিল সাফল্যের দিকে। হুমায়ুন ও আকবরের সময় থেকে ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রের ঘাটিতে পরিণত হয়েছিল মুঘল প্রাসাদ। মুঘল হেরেমে রাজপুত বালাদের স্থান লাভের পর থেকে ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতি মুঘল প্রাসাদকে সম্পূর্ণ গ্রাস করে নেয়। শরাব সাকী নৃত্য গীত

www.pathagar.com

বিলাসিতা ও আলস্যে বিবস হয়ে পড়ে সংগ্রামী বাবরের বংশধররা। তাদের ঔদাসীন্যের কারণে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্র পোক্ত হয়ে উঠে। সম্রাট আরঙ্গজেব চলমান ধারা থেকে বেরিয়ে আসার উদ্যোগ নিলেও তার সময় থেকেই শুরু হয় ব্রাহ্মণ্য বাদীদের মুসলিম বিরোধী তৎপরতা। আওরঙ্গজেব তাদের অপতৎপরতা প্রতিরোধ করতে সক্ষম হলেও পরবর্তী মুঘল উত্তরাধিকারীরা বর্ণ হিন্দু, রাজপুত জাঠ মারাঠা এবং শিখদের সুসংবদ্ধ অগ্রযাত্রা ঠেকিয়ে রাখতে পারেননি। উপমহাদেশের বৌদ্ধ নিধন যজ্ঞের মত মুসলিম নিধন শুরু হয়। লুণ্ঠন ও হত্যার নৃশংসতা মুসলিম জনপদগুলোতে ছড়িয়ে দেয়। মুঘল ও মোঘলায় সাংস্কৃতির ধারকদের নেশাগ্রস্ত অন্তরে মুসলিম জনপদগুলোর মাতম কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেনি। তারা ছিল প্রাসাদ ষড়যন্ত্রে উম্মাতাল এবং আত্মঘাতি তৎপরতায় লিপ্ত। কিন্তু তখন সুবাহ বাংলার পরিস্থিতি ছিল ভিন্ন রকম এখানে প্রশাসন ছিল মিশ্র। নামে মুসলমানদের হাতে নবাবী থাকলেও সকল ক্ষেত্রে প্রাধান্য ছিল হিন্দুদের। মুঘলায় সাংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্যের উত্তরাধিকারী বাংলার মুসলিম আমীর ওমরাহ ও উচ্চ শ্রেণী যাবতীয় নৈতিকতা ও সততা বিসর্জন দিয়ে ভ্রাতৃঘাতী ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তবে বাংলার জনসাধারণের সংখ্যাগরিষ্ট মুসলমান থাকার কারণে এবং বাংলার কোন বিশেষ অঞ্চল বর্ণ হিন্দুদের শাসনাধীনে না থাকায় বর্ণবাদীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে আক্রমনাত্মক ভূমিকা নিতে অথবা নেয়াতে সক্ষম হয়নি। এ সত্বেও বাংলার বর্ণ হিন্দুরা অন্যান্য অঞ্চলের তুলনায় মুসলিম বিরোধী ভূমিকায় পিছিয়ে ছিল না। তারা প্রকাশ্য যুদ্ধ না করলেও দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা হাতে নিয়ে ষড়যন্ত্র ও চক্রান্তের মাধ্যমে মুসলমানদের চূড়ান্ত ক্ষতিসাধনে তৎপর ছিল। সমস্ত মুসলিম বিরোধী তৎপরতার মূল নায়ক ছিলেন জগৎশেঠ। একদিকে যেমন আলীবর্দী খানের উপর ছিল তার প্রভাব অন্যদিকে মুদ্রা ভাংগানী ব্যবসার সূত্রে ইংরেজদের সাথে গড়ে উঠে সখ্যতা। আলীবর্দীখানের নির্ভরযোগ্য ও বিশ্বস্ত সহযোগী হওয়ার কারণে ঘষেটি বেগমের বিশ্বস্ত প্রাদেশিক দেওয়ান রাজ বল্লভ এবং বিহারে নিযুক্ত প্রথম গভর্নর জানকী রাম ও পরবর্তী গভর্নর রামনারায়ণের সাথে নবাবের দিওয়ান চিনুরায় বাবু বীরু দত্ত, আলম চাঁদের পুত্র বারারায়ান করাত চাঁদ ও উমিচাঁদের সহযোগীতায় রাজস্বের জামিন ব্যাংকার হিসাবে সারা বাংলার জমিদারদের সাথে ছিল স্বরূপ চাঁদ জগৎশেঠের নিয়মিত যোগাযোগ। সেনাবাহিনীর প্রধান প্রভাবশালী সৈন্যাধক্ষ, রায় দুর্লভ, রাম বাবু, মানিক চাঁদ, রাজা নন্দ কুমার, মোহন লাল প্রমুখও ছিলেন তার আপন জন। যেসব হিন্দু বেনিয়া মালামাল সরবরাহ করত

www.pathagar.com

সেই সব প্রতিষ্ঠিত বণিকদের সাথেও জগৎ শেঠের ভাল সম্পর্ক ছিল। এই কারণে জগৎশেঠ মধ্যমনি হয়ে ষড়যন্ত্র জাল বিস্তার করতে অতি সহজে সক্ষম হন।

বর্গী হামলা প্রতিহত করার নামে বর্ধমানের মহারাজার সাথে মিলে জগত শেঠ মুর্শিদাবাদের নবাবের কোটি কোটি টাকা আত্মসাৎ করেন। অবশ্য ধরা পড়ে বর্তমান মুদ্রামানে দু হাজার কোটি টাকা নবাবকে ফেরত দিতে বাধ্য হন। পক্ষান্তরে বর্গী হামলার হাত থেকে রক্ষার নামে ইংরেজদের সাথে ব্যবসারত বর্ণ হিন্দু বণিকদের চাঁদার টাকায় কোলকাতা নগরীকে ঘিরে মারাঠা রক্ষা প্রাচীর ও পরিখা গড়ে তুলে সমগ্র দক্ষিণ পশ্চিম বাংলার বিত্তশালী বর্ণ হিন্দু ব্যক্তিদেরকে এমনভাবে জমায়েত করা হয় যে ১৬৯০সালে প্রতিষ্ঠিত কোলকাতার জনসংখ্যা ১৭৫৭ সালের আগেই হয়ে দাঁড়ায় লক্ষাধিক এবং এই জনসংখ্যার এক শতাংশও মুসলমান ছিল না। এর ফলে কোলকাতা কুচক্রীদের নিরাপদ আশ্রয়ে পরিণত হলো।

বৃটিশ শাসনের পূর্বে সুবাহ বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

এ দেশের শিল্প বাণিজ্য ধ্বংস করে বৃটিশ বেনিয়ারা। আজকের এই তলাবিহীন ঝুড়ির এক প্রান্তে বসে আমরা কল্পনা করতে পারি না বিপুল ঐশ্বর্যের ভাণ্ডার এই বাংলা কি বিশাল সম্পদের অধিকারী ছিল এদেশের মানুষ! কি গতিশীল অর্থনীতি বিরাজমান ছিল এখানে।

ফরাসী ডাক্তার ব্যবসায়ী পর্যটক বার্নিয়ার তৎকালীন বাংলা মুলুক সফর করে লিখেছেন, "বাংলার মত দুনিয়ার অন্য কোথাও বিদেশী বণিকদের আকৃষ্ট করার জন্য এত বেশী রকমের মূল্যবান সামগ্রী দেখা যায় না... বাংলায় এতো বিপুল পরিমাণ সূতী ও রেশমী পণ্যসামগ্রী রয়েছে যে, কেবল হিন্দুস্থান বা মোগলদের সাম্রাজ্যের জন্য নয় বরং পার্শ্ববর্তী দেশগুলো এবং ইউরোপের বাজারসমূহের জন্য বাংলাকে এ দুটি পণ্যের সাধারণ গুদামঘর বলে অভিহিত করা চলে। মিহি ও মোটা, সাদা ও রঙিন ইত্যাদি সকল রকম সূতী বস্ত্রের বিরাট স্তূপ দেখে আমি মাঝে মাঝে বিস্ময়াভিভূত হয়েছি যে, কেবলমাত্র ওলন্দাজ বণিকেরা বিভিন্ন প্রকারের ও মানের সাদা এবং রঙ্গীন সূতীবস্ত্র বিপুল পরিমাণে, বিশেষ করে জাপান ও ইউরোপে রফতানী করে থাকে, তা নয়। ইংরেজ, পর্তুগীজ ও দেশীয়

www.pathagar.com

বণিকেরাও এসব দ্রব্য নিয়ে প্রচুর ব্যবসা করে থাকে। রেশম ও বিভিন্ন রেশমজাত দ্রব্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য।" (বার্নিয়ার,পৃঃ ৪৩৯)

বাংলার চাউল সম্পর্কে বার্নিয়ার বলেন– "বাংলার এতো বেশি পরিমাণ চাউল উৎপন্ন হয় যে, তা কেবল প্রতিবেশী দেশগুলোতেই নয়, দূরবর্তী রাজ্যগুলোতেও রফতানী করা হয়ে থাকে। মসলিপত্তম ও করোমন্ডল উপকূলের নানাস্থানে প্রেরিত হয়। সাগর পারের রাজ্যসমূহে, বিশেষ করে সিংহল ও মালদ্বীপেও চাউল পাঠানো হয়।" তিনি লিখেছেন– "বাংলা মুলক চিনি উৎপাদনেও একই রকম সমৃদ্ধশালী; এই চিনি গোলকুন্ডা ও কর্নাটক রাজ্যে (সেখানে সামান্য চিনি উৎপাদিত হয়), মোকা ও বসোরা শহরের মাধ্যমে আরব ও মেসোপটেমিয়ায় এবং বন্দর আব্বাসের পথে পারস্য পর্যন্ত সরবরাহ করা হয়ে থাকে।" বার্নিয়ারের বর্ণনা মতে, বাংলা থেকে সে যুগে সব থেকে উন্নত ধরনের লাক্ষা, আফিম, মোম, মরিচ, গন্ধদ্রব্য ও ঔষধপত্র রফতানী হতো। তিনি বলেন– "ঘি-এর উৎপাদন এত প্রচুর যে, রফতানীর ক্ষেত্রে এটা খুব ভারী বস্তু হওয়া সত্ত্বেও সমুদ্র পথে বহুস্থানে প্রেরিত হয়।" (বার্নিয়ার, পৃঃ ৪৩৭-৩৯)। বার্নিয়ার জানান–, "বাংলা মুলকের পুর্তগীজ অধ্যুষিত এলাকায় অর্থাৎ দক্ষিণ বাংলায় নানান জাতীয় মিষ্টিও তৈরী হয়ে বিদেশে রফতানী হয়ে থাকে।: (ইতিহাসের অন্তরালে, ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ২১৮)

নদীমাতৃক বাংলার ভৌগোলিক অবস্থানই একে আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের সহায়ক করে তুলেছিল। ফলে কালক্রমে এই ভূখণ্ড বিশাল ভারত উপমহাদেশের গঞ্জ রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়। তাম্রলিপ্ত এবং সপ্তগ্রাম ছিল বাংলার ব্যস্ত বন্দর। সময়ের প্রয়োজনেই স্বাভাবিকভাবে এসব অঞ্চলে গড়ে উঠেছিল জাহাজ নির্মাণ কারখানা। বহিঃসমুদ্রের উপযোগী বিরাট বিরাট জাহাজ নির্মাণ করতো এদেশেরই মানুষ। এদেশের সন্তানেরাই দূর সমুদ্রে যাত্রা করত বিরাট বিরাট বাণিজ্য বহর নিয়ে। এই জাহাজ নির্মাণ কারখানাগুলোকে বৃটিশরা ধ্বংস করল তাদের নিজস্ব স্বার্থে। বাংলার অন্যান্য মুখ্য শিল্পের মধ্যে ছিল চিনি, লবণ ও সোরা। এই সমস্ত দ্রব্য ব্যাপকভাবে রপ্তানী হত। চিনি ও লবণ এবং তৎসহ জাহাজ নির্মাণ শিল্পকে বৃটিশ রাজত্বের সময়ে ধ্বংস করে ফেলা হয়েছিল সম্পূর্ণরূপে। প্রয়োজনীয় সর্ববিধ কৃষি তথা গৃহস্থালির যন্ত্রপাতি এবং বাসনপত্র তৈরি হত বাংলাতেই। বাংলা থেকে রপ্তানি করা পণ্যের মূল্য হিসাবে আমদানিকারক দেশগুলি দিত সোনার বাট, ধাতুমুদ্রা এবং মণিরত্ন। শত শত

www.pathagar.com

বছর ধরে বাংলা রপ্তানি উদ্বৃত্ত ভোগ করেছে। ব্রিটিশ প্রভুত্ব কায়েম হবার পরে যে দুর্ভিক্ষ ঘন ঘন দেখা দিয়েছে, সে যুগে তা ছিল অজ্ঞাত। যে যে দেশের সঙ্গে বাংলার বাণিজ্যিক সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছিল তারা প্রত্যেকেই বাংলার শিল্পকুশলতা ও কারিগরী দক্ষতার কথা স্বীকার করেছে। এমনকি ব্রিটেনের মাটিতেও এখানকার রেশম বস্ত্রের সঙ্গে সমশর্তাবলীতে প্রতিযোগিতায় এটে উঠতে না পেরে বৃটিশরা পলাশী যুদ্ধের ৫৬ বছর পূর্বে ১৭০১ সালে, বাংলা থেকে রেশমবস্ত্র আমদানি সরাসরি নিষিদ্ধ করে দিয়েছিল। (ধ্বংসের পথে পশ্চিম বাংলা রণজিত রায় উদ্ধৃত নতুন সফর নভেম্বর, ১৯৯৬)

১৯৫৭ সালের আগে আরমেনিয়াসহ ইউরোপের ৭টি দেশের হাজার হাজার নাবিক শত শত জাহাজ নিয়ে বাংলার নদীতে পণ্য খরিদ করে ফিরতো অন্য সবকিছু বাদ দিয়ে কেবল মসলিন, মোটা সূতী বস্ত্র, রেশম ও রেশমী বস্ত্র ইউরোপ ও জাপানসহ সারা বিশ্বে রফতানি হতো দশ/বার হাজার কোটি টাকার। বাংলাকে বলা হতো সারা ইউরোপের বাজারগুলোর কাপড়ের গুদাম; নারী-পুরুষ, বৃদ্ধ-কিশোর মিলিয়ে ন্যূণ ২৫ লাখ বস্ত্রশিল্পী নিয়োজিত থাকতেন কাপড় তৈরীর কাজে। গংগার পথে পাটনা হয়ে মধ্য ভারতে এবং করোমন্ডল উপকূলে, এমনকি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে চাউল রফতানি হতো; আফিম রফতানি হতো চীন জাপানে, চিনি রফতানি হতো আরব, ইরান, ইরাক অঞ্চলে। সল্টপিটার প্রেরিত হতো ইউরোপে। লবণ চালান হতো মধ্য ভারত ও আসামে। মরিচ, আদা ও দারুচিনি রফতানি হতো ইউরোপে ও মধ্যপ্রাচ্যে- সব মিলিয়ে ন্যূণ ১৫ হাজার কোটি টাকার পণ্য বাংলা থেকে বিশ্বের বাজারে ছড়িয়ে পড়তো। (ইতিহাসের অন্তরালে ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ২১৮)

এই বিপুল রফতানির বিনিময়ে তাদের আমদানী ছিল খুবই কম। মোটা কাপড় প্রস্তুতের জন্য সুরাট মির্জাপুর থেকে কিছু সূতা এবং রেশম বস্ত্রের বাড়তি চাহিদা মেটাবার জন্য চীনদেশ থেকে কিছু কাঁচা রেশম আমদানি হতো। ধনী বাংগালীরা খনিজ লবণ ভালোবাসতো বিধায় নিজেদের তৈরী সামুদ্রিক লবণ রফতানি করে উত্তর ভারত থেকে খনিজ লবন আমদানি করতো। এছাড়া চীনামাটির সৌখীন থালাবাসন আমদানি হতো। আর আমদানি হতো কাফ্রী ক্রীতদাস-দাসী। বাংলার নিত্য বর্ধিষ্ণু কৃষি ও শিল্পোন্নত শ্রমশক্তির বিপুল চাহিদা ছিল, ঠিক যেমনটি বর্তমান বিশ্বের শিল্পোন্নত দেশগুলোতে রয়েছে। বিদেশী বনিকেরা ক্রীতদাস-দাসী নিয়ে এসে বাংলায় বিক্রি করতো। বাংলার মুসলমান কারখানা ও খামার-

www.pathagar.com

মালিকেরা তাদেরকে খরিদ করে উৎপাদনকার্যে নিয়োগ করতেন। এ কারণেই বাংলায় নিয়মিত ক্রীতদাস আমদানি হতো। এর বাইরে তেমন কিছুই আমদানি করতে হতো না। এসব আমদানি পণ্যের মূল্য যদি সেকালের মুদ্রায় ৪০ লাখ টাকা (বর্তমান মূদ্রামানে ৮ শত কোটি টাকা ধরা হয়, তাহলে বাংলার বৈদেশিক বাণিজ্যের নীট উদ্বৃত্ত দাঁড়াতো বার্ষিক ৭ কোটি টাকা বর্তমান মুদ্রামানে ১৪ হাজার কোটি টাকা। এ অর্থ এদেশে আসতো স্বর্ণ, রৌপ্য ও মূল্যবান পাথর হীরা-জহরত মণিমরকত হিসাবে। (ইতিহাসের অন্তরালে ফারুক মাহমুদ, পৃঃ ১৪০)

মুসলিম শাসনামলে কৃষি নীতির প্রধান দর্শন ছিল লাঙলের পেছনের মানুষটি। কৃষি এবং শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে রাষ্ট্র ছিল উৎপাদনে শরীক। পণ্য এবং রাজস্ব বা কর উভয়ের মাধ্যমেই প্রজা এবং সার্বভৌমত্বের মধ্যে সংযোগ ছিল। দ্বিমূখী ফলনের অংশ দ্বারা রাজস্ব দিতে হত বলে মুদ্রার উৎপাত ছিল না। রাজা এবং প্রজার মধ্যে ধুনকুবের এবং মুৎসুদ্দী শ্রেণীর কোন ঠাঁই ছিল না।

www.pathagar.com

তৃতীয় অধ্যায়

পলাশী নাটকের গ্রীণরুমে

ডক্টর মোহর আলী লিখেছেন– দুই অপশক্তি অতি সন্তর্পনে এক অভিন্ন লক্ষ্যের দিকে এগিয়ে চলে। উভয় দলের উদ্দেশ্যের ভিন্নতা থাকা সত্বেও তাদের লক্ষ্য ছিল এক। সেটা হলো সিরাজের পতন অনিবার্য করে তোলা। একটির উদ্দেশ্য ছিল শোষণ লুণ্ঠনের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সাফল্যকে চূড়ান্ত করার জন্য ঔপনিবেশিক প্রভুত্বকে প্রতিষ্ঠিত করা। অন্যটির উদ্দেশ্য ছিল সিরাজের পতন ঘটিয়ে মুসলমানদের বিনাশ করে হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করা। তাদের একটা সহজ হিসাব ছিল মুসলমানরা ভারত বর্ষের যেখানেই প্রবেশ করেছে সেখানকার মাটি ও মানুষের সাথে একাকার হয়ে যাওয়ার কারণে তাদের শিকড় অনেক গভীরে প্রথিত হয়ে যায়। এজন্য তাদের উৎখাত করা বর্ণ হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠে না। এ কারণে তারা ভাবতে শুরু করল ইংরেজদের সাহায্য সহযোগিতায় মুসলমানদের পতন সম্ভব হলে কালক্রমে বৃটিশদের বিতাড়িত করা তাদের জন্য কঠিন হবে না। কেননা সাতসমূদ্র তের নদীর ওপার থেকে ভারতে তাদের প্রাধান্য বজায় রাখা বৃটিশদের পক্ষে অসম্ভব হওয়াই স্বাভাবিক।

উভয় পক্ষই তাদের আপাত লক্ষ্য অর্জনের জন্য অভিন্ন কৌশল অবলম্বন করে। প্রথম বর্নবাদী হিন্দুচক্র এবং বৃটিশ বেনিয়া নিজেদের মধ্যে সখ্যতা বৃদ্ধির প্রয়াস নেয় এবং নিজেদের কৌশল সংক্রান্ত তথ্য বিনিময় করে। এই সাথে বিভিন্নভাবে গুজব ছড়িয়ে নবাবের চরিত্র হননের উদ্যোগ নেয়। সার্বিকভাবে নবাবের ছিদ্রান্বেষণে ব্যস্ত হয়ে পড়ে উভয় পক্ষ।

তৎকালীন বাংলার পরিস্থিতির উপর আলোচনা রাখতে গিয়ে প্রফেসর এমাজউদ্দিন লিখেছেন– তৎকালীন সামাজিক পরিবেশও ছিল ষড়যন্ত্রের উপযোগী। তপনমোহন চট্টোপাধ্যায়ের কথায়, "পশ্চিমবঙ্গে তখন বীরভূম ছাড়া আর সব বড় বড় জায়গাতেই হিন্দু জমিদার ...। প্রকাশ্যে না হলেও ভিতরে ভিতরে প্রায় সব জমিদারই এই ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। তাদের মধ্যে প্রধান নদীয়ার রাজা কৃষ্ণ চন্দ্র রায়। বর্ধমানের রাজার পরই ধনে মানে কৃষ্ণনগরের

www.pathagar.com

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নাম। বাংলার মহাজনদের মাথা জগৎশেঠদের বাড়ীর কর্তা মহাতাব চাঁদ। জগৎশেঠরা জৈন সম্প্রদায়ের লোক হলেও অনেকদিন ধরে বাংলায় পুরুষানুক্রমে থাকায় তাঁরা হিন্দু সমাজেরই অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিলেন। কর্মচারীদের পাণ্ডা হলেন রায় দুর্লভ রাম।... হুগলীতে রইলো নন্দকুমার।" জগৎশেঠ এবং উমিচাঁদের আশ্রিত ইয়ার লতিফ খাঁ আর একজন ষড়যন্ত্রকারী। সবার শীর্ষে ছিলেন আলীবর্দী খাঁর এক বৈমাত্রেয় ভগ্নীর স্বামী মীরজাফর আলী খাঁ। নবাব হবার বাসনা তার অনেক দিনের। বর্গীয় হাঙ্গামার সময় আলীবর্দী খাঁকে হত্যা করিয়ে বাংলার নবাবী গ্রহণের আকাঙ্ক্ষা তাঁর ছিল। শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা ফলবতী হয়নি। সিরাজউদ্দৌলা নবাব হলে জগৎশেঠ শওকত জঙ্গের সাথে মিলে ষড়যন্ত্রের আর এক গ্রন্থি রচনা করেন। কিন্তু তা কার্যকর হয়নি। এবারে জগৎশেঠ, ইয়ার লতিফ খাঁ, উমিচাঁদের সহযোগী হিসেবে মাঠে নামেন। সিরাজের সমর্থকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন সেনা নায়ক মোহন লাল এবং মীর মদন বা মীর মর্দান (২৩ জুনের পূর্বে বাংলার 'মুক্তির চুক্তি' নামে এক চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মীরজাফর এবং ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর সাথে। অক্ষর কুমার মৈত্রের রচিত মীর কাসিম গ্রন্থের ২২৩-২৪ পৃষ্ঠায় ১২ দফার এই চুক্তির বিবরণ রয়েছে। মীরজাফরের স্বাক্ষরে চুক্তিতে বলা হয় : 'আমি আল্লাহর নামেও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তবলী মানিয়া চলিব।'

আগে উল্লেখ করেছি ভারতের মারখাওয়া ব্রাহ্মণ্যবাদী শক্তি মুসলিম শাসনের বিরুদ্ধে কিভাবে সংঘবদ্ধ ও শক্তিশালী হচ্ছিল কিভাবে তারা তাদের লক্ষ্যের দিকে সন্তর্পণে এগুচ্ছিল সেটা সমকালীন প্রতিষ্ঠিত শাসকরা আঁচ করতে পারেনি। কারণ ব্রাহ্মণ্যবাদী কুচক্রীদের তোষামুদিতে সম্মোহিত হয়ে ছিল তারা। কিন্তু তৎকালীন পরিস্থিতি সংক্রান্ত গভীর উপলব্ধি ছিল বৃটিশদের। ১৭৫৪ সালে জনৈক ইংরেজ স্কটের পত্র থেকে সেটা জানা যায়। হিন্দু জমিদারদের মনোভাব সম্পর্কে তিনি লিখেন– 'হিন্দু রাজা ও জমিদাররা মুসলিম শাসকদের প্রতি সর্বদা হিংসাত্মক ও বিদ্রোহী মনোভাব পোষণ করেন। গোপনে তারা মুসলিম শাসনের হাত থেকে পরিত্রাণের পথ খুঁজে।'

একই সময় কোম্পানীর একজন মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ার তার বৃটিশ কর্তৃপক্ষের নিকট একটি রিপোর্ট পেশ করেন তাতে তিনি লিখেছিলেন– 'যদি ইউরোপীয় সেনাবাহিনী তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির লক্ষ্যে সঠিকভাবে হিন্দুদের উৎসাহিত

www.pathagar.com

করতে পারে তবে হিন্দুরা অবশ্যই যোগ দিবে তাদের সাথে, উমি চাঁদ ও তাদের সহযোগী হিন্দুরাজা ও সৈন্য বাহিনীর উপর যাদের আধিপত্য কাজ করছে তাদেরও টানা যাবে এ ষড়যন্ত্রে।' কে কে দত্তের আলীবর্দী এন্ড 'হিজ টাইম' গ্রন্থে উল্লেখ রয়েছে– '১৭৫৭ সালে নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংসহাসন চ্যুত করার ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিল হিন্দু জমিদার ও বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী লেখক রাজীব লোচন লিখেছেন– 'হিন্দু জমিদার ও প্রধানগণ সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসনচ্যুত করার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়েছিলেন। [কে, কে. দত্ত. আলীবর্দী এন্ড হিজ টাইম, পৃঃ ১১৮]।

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ক্লাইভের সাথে বর্ধমান, দিনাজপুর ও নদীয়ার জমিদারদের পত্র যোগাযোগ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ মেলে যে, অগ্রিম আনুগত্য প্রকাশ করে তারা ক্লাইভকে যুদ্ধযাত্রার দাওয়াত জানান [শিরীন আক্তার] নদীয়া, বর্ধমান, বিষ্ণুপুর, মেদিনীপুর, দিনাজপুর, বীরভূমের রাজা-মহারাজারা মুর্শিদাবাদ সমবেত হয়ে দেওয়ান-ই-সুবা মহারাজা মহেন্দ্রের কাছে অনেকগুলো দাবী পেশ করেন- তাদের ক্রমবর্ধিষ্ণু দাবী মিটাতে নবাব অপারগ হলে জগৎ শেঠের পরামর্শে তারা মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের নেতৃত্বে-এক বৈঠকে মিলিত হয়ে সিরাজদ্দৌলাকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। সভার পক্ষে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কোলকাতায় মিঃ ড্রেকের সাথে সাক্ষাৎ করে তাকে নবাবের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আহবান জানান এবং সর্বমুখী সাহায্য সহযোগিতার আশ্বাস দেন। Ierrititial Aristocracy of Bangla the Naelia Raj : C.R. 1872 1.V., 107-110.) সুবে বাংলার কুলিন বর্ণহিন্দু রাজা-মহারাজারা আলাবর্দীকে দিয়ে নবাব সরফরাজকে উচ্ছেদ করে যেরূপ ফায়দা হাসিল করেন, নবাব আলীবর্দী মৃত্যু মুহুর্তেও তেমনি দেওয়ান রাজবল্লভের নেতৃত্বে তাদের একদল সিরাজের বড় খালা ঘষেটি বেগমকে উস্কানি দিয়ে, সসৈন্যে সাথে করে নিয়ে মুর্শিদাবাদ আক্রমনের জন্য নগরীর দ্বারপ্রান্তে হাজির করেন। সিরাজউদ্দৌলা তাঁর খালার মন জয় করে তার সমর্থন পেয়ে যাওয়ায় দিশেহারা দেওয়ান রাজবল্লভ নিজ পুত্র কৃষ্ণবল্লভকে দিয়ে নবাবের ঢাকাস্থ যাবতীয় অর্থবৃত্ত সম্পদ-সম্ভার কোলকাতায় ইংরেজদের আশ্রয়ে পাচার করে দেন। অন্যদিকে সিরাজের খালাতো ভাই পুর্নিয়ার গভর্নর শওকত জংকেও শ্যামসুন্দর বাবুরাই উস্কানি দিয়ে তাঁর বিরুদ্ধে অবতীর্ণ করেন।

www.pathagar.com

ইংরেজদের সাথে বিরোধের সূচনা

আসকার ইবনে শায়েখ লিখেছেন– নবাব আলীবর্দী খানের শাসনামলে (১৭৪০-৫৬) ঢাকার দেওয়ান রাজবল্লভকে হিসাবপত্র নিরীক্ষণের জন্য কাগজপত্রসহ মুর্শিদাবাদ তলব করা হয়। তাঁর বিরুদ্ধে তহবিল তসরুফের প্রামাণ্য অভিযোগ ছিল। কিন্তু হিসাব পরীক্ষার পূর্বেই তিনি কাশিম বাজারে কুঠির প্রধান উইলিয়াম ওয়াটসের নিকট তাঁর পুত্র ও পরিজনের আশ্রয় প্রার্থনা করেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণ দাস বা কৃষ্ণবল্লভ ৫৩,০০০০০ টাকা মূল্যের নগদ অর্থ ও সোনা রূপাসহ কলকাতায় আশ্রিত হন। এই কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণের জন্য নবাব দরবার হতে বার বার নির্দেশ ও তাগিদ দেয়া সত্ত্বেও কোম্পানীর গভর্নর রজার ড্রেক তা পালন করতে অস্বীকার করেন। দ্বিতীয় ঘটনাটি ঘটে ১৭৫৬ সালের মাঝামাঝি সময়ে নবাবের নিষেধ সত্ত্বেও ইংরেজরা তাদের ফোর্ট উইলিয়াম (কলকাতায়) দুর্গটিকে সামরিক সাজে সজ্জিত করে তুলতে শুরু করে। বৃদ্ধ নবাব আলীবর্দী এ দুটি ঘটনার 'প্রতিকার করে যেতে পারেননি।

নবাবী লাভ করেই সিরাজউদ্দৌলা কৃষ্ণবল্লভকে প্রত্যার্পণ করতে গভর্নর ড্রেককে এবং দুর্গ দেয়াল ভেঙ্গে পরিখা বন্ধ করে দিতে ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে নির্দেশ দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে নারায়ণ সিংহ নামক একজন বিশ্বস্ত দূতকে ইংরেজদের মনোভাব যাচাই করার জন্য কলকাতা পাঠালেন। কিন্তু ইংরেজরা নারায়ণ সিংহকে অপমান করে কলকাতা হতে তাড়িয়ে দেয়। নবাব আবার অন্যতম ব্যাংক ব্যবসায়ী খাজা ওয়াজিদকে একই উদ্দেশ্যে কলকাতা পাঠান। পরপর চার বার তিনি কলকাতা যান, কিন্তু ইংরেজরা তার সঙ্গেও সংযত আচরণ বা আপোষমূলক মনোভাব প্রদর্শন কোনটিই করেনি।

এভাবে নবাবের আন্তরিক সদিচ্ছা ব্যর্থ হবার ফলে তিনি দুর্লভরাম ও হুকুম বেগকে কাশিম বাজার কুঠি অবরোধের নির্দেশ দিলেন। মির মোহাম্মদ জো খান হুগলীতে জাহাজ নির্গমনের পথ রোধ করলেন এবং নবাবের উপস্থিতিতে কাশিম বাজারের পতন ঘটল। কুঠি প্রধান ওয়াট্স্ এবং কলেটকে সঙ্গে নিয়ে নবাব কলকাতার দিকে অগ্রসর হলেন। কাশিম বাজার অবরোধ ও পতনের মাধ্যমে সমঝোতায় আসতে ইংরেজদের উপর চাপ সৃষ্টি করাই নবাবের উদ্দেশ্য ছিল। পরবর্তী ঘটনায় তার প্রমাণ মিলে। খাজা ওয়াজিদের মিশন ব্যর্থ হবার পর উর্মিচাঁদ ও শ্রীবাবু নামক জনৈক ব্যবসায়ী সমঝোতার প্রস্তাব দেন। মীমাংসায় আসার জন্য নবাবের নিকট একজন দূত পাঠাতে ড্রেককে অনুরোধ করে পত্র

www.pathagar.com

লেখেন উইলিয়াম ওয়াটস্ ও কলেট। এ পত্র পাঠান হয় ওলন্দাজ এজেন্ট বিসডোমের মাধ্যমে। ড্রেক তাও রক্ষা করেননি। অবশেষে ফরাসী দেশীয় ম্যাকুইস দ্যা সেন্ট জ্যাকুইস এর মাধ্যমে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব পাঠানো হয় কোলকাতায়। উত্তরে উদ্ধ্যত রজার ড্রেক প্রস্তাবকারীকে পক্ষ পরিবর্তনের উপদেশ দেন।

সুতরাং অনিবার্য হয়ে উঠল সংঘাত। ১৭৫৬ সালে ১৩ই জুন নবাব ফোর্ট উইলিয়মে পৌছান এবং যথারীতি কোলকাতা অবরুদ্ধ হয় ১৯ জুন। নাটকের উদ্ধৃত অহংকারী নায়ক রজার ড্রেক সঙ্গী মিনকিন, ম্যাকেট ও গ্রান্টসহ সগৌরবে পিছন দিকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করেন। সংগে সংগে ইংরেজ শিবিরে পলায়ন প্রক্রিয়া দ্রুত সংক্রমিত হয়ে পড়ে। এক ঘণ্টার মধ্যে ইংরেজদের সকল জাহাজ পলাতকদের নিয়ে ভাটির পথে পাড়ি জমায়...।

... ড্রেক ও অন্যান্যদের পলায়নের পর ফোর্ট উইলিয়ামের মাত্র আটজন যুদ্ধ পরিষদের সদস্য অবশিষ্ট রইল। তাদের মধ্যে হলওয়েল রজার ড্রেকের স্থলবর্তী গভর্নর নিয়োজিত হলেন। হলওয়েল পলায়নের কোন নৌকার অভাবেই কলকাতায় থেকে যেতে বাধ্য হন এবং তিনিই পরবর্তীকালে তথাকথিত কাল্পনিক অন্ধকুপ হত্যার গল্প কাহিনীর জন্ম দান করেন। হলওয়েল গভর্নর হয়ে এক দুপুর টিকে ছিলেন; তার পর আত্মসমর্পন ভিন্ন কিছুই আর তাঁর করবার রইল না। ২০ জুন বিকেল চারটায় কলকাতার পতন ঘটে।

১৭ জুলাই বন্দীদের নবাবের সামনে হাজির করা হয়। অন্যদিকে কাশিমবাজার ও কলকাতার পতন সংবাদ পর পর মাদ্রাজ পৌছে। ফলে প্রথমে মেজর কিলপেট্রিক-এর নেতৃত্বে দুটি জাহাজ এবং পরে রবার্ট ক্লাইভ– প্রচুর সৈন্য, গোলাবারুদ ও সাজ-সরঞ্জামসহ বারটি জাহাজ পাঠান হয় বাংলায়। এই অভিযানের প্রধান দুটি উদ্দেশ্য নির্ধারিত হয়; ক. নবাবের বিরুদ্ধে একটি অভ্যুত্থান ঘটিয়ে কোম্পানীর ইচ্ছানুরূপ ক্ষমতা পরিবর্তন : খ. কোম্পানীর প্রতিদ্বন্দ্বী ফরাসীদের চন্দন নগর হতে উৎখাত। কলকাতার ফোর্ট উইলিয়াম কাউন্সিলকে লিখিত মাদ্রাজের সেন্ট জর্জ কাউন্সিলের লিখিত পত্রে (১৩ অক্টোবর ১৭৫৬) 'The sword should go hand in hand with the pen' উপদেশের সঙ্গে সঙ্গে নবাবের বিরুদ্ধে যে কোন স্বার্থান্বেষী মহলের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করতে এবং ফরাসীদের চন্দন নগর হতে বিতাড়নের নির্দেশও দেয়া হয়।

www.pathagar.com

২৫ ডিসেম্বর ফুলতা পৌঁছেই ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সন 'কলমের সঙ্গে সঙ্গে তরবারির মহড়া শুরু করেন। ৩০ ডিসেম্বর তাঁরা বজবজ দখল করেন এবং ২ জানুয়ারী (১৭৫৭) কলকাতা পুনুরুদ্ধার করে ড্রেক ও তাঁর কাউন্সিল সদস্যদের ফোর্ট উইলিয়ামে প্রতিষ্ঠিত করেন। এই বিজয়ের গৌরবের ইংরেজেরা ৩ জানুযায়ী নবাব ও তাঁর দেশবাসীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে বসে। হুগলী শহরটি ব্যাপকভাবে লুণ্ঠিত হয় এবং পার্শ্ববর্তী গ্রামাঞ্চলে তারা আগুন ধরিয়ে দেয়। সেদিনই নবাব তাঁর এক ক্ষুদ্র বাহিনী নিয়ে হুগলীর উত্তরে পৌঁছেন। ইংরেজরা ফিরে যায় কলকাতা। ফরাসী ও ওলন্দাজেরা নবাব ও ইংরেজদের বিবাদে মধ্যস্থতার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু ইংরেজেরা তাদের কাউকে বিশ্বাস না করে এবার খাজা ওয়াজিদের মাধ্যমে তাদের দাবীর কথা জানিয়ে দেয় ২২ জানুয়ারী। বলা হয়, কাশিমবাজার ও কলকাতা দখলের ক্ষতিপূরণ, ১৭১৭ সালের ফরমানানুযায়ী সকল সুবিধা, কলকাতায় সামরিক দুর্গ নির্মাণের অনুমতি এবং কোম্পানীর নিজস্ব মুদ্রা তৈরীর অধিকার দিতে হবে।

বৃটিশদের ঔদ্ধত্ব ও আগ্রাসী কর্মকাণ্ডের ফলে নওয়াব দারুনভাবে বিব্রত ও ক্ষুব্ধ হয়। ওদিকে শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলভীর আমন্ত্রণে আফগান বীর ভারতবর্ষে আগমন করেন মূলত মারাঠা ঔদ্ধত্ব্য গুড়িয়ে দেয়ার জন্য। তার আক্রমণের লক্ষ্য সুবাহ বাংলা ছিল না। কিন্তু দরবারের কুচক্রী সৃষ্ট আহমদ শাহ আবদালীর বাংলা আক্রমণ সংক্রান্ত গুজব নতুন আশঙ্কার জন্ম দেয়। এ আশঙ্কা নবাবকে অনেকটা হত বিহবল করে ফেলে। উদ্বিগ্ন নবাব আবদালীর আক্রমণ প্রতিহত করার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠেন। সে সময় ইংরেজদের ঔদ্ধত্য পূর্ণ্য আচরণ নবাবের কাছে গৌন বলে অনুভুত হয়। নবাব ইংরেজদের সাথে আপোষের কথা ভাবতে থাকেন এই কারণে যেন আবদালীর আক্রমণের বিরুদ্ধে প্রতিরোধে মনযোগী হতে পারেন। ওদিকে নবাবের উপর চূড়ান্ত আঘাত হানার উদ্দেশে নবাব বিরোধী ষড়যন্ত্র পোক্ত হওয়ার জন্য ইংরেজদেরও সময়ের প্রয়োজন ছিল। উভয়ের প্রয়োজনে ১৭৫৭ সালের ৯ ফেব্রুয়ারী নবাব ও ইংরেজদের মধ্যে একটি সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর হয়। এই সন্ধির পর নবাব আফগান আক্রমণ প্রতিরোধে মনোযোগী হলেন। এই অবকাশে ইংরেজরা একদিকে নবাবের পারিষদবর্গ ও সেনা নায়কদের প্রলুব্ধ ও প্রভাবিত করার সুযোগ পেল এবং অন্যদিকে ফরাসীদের উপর ঝাপিয়ে পড়ল সম্ভাব্য বিপর্যয় নাটকের দৃশ্য থেকে ফরাসীদের বিদায় করার জন্য। বাংলার প্রেক্ষিত নয় আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি সামনে এনে ইঙ্গ ফরাসী যুদ্ধের দোহায় পেড়ে ইংরেজরা ১৪ মার্চ ফরাসী অধ্যুসিত চন্দন নগর অবরোধ করে।

www.pathagar.com

(১৭৫৭) চন্দন নগর অবরোধের সংবাদ পেয়ে নবাব দুর্লভরাম ও নন্দকুমারকে আবার ফরাসীদের সাহায্যের জন্য পাঠান। ইংরেজদের দেয়া ঘুষে এবারও তারা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করে। ২৩ মার্চ চন্দন নগরের পতন ঘটে। ফরাসীরা বাংলার তাদের সবগুলো কুঠি ইংরেজদের ছেড়ে দিতে বাধ্য হয়। তাদের কিছু সৈন্য কাশিম বাজারে পালিয়ে গিয়ে আত্মরক্ষা করে, কিছু প্রাণ দেয়, কিছু বন্দী হয়। ইংরেজদের পক্ষে যুদ্ধ করে নিহত দেশীয় সিপাহীদের ইংরেজ সেবার নিদর্শন স্বরূপ জনপ্রতি দশ টাকা করে পুরস্কার দেয়া হয়।

ডক্টর মোহর আলী– 'ইংরেজদের চন্দন নগর আক্রমনের প্রাক্কালে নবাব তাদের প্রতিরোধে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু বিপুল পরিমাণ ঘুষের বিনিময়ে প্রতিরোধ বাহিনীর নেতা নন্দকুমার বিশ্বাসঘাতকতা করেন এবং রায় দুর্লভ রাম ইংরেজদের বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণে সিরাজকে বাধা দিতে থাকেন। ক্ষমতা লাভে ছয় মাসের মধ্যেই তার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের জাল পরিপক্ক হয়ে ওঠে। এই লোকগুলোর সহযোগিতায় ক্লাইভ খুব সহজেই নবাব প্রশাসনকে প্রায় সম্পূর্ণভাবে বিকল করে ফেলেন এবং নবাবের গোপন কাগজ ও চিঠিপত্র হস্তগত করেন। নবাব এসব ষড়যন্ত্রের সবকিছু জানতে পারেন। কিন্তু ব্যাপক বিস্তৃত এই ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তখন তাঁর কিছুই করার ছিলো না। কারণ, তিনি কাউকেই বিশ্বাসযোগ্য বিবেচনা করতে পারেননি।' প্রফেসর আব্দুর রহিম লিখেছেন ২৩ এপ্রিল (১৭৫৭) ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কোলকাতা কাউন্সিল নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে সিংহাসন চ্যুত করার জন্য একটি প্রস্তাব পাশ করে। হিল লিখেছেন যে ক্লাইভ উমিচাঁদকে নবাবের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র গড়ে তোলার কাজে ব্যবহার করেন।'

অন্যদিকে ডক্টর মোহর আলী– ১৭৫৭ সালের পয়লা মে অনুষ্ঠিত ফোর্ট উইলিয়াম সিলেক্ট কমিটির বিবরণ দিয়ে লিখিছেন– 'সিরাজকে উৎখাতের জন্য পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা তাদের হীন পকিল্পনার পক্ষে যে সকল যুক্তি দাঁড় করায় তা হচ্ছে–

(ক) সিরাজ অসৎ এবং ইংরেজদের নিযার্তনকারী।

(খ) তিনি ফরাসীদের সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত, যার অর্থ হচ্ছে ইংরেজদের সঙ্গে চুক্তিভঙ্গ এবং

(গ) সিরাজ বাঙ্গালীদের কাছে তাঁর জনপ্রিয়তা হারিয়ে ফেলেছেন– যার ফলে একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন সহজেই ঘটতে পারে।

www.pathagar.com

এই পরিকল্পনা গ্রহণের পর মুর্শিদাবাদের অদূরে পলাশী প্রান্তরে ক্লাইভ তাঁর সৈন্য সমাবেশ শুরু করেন। মীরজাফর ও দুর্লভ রামের নেতৃত্বে নবাব ১৫,০০০ হাজার সৈন্যের এক বাহিনী প্রেরণ করেন। এদিকে মুর্শিদাবাদের ইংরেজ প্রতিনিধি ওয়াটস তখনই যুদ্ধ না বাঁধিয়ে সৈন্য প্রত্যাহার করে কলকাতায় সুযোগের প্রতীক্ষা করতে ক্লাইভকে উপদেশ দেন। ক্লাইভ তা মেনে নেন এবং নবাবকেও তাঁর সৈন্য প্রত্যাহারের অনুরোধ জানান। ইংরেজদের আচরণ নবাবের মনে সন্দেহের সৃষ্টি করে; তিনি তাঁর বাহিনী অপসারণের নির্দেশ দিলেন। ক্লাইভ তাঁদের আচরণের সততার প্রতি নবাবের সন্দেহ দূর করার জন্য এক কুটচাল চালেন। মারাঠাদের লিখা এক চিঠি দিয়ে তিনি স্ক্রেফ্টনকে মুর্শিদাবাদ পাঠান। এ চিঠিতে ইংরেজ ও মারাঠাদের মধ্যে বাংলাকে ভাগ করে নেবার প্রস্তাব ছিল। এবার নবাব ইংরেজদের বিশ্বাস করলেন এবং তার বাহিনীকে মুর্শিদাবাদ ফিরে আসার নির্দেশ দিলেন।

'নবাব সিরাজউদ্দৌলা তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের কথা জানিতে পারেন। তিনি মীরজাফরকে প্রধান সেনাপতির পদ হইতে অপসারিত করেন এবং আবদুল হাদী খানকে সে পদে নিয়োগ করেন। আবদুল হাদী ও মীর মদন মীরজাফরকে ধ্বংস করিবার জন্য নবাবকে পরামর্শ দেন। কিন্তু জগৎশেঠ ও অন্যান্য বিশ্বাসঘাতক উপদেষ্টাগণ নবাবকে পরামর্শ দেন যে, ইংরেজদের বিরুদ্ধে শক্তিবৃদ্ধির জন্য মীরজাফরের সহযোগিতা লাভ করা নবাবের পক্ষে সুবিবেচনার কাজ হইবে। নবাব তাহাদের উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি মীরজাফরের বাড়ীতে গিয়ে নবাব আলীবর্দীর নামে তাঁহার নিকট ইংরাজদের বিরুদ্ধে সাহায্যের জন্য মর্মস্পশী আবেদন জানান। পবিত্র কুরআন হাতে লইয়া মীরজাফর এই সময় অঙ্গীকার করেন যে, তিনি নবাবের জন্য ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবেন। (প্রফেসর অব্দুর রহিম)

সাময়িক পদচ্যুতির অপমানে মীরজাফর দারুণভাবে প্রতিহিংসা পরায়ণ ও ক্রোধান্ধ হয়ে উঠলেন। সিরাজের আশু পতন অনিবার্য করে তোলার জন্য সর্বাত্মক উদ্যোগ নিলেন। মুর্শিদাবাদ আক্রমণ করার জন্য বার বার ক্লাইভের নিকট বার্তা প্রেরণ করে তাগাদা দিতে থাকেন। এমন মাহেন্দ্রক্ষণের প্রতীক্ষায় ছিলেন ক্লাইভ। এই সুযোগে তিনি আরো অতিরিক্ত শর্ত যুক্ত করলেন। পরিণতির কথা না ভেবেই মীরজাফর সব দাবী অকপটে মেনে নিলেন। জগৎশেঠের প্রোথিত বিষাক্ত বীজ অঙ্কুর থেকে বৃক্ষে পরিণত হল অতঃপর

www.pathagar.com

মহীরুহে। ম্লেচ্ছ যবন মুসলিম শাসনের অবসান ঘটিয়ে নব উত্থান সম্ভাবনায় ব্রাহ্মন্যবাদীরা উদ্বেলিত হয়ে উঠল।

'অতঃপর ষড়যন্ত্রকারীগণ জগৎশেঠের বাড়িতে গোপন বৈঠকে মিলিত হয়। জগৎশেঠ, উমিচাঁদ, রায়দুর্লভ, মীরজাফর, রাজবল্লভ এবং আরও কয়েকজন বিশিষ্ট ব্যক্তি এই বৈঠকে যোগ দেন। ইংরাজ কোম্পানীর এজেন্ট ওয়াটস মহিলাদের মত পর্দা-ঘেরা পাল্কিতে জগৎশেঠের বাড়িতে আসেন। এই বৈঠকে সিরাজউদ্দৌলাকে সরাইয়া মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। ওয়াটস এই কাজে ইংরেজদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দেন। ইহার পর কোম্পানীর প্রধানগণ চুক্তিপত্রের খসড়া প্রস্তুত করেন এবং ১৯ মে ইহাতে দস্ত খত করেন। মীরজাফরসহ ৪ জন চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করেন। চুক্তির শর্তানুযায়ী ইংরাজদের সৈন্য সাহায্যের বিনিময়ে মীরজাফর তাহাদিগকে কয়েকটি বাণিজ্য-সুবিধা দিতে স্বীকার করেন। তাহা ছাড়া তিনি ইংরেজ সৈন্যদের ব্যয়ভার বহন করিতে এবং কোম্পানীকে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ দুই কোটি টাকা দিতে সম্মত হন। নবাবের কোষাগার হইতে উমিচাঁদকে ২০ লক্ষ টাকা দেওয়া হইবে বলিয়া বলা হয়। উমিচাঁদকে প্রতারিত করিবার জন্য ক্লাইভ চুক্তিপত্রের দুইটি খসড়া প্রস্তুত করেন। আসল খসড়ায় উমিচাঁদকে টাকা দেয়ার শর্তের উল্লেখ করা হয় নাই। নকল খসড়ায় এই শর্তটি লিখিত হয়। ইহার দস্তখতগুলি সবই ক্লাইভ জাল করিয়াছিলেন। রায়দুর্লভকেও লুটের মালের কিয়দংশ দেওয়া হইবে বলিয়া প্রতিশ্রুতি দেয়া হয়। (প্রফেসর আব্দুর রহিম)

৪ জুনের স্বাক্ষরিত চুক্তিটি ছিল নিম্নরূপ :

"আমি আল্লাহর নামেও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

ধারা-১ : নবাব সিরাজউদ্দৌলার সঙ্গে শান্তিচুক্তির যেসব ধারায় সম্মতি দান করিয়াছি, আমি সেসব ধারা মানিয়া চলিতে সম্মত হইলাম।

ধারা-২ : ইংরেজদের দুশমন আমারও দুশমন, তাহারা ভারতবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়।

ধারা-৩ : জাতিসমূহের স্বর্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদের সকল সম্পত্তি এবং ফ্যাক্টরীগুলো ইংজেরদের দখলে থাকিবে এবং কখনো তাহাদিগকে (ফরাসীদেরকে) ওই তিনটি প্রদেশে আর কোন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।

ধারা-৪ : নবাব সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখল ও লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ কোম্পানী যেসব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিবেচনায় এবং তন্নিমিত্ত

www.pathagar.com

মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ আমি তাহাদিগকে এক ক্রোর তঙ্কা প্রদান করিব।

ধারা-৫ : কলিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মালামাল লূণ্ঠনের জন্য আমি তাহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম।

ধারা-৬ : কলিকাতার জেন্টু (হিন্দু), মূর (মুসলমান) এবং অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদান করা হইবে বিশ লক্ষ্য তঙ্কা। (ইংরেজরা হিন্দুদেরকে জেন্টু' এবং মুসলমানাদের 'মূর' ও 'মেহোমেটান' বলে চিহ্নিত করতো)।

ধারা-৭ : কলিকাতার আর্মেনীয় অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে সাত লক্ষ তঙ্কা। ইংরেজ, জেন্টু, মূর এবং কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদেয় তঙ্কার বিতরণ-ভার ন্যস্ত রহিল এডমিরাল ওয়াটসন, কর্নেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, উইলিয়াম ওয়াটস, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার মহোদয়গণের উপর। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় যাহার যেমন প্রাপ্য তাহা প্রদান করিবেন।

ধারা-৮ : কলিকাতার বর্ডার বেষ্টনকারী মারাঠা ডিচের মধ্যে পড়িয়াছে কতিপয় জমিদারের কিছু জমি; ওই জমি ছাড়াও আমি মারাঠা ডিচের বাইরে ৬০০ গজ ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

ধারা-৯ : কল্পি পর্যন্ত কলিকাতার দক্ষিণস্থ সব জমি ইংরেজ কোম্পনীর জমিদারীর অধীনে থাকিবে এবং তাহাতে অবস্থিত যাবতীয় অফিসাদি কোম্পানীর আইনগত অধিকারে থাকিবে।

ধারা-১০ : আমি যখনই কোম্পানীর সাহায্য দাবি করিব, তখনই তাহাদের বাহিনীর যাবতীয় খরচ বহনে বাধ্য থাকিবে।

ধারা-১১ : হুগলীর সন্নিকটে গঙ্গা নদীর নিকটে আমি কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

ধারা-১২ : তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবামাত্র আমি উপরিউক্ত সকল তঙ্কা বিশ্বস্তভাবে পরিশোধ করিব।

২৩ জুন ১৭৫৭ মীরজাফরের সাময়িক পদচ্যুতির মাত্র একমাসের ব্যবধানে সমাগত হল সিরাজের অন্তিম পর্ব। পলাশীতে সৈন্য সমাবেশ হল নবাব এবং ক্লাইভ উভয় পক্ষের। নবাবের পক্ষে সৈন্য সংখ্যা ৫০ হাজার এর মধ্যে পদতিক ৩৫ হাজার অশ্বারোহী। ক্লাইভের পক্ষে ছিল মাত্র ৩ হাজার দেশী বিদেশী সম্মিলিত ভাবে।

www.pathagar.com

২৩ জুনের পূর্বে বাংলার মুক্তি চুক্তি নামে ১২ দফা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয় মীরজাফর ও ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর মধ্যে তাতে মিরজাফরের পক্ষ থেকে বলা হয় : আমি আল্লাহর নামে আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করছি যে আমার জীবনকালে আমি এই চুক্তিপত্র মানিয়া চলিব।

এই মুক্তির চুক্তি মীরজাফর সত্যি আক্ষরিকভাবে অনুসরণ করেছিলেন। প্রধান সেনাপতির দায়িত্ব নিয়ে তিনি রনাঙ্গনে ছবির মত দাঁড়িয়ে ছিলেন। দাঁড়িয়েছিল তার বাহিনী। তিনি প্রধান সেনাপতি হয়ে নবাবের পতন উপভোগ করলেন প্রাণভরে। মুর্শিদাবাদের পতন হল। পুনরুদ্ধারের আশায় নবাব ছুটে চললেন বিহারে তার অনুগত বাহিনীর নিকট। তার আশা পূর্ণ হলো না। পথে গ্রেপ্তার হলেন। মীরজাফর তনয় মিরন তাকে নির্মমভাবে হত্যা করল। তার রক্তপাতের মধ্য দিয়ে সমগ্র সুবাহ বাংলার স্বাধীনতা ১৯০ বছরের জন্য মহাকালের অন্ধকারে হারিয়ে গেল। সমগ্র জাতি শৃংখলিত হল ঔপনিবেশিক অক্টোপাশে। সে ইতিহাস ও অতি মর্মান্তিক। ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্রের ঘরে ঘরে আনন্দের বন্যা বয়ে গেল। সিরাজের পতনের মধ্যে তারা দেখতে পেল তাদের উত্থান সম্ভাবনা।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

পলাশীর পরে

পলাশী যুদ্ধের প্রহসনমূলক নাটক শেষ হতে না হতেই লুণ্ঠিত হল মুর্শিদাবদের রাজকোষ। সে সময় রাজকোষে কি পরিমাণ সম্পদ ছিল?

মুর্শিদকুলী খাঁ-এর শাসনকাল থেকে দীর্ঘ ৫৫ বছরের সঞ্চয় একত্রিত হয়ে নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার কোষাগারে পূর্ণিয়া যুদ্ধের পর সঞ্চিত ছিল সার্জন ফোর্থের প্রদত্ত হিসাব মতে মনিমুক্তা হিরা জহরতের মূল্য বাদ দিয়ে, তৎকালীন মুদ্রায় ৬৮ কোটি টাকা [S. C. Hill. Bengal in 1757-67, P.108] যা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বাজেটের সাথে তুলনীয়।'

পলাশীর নাটক শেষ করে সিরাজ-উদ্দৌলারই দীওয়ান রামচাঁদ বাবু মুনশী নবকিষেণ, লর্ড ক্লাইভ ও মীরফাফরকে নিয়ে নবাবের কোষাগারে হাজির হন বিত্ত-সম্পদ লুট করার জন্য। দীওয়ান বাবুর তালিকার সাথে মিলিয়ে প্রাপ্ত সম্পদ তারা ভাগ বাঁটোয়ারা করে নেন। সিরাজউদ্দৌলার প্রাসাদে ও অন্দরমহলে রক্ষিত সম্পদ ভাগ করে নেন দীওয়ান রামচাঁদ, মুনশী নবকিষেণ, মীরজাফর আলী খান ও আমীর বেগ খান। (সিয়ারে মতাযেলি, ২য় খণ্ড (অনুবাদ) পৃ-২৩।

মুর্শিদাবাদের রাজকোষ থেকে পাওয়া গেল পনের লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ ৩০ কোটি টাকা মূল্যের সম্পদ। ক্ষতিপূরণ হিসাবে বৃটিশ নৌবাহিনী এবং স্থল বাহিনীর ৬জন সদস্যকে দিতে হল ৮কোটি টাকা। সিলেক্ট কমিটির ৬ জন সদস্যকে দিতে হল ৯ লক্ষ পাউন্ড (১৮ কোটি টাকা), ক্লাইভ তার নিজের জন্য আদায় করলেন ২ লক্ষ চৌত্রিশ হাজার পাউন্ড (প্রায় ৩ কোটি টাকা), কাউন্সিল মেম্বাররা পেলেন এক থেকে দেড় কোটি টাকা করে।

এছাড়াও উৎকোচ, নিপীড়ন এবং আরো বিবিধ নীতি বহির্ভূত ঘৃণিত পন্থায় এ দেশের সম্পদ লুট করেছে বৃটিশ বেনিয়ারা। সিরাজের পতনের পর নবাবের শূন্য আসনটি কোম্পানীর অর্থোপার্জনের উৎসে পরিণত হয়। শিখণ্ডি নবাবী কেনাবেচার মধ্য দিয়ে কোম্পানীর নতুন ধরনের তেজারতি শুরু হয়।

www.pathagar.com

কোম্পানী এবং তাদের কর্মচারীগণ যাকে খুশী তাকে নবাবের পদে অধিষ্ঠিত করতে পারতো এবং যাকে খুশী তাকে ক্ষমতাচ্যুত করতো। ১৭৫৭ থেকে ১৭৬৫ সাল পর্যন্ত মাত্র আট-ন' বছরে এ ব্যাপারে কোম্পানী ও তার দেশী বিদেশী কর্মচারীদের পকেটে যায় কমপক্ষে ৬২, ৬১, ১৬৫ পাউন্ড। প্রত্যেক নবাব কোম্পানীকে বিভিন্ন বাণিজ্যিক সুযোগ-সুবিধা দানের পরও বহু মূল্যবান উপঢৌকনাদি দিয়ে সন্তুষ্ট রাখতো। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃ.-৯৫)

মীরজাফর ক্ষমতায় আরোহণ করে টের পেলেন যে, তিনি প্রকৃতপক্ষে বাংলার নবাব নন, শিখণ্ডি মাত্র। বলতে গেলে তিনি বৃটিশদের অর্থোপার্জন এবং শোষণের যন্ত্র। সিরাজের প্রধান সেনাপতি থাকা অবস্থায় তিনি যে মর্যাদা এবং প্রতিপত্তির প্রতীক ছিলেন আজ নবাবীর আসনে অধিষ্ঠিত হয়েও তাকে কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারীদের তোষামোদ করে চলতে হচ্ছে। তাদের সন্তুষ্ট রাখার জন্য উৎকোচ উপঢৌকন হিসাবে তাকে লক্ষ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করতে হয়েছে। কিন্তু তবু কোম্পানীর ক্ষুধা মেটান সম্ভব হয়নি। রাজকোষের সমস্ত ভাণ্ডার উজার করে দিয়েও তিনি তার ক্ষমতা ধরে রাখতে পারেননি। ষড়যন্ত্রের শুরুতে তিনি ভেবেছিলেন ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এবং ইংরেজ বনিকদের সহযোগিতা নিয়ে তিনিই হবেন উপমহাদেশের সবেচেয়ে শক্তিশালী নবাব। নবাবীর নেশায় তিনি এত উন্মত্ত মাতাল ছিলেন যে, ষড়যন্ত্রের গভীরে আর এক ষড়যন্ত্রকে আমলে আনতে পারেননি। কিন্তু নবাবের পতনের পর যখন দেখলো শক্তির সব সূত্রগুলো ছিন্ন ভিন্ন, সব আমাত্যবর্গ উগ্র লালসা নিয়ে ক্লাইভের তোষামোদে ব্যস্ত , দেখলেন কোম্পানীর কর্মকর্তাদের দাপট, দেখলেন রাজ কোষের নির্মম লুণ্ঠন এবং লোপাট হতে দেখলেন নগর জনপদগুলো। বাংলার নবাব হয়ে তাকে দেখতে হল সবকিছু নীরবে, নিরুপায় হয়ে। দুর্বিসহ মনে হলেও কোম্পানীর সব অপকর্মকে সমর্থন দিতে হল হাসি মুখে। ক্লাইভের চোখে চোখ রেখে কথা বলার সাহসটুকুও তার অবশিষ্ট রইল না। সিরাজের পতনের সাথে সাথেই বাংলার মুসলমান হয়ে পড়ল অভিভাবকহীন। বাংলার মুসলমানদের জীবন-জীবিকা এবং অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দের সব উৎসমুখগুলোতে আগুন জ্বলে উঠল। একের পর এক ধনী গরীব নির্বিশেষে বাংলার সব মুসলমান এগিয়ে চলল ধ্বংসের কিনারে।

মীরজাফর নিজেকে শেষ অবধি কি চিনতে পেরেছেন? পারলেও তার ফেরার পথ খোলা ছিল না। অবজ্ঞা, অপমান আর ঘাত প্রতিঘাত নির্দেশ খবরদারীর

www.pathagar.com

দুর্বিপাকে পড়ে স্বপ্ন আর সম্মোহনের ঘোর কাটতে খুব বেশী দেরী হয়নি তার। দেরী হয়নি তার নিজেকে চিনতে। নবাবীর মোড়কে ঢাকা বেনিয়া চক্রের শিখন্ডি বৈতো তিনি আর কিছু নন। উচ্চাভিলাষ চরিতার্থের জন্য তার ব্যক্তিসত্তা বিক্রি হয়েছে অনেক আগে।

সিরাজের শোণিত-সিক্ত বাংলার মসনদ পরিণত হল তেজারতের পণ্যে। ক্লাইভের অর্থের তৃষ্ণা মেটাতে ব্যর্থ হয়ে মীরজাফর অসহিষ্ণু এবং মরিয়া হয়ে উঠলেন ইংরেজদের লালসার দোহন থেকে নিজেকে বাঁচাতে চাইলেন। একারণে তিনি ওলন্দাজদের সাহায্য নিয়ে ইংরেজদের দেশছাড়া করার এক কর্মসূচী গ্রহণ করেন। আর এ কারণেই নবাবের নাটমঞ্চ থেকে বিদায় নিতে হল মীরজাফরকে। তাকে পদচ্যুত করে কোলকাতায় নজরবন্দী করে রাখা হল। এর পর কোম্পানীকে টাকা উৎকোচ দিয়ে গ্রীনরুম থেকে মঞ্চে উপস্থিত হলেন মীর কাসিম। মীর কাসিম শুধুমাত্র মঞ্চাভিনয়ে সীমাবদ্ধ রইলেন না। সত্যিকার নবাব হবার চেষ্টা করলেন। নাটমঞ্চ থেকে রণাঙ্গনের রক্তাক্ত পথ বেছে নিলেন বাংলার ভাগ্য ফেরানোর জন্য। সাতটি রক্তাক্ত যুদ্ধের মুখোমুখি হয়ে তার অতীত গুনাহর কাফফারা আদায় করেছেন তিনি। শেষ অবধি বিচ্ছিন্ন শক্তি সমূহের সব সূত্র একই গ্রন্থিতে বাধার চেষ্টা করেও তিনি ব্যর্থ হলেন। সব সময় পঞ্চম বাহিনী গাদ্দারদের প্রেতাত্মা তাকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরেছে। গিরিয়ালা, উদয়নালা এবং বক্সারের প্রতিরোধ যুদ্ধে পরাজিত হয়ে তাকে বাংলার মাটি ছেড়ে নিরুদ্দেশ যাত্রা করতে হয়। অবশেষে অনাহারে অর্ধাহারে ধুকে ধুকে নিরাশ্রয় মীর কাশিম দিল্লীর রাজপথে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। তখন বাংলার অবস্থা কি?

অবশেষে কোম্পানীর ছোট বড় সব কর্মচারী এবং তাদের দলগত চক্র শোষণ লুণ্ঠনের দুঃসহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে সমগ্র বাংলাব্যাপী। আর মুসলমানদের উচ্চবিত্ত আমীর ওমরাহর দল শিখণ্ডী নবাব হবার অভিলাষে তাদের সম্পদ উজাড় করে ইংরেজদের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠে এবং বৃটিশদের অর্থতৃষ্ণা মেটাতে থাকে। মীর কাশিম একই উদ্দেশ্যে ২ লক্ষ্য পাউন্ড (৪ কোটি টাকা) বর্তমান মুদ্রামানে ৮ হাজার কোটি টাকা কোম্পানীর হাতে তুলে দেন। মীর জাফরের পুত্র ও কোম্পানীকে দেয় ১ লক্ষ ৪৯ হাজার পাউন্ড অর্থাৎ ৩ কোটি টাকা, বর্তমান মুদ্রামানে ৬ হাজার কোটি টাকা।

ওদিকে বাংলার জনপদ তার জেল্লা হারিয়ে নৈরাশ্য, হতাশা এবং বিশৃংখলার দিকে ধাপে ধাপে এগুতে থাকে। ক্লাইভের স্বীকৃতি থেকে তৎকালীন পরিস্থিতি

www.pathagar.com

কিছুটা অনুধাবন করা যায়। ক্লাইভের ভাষায়– "আমি কেবল স্বীকার করতে পারি, এমন অরাজকতা বিশৃংখলা, উৎকোচ গ্রহণ, দুর্নীতি ও বলপূর্বক ধনাপহরণের পাশব চিত্র বাংলা ছাড়া অন্য কোথাও দৃষ্ট হয়নি।" অথচ নির্লজ্জ ক্লাইভই এ শোষণযজ্ঞের প্রধান পুরোহিত ছিলেন। (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ সংস্কৃতির রূপান্তর, আব্দুল ওয়াদুদ, পৃ.- ৬০-৬২)

ব্রিটিশ আমলে বাংলার অর্থনীতি মানেই হলো- সুপরিকল্পিত শোষণের মর্মভেদী ইতিহাস। ঐতিহাসিকরা মোটামুটি হিসাব করে বলেছেন, ১৭৫৭ থেকে ১৭৮০ পর্যন্ত মাত্র তেইশ বছরে বাংলা থেকে ইংল্যান্ডে চালান গেছে প্রায় তিন কোটি আশি লক্ষ পাউন্ড অর্থাৎ সমকালীন মূল্যের ষাট কোটি টাকা। কিন্তু ১৯০০ সালের মূল্যমানের তিনশো কোটি টাকা। (বর্তমান মুদ্রামানে ১ লক্ষ ২০ হাজার কোটি টাকা)। (Miller quoted by Misra. P-15.)

পলাশী যুদ্ধের প্রাক্কালে ষড়যন্ত্রকারী দল কি মহামূল্য দিয়ে ব্রিটিশ রাজদণ্ড এ দেশবাসীর জন্য ক্রয় করেছিল, তার সঠিক খতিয়ান আজও নির্ণীত হয়নি। হওয়া সম্ভব নয়। কারণ কেবল অলিখিত বিবরণ অর্থ সাগরপারে চালান হয়ে গেছে, কিভাবে তার পরিমাপ করা যাবে? (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, আব্বাস আলী খান, পৃ-৯৫)

একটা স্বপ্নের ঘোর ছিল মীর জাফরের। তিনি নিজেকে ভেবেছিলেন সিরাজ বিরোধী চক্রের মহানায়ক। সিরাজের পতনের অর্থ তিনিই বাংলা বিহার উড়িস্যার মহান অধিপতি। তিনি জানতেন, দুঃসাহস আর দৃঢ়তা নিয়ে সিরাজ দাঁড়িয়েছিলেন চোরাবালির উপরে। আর এ চোরাবালি সৃষ্টির নায়কেরা তারই সহযোগী। তাদের পছন্দসই, তাদেরই মনোনীত নবাব তিনি। তিনি ভেবেছিলেন জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, উঁমিচাদ, নন্দকুমার প্রমুখ অসংখ্য হিন্দু আমাত্যবর্গ এবং মীর কাসিমের পতনের পর পুনরায় মীর জাফরকে পুতুল নবাব হিসাবে ক্ষমতায় বসানো হলো। এবার কিন্তু মীর জাফরকে নির্দেশ দেয়া হল সেনাবাহিনী ভেঙ্গে দেয়ার জন্য। কোম্পানীর নির্দেশকে উপেক্ষা করার ক্ষমতা শিখণ্ডী নবাবের পক্ষে সম্ভব ছিল না। বাধ্য হয়ে তিনি ৮০ হাজার সৈন্যকে বরখাস্ত করলেন। এর আগে মীর কাসিমের ৪০ হাজার সৈন্য ছত্র-ভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। মোটের উপর পলাশীর প্রহসনমূলক যুদ্ধ নাটকের পর থেকে সেনাবাহিনীর দেড়লক্ষাধিক সৈন্য এবং এ বিভাগের সাথে সংশ্লিষ্ট ৫০ হাজার কর্মচারী চাকুরীচ্যুত হল। এদের সবাই ছিল মুসলমান। এর ফলে বাংলার অসংখ্য মুসলিম পরিবার এগিয়ে চললো বেকারত্ব

www.pathagar.com

এবং দারিদ্র্যের দুঃসহ অবস্থার দিকেও শুরু হল সুবাহ বাংলার মুসলমানদের অর্থনৈতিক বিপর্যয়।

হান্টার (১৮৭১ সালে) বলেন, জীবিকার্জনের সূত্রগুলির প্রথমটি হচ্ছে সেনাবাহিনী। সেখানে মুসলমানদের প্রবেশাধিকার রুদ্ধ হয়ে যায়। কোন সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারের সন্তান আর আমাদের সেনাবাহিনীতে প্রবেশ করতে পারতো না। যদিও কদাচিৎ আমাদের সামরিক প্রয়োজনের জন্যে তাদেরকে কোন স্থান দেয়া হতো, তার দ্বারা তার অর্থোপার্জনের কোন সুযোগই থাকতো না।

ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি

নিউটনের তৃতীয় সূত্রে বলা হয়েছে প্রত্যেক ক্রিয়ার সমমুখী ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া রয়েছে। এটা শুধু মাত্র বস্তুর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এমনটি নয়। রাজনীতি অর্থনীতি প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে সমান প্রতিক্রিয়া তা না হলে গাদ্দারদের এমন মর্মান্তিক পরিণতি হবে কেন?

সিরাজ উৎখাতে পলাশী ষড়যন্ত্রে যারা নেতৃত্ব দিয়েছিল ইতিহাসে অমোঘ নিয়মে তাদেরও হয়েছিল মর্মান্তিক পরিণতি। কাউকে পাগল হতে হয়েছিল, কারো হয়েছিল অপঘাতে মৃত্যু। কাউকে নির্মম অপমৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে হয়েছিল। সবার ভাগ্যে জুটেছিল কোন না কোন ভয়াবহ পরিণতি। নীচে কতিপয় মুখচেনা মুখ্য ষড়যন্ত্রকারীদের পরিণতি তুলে ধরা হল।

মিরন

মিরন ছিলেন পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম নায়ক। তার পুরো নাম মীর মুহাম্মদ সাদেক আলি খান। তিনি মীরজাফরের জ্যেষ্ঠ পুত্র। আলীবর্দী খানের ভগ্নী শাহ খানম-এর গর্ভে তাঁর জন্ম হয়েছিল। এই সূত্রে মিরন ছিলেন আলিবর্দীর বোনপো। অত্যন্ত দুর্বৃত্ত, নৃশংস ও হীনচেতা এবং সিরাজ হত্যাকাণ্ডের মূল নায়ক মিরন। আমিনা বেগম, ঘষেটি বেগম হত্যার নায়কও তিনি। লুৎফুন্নিসার লাঞ্ছনার কারণও মিরন। মিরজা মেহেদীকেও নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছিলেন তিনি।

এই মিরনকে হত্যা করে ইংরেজদের নির্দেশে মেজর ওয়ালস। তবে তার এই মৃত্যু ঘটনাটি ধামাচাপা দেয়ার জন্যে ইংরেজরা মিথ্যা গল্প বানিয়েছিল। তারা

www.pathagar.com

বলেছে, মিরন বিহারে শাহজাদা আলি গওহারের (পরে বাদশাহ শাহ আলম) সাথে যুদ্ধ করতে গিয়ে পথের মধ্যে বজ্রাঘাতে নিহত হন। ইংরেজরা বলেছে, বজ্রপাতের ফলে তাঁবুতে আগুন ধরে যায় এবং তাতেই তিনি নিহত হন। ফরাসী সেনাপতি লরিস্টনের Jean-Law ঘটনাকে অস্বীকার করেছেন। বরং এই মত পোষণ করেন যে, মিরনকে আততায়ীর দ্বারা হত্যা করা হয়েছিল।

মুহাম্মদীবেগ

মুহাম্মদীবেগ ৩ জুলাই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলাকে নির্মমভাবে হত্যা করেছিল। নবাব সিরাজ এ সময় তার কাছে প্রাণ ভিক্ষা চাননি। তিনি কেবল তার কাছে থেকে দু'রাকাত নামাজ পড়ার অনুমতি চেয়েছিলেন। কিন্তু কুখ্যাত মুহাম্মদীবেগ নবাব সিরাজকে সে সুযোগ প্রত্যাখ্যান করার পরপরই তাকে নির্মমভাবে হত্যা করে।

পরবর্তী পর্যায়ে মুহাম্মদী বেগের মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটে এমতাবস্থায় সে বিনা কারণে কূপে ঝাঁপিয়ে পড়ে মৃত্যুবরণ করেছিল। এই মুহাম্মদীবেগ সিরাজউদ্দৌলার পিতা ও মাতামহীর অন্নে প্রতিপালিত হয়। আলীবর্দীর বেগম একটি অনাথ কুমার-এর সাথে তার বিয়ে দিয়েছিলেন।

মীরজাফর

পলাশী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান নায়ক ছিলেন মীরজাফর আলি খান। তিনি পবিত্র কোরআন মাথায় রেখে নবাব সিরাজের সামনে তাঁর পাশে থাকবেন বলে অঙ্গীকার করার পরও বেঈমানী করেছিলেন। প্রকৃত পক্ষে ষড়যন্ত্রের মধ্যমনি ছিলেন জগৎশেঠ মীরজাফর নয়। তিনি ছিলেন ষড়যন্ত্রের শিখন্ডি।

মীর জাফরের মৃত্যু হয় অত্যন্ত মর্মান্তিকভাবে। তিনি দুরারোগ্য কুষ্ঠব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন। নিখিলনাথ রায় লিখেছেন, ক্রমে অন্তিম সময় উপস্থিত হইলে, হিজরী ১১৭৮ অব্দের ১৪ই শাবান (১৭৬৫ সালের জানুয়ারী মাসে) বৃহস্পতিবার তিনি কুষ্ঠরোগে ৭৪ বৎসর বয়সে পরলোকগত হন। তাঁহার মৃত্যুর পূর্বে নন্দকুমার কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত আনাইয়া তাহার মুখে প্রদান করাইয়াছিলেন এবং তাহার তাহাই শেষ জলপান।'

www.pathagar.com

জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদ এবং মহারাজা স্বরূপচাঁদ

পলাশী বিপর্যয়ের নীল নক্সা তিনিই প্রণয়ন করেন সিরাজের সাথে ইংরেজদের সংঘাত এবং তার বিপর্যয় পর্যন্ত সব কিছুর মধ্যমনি ছিলেন তিনি– আলীবর্দী খাঁর শাসনামলেই জগৎশেঠের সাথে ইংরেজদের সম্পর্ক গভীর ছিল। নবাব সিরাজ ক্ষমতায় এলে এই গভীরতা আরো বৃদ্ধি পেলো এবং তা ষড়যন্ত্রে রূপ নিলো। পলাশী বিপর্যয়ের পর জগৎশেঠ রাজকোষ লুণ্ঠনে অংশ নেন।

নিখিলনাথ রায় লিখেছেন– ইহার পর ক্রমে ইংরেজদিগের সহিত মীর কাসেমের বিবাদ গুরুতর হইয়া উঠিলে, নবাব কাটোয়া গিরিয়া, উধুয়ানালা প্রভৃতি স্থানে পরাজিত হইয়া মুঙ্গেরে জগৎশেঠ মহাতাপচাঁদকে অত্যুচ্চ দুর্গশিখর হইতে গঙ্গারগর্ভে নিক্ষেপ কর হয়। মহারাজা স্বরূপচাঁদও ঐ সাথে ইহজীবনের লীলা শেষ করিতে বাধ্য হন।

রবার্ট ক্লাইভ

নবাব সিরাজ বিরোধী ষড়যন্ত্রের অন্যতম প্রধান ব্যক্তিত্ব ছিলেন রবার্ট ক্লাইভ। ক্লাইভ খুব অল্প বয়সে ভারতে আসেন। প্রথমে তিনি একটি ইংরেজ বাণিজ্য কেন্দ্রের গুদামের দায়িত্বে নিযুক্ত হন। বিরক্তিকর এই কাজটিতে ক্লাইভ মোটেও সন্তুষ্ট ছিলেন না। এ সময় জীবনের প্রতি তার বিতৃষ্ণা ও হতাশা জন্মে। তিনি আত্মহত্যা করার চেষ্টা করেন। তিনি রিভলভার দিয়ে নিজের কপালের দিকে লক্ষ্য করে পর পর তিনটি গুলী ছোঁড়েন। কিন্তু গুলী থাকা অবস্থাতেই গুলী রিভলবার থেকে বের হয়নি। পরে তিনি ভাবলেন ঈশ্বর হয়ত তাকে দিয়ে বড় কোন কাজ সম্পাদন করবেন বলেই এভাবে তিনি তাঁকে বাঁচালেন। পরবর্তীতে দ্রুত তিনি ক্ষমতার শিখরে উঠতে শুরু করেন। পরিশেষে পলাশী ষড়যন্ত্রে নেতৃত্ব দিয়ে তিনি কোটি টাকার মালিক হন। ইংরেজেরা তাকে 'প্লাসি হিরো' হিসেবে আখ্যায়িত করেন। তিনি দেশে ফিরে গিয়ে একদিন বিনা কারণে বাথরুমে ঢুকে নিজের গলায় নিজের হাতেই ক্ষুর চালিয়ে আত্মহত্যা করেন।

ইয়ার লতিফ খান

পলাশী ষড়যন্ত্রের শুরুতে ষড়যন্ত্রকারীরা ইয়ার লতিফ খানকে ক্ষমতার মসনদে বসাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পরে এই সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে এক্ষেত্রে

www.pathagar.com

মীরজাফরের নাম উচ্চারিত হয়। ইয়ার লতিফ খান ছিলেন নবাব সিরাজের একজন সেনাপতি। তিনি এই ষড়যন্ত্রের সাথে গভীরভাবে যুক্ত ছিলেন এবং যুদ্ধের মাঠে তার বাহিনী মীরজাফর, রায় দুর্লভের বাহিনীর ন্যায় ছবির মতো দাঁড়িয়েছিলো। তার সম্পর্কে জানা যায়, তিনি যুদ্ধের পর অকস্মাৎ নিরুদ্দিষ্ট হয়ে যান। অনেকের ধারণা, তাকে কে বা কারা গোপনে হত্যা করেছিল। (মুসলিম আমলে বাংলার শাসনকর্তা, আসকার ইবনে শাইখ, পরিশিষ্ট)।

মহারাজা নন্দকুমার

মহারাজা নন্দকুমার এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন। মুর্শিদাবাদ কাহিনী গ্রন্থে নিখিলনাথ রায় লিখেছেন– নন্দকুমার অনেক বিবেচনার পর সিরাজের ভবিষ্যৎ বাস্তবিকই ঘোরতর অন্ধকার দেখিয়া, ইংরেজদিগের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনের ইচ্ছা করিলেন। ইংরেজ ঐতিহাসিকগণ বলিয়া থাকেন যে, ইংরেজরা সেই সময়ে অমীরচাঁদকে দিয়া নন্দকুমারকে ১২ হাজার টাকা প্রদান করিয়াছিলেন। পলাশী ষড়যন্ত্রের পর নন্দকুমারকে মীরজাফর স্বীয় দেওয়ান নিযুক্ত করে সব সময় তাকে নিজের কাছে রাখতেন। মীরজাফর তার শেষ জীবনে যাবতীয় কাজকর্ম নন্দকুমারের পরামর্শানুসারে করতেন। তার অন্তিম শয্যায় নন্দকুমারই তার মুখে কিরীটেশ্বরীর চরণামৃত তুলে দিয়েছিলেন।

তহবিল তছরূপ ও অন্যান্য অভিযোগের প্রেক্ষিতে আদালত মহারাজা নন্দকুমারের প্রাণ দণ্ডের আদেশ প্রদান করে।

রায় দুর্লভ

রায় দুর্লভ ছিলেন নবাবের একজন সেনাপতি। তিনিও মীরজাফরের সাথে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত ছিলেন। যুদ্ধকালে তিনি এবং তার বাহিনী মীরজাফরদের সাথে যুক্ত হন এবং সেখানেই তার মৃত্যু ঘটে।

উমিচাঁদ

ক্লাইভ কর্তৃক উমিচাঁদ প্রতারিত হয়েছিলেন। ইয়ার লতিফ খান ছিলেন উমিচাঁদের মনোনীত প্রার্থী। কিন্তু যখন অন্যান্য ষড়যন্ত্রকারীরা এ ক্ষেত্রে মীরজাফরের নাম ঘোষণা করলেন, তখন উমিচাঁদ বেঁকে বসলেন এবং বললেন,

www.pathagar.com

আপনাদের প্রস্তাব মানতে পারি এক শর্তে, তা হলো যুদ্ধের পর নবাবের রাজকোষের ৫ ভাগ সম্পদ আমাকে দিতে হবে। ক্লাইভ তার প্রস্তাব মানলেন বটে কিন্তু যুদ্ধের পরে তাকে তা দেয়া হয়নি। যদিও এ ব্যাপারে একটি মিথ্যা চুক্তি হয়েছিল। ওয়াটস রমণী সেজে মীরজাফরের বাড়িতে গিয়ে লাল ও সাদা কাগজে দুটি চুক্তিতে তার সই করান। লাল কাগজের চুক্তিতে বলা হয়েছে, নবাবের কোষাগারের পাঁচ শতাংশ উমিচাঁদের প্রাপ্য হবে। এটি ছিল নিছক প্রবঞ্চনামাত্র। যাতে করে উমিচাঁদের মুখ বন্ধ থাকে। যুদ্ধের পর ক্লাইভ তাকে সরাসরি বলেন, আপনাকে কিছু দিতে পারবো না। এ কথা শুনে তিনি মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেন। এবং স্মৃতিভ্রংশ উন্মাদ অবস্থায় রাস্তায় রাস্তায় ঘুরতে ঘুরতে তার মৃত্যু ঘটে।

রাজা রাজবল্লভ

ষড়যন্ত্রকারী রাজা রাজবল্লভের মৃত্যুও মর্মান্তিকভাবে ঘটেছিল। জানা যায়, রাজা রাজবল্লভের কীর্তিনাশ করেই পদ্মা হয় কীর্তিনাশা।

দানিশ শাহ বা দানা শাহ

দানিশ শাহ সম্পর্কে বিতর্ক রয়েছে। অনেকে বলেছেন, এই দানেশ শাহ নবাব সিরাজকে ধরিয়ে দিয়েছিলেন। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় লিখেছেন, দানশাহ ফকির মোটেই জীবিত ছিলেন না। আসকার ইবনে শাইখ তাঁর মুসলিম আমলে বাংলার শাসন কর্তা গ্রন্থে লিখেছেন' বিষাক্ত সর্প দংশনে দানিশ শাহর মৃত্যু ঘটেছিল।

ওয়াটস্

ওয়াটস এই ষড়যন্ত্রের নেপথ্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছিলেন। তিনি রমণী সেজে মীরজাফরের বাড়িতে গিয়ে চুক্তিতে মীরজাফরের স্বাক্ষর এনেছিল। যুদ্ধের পর কোম্পানীর কাজ থেকে বরখাস্ত হয়ে মনের দুঃখে ও অনুশোচনায় বিলাতেই অকস্মাৎ মৃত্যুমুখে পতিত হন।

স্ক্রাফটন

ষড়যন্ত্রের পিছনে স্ক্রাফটনও বিশেষভাবে কাজ করেছিলেন। জানা যায়, বাংলার বিপুল সম্পদ লুণ্ঠন করে বিলেতে যাওয়ার সময় জাহাজডুবিতে তার অকালমৃত্যু ঘটে।

www.pathagar.com

ওয়াটসন

যড়যন্ত্রকারী ওয়াটসনক্রমাগত ভগ্নস্বাস্থ্য হলে কোন ওষুধেই ফল না পেয়ে কলকাতাতেই করুণ মৃত্যুর মুখোমুখি হন।

মীর কাসেম

মীরজাফরের ভাই রাজমহলের ফৌজদার মীর দাউদের নির্দেশে মীর কাসেম নবাব সিরাজের খবর পেয়ে ভগবানগোলার ঘাট থেকে বেঁধে এনেছিলেন মুর্শিবাদে। পরে ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে তিনি নবাব হন এবং এ সময় ইংরেজদের সাথে তার বিরোধ বাধে ও কয়েকটি যুদ্ধে পরাজিত হন। পরে ইংরেজদের ভয়ে হীনবেশে পালিয়ে যান এবং রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে বেড়ান।। অবশেষে অজ্ঞাতনামা হয়ে দিল্লীতে তার করুণ মৃত্যু ঘটে। মৃতের শিয়রে পড়ে থাকা একটা পোটলায় পাওয়া যায় নবাব হিসেবে ব্যবহৃত মীর কাশেমের চাপকান। এ থেকেই জানা যায় মৃত ব্যক্তি বাংলার ভূতপূর্ব নবাব মীর কাসেম আলী খান।

এই ভাবেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজউদ্দৌলার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারীরা পলাশী যুদ্ধের কিছুকালের মধ্যেই বিভিন্ন পন্থায় মর্মান্তিকভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হন। পলাশী ষড়যন্ত্রকারীদের ওপরে আল্লাহর গজব নাজিল হয়েছিল বলেই অনেকের ধারণা। আসলে এই সব ঘটনা থেকেই আমাদের অনেক কিছু শেখার বিষয় রয়েছে। (লেখাটি ডঃ মুহাম্মদ ফজলুল হক রচিত 'বাংলার শেষ স্বাধীন নবাব সিরাজ' প্রকাশিতব্য গ্রন্থ থেকে)

www.pathagar.com

কোম্পানীর রাজস্ব নীতি

একটা স্বাধীন দেশের নাগরিকের রাষ্ট্রের প্রতি যেমন দায়িত্ব ও কর্তব্য আছে অনুরূপ রয়েছে তার অধিকার ও সুযোগ সুবিধা প্রাপ্তির নিশ্চয়তা। কিন্তু ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর মূল লক্ষ্যই হলো শোষণ। সাধারণ মানুষের জন্য ন্যূনতম মানবিক দায়িত্ব পালনের অঙ্গীকারে আবদ্ধ নয় ঔপনিবেশিক শাসকেরা। শোষণের মৌলিক নীতি সামনে রেখেই উপনিবেশবাদীরা তাদের সব ধরনের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে থাকে। বৃটিশদের ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম হয়নি। বরং উপনিবেশবাদীদের ইতিহাসে জঘন্য দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছে বৃটিশ বেনিয়ারা।

মুসলিম শাসনামলে যদিও বাংলায় জমিদার ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, তাহলেও এসব প্রতিষ্ঠান লাগামহীন শোষণের যন্ত্র হিসাবে কেউ মনে করত না। সরকার এবং প্রজাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ সম্পর্কের নীতিই ছিল মুসলিম শাসন ব্যবস্থার মূলনীতি। জমিদাররা কোন অবস্থায় খাজনা বৃদ্ধি করতে পারতেন না। জমির উপর প্রজাদের বংশানুক্রমিক মালিকানা স্বত্ব বহাল থাকত এবং পুরুষানুক্রমে জমি ভোগ দখল করতে পারত। তারা নির্দিষ্ট পরিমাণ খাজনা দিত। জনগণের নিরাপত্তা এবং সুখ সুবিধার প্রতি দৃষ্টি রাখতে হত শাসকদের।

কিন্তু কোম্পানী ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান হওয়ার কারণে তার দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পৃথক। মুনাফা অর্জন ছাড়া ভিন্ন কোন ভাবনা তাদের ছিল না। যার ফলে অর্থনৈতিক শোষণই ছিল কোম্পানী শাসনের মূল নীতি। প্রজাদের কল্যাণ এবং সুযোগ সুবিধার প্রতি তাদের মোটেও ভ্রুক্ষেপ ছিল না।

'ক্লাইভ প্রথম রাজস্বের ভার গ্রহণ করেন এবং শাসনের দায়িত্ব এড়াইয়া চলেন। রাজস্ব ব্যবস্থা হইতে মুনাফার জন্য তিনি বাংলায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তন করেন। কোম্পানী রাজস্ব ব্যবস্থা হইতে প্রচুর অর্থ মুনাফা করিত। প্রতি বৎসর পাঁচ লক্ষ পাউন্ড রাজস্বের মুনাফা বিলাতে প্রেরিত হইত এবং ইহা কোম্পানীর অংশীদারদের মধ্যে ভাগ হইত। বাংলার রাজস্বে ইহার কৃষকদের কোন উপকার হইত না। তাহা ছাড়া কোম্পানী রাজস্বের ব্যাপারে যে পুঁজি নীতি (Investment policy) অবলম্বন করে, তাহা বাংলা র পক্ষে খুব ক্ষতিকর হয়।

www.pathagar.com

কোম্পানীর কর্তৃপক্ষ রাজস্ব ব্যবসায়ে নিয়োগ করিত এবং এই টাকায় পণ্যদ্রব্য ক্রয় করিয়া বিদেশে পাঠাইত ও লাভজনক ব্যবসায় করিত। শাসনকার্য চালাইবার জন্য টাকার অভাব হইত। ১৭৯৩ খ্রীস্টাব্দে হাউস অব কমনসের সিলেক্ট কমিটি ইহার রিপোর্ট স্বীকার করে যে, কোম্পানীর রাজস্ব সম্পর্কে পুঁজিনীতির ফলে বাংলা ও বিহার খুবই আর্থিক দুরবস্থায় পতিত হইয়াছে। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম এ রহিম, পৃ.-৪৫)

মীরজাফর বৃটিশদের শিখণ্ডি হওয়া সত্ত্বেও তার আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ৮,১৭,৫৫৩ পাউন্ড। অথচ দেওয়ানী লাভের প্রথম বছরেই ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী রাজস্ব আদায় করে ১৬,৮১,৪০৭ পাউন্ড। আগের তুলনায় দ্বিগুণ।

এখানে এসে অন্য আর একটি হিসাবে দেখা যায়, ১৭৫৬ থেকে ১৭৬৬ সাল পর্যন্ত ১০ বছরে যেখানে মোট আদায়কৃত রাজস্বের পরিমাণ ছিল ১৫ লাখ ৮১ হাজার পাউন্ড, ১৭৬৬-৬৭ সালে সেই রাজস্বের পরিমাণ দাঁড়ায় ২৫ লাখ ২৭ হাজার পাউন্ডে ভূমি রাজস্বের ক্ষেত্রে ওয়ারেন হেষ্টিংস যে কঠোরতা অবলম্বন করেন এবং যে নৃশংসতার পরিচয় দেন তা ইতিহাসের বিরল। (কোলাকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম আখতার মুকুল, পৃ.-৩৭)

রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে ওয়ারেন হেষ্টিংসের নতুন ব্যবস্থায় বাংলার মানুষ বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠীকে তীব্র সংকটের মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়। হেষ্টিংস নিলামে রাজস্বের বন্দোবস্ত করেন। প্রথমত ইংরেজরা রাজস্ব আদায়ের ব্যাপারে নির্ভর করেছে প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার উপর। ফলে নবাবী আমলের কর্মচারী কর্মকর্তারা নিজস্ব অবস্থানে থেকে নতুন দেওয়ানীর অধীনে কর্মরত থাকে। হেষ্টিংস প্রতিটি জেলায় ইংরেজ কালেক্টর নিয়োগ করলেন এবং এদের সহযোগী কর্মচারীদের নেয়া হল হিন্দু জনগোষ্ঠী থেকে। এর ফলে রাজস্ব আদায়ে লিপ্ত মুসলমান কর্মচারীরা অপসারিত হল। ইংরেজ কালেক্টররা জেলার দায়িত্বভার গ্রহণ করেই নিলামে রাজস্বের বন্দোবস্ত দেয়ার উদ্যোগ নেয়। যারা অধিক পরিমাণে রাজস্ব প্রদানে স্বীকৃত হল তাদের হাতেই তুলে দেয়া হল জমিদারী। এ প্রেক্ষিতে জমিদার শ্রেণীর উদ্ভব হল।

রাজস্ব বিভাগ কোম্পানীর পরিচালনাধীন হওয়ার পর কর্তৃপক্ষকে সন্তুষ্ট রাখার জন্যে হিন্দু ও ইংরেজ আদায়কারীগণ অতিমাত্রায় শোষণ নিষ্পেষণের মাধ্যমে রাজস্ব আদায় করে কোম্পানীর রাজকোষ পূর্ণ করতে থাকে। ইতিপূর্বে প্রজাদের নিকট থেকে আদায়কৃত সকল অর্থ দেশের জনগণের মধ্যে তাদেরই জন্যে ব্যয়

www.pathagar.com

হতো। কিন্তু তখন থেকে আদায়কৃত অর্থ ইংল্যাণ্ডের ব্যাংকে ও ব্যবসা কেন্দ্রগুলিতে স্থানান্তরিত হতে থাকে।

নীতি এবং দায়-দায়িত্বহীন কার্যক্রম, অনাবৃষ্টি, নির্যাতিত কৃষক সমাজের অস্থিরতা এবং বেহাল অবস্থা করুণ পরিণতির দিকে টেনে আনল বাংলার জনপদকে। সমগ্র বাংলা বিহারে এলো মহামন্বন্তর, হৃদয়বিদারক দুর্ভিক্ষ। খাদ্যের অভাবে নির্মমভাবে মৃত্যু কোলে ঢলে পড়ল এদেশের এক তৃতীয়াংশ মানুষ। কিন্তু তবু করুণার উদ্রেক হল না বেনিয়া এবং তাদের দালাল চক্রের। ১৭৭০-৭১ সালে হলো মহা মন্বন্তর (বাংলা ১১৭৬)। ইতিহাসে এই কুখ্যাত মন্বন্তরের পরে পরেই অধিক পরিমাণে বাহবা নেয়ার জন্য এবং নিজেকে কড়িৎকর্মা প্রমাণের উদ্দেশ্যে ১৭৭২ সালের ৩রা নভেম্বর বাংলার গভর্নর ওয়ারেন হেষ্টিংস বিলেতের ডিরেক্টর বোর্ডকে জানালেন– 'দুর্ভিক্ষে এই প্রদেশের এক তৃতীয়াংশের বেশী লোক মারা গেছে, চাষাবাদেরও ভয়ানক ক্ষতি হয়েছে' এই অবস্থা সত্বেও ১৭৭১ সালের আদায়কৃত রাজস্ব ১৭৬৮ সালের রাজস্ব থেকে অনেক বেশী আদায় হয়েছে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

এদেশে ইংরেজদের আগমনের শুরু থেকে ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী একচেটিয়া বাণিজ্যের সনদ লাভ করেছিলেন। ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী ছাড়া আর কোন বিদেশী কোম্পানী এমন কি ইংরেজ কোম্পানীরও বাণিজ্যের অধিকার ছিল না। তাদের জন্য এদেশে বাণিজ্যের সুযোগ সুবিধা ছিল অবারিত। অন্যান্য বিদেশী বণিকেরা এদেশের বাণিজ্যের চেষ্টা করলেও ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নিকট প্রতিযোগীতায় কুলিয়ে উঠতো না। ছলে বলে কৌশলে অন্যান্য বিদেশী বণিকদের বাণিজ্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী প্রতিহত করে নিজেদের জন্য অবারিত করে রেখেছিল। সুচারুরূপে বাণিজ্য পরিচালনার জন্য তারা বেশ কিছু এজেন্সী হাউস স্থাপিত করে। এইসব এজন্সী হাউস এক ধরনের ব্যাঙ্কিং পরিচালনা করত। স্থানীয় বণিক মূলত যারা ছিল হিন্দু সম্প্রদায় ভুক্ত তারা প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষভাবে এইসব এজেন্সী হাউসগুলোর সাথে সংশ্লিষ্ট হয়ে পড়ে। এসব এজেন্সী হাউসগুলোর মাধ্যমে এদেশের রেশম, পাট, তুলা, নীল, অন্যান্য পণ্যের ব্যবসা একচেটিয়াভাবে পরিচালিত হতে থাকে। এসব কারবারে অতিদ্রুত বিপুল পরিমাণ মুনাফা আসতে থাকে। এসবের সাথে সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে সুবর্ণ

www.pathagar.com

বণিকদের পুঁজির সাথে যুক্ত হতে থাকে অকল্পনীয় মুনাফা। মুর্শিদাবাদ এবং বাংলার জনপদ লুট করার পর ইংরেজ বণিকদের চোখ পড়ে কোলকাতার বণিকদের সঞ্চিত সম্পদের দিকে। তারা আশঙ্কা করে যদি কোলকাতায় সুবর্ণ বণিকদের স্ফীত সম্পদ দেশে অথবা বহির্বিশ্বে বাণিজ্য পরিচালনায় ব্যবহার হয় তাহলে এরাই একদা ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর প্রতিযোগী ও প্রতিদ্বন্দ্বীতে পরিণত হবে। ১৭৭৩ সালের ৬ই মার্চ কর্নওয়ালিস ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর ডিরেক্টরদের কাছে লিখলেন– 'বেশ কিছু নেটিভদের হাতে যে বিপুল পরিমাণ মূলধন রয়েছে তা বিনিয়োগ করার আর কোন পথ নেই। তাই জমিদারী বন্দোবস্ত (চিরস্থায়ী) নিশ্চিত করা হলে শীগগির উল্লিখিত সঞ্চিত মূলধন জমিদারী ক্রয়ে বিনিয়োগ করা হবে।' কর্নওয়লিসের এই পদক্ষেপ বৃটিশ স্বার্থের জন্য মোক্ষম হিসাবে প্রমাণিত হয়েছে। তার উদ্দেশ্য অর্জিত সুবর্ণ বণিকদের অর্থ সম্পদ ও মুলধন হাতিয়ে নেয়া এবং পুরাতন জমিদারদের হটিয়ে নতুন জমিদার সৃষ্টি করা, যারা অনুগত ঔপনিবেশিক দালাল হিসাবে কোম্পানীর স্বার্থ সমুন্নত রাখবে। মোটের উপর নবাবের পতন ঘটিয়েও ইংরেজরা নিজেদের নিরাপদ ভাবতে পারেনি। ছোট ছোট জমিদার জায়গীরদারদের উচ্ছেদ করে মুসলমানদের কড়ির কাঙ্গালে পরিণত না করা পর্যন্ত তারা স্বস্তি পাচ্ছিল না।

যে কারণে লর্ড কর্নওয়ালিস দশশালা বন্দোবস্তে পুরোপুরি সন্তুষ্ট না হয়ে ১৭৯৩ সালে চিরস্থায়ী ভিত্তিতে জমিদারী প্রথা চালূ করলেন। সূর্যাস্ত আইনের অছিলায় মাত্র ২ বছরের মধ্যে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে বাংলার অর্ধেক জমিদারী নিলাম হয়ে গেল। নিলামে এসব জমিদারী ক্রয় করল কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু বিত্তশালী ও সুবর্ণ শ্রেণীর মহাশয়েরা। শুরু হল নতুন উদ্যোগে অত্যাচার। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী, এম আখতার মুকুল, পৃ-৬৯।)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য ছিল মূসলমান জমিদারদের অধীনে নিযুক্ত হিন্দু নায়েব ম্যানেজার প্রভৃতিকে নব্য জমিদার হিসেবে স্বীকৃতি দান। ১৮৪৪ সালে Calcutta Review-তে যে তথ্য প্রকাশিত হয় তাতে বলা হয় এক ডজন জমিদারীর মধ্যে, যাদের জমিদারীর পরিধি ছিল একটি করে জেলার সমান, মাত্র দুটি পূর্বতন জমিদারদের দখলে রয়ে যায় এবং অবশিষ্ট হস্তগত হয় প্রাচীন জমিদারদের নিম্নকর্মচারীর বংশধরদের। এভাবে বাংলার সর্বত্র এক নতুন জমিদার শ্রেণীর পত্তন হয়, যারা হয়ে পড়েছিল নতুন বিদেশী প্রভুদের একান্ত অনুগত ও বিশ্বাসভাজন।

www.pathagar.com

হান্টার তাঁর গ্রন্থে বলেন : যেসব হিন্দু কর আদায়কারীগণ ঐ সময় পর্যন্ত নিম্নপদের চাকুরীতে নিযুক্ত ছিল, নয়া ব্যবস্থার বদৌলতে তারা জমিদার শ্রেণীতে উন্নীত হয়। নয়া ব্যবস্থা তাদেরকে জমির উপর মালিকানা অধিকার এবং সম্পদ আহরণের সুযোগ-সুবিধা প্রদান করে। অথচ মুসলমানরা নিজেদের শাসনামলে এ সুযোগ সুবিধাগুলো একচেটিয়াভাবে ভোগ করেছে। (Hunter The Indian, Musolman অনুবাদ আনিসুজ্জামান, পৃ-১৪১)

চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নব্য জমিদারদের অবাধ লুণ্ঠনের অধিকার দিয়েছে। কিন্তু প্রজা সাধারণের কোন অধিকার দেয়া হয়নি। সাধারণ মানুষকে জমিদারদের উপর ছেড়ে দেয়া হয়েছিল। প্রজাপালন এবং প্রজাদের কল্যাণের দিকে জমিদারদের কারো ভ্রুক্ষেপ ছিল না। প্রজা সাধারণ অনাবাদী জমিকে আবাদ যোগ্য করে তুললেও জমির উপর তাদের কোন স্থায়ী অধিকার ছিল না। জমিদার তার ইচ্ছা মত যে কোন প্রজাকে যে কোন সময় উচ্ছেদ করতে পারত। মুসলিম শাসন আমলে আইন ছিল প্রজা সাধারণের সাধারণ নিরাপত্তার ব্যবস্থা করবে জমিদাররা। তারা এজন্য সমাজ বিরোধী দুষ্কৃতিকারী ও দুস্যু তস্করের প্রতি সজাগ, দৃষ্টি রাখতো, লুণ্ঠিত মালামালসহ ধরা পড়লে রাজকোষে জমা দিতে হতো। ১৭৭২ সালে কোম্পানী এই আইন রোহিত করে দুষ্কৃতিকারীদের বেআইনী লুণ্ঠনের অবাধ সুযোগ করে দেয়। ব্যবসায়ী শ্রেণী থেকে আগত নতুন জমিদারেরা স্বাভাবিকভাবে দস্যু তস্করদের ধরিয়ে দেয়ার পরিবর্তে তাদের লালনকারী হয়ে উঠে এবং লুণ্ঠিত দ্রব্যের অংশীদার হয়ে তাদের ধনাগার পূর্ণ করতে থাকে। ১৯৪৪ সালে Calcatta Reveiw তে প্রকাশিত তথ্যে বলা হয় যে এসব জমিদার ধন অর্জনের উদ্দেশ্যে দস্যু তস্করদের লালন পালন করত। বুকানন্ বলেন, "রায়তদেরকে বাড়ি থেকে ধরে এনে কয়েকদিন পর্যন্ত আবদ্ধ রেখে নিরক্ষর প্রজাদের নিকট থেকে জাল রশিদ দিয়ে জমিদারের কর্মচারীগণ খাজনা আদায় করে আত্মসাৎ করতো। (Martin-The history-Antiquities Topocraogt and stakes of esters Indian London-1438, Vol-11)

অন্য আর এক তথ্য থেকে জানা যায়– "তৎকালীন জমিদারগণ সরকারকে ৩৭,৫০,০০০ পাউন্ড রাজস্ব দিত। কিন্তু তাহারা প্রজাদের নিকট হইতে প্রায় ১,৩০,০০,০০০ পাউন্ড খাজনা আদায় করিত।" (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস এম এ রহিম, পৃ-৪৮)

"চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে মুসলমানগণ খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তাহাদের সমৃদ্ধি নষ্ট হইয়া যায়। হান্টার লিখিয়াছেন যে, মুসলমান আমলে রাজস্ব আদায় শাসন

www.pathagar.com

পরিচালনায় মুসলমানদের একচেটিয়া অধিকার ছিল এবং ইহা হইতে তাহাদের প্রচুর অর্থ সমাগম হইত। পুরাতন রাজস্ব ব্যবস্থার পরিবর্তন ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রচলন করিয়া বৃটিশ গভর্নমেন্ট বাংলার মুসলমানদের আর্থিক জীবনে তীব্র আঘাত করে। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের অবিচারের কথা স্বীকার করিয়া মেটকাফ বলিয়াছেন যে, এই ব্যবস্থায় জমির প্রকৃত মালিকদের নিকট হইতে ছিনাইয়া লইয়া এরূপ এক শ্রেণীর বাবুদিগকে দেওয়া হয় যাহারা ঘুষ ও অন্যান্য অবৈধ উপায়ে ধনী হইয়াছেন। জেমস ও কেনেলী মন্তব্য করিয়াছেন– 'যে সকল হিন্দু কর্মচারী পূর্বে রাজস্ব বিভাগের সামান্য পদে ছিল, এই বন্দোবস্তে তাহারা জমিদার পদে উন্নীত করার জন্য জমির মালিকানাস্বত্ব দেওয়া হয় এবং অর্থ সংগ্রহ করিতে সুযোগ দেওয়া হয়। এই অর্থ মুসলমানদের শাসনকালে মুসলমানদের হাতে আসিত।' বড় জমিদারদের অধীনে অনেক তালুকদার ও পত্তনিদার ছিল। তাহারা জমিদারদের নির্দেশ মত চলিত। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে তাহারা স্বাধীন হইয়া পড়ে।" (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস, এম এ রহিম, পৃ-১৭)

মহাজনদের অত্যাচার

জমিদার-পত্তনীদারদের উৎপীড়নে কৃষকদের জীবন দুর্বিসহ যখন হয়ে পড়তো, বাধ্য হয়ে তাদেরকে তখন হিন্দু মহাজনদের দ্বারস্থ হতে হতো। উপরন্ত তাদের গরু/মহিষ মহাজনের কাছে বন্ধক রাখতে হতো। অভাবের দরুন মহাজনের কাছে অগ্রিম কোন শস্য গ্রহণ করতে হলে তার দ্বিগুণ পরিশোধ করতে হতো। আবার উৎপন্ন ফসল যেহেতু মহাজনের বাড়ীতেই তুলতে হতো, এখানেও তাদেরকে প্রতারিত করা হতো। মোটকথা হতভাগ্য কৃষকদের জীবন নিয়ে এসব জমিদার মহাজনরা ছিনিমিনি খেলে আনন্দ উপভোগ করতো।

কৃষকদের এহেন দুঃখ-দুর্শশার কোন প্রতিকারের উপায়ও ছিল না। কারণ তা ছিল অত্যন্ত ব্যয়সাপেক্ষ। উপরন্ত জমিদার ও তাদের দালালগণ উৎকোচ ও নানাবিধ দুর্নীতির মাধ্যমে মামলার খরচ কয়েক গুণ বাড়িয়ে দিত। পরিণাম ফল এই হতো যে, জমিদার মহাজন তাদেরকে ভিটেমাটি ও জমিজমা থেকে উচ্ছেদ করে পথের ভিখারীতে পরিণত করতো। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস ঃ আব্বাস আলী, পৃ.-১০৪)

www.pathagar.com

নীলকদের অত্যাচার

বৃটিশ সৃষ্ট নব্য জমিদারদের শোষন এবং নিত্য নৈমিত্তিক, নিপীড়নের সাথে যুক্ত হল আর এক যন্ত্রণা নীলকরদের অত্যাচার। যেন গোদের উপর বিষফোড়া। এদিকে সিরাজের পতনের পর কোম্পানীর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হলে বৃটিশ বণিকেরা নীলের জন্য বাংলাকে উপযুক্ত স্থান বলে মনে করল। শুরু হল ব্যাপক নীলচাষ। দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলসমুহে প্রতিষ্ঠিত হল নীলকুঠি। রাজ্য হারিয়ে, জমিদারী হারিয়ে, চাকুরিচ্যুত হয়ে মুসলমানরা যখন দু'মুঠো অন্নের জন্য পুরোপুরি কৃষিনির্ভর হয়ে উঠল, সে সময় বৃটিশ বণিকরা নব্য জমিদারদের পাশাপাশি মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় ডেরা বাঁধল। জমিদারদের শোষণের সাথে সাথে শুরু হল জুলুম। বণিকরা কোম্পানীর বিজয়ের আধিপত্যকে পুঁজি করে গ্রামবাংলায় ঝাঁপিয়ে পড়ল। এরা নীলের এমন নিম্নমুল্য বেঁধে দিল যাতে চাষীদের উৎপাদন খরচও উঠতো না। এই নিষ্ঠুর নীলকর সাহেবরা কৃষকদের নীল চাষে বাধ্য করত। তা না হলে বাড়ীঘরে আগুন লাগিয়ে দিত, দৈহিক অত্যাচার করত, এমনকি মহিলাদের অপরহণ করত। এছাড়াও জাল চুক্তিনামার বলে জমি-জিরাত ভিটেমাটি থেকে উচ্ছেদ করতো। প্রশাসন এবং নব্য জমিদারদের সাথে ছিল এদের অন্তরের যোগ। এ কারণে পুলিশে খবর দিয়ে প্রতিকার তো হতোই না পরন্তু উল্টো ঝামেলায় পড়তে হতো। অনেক সময় জমিদাররা প্রজাকে শাস্তি দেয়ার জন্য তার কাছে থেকে জমি কেড়ে নিয়ে নীলকরদে হস্তান্তর করত। যে কারণে একজন ম্যাজিষ্ট্রেট একজন খৃস্টান মিশনারীকে কথা প্রসঙ্গে বলেন– 'মানুষের রক্তে রঞ্জিত হওয়া ব্যতীত একবাক্স নীলও ইংলন্ডে প্রেরিত হয় না।' (নীল কমিশন রিপোর্ট এবং ক্যালকাটা খৃস্টান অবজারভার, নভেম্বর ১৮৫৫ সাল)। ঐতিহাসিক হারান চন্দ্র চাকলাদার লিখেছেন, 'ইউরোপীয়রা এদেশে এসেছিল দাস মালিকের মনোবৃত্তি নিয়ে। নিরঙ্কুশ শ্রেষ্ঠত্বের প্রচন্ড লোভের সংগে উদ্ভাবনী কল্পনাশক্তি মিলিত হয়ে যত প্রকার উপায় আবিষ্কার করতে সক্ষম হয়েছিল তার প্রত্যেকটিকেই নীলকর সাহেবরা এদেশে প্রয়োগ করেছিল।... (ফিফটি ইয়ার্স এগো, ডন ম্যাগাজিন, জুলাই, ১৯০৫)

লা'খেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

পলাশী যুদ্ধের প্রায় ১৫ বছর পর ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী তরবারির জোরে বঙ্গীয় এলাকায় তহসিলের দায়িত্ব নেয়ার পর ভেবেছিল যে খাজনা আদায়ের উদ্বৃত্ত অর্থ

www.pathagar.com

থেকে কোম্পানী হেড অফিসে পাঠানো সম্ভব হবে। কিন্তু বাস্তবে তা না হওয়ার ফলে ১৭৭২ খৃস্টাব্দে ওয়ারেন হেস্টিং সর্বপ্রথম হিসেব করে বের করলেন যে বাংলার ৪ ভাগের ১ ভাগ জমি একেবারে নিস্কর অর্থাৎ লাখোরাজ হয়ে রয়েছে। এর পর থেকেই ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী নানা বাহানায় এসব জমি খাজনা যুক্ত করার জন্য এক অঘোষিত যুদ্ধ অব্যাহত রাখে জমির প্রকৃত মালিক স্থিরীকরণের অছিলা এসব বাহানার অন্যতম। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম, আর, আখতার মুকুল, পৃ.-৭৮)

কয়েক শতাব্দী ধরে লাখেরাজ সম্পত্তি যথানিয়মে ভোগ দখল হয়ে আসছিল। শাসক পরিবর্তন হলেও লাখেরাজ সম্পত্তির উপর কেউ হস্তক্ষেপ করেনি। কিন্তু বৃটিশ বেনিয়াদের অর্থনৈতিক লালসা এমন তীব্র ছিল যে লাখেরাজ সম্পত্তির উপর নির্মমভাবে হস্তক্ষেপ করতেও তারা কুণ্ঠিত হয়নি। লর্ড কর্নওয়ালিশ ১৭৯৩ সালে আইনের ১৯ ও ৩৭ প্রবিধান বলে অফিসে লাখেরাজ জমির দানপত্র পরীক্ষার ব্যাপারে জেলা কালেক্টর অফিসে জমা দেয়ার জন্য নিস্কর সম্পত্তির মালিকদের প্রতি নির্দেশ জারি করেন। কোন মাপকাঠির ভিত্তিতে দলিলসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হবে সে ব্যাপারে কোন দিক নির্দেশনা ছিল না। সম্ভবত সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ছিল 'অরি মারি পারি যে কৌশলে'। যেভাবেই হোক লাখেরাজ সম্পত্তি হস্তগত করাই হল ইংরেজ সরকারের মূল লক্ষ্য। কোন মাপকাঠি না থাকার দরুন কালেক্টরের ইচ্ছাই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। ওদিকে কালেক্টরদের প্রলুব্ধ করার জন্য বলা হয়, যেসব জমি বাজেয়াপ্ত করা হবে, কালেক্টরদের সেগুলির প্রথম বছরের খাজনার এক চতুর্থাংশ কমিশন হিসাবে দেয়া হবে। স্বাভাবিকভাবে কমিশন প্রাপ্তির আশায় লাখেরাজ সম্পত্তি সরকারের হাতে তুলে দেয়া কালেক্টরের মূল লক্ষ্য হয়ে উঠল। এ যেন বৈধতার মোড়কে চুরিকে উৎসাহিত করা। এছাড়াও এক পর্যায়ে কালেক্টরদের নিস্কর জমি সংক্রান্ত মোকদ্দমা বিচারের অতিরিক্ত ক্ষমতা দেয়া হয। সরকারী বাদী এবং বিচারক উভয়বিধ ক্ষমতার অধিকারী হয় কালেক্টর স্বয়ং। এর ফলে লাখেরাজ সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলাসমূহের সুবিচারমূলক নিষ্পত্তি হয়নি।

চট্টগ্রাম বোর্ড অব রেভিনিউ-এর জনৈক অফিসার নিম্নোক্ত মন্তব্য করেন ঃ সরকারের নিয়তের প্রতি লাখেরাজদারগণ সন্দিগ্ধ হয়ে পড়লে তাতে বিস্ময়ের কিছুই থাকবে না। এটা অত্যন্ত স্বাভাবিক, ১৪৮৬৩টি মামলার মধ্যে সব কয়টিতেই লাখেরাজদারদের অনুপস্থিতিতে সরকারের পক্ষে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এ তিক্ত অভিজ্ঞতার পর Tribunals of Resumption-এর প্রতি তাদের

www.pathagar.com

আস্থাহীন হবারই কথা। Comment by Smith on Harver's Report of 19th June 1840. A.R. Mallick: British policy and the Muslims of Bengal.

মুসলমান লাখেরাজদারদের ন্যায্য ভূমি মালিকানা থেকে উচ্ছেদ করার জন্যে নানাবিধ হীনপন্থা অবলম্বন করা হতো এবং ইংরেজ কর্মচারীদের মধ্যে এ ব্যাপারে এক বিদ্বেষদুষ্ট মানসিকতা বিরাজ করতো। লাখেরাজদারদের সনদ রেজেস্ট্রী না করার কারণে বহু লাখেরাজ বাজেয়াপ্ত করা হয়। জেলার কালেক্টরগণ ইচ্ছা করেই সময়মতো সনদ রেজেষ্ট্রী করতে গরিমসি করতো। তার জন্যে চেষ্টা করেও লাখেরাজদারগণ সনদ রেজিষ্ট্রী করাতে পারতেন না।

চট্টগ্রামে লাখেরাজদারদের কোর্টে হাজির হবার জন্যে কোন নোটিশই দেয়া হতো না। অনেক ক্ষেত্রে এমনও দেখা গেছে যে, মামলার ডিক্রী জারী হবার বহু পূর্বেই সম্পত্তি অন্যত্র পত্তন করা হয়েছে। ১৮২৮ থেকে ১৮৫১ সাল পর্যন্ত সময়কালের মধ্যে সমগ্র বাংলা বিহারে লাখেরাজদারদের মিথ্যা তথ্য সংগ্রহের জন্যে চর, ভুয়া সাক্ষী ও রিজাম্পশন অফিসার পংগপালের মতো চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে এবং মুসলমানদেরকে মামলায় জড়িত করে। এসব মামলায় সরকার ছাড়াও তৃতীয় একটি পক্ষ বিরাট লাভবান হয়। যারা মিথ্যা স্বাক্ষ্যদান করে এবং যারা সরকারী কর্মচারীদের কাছে কাল্পনিক তথ্য সরবরাহ করে– তারা প্রভুত অর্থ উপার্জন করে। পক্ষান্তরে, মুসলিম উচ্চশ্রেণী ও মধ্যবিত্ত শ্রেণী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হওয়ার ফলে বহু শিক্ষা প্রতিষ্ঠানও বন্ধ হয়ে যায়। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস আব্বাস আলী খান, পৃ.-১০৩)

'লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে ১৮৪৭-৪৮ সাল পর্যন্ত সরকারের যাহা খরচ হয়, তাহা এই বার্ষিক আয়ের প্রায় চারগুণ ছিল। হান্টার লিখিয়াছেন যে, এই আয়ের অধিকাংশই মুসলমানদের লাখেরাজ সম্পত্তি হইতে হইত। লাখেরাজ বাজেয়াপ্তির দরুন বাংলার মুসলমানদের যে কি ভয়ানক ক্ষতি হইয়াছিল, তাহা উল্লেখ করিয়া হান্টার বলিয়াছেন, শত শত পরিবার সর্বস্বান্ত হইয়া পড়ে এবং যে সকল মুসলিম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নিস্কর জমির আয়ের উপর চলিত সেগুলি ধ্বংসের মুখে পতিত হয়। সরকারের আঠার বৎসরব্যাপী স্বেচ্ছাচারিতামূলক কার্যকলাপের দরুন মুসলমানদের শিক্ষিত শ্রেণীর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়।

সিরাজের পতনের পর থেকে কোম্পানী কর্তৃপক্ষের প্রতিটি পদক্ষেপে মুসলমানদের জন্য ছিল অসনি সংকেত। তাদের প্রতিটি পদক্ষেপ মুসলমানদেরকে অনিবার্য ধ্বংসের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে। আঘাতে আঘাতে

www.pathagar.com

মুহ্যমান করে তুলেছে বাংলার সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠি বাংলার মুসলমানদের। বিনয় ঘোষের ভাষায় ঃ মুসলমানদের প্রতি বৃটিশ শাসকদের অবিচার ও বিদ্বেষভাব প্রথম যুগে বেশ প্রবল হয়ে উঠেছিল। ইংরেজদের নতুন জামিদারী ব্যবস্থার ফলে শুধু যে মুসলমান জমিদার জায়গীরদার ধ্বংস হয়ে গেলো তা নয় বাংলার যে কৃষক প্রজারা ভিটেমাটি থেকে উৎখাত হল তাদের মধ্যে অধিকাংশ মুসলমান। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম আর আখতার মুকুল, পৃ.-৭৩)

এখানে এসে বৃটিশদের চক্রান্ত থেমে থাকল না। হিন্দু জনগোষ্ঠীর জন্য সৌভাগ্যের দ্বার একটার পর একটা উন্মোচন করার এবং মুসলমানদের রুটিরুজীর পথ রুদ্ধ করে সর্বহারা জাতিতে রূপান্তর করার চক্রান্ত অব্যাহত থাকল। হিন্দুদের সাথে হৃদ্যতা উত্তরোত্তর বাড়তে লাগল।

১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে ফাসীর পরিবর্তে ইংরেজীর প্রবর্তন মুসলমানদের কপাল বরাবর আর এক প্রচণ্ড আঘাত।

কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিটদের সাথে বোঝাপড়ার ভিত্তিতে ১৮৩৭ সালে মুসলমানদের ক্ষতবিক্ষত করার জন্য এই বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করা হয়। একটু গভীরভাবে খতিয়ে দেখলে চক্রান্তটা সুস্পষ্টই হয়ে উঠে। ১৮১৬ খৃস্টাব্দে উচ্চ শিক্ষার জন্য কোলকাতায় প্রথম হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হয়। এই সময় থেকেই কোলকাতা এবং তার সন্নিহিত এলাকাসমূহে ব্যাপক ইংরেজী শিক্ষা প্রসারের উদ্যোগ দেখা যায়। এর ফলে ১৫/২০ বছর সময়ের মধ্যে বিরাট সংখ্যক হিন্দু যুবক শিক্ষা সমাপন করে বেরিয়ে আসে। ওদিকে ইংরেজরা ভাষা সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত প্রকাশের আগেই দেখা গেল ১৮৩৫ সালে ইংরেজদের সহযোগী শক্তি ঔপনিবেশিক দালাল কোলকাতার ধনাঢ্য বর্ণহিন্দুরা ৬,৯৪৭ জনের এক যুক্ত দরখাস্তে অফিস আদালতের ভাষা ইংরেজী চালু করার দাবী তোলে। ওদিকে ১৮৩২ সালে ক্যাপ্টেন টি বৃসকান সিলেক্ট কমিটির কাছে অত্যন্ত জোরের সংগে সুপারিশ করেছিলেন যে অফিসের ভাষার পরিবর্তনটা যেন মন্থর হয়। অন্যথায় বিশেষ করে মুসলিম জনগোষ্ঠী মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। কিন্তু তার সুপারিশ অরণ্যের রোদনে পরিণত হল। ১৮৩৭ সালে অফিস আদালতে এবং ১৮৪৪ সালের ১৪ই অক্টোবর সরকারী নির্দেশ এই মর্মে জারী করা হল যে 'অতঃপর সরকারের সমস্ত দপ্তরে ইংরেজী শিক্ষিত লোকদের চাকুরিতে নিয়োগ করতে হবে। (কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবী এম, আর আখতার মুকুল, পৃ-৭৩)

www.pathagar.com

ফারসীর বদলে ইংরেজী চালু করার শক্ত পদক্ষেপ নেয়ার ফলে শিক্ষা বিভাগ এবং প্রশাসনের অন্যান্য বিভাগ থেকে দলে দলে বাঙালী মুসলমানরা চাকুরীচ্যুত হয়ে বিতাড়িত হল।

'এ পরিবর্তন অপর সম্প্রদায়ের (বাঙালী হিন্দু) জন্য খুব সুখকর হয়ে উঠলো। কারণ তারা ইতিমধ্যেই ইংরেজী শিক্ষায় অনেকদূর অগ্রসর হতে পেরেছিল। মুসলমানদের জন্য এ সময়ে ইংরেজী শিক্ষার কোন প্রতিষ্ঠান ছিল না। সুতরাং হিন্দু কলেজের (পরবর্তীতে কোলকাতা প্রেসিডেন্সী কলেজ) ছাত্ররা এই পরিবর্তনের পূর্ণ উপকার ভোগ করেছে। অপরপক্ষে মুসলিম আপার ক্লাস নতুন ব্যবস্থার সাথে খাপ খাওয়াতে না পেরে সর্বস্তরের অফিস আদালত থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। (ব্রিটিশ নীতি ও বাংলার মুসলমান)

আমীর আলী আরো বলেন– "গত বিশ বৎসর যাবত মুসলমানগণ যোগ্যতা লইয়া চাকুরীতে ঢুকিতে আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে; কিন্তু ভিণ্ন সম্প্রদায়ের লোকগণ প্রত্যেক সরকারী চাকুরীর দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখায় তাহাদের পক্ষে কোনো অফিসে প্রবেশ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া পড়িয়াছে।" যদি সৌভাগ্যক্রমে কোন মুসলমান চাকুরী পায়, তাহা হইলে ইহা রক্ষা করাও তাহার পক্ষে কঠিন হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

ষষ্ঠ অধ্যায়

শতাব্দীকালের প্রতিরোধ যুদ্ধ অতঃপর হতাশা

সিরাজের পতন অতঃপর মীর কাসিমের প্রতিরোধ যুদ্ধের অবসান হলে ইংরেজরা শুধু মাত্র শোষণ এবং এদেশের সম্পদ লুণ্ঠনের মধ্যে তাদের কার্যক্রম সীমাবদ্ধ রাখেনি। তাদের সহযোগী তাদের জুনিয়ার পার্টনার বর্ণবাদী হিন্দুদের সহযোগীতাই মুসলমানদের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড ভাঙলো অতঃপর শিক্ষা সংস্কৃতি সভ্যতা সবকিছু থেকে বঞ্চিত করার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখল। একদিকে বৃটিশদের বিমাতাসূলভ আচরণ নীলকরদের অত্যচার অন্যদিকে হিন্দু জমিদারদের শোষণ ও অত্যাচারে এদেশের মানুষ দিশেহারা হয়ে পড়ল। মুসলমানরা চাকুরি হারাল, আয়মা লাখেরাজ সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হল। লক্ষাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ হওয়ায় সমগ্র জাতি ঘোর অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। বিলাতী বস্ত্রে ছেয়ে গেল দেশ। লক্ষ লক্ষ তাঁতী হল কর্মহীন। লবন ব্যবসা চলে গেল ইউরোপীয়দের হাতে। নীলকরদের অত্যাচারে সর্বসান্ত হল কৃষকরা। খাজনা আদায়ের ভার দেয়া হল হিন্দুদের। জমিদার হয়ে বসল হিন্দুরা। অর্থনীতির সব সেক্টর থেকে মুসলমানরা হল বিতাড়িত।

এই সর্বহারা মুসলমানরা পরাধীনতার ঘোড় অন্ধকারে তাদের হারান ইতিহাস ঐতিহ্য হাতড়ে ফিরল। দেখল তাদের সব কিছু ধ্বংস স্তূপের নীচে চাপা পরে আছে। সেখান থেকে পুনরুদ্ধারের উদ্যোগ নিল। দেখল ঔপনিবেশিক শক্তি এবং তাদের ব্রাহ্মণ্যবাদী সহযোগীরা বিঘ্নের পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। নিপিড়নের মধ্য দিয়ে নিস্পেষিত জনগণের প্রতিরোধ শক্তি দানা বেধে উঠল। ক্ষমতার দ্বন্দ্ব পরিণত হল গণ প্রতিরোধে। সিরাজের পতন পর্যায়ে যে জনগণ ছিল প্রতিক্রিয়া হীন সে জনগণ স্বাধীনতা সংগ্রামে সম্পৃক্ত হল।

যারা সবকিছু চাওয়া পাওয়ার বাইরে অবস্থান করছিল সেই ফোকরা গোষ্ঠি সংঘবদ্ধ হল এবং এগিয়ে এলো প্রতিরোধ যুদ্ধে। হৃত স্বাধীনতা পুনরুদ্ধারের জন্য জানবাজি রাখতে তৈরি হল। ইতিহাসে যেটা পরিচিত ফকীর বিদ্রোহ নামে। শুধুমাত্র বাংলায় স্থানীয়ভাবে বিদ্রোহ সংঘটিত হয় ত্রিশটি বছর বিদ্রোহে বর্ণবাদী হিন্দুরা ছিল ঔপনিবেশবাদী বৃটিশদের সর্বাত্মক সহযোগী। তাদের প্ররোচনায় কোন নিপিড়িত হিন্দুদের কোন একটি অংশও স্বাধীনতা সংগ্রামে

www.pathagar.com

অংশ নেইনি। এককভাবে মুসলিম জন গোষ্ঠী স্বাধীনতা সংগ্রামে একটানা একশ বছর 'বিরামহীন ভাবে লড়াই করেছে। ফকির বিদ্রোহ থেকে মুজাহিদ আন্দোলন সবখানে ছিল মুসলমানদের সক্রিয় ভূমিকা। শুধুমাত্র ভারত কাঁপানো সিপাহী বিদ্রোহে ঝাঁসীর রানী লক্ষ্মীবাই এবং তাতিয়া তোপি এবং অবাঙালী সিপাহীরা বিদ্রোহে যোগ দিলেও বাঙালী বাবুরা এ বিদ্রোহে থেকে দুরেই শুধু অবস্থান করেনি তারা সিপাহী বিপ্লবের সময় ইংরেজদের সার্বিকভাবে সহযোগীতা করে নিজেদের ঔপনিবেশিক দালাল হিসাবে চিহ্নিত করেছে। স্বার্থপর শিখেরা সিপাহী বিপ্লবের সময় স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগদানের কথা চিন্তা করেনি। তারাও ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র এবং বাঙালী বাবুদের মত ভারতে মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে ছিল শংকিত। একজন বাহাদুর শাহর পরিবর্তে একজন ডাল হৌসীর প্রয়োজন ছিল তাদের কাছে অনেক বেশী। 'ভারত উপমহাদেশে সিপাহী বিপ্লবের প্রচন্ড ঝড়কে চোখ বন্ধ করে উপেক্ষা করেছে শিখ ও কোলকাতা কেন্দ্রিক হিন্দু এলিট গোষ্ঠী বর্ণ হিন্দু ও তার প্রভাবিত বাঙালী হিন্দুরা। এরা ঝড়ের ঝাপটা থেকে নিজেদের বাঁচিয়ে রাখার জন্য ইংরেজদের পক্ষপুটের নিবিড় আশ্রয়ে নিরাপদ অবস্থান নিল। যখন ঢাকার পথে গাছের ডালে ডালে মুক্তিকামী স্বাধীনতা সংগ্রামীদের লাশ ঝুলছিল তখন কোলকাতার বাবুদের ঘরে ঘরে চলছিল বিজয়ের মহোউৎসব। যখন সমস্ত উপমহাদেশের মুসলমান ও সংশ্লিষ্ট অবাঙালী হিন্দুদের বুক বিদীর্ণ হচ্ছিল বন্দুকের গুলিতে তখন কোলকাতায় আতসবাজী দিয়ে বিজয়ী বৃটিশদের জানান হচ্ছিল সাদর অভিনন্দন। যখন মুসলিম রমনীদের চোখে নতুন করে ঝরছিল স্বজনহারা বেদনার অশ্রু তখন কোলকাতার হিন্দু কুল বধুরা উলুধ্বনি দিয়ে জানাচ্ছিল সম্ভাষণ। যখন লালবাগের ভাঙা কেল্লায় রক্তাক্ত সিপাহীরা আর্তনাদ করছিল তখন নির্মিত হচ্ছিল বাবুদের জন্য ইংরেজদের বিশেষ উপহার কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়।

সিপাহী বিপ্লবের প্রজ্জ্বলিত শিখা যখন ছড়িয়ে পড়েছে উপমহাদেশের সর্বত্র তখন ইশ্বর গুপ্ত সম্পাদিত সংবাদ প্রভাকর পত্রিকায় তৎকালীন বাঙালী অর্থাৎ হিন্দু সমাজের উদ্দেশ্যে উপদেশ প্রদান করে বলা হয়– 'হে বাঙালী মহাশয়েরা এ বিষয়ে আপনাদের যুদ্ধ করিতে হইবে না। আপনারা শুধু একান্ত চিত্তে কেবল রাজপুরুষদের মঙ্গলার্থে সান্তায়ন করুন।

সিপাহী বিপ্লবের আগুন স্তিমিত হল। মুক্তিকামী সিপাহী ও জনতার লাশ মাড়িয়ে ইংরেজ সেনাপতি দিল্লীতে প্রবেশ করলে কোলকাতায় বয়ে যায় আনন্দের বন্যা। হিন্দু মানস উল্লসিত হয়ে ওঠে। পণ্ডিত গৌরী চন্দ্র সম্পাদিত সম্বাদ ভাস্মর

www.pathagar.com

পত্রিকায় মন্তব্য করা হয়– 'হে পাঠক সকল উদ্বাহু হইয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিয়া জয়ধ্বনি করিতে করিতে নৃত্য কর।

কোলকাতার বাবুরা বৃটিশদের এতখানি আস্থাভাজন হয়েছিলেন যে সমগ্র ভারতের ১৪টি শহরে সামরিক আইনের এবং ঔপনিবেশিক নিপিড়নের স্টীম রোলার অব্যাহত ভাবে চললেও কোলকাতা সামরিক আইনের আওতার অন্তর্ভুক্ত ছিল না। এছাড়াও বাংলার বাইরে বাঙালী হিন্দুদের গৃহে 'ক্যালকাটা বাবুজ' লেখা থাকলে সেটাও জুলুম মুক্ত নিরাপদ গৃহ হিসাবে বিবেচিত হতো।)

ডক্টর আনিসুজ্জামানের মন্তব্যে বলা হয়েছে– সিপাহী বিপ্লবের সমস্ত দায়িত্বটা কিন্তু ভারতীয় মুসলমানদের ঘাড়ে এসে পড়েছিল। দেশে এবং বিলেতে শাসক মহলে এ ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল যে মুঘল শাসনের পূর্ণ প্রতিষ্ঠার জন্য মুসলমানরা এ বিদ্রোহ ঘটিয়েছিলেন। শাস্তিমূলক ব্যবস্থার মোটা অংশই তাদের ভাগ্যে জুটেছিল।

১৮৫৭ সালের ২১ সেপ্টেম্বর ইংরেজ কর্তৃক দিল্লী দখলের পরদিনের বিবরণ দিয়েছেন জনৈক ইংরেজ– 'আমাদের সৈন্যগণ নগরে প্রবেশ করার পর নগর প্রাচীরের মধ্যে যাকে পেয়েছে তাকেই বেয়নটের আঘাতে হত্যা করেছে। কোন কোন বাড়ীতে চল্লিশ পঞ্চাশ জন লুকিয়েছিল। এ থেকে বোঝা যায় তাদের সংখ্যা বেশ ছিল। এরা বিদ্রোহী নয় শহরের অধিবাসী মাত্র।'

সিপাহী বিপ্লবের মর্মান্তিক পরিণতির পর মুসলমানদের পুনরুত্থান ও স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা একেবারে স্থিমিত হয়ে পড়ে। স্বাধীনতাকামীদের যারা বেঁচে ছিলেন তারা বনে বাদারে অথবা নিভৃত পল্লীর অপরিচিত পরিবেশে স্থান নিলেন শুধু মাত্র ক্ষুদ কুড়ো দিয়ে জাবিকা নির্বাহের জন্য। নৈরাশ্য হতাশা ও নীরব কান্নায় গুমড়ে মরছিল সমগ্র মুসলিম জনগোষ্ঠী। হিন্দু বেনিয়া ও বৃটিশদের প্রতিরোধ স্পৃহা এবং তাদের বৈরী নীতি মুসলমানদেরকে অধঃপতনের দোড় গোড়ায় নিয়ে এল। পাশাপাশি হিন্দু জনগোষ্ঠীর সৌভাগ্য আকাশ চুম্বী হয়ে উঠল। মুসলমানদের শুধুমাত্র দীর্ঘশ্বাস ছাড়া কোন অবলম্বনই অবিশষ্ট রইল না।

মুসলমানদের পূনরুত্থান প্রয়াসের শেষ আলোটা যখন সিপাহী বিদ্রোহের বহ্নি শিখা হয়ে দপ করে নিভে গেল তখন থেকে শুরু হল সত্যিকার হিন্দু রেঁনেসা। মুসলমানদের শাসক জাতি থেকে কড়ির কাঙালে পরিণত করা পর্যন্ত যে সময়টুকু লেগেছিল এই দীর্ঘ সময় ধরে বৃটিশ তোষনের মধ্যদিয়ে হিন্দু জনগোষ্ঠী তাদের শক্তি সুসংহত করে। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে প্রকৃত পক্ষে হিন্দু রেঁনেসার সূচনা হয়। সিপাহী বিপ্লোবত্তরকালে কোম্পানীর বদলে

www.pathagar.com

রাজকীয় শাসনের সবটুকু সুফল হিন্দুদের ভাগ্যে জুটে। তখনো মুসলমানরা নতুন করে পরাজয়ের হীনমান্য মানসিকতা নিয়ে হতাশা আর দুর্ভাগ্যের শেষ প্রান্তে এসে আশা নয় শুধুমাত্র আশঙ্কার ঘোর তমসায় আচ্ছন্ন। মুসলিম বিদ্বেষ ঘৃণা আর প্রতিহিংসার ভিত্তির ওপর গড়ে ওঠে হিন্দু রেঁনেসার ইমারত। মুসলমানরা যখন জ্ঞান বিজ্ঞান সাহিত্য সাংস্কৃতির অঙ্গন থেকে পরিত্যাক্ত হয়ে অজ্ঞানতা ও অন্ধতার অথৈ সমুদ্রে আবর্তিত হচ্ছিল তখন হিন্দু জনগোষ্ঠী জ্ঞান-বিজ্ঞান সাহিত্য সংস্কৃতির নিত্য নব নব উপত্যকা পেছনে ফেলে দশ দিগন্তে পাখা মেলে এগিয়ে চলছিল। ডক্টর এম এ রহিম লিখেছেন– 'উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য ভাগ থেকে হিন্দু সমাজের ধর্মীয় জাতীয়তাবাদের সূচনা হয় এবং ইহার উপর ভিত্তি করে তাদের রাজনৈতিক জাতীয়তার উত্থান হয়। এ বিষয়ে ডক্টর আর সি মজুমদার লিখিয়াছেন, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস কৃষ্টির ওপর ভিত্তি করিয়া ভারতীয় জাতীয়তাবাদ ও হিন্দুদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট গড়িয়া উঠিয়াছে। জাতীয় পত্রিকা নামক সাময়িকীর মাধ্যমে রাজ নারায়ণ বসু ও কবি গোপাল মিত্র হিন্দু জাতীয়তাবাদের বানী প্রচার করেন। ইশ্বর চন্দ্র গুপ্ত রঙ্গলাল বন্দোপাধ্যায় হেম চন্দ্র নবীন চন্দ্র প্রমুখ কবিগণ তাদের রচনার মধ্য দিয়ে হিন্দুদের হিন্দু জাতীয়তাবাদের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করেন।

পরবর্তী পর্যায়ে বঙ্কিম চন্দ্র থেকে রবীন্দ্র নাথ পর্যন্ত হিন্দু রেঁনেসা সমুন্নত করার বিশেষ লক্ষে সক্রিয় ছিলেন। প্রত্যেকের মধ্যে ছিল মুসলিম বিদ্বেষ ও বৃটিশ তোষণ। যেমন আনন্দ মঠে বিসি চ্যাটাজী সংলাপ আকারে লিখেছেন– আমরা রাজ্য চাহিনা কেবল মাত্র মুসলমানরা ভগবান বিদ্বেষী বলিয়া তাহাদের সবংশে নিপাত করিতে চাই ইত্যাদি।

হিন্দুদের এই মুসলিম বিদ্বেষ ও ঘৃণার উচ্ছাস মুসলমানদের মধ্যে অতি ধীরে হলেও চেতনার উন্মেষ ঘটাতে থাকে। অত্যন্ত ধীর গতিতে মন্দ মন্থরে মুসলমানরা শিক্ষাঙ্গনের দিকে পা বাড়াতে থাকে। মুসলমানদের মধ্যে অগ্রগামী ও চিন্তাশীল উদ্যোক্তা মুসলমানদের আড়ষ্টতা ভাংবার উদ্যোগ নেয়। ১৮৬৩ সালে কোলকাতার মোহমেডান লিটারারী সোসাইটি ১৮৭৭ সালে কোলকাতার সেন্ট্রাল ন্যাশনাল মোহামেডান এ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠিত হয়। এ সময় থেকেই মুসলমানদের মধ্যে দেখা যায় সংঘবদ্ধ হবার প্রয়াস।

১৮৮৩ সালে মুসলিমস সুহৃদ সমিতি গঠিত হয়। এই ভাবে মুসলমানরা একদিকে শিক্ষাঙ্গনে হাটি হাটি পা পা করে পদচারণা শুরু করে অন্যদিকে সমিতি সোসাইটি গঠন করার মধ্যদিয়ে রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে।

www.pathagar.com

সপ্তম অধ্যায়

সিপাহী বিদ্রোহের পর কেড়ে নেয়া হল মুসলমানদের মুখের ভাষা

ওদিকে (পাঁচ সাতশ' বছর ধরে একটানা মুসলিম শাসনামলে আরবী ফারসী সমন্বয়ে প্রাকৃতিক নিয়মে মিশ্র প্রক্রিয়ায় সহজভাবে ভাব প্রকাশের জন্য একটা ভাষার উদ্ভব হয়েছিল সেটাকে বলা হত চলতি ভাষা। অনেকে বলত মুসলমানী ভাষা। এ প্রসঙ্গে উইলিয়াম হান্টার বলেন–

আজ পর্যন্ত বদ্বীপ অঞ্চলের কৃষক মুসলমান। নিম্নবংগে ইসলাম এতই বদ্ধমূল যে, এটি এক নিজস্ব ধর্মীয় সাহিত্য ও লৌকিক উপভাষার উদ্ভব ঘটিয়েছিল হিরাতের ফার্সী ভাষা থেকে ভারতের উর্দু যতোখানি পৃথক, 'মুসলমানী বাংলা' নামে পরিচিত উপভাষাটি উর্দু হতে ততোখানি পৃথক। (W. W Hanter-Indian Musoleman's, P-146.)

এই ভাষার পরিচয় যে যেভাবেই উপস্থাপন করুক না কেন, এটা ছিল হিন্দু মুসলিম নির্বিশেষে এদেশের প্রতিটি মানুষের মুখের ভাষা। এ সত্বেও গোড়া হিন্দু পণ্ডিতেরা এই ভাষাকে অবজ্ঞা অবহেলার চোখে দেখত। এর কারণ সম্ভবত এ ভাষাতে ছিল আরবী ফারসী উর্দু শব্দসমূহের সহজ মিশ্রণ। এছাড়াও ছিল এর মধ্যে মুসলিম সংস্কৃতির স্বাচ্ছন্দ প্রবেশাধিকার। হিন্দু মানসিকতার কাছে এটা ছিল দুর্বিসহ। শতাব্দীর পর শতাব্দী মুসলিম শাসন প্রতিষ্ঠিত থাকার কারণে এর বিরুদ্ধে হিন্দু পণ্ডিতেরা সক্রিয় অবস্থান নিতে পারেনি। মুসলিম শাসকদের ঔদার্যের কারণে তাদেরই পৃষ্ঠপোষকতায় হিন্দুদের অনেক ধর্মীয় গ্রন্থ অনুবাদ হয়। কিন্তু এইসব গ্রন্থ সাধারণ হিন্দুদের পাঠের ব্যাপারে হিন্দু পণ্ডিতেরা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করে রাখে। তারা বলে অষ্টাদশ হিন্দু পুরান রাম চরিত যে মানব পড়বে, তার ব্যবস্থা রৌরব নরকে। তাদের এই নিষেধাজ্ঞা পুরো হিন্দু সমাজকে চলতি বাংলাভাষা চর্চার ব্যাপারে অনীহাপ্রবণ করে তোলে। ভাষা চর্চার ব্যাপারে তারা সংস্কৃত আশ্রিত হয়ে উঠে।

ওদিকে খৃস্টান মিশনারীদের লক্ষ্য যেহেতু হিন্দু জনগোষ্ঠী তারা হিন্দুদের উপর প্রভাব বিস্তারের উদ্দেশ্যে তাদের উপযোগী সাহিত্য সৃষ্টির জন্য সংস্কৃত একথা

www.pathagar.com

খৃস্টান মিশনারীগণও ভালোভাবে উপলব্ধি করেন যে, যে ভাষার প্রতি হিন্দু পণ্ডিতগণ ঘৃণা পোষন করেন, সে ভাষার শুদ্ধিকরণ ব্যতীত তার দ্বারা খৃস্টধর্মে আকৃষ্ট করা কষ্টকর হবে। তাই তাঁরা এক ঢিলে দুই পাখী মারার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হন। ভাষাকে আরবী-ফার্সীর ছোঁয়াচ্ থেকে রক্ষা করে হিন্দুর গ্রহণযোগ্য করা এবং মুসলমানদের বাংলা মাতৃভাষার বা ধ্বংসযজ্ঞ সম্পাদন করা যায় উল্লেখ সজনীকান্ত করেছেন। এ মহান (?) উদ্দেশ্যে নাথানিয়েল ব্রাসি হ্যালহেড (Halhed) ১৭৭৮ সালে A Grammar of the Bengali Literature নামে বাংলা ব্যাকরণ প্রণয়ন করেন এবং শ্রীরামপুর প্রেস থেকে প্রকাশিত হয় মুদ্রিত গ্রন্থ হিসাবে। এইটিই ছিল প্রথম– যাতে প্রথম বাংলা অক্ষর ব্যবহৃত হয়। এরপর শুরু হয় সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা। ১৮০১ সালে ফোর্ট উইলিয়ামে বাংলা বিভাগ খোলা হয়। উইলিয়াম কেরী হলেন অধ্যক্ষ, ভাষা সংস্কারের জন্য তার অধীনে ৮ জন পণ্ডিত নিযুক্ত হলো। সংস্কৃত স্টাইলের বাংলা ভাষায় মুসলমান বিবর্জিত বিষয়বস্তু নিয়ে পুস্তক প্রকাশ শুরু হল। প্রতাপ আদিত্য, রূপ সনাতন, বীরবল ইত্যাদি নিয়ে শুরু হল ভারতীয় ইতিহাসের চরিত্র চিত্রণ।

আবদুল মওদুদ বলেন– "এই মিশ্রনীতির বাংলাভাষায় সাহিত্য গড়ে উঠার মুখেই বণিকের তুলাদণ্ড হলো রাজদণ্ডে রূপান্তরিত এবং বণিকের তল্পীবাহক মিশনারীরাও দিলেন সাহিত্যের ভাষায় মোড় পরিবর্তন করে।... পাশ্চাত্যের শিক্ষার প্রবর্তকরা বাংলা ভাষার কাঠামোকেও নতুন ছাঁচে তৈরী করে দিলেন- বাবু সম্প্রদায়ের জন্যে। তার দরুন বাবু কালচারের আবাহন হলো যে ভাষায়, তা কেবল সংস্কৃতঘেঁষা নয়, একেবারে সংস্কৃতসম। আর এটিও হয়েছে সুপরিকল্পিত সাধনায়– হিন্দু পন্ডিতরা উল্লসিত হলেন। তার দরুন সংস্কৃত ভাষা ও কৃষ্টির নব প্রবর্তনের সম্ভাবনায় এবং মিশনারীকূল তৎপর হয়েছিলেন মুসলমানদের মুখের ভাষা কেড়ে নিয়ে তাকে সাহিত্য ও কালচারের দিক দিয়েও নিঃস্ব করে দিতে। (আব্দুল মওদুদ, মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ, পৃঃ ৩৮৫)

শিক্ষা ক্ষেত্রে মুসলমানদের পিছু হটিয়ে দেয়া হল

সে দিনের সুবাহ বাংলায় শিক্ষার এত ব্যাপক বিস্তৃতি সম্ভব হয়েছিল শিক্ষার প্রতি মুসলমানদের ঐতিহ্যগত অনুরাগের কারণে। শাসক, ওমরাহ রাজকর্মচারী এবং সামর্থবান ব্যক্তিরা শিক্ষিত লোক এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমুহের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। এদেশের মুসলমানদের বিদ্যানুরাগ কত প্রবল ছিল উইলিয়াম

www.pathagar.com

এডামসের বক্তব্য থেকে বুঝা যায়। তিনি বলেন ঃ বাংলার মুসলমান বহু বেসরকারী বিদ্যালয় স্থাপন করেছিল এবং শিক্ষাকে তারা কেবল জীবনের পেশা এবং জীবিকা নির্বাহের উপায় হিসাবে গ্রহণ করেনি। তারা তাকে ন্যায় এবং পূণ্যের কাজ বলে বিশ্বাস করত। (মুসলমানদের ইতিহাস এম এ রহিম, পৃঃ ১০০)

বিহারে ৪ কোটি মানুষের জন্য এক লক্ষ্য প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। একজন প্রাচ্য বিশারদ বলেন, ইংরেজ শাসন প্রতিষ্ঠার ৩০ বছর পূর্বে বাংলায় ৮০ হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ছিল। ফারুক মাহমুদ লিখেছেন তৎকালীন বাংলায় ১৩টি বিশ্ব বিদ্যালয় ছিল। এ সত্ত্বেও মাত্র কয়েক যুগের ব্যবধানে শিক্ষার উজ্জল দিগন্ত থেকে ছিটকে হারিয়ে গেল অন্ধকারের অতল গহবরে। কিন্তু কিভাবে এমনটি হল।

মুসলমানদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের অর্থনৈতিক উৎস ছিল লাখেরাজ সম্পত্তি। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি লাখেরাজ সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করার ফলে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ অর্থ সংকটে অচল হয়ে পড়েছিল। বৃটিশ হিন্দু যৌথভাবে এমন নীতি অবলম্বন করেছিল যেন মুসলমানরা তাদের বিধ্বস্ত বর্তমানকে সামাল দিতে ব্যস্ত থাকে।

এম. এ রহিমের ভাষায়– 'হিন্দু জমিদারগণ তাঁহাদের সম্প্রদায়ের জন্য স্কুল স্থাপন করিয়াছেন। পূর্ববাংলায় কোন কোন হিন্দু জামিদার তাঁহাদের জমিদারীতে স্কুল স্থাপন না করিয়া পশ্চিম বাংলা হিন্দু এলাকায় স্কুল স্থাপন করেন। ঠাকুর পরিবার এবং আরও অনেক হিন্দু জমিদারের পূর্ববাংলায় জমিদারী ছিল। তাঁহারা কলিকাতা ও পশ্চিম বাংলায় বাস করিতেন এবং সেখানকার লোকের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করিতেন। তাহারা পূর্ববাংলায় নিজেদের জমিদারীর প্রজাদের শিক্ষার জন্য অর্থ ব্যয় করেন নাই। কোন কোন জমিদার প্রজাদের শিক্ষার বিরোধী ছিলেন, কারণ তাঁহারা মনে করিতেন যে, প্রজাগণ শিক্ষিত হইলে জমিদারীতে তাঁহাদের কর্তৃত্ব দুর্বল হইয়া পড়িবে। (বাংলার মসলমানদের ইতিহাস এম. এ রহিম, পৃঃ ১১২)

'মিশনারী স্কুল ও কলেজের পাঠ্যতালিকা মুসলমানদের জন্য গ্রহণযোগ্য হয় নাই। হিন্দুদের পরিচালিত স্কুল ও কলেজে মুসলমানদের শিক্ষার উপযোগী না হওয়ায় তাহারা সেখানে ভর্তি হইতে উৎসাহ পাইত না। বিদ্যালয়গুলোতে যে সংস্কৃত উদ্ভুত বাংলা শিক্ষা দেওয়া হইত তাহা মুসলমান ছাত্রদের পক্ষে খুব কঠিন হইয়া পড়িত, কারণ কথ্যভাষা ব্যবহার করিত। তাহা ছাড়া বাংলা পাঠ্যপুস্তক দেবদেবী ও পৌরাণিক কাহিনীতে পূর্ণ ছিল।'

www.pathagar.com

এ প্রসঙ্গে ইসি বেইলী বলেন– 'শিক্ষা পদ্ধতি মুসলমানদের নিকট গ্রহণযোগ্য না হওয়ার কারণ ছিল, এটা প্রবর্তন করার সময় তাদের সংস্কার সম্বন্ধে কোনরূপ বিবেচনা করা হয়নি এবং তাদের প্রয়োজনের প্রতিও লক্ষ্য করা হয়নি। এই জন্য শিক্ষাপদ্ধতি তাদের স্বার্থের পরিপন্থী ও সামাজিক রীতিনীতির প্রতিকূল হয়ে পড়ে।"

বেইলী আরো বলেন– 'সত্য কথা বলতে গেলে বলতে হয় যে, আমাদের জনশিক্ষা পদ্ধতি তিনটি বিষয়ে মুসলমানদের প্রবল মানসিক বৃত্তি উপেক্ষা করেছে। প্রাদেশিক ভাষায় শিক্ষা মুসলমানদের মনঃপূত হয়নি এবং হিন্দু শিক্ষকও তাহাদের নিকট গ্রহণযোগ্য হয়নি। তাছাড়া গ্রাম্য বিদ্যালয়গুলিতে যে শিক্ষা দেয়া হত তা মুসলমান ছাত্রদিগকে সামাজিক জীবনে শ্রদ্ধার আসন পেতে ও ধর্মীয় কর্তব্য পালন করতে সাহায্য করত না। জিলা স্কুলগুলিতেও আরবী-ফার্সী শিক্ষার কোন ব্যবস্থা ছিল না। জনশিক্ষা পদ্ধতির শিক্ষা ব্যবস্থার কোন পর্যায়ে ধর্মীয় শিক্ষার স্থান ছিল না। মুসলমানগণ সাধারণ শিক্ষার সহিত ধর্মীয় শিক্ষা অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে করিত। (বাংলার মুসলমানদের ইতিহাস এম. এ রহিম, পৃঃ ১১২-১১৩)

বৃটিশ ও বর্ণ হিন্দুদের উদ্যোগে ধ্বংস হল বাংলার শিল্প

বাংলার এই বিপুল ঐশ্বর্যের প্রতি বৃটিশ বেনিয়াদের ছিল অপরিসীম লোভ। এই সম্পদের উপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার জন্য ছিল তাদের দীর্ঘ কালের প্রয়াস। সুদীর্ঘকাল ধরে সুপরিকল্পিতভাবে তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য তারা কাজ করে গেছে। প্রথমত তারা এদেশের ধনিক বণিক বিশেষ করে হিন্দু বণিকদের সাথে সখ্যতা স্থাপন করে। বাংলার রাজদরবারে এসব বণিকদের প্রভাব থাকার কারণে তাদের মাধ্যমে বৃটিশরা সব ধরনের বাণিজ্যিক সুবিধা আদায় করে নেয়।

দ্বিতীয়তঃ বৈদেশিক বাণিজ্য ক্ষেত্রে সমস্ত বিদেশী বণিকদের বাংলাদেশের বাজার থেকে বিতাড়িত করে। কখনো শক্তি প্রয়োগ করে, কখনো হিন্দু বেনিয়া রাজা মহারাজাদের মাধ্যমে রাজদরবারে প্রভাব বিস্তার করে সরকারী নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে অন্যান্য বিদেশী বাণিকদের বৃটিশরা বাংলাছাড়া করে। মসলিন সূতী কাপড় রেশম ও রেশমজাত বস্ত্র চিনি চাউল, আফিম সল্টপিটার ইত্যাদি রপ্তানীর ক্ষেত্রে মনোপলি প্রতিষ্ঠা করে। সিরাজের পতনের পর বলতে গেলে সব কিছুর উপর বৃটিশদের একচেটিয়া কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।

www.pathagar.com

১৭৬৫ সালের ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর দেওয়ানী প্রাপ্তির পর ব্রিটিশরা এমন রাজস্ব আয়-ব্যয় নীতি প্রবর্তন করে যার তুলনা বিশ্ব-ইতিহাসে ছিল না এবং এখানো নেই। কর আরোপ এখন থেকে হয়ে দাঁড়াল কোম্পানীর মুনাফা লোটার এক বাড়তি এবং মোটা রকমের উৎস। এখন হতে বাংলা থেকে আমদানিকৃত পণ্যদ্রব্যের জন্য ব্রিটেনের কোন মূল্য দিতে হত না। মূল্য প্রদান করা হত বাংলার রাজত্ব থেকে যাকে কোম্পানী তার বৈধ "মুনাফা" স্বরূপ গণ্য করত। ব্রিটেনে প্রেরণের উদ্দেশ্যে বাংলার পণ্যদ্রব্য খরিদের জন্য রাজস্ব সঞ্চয়কে ব্যবহার করাটাকে মোলায়েম করে বলা হত "বিনিয়োগ"। এই পণ্যদ্রব্য ব্রিটেনে বিক্রয় করে যে অর্থ লাভ হত তা জমা পড়ত কোম্পানীর লন্ডনস্থিত হিসাবের খাতায়, এবং বাংলা তা থেকে বঞ্চিত হত চিরতরে। রমেশ দত্তের ভাষায় ঃ মুল্যহ্রাস প্রাপ্ত টাকার হিসাবে পড়লে এটা দাঁড়াবে ১৪,৫০০০ কোটি টাকার সমান। (নতুন সফর, ঢাকা)

অতীতে বাংলা চিরদিনই ছিল পণ্যদ্রব্যের রপ্তানিকারক দেশ। উদ্বৃত্তের বিনিময়ে আমদানি হত স্বর্ণ ও রৌপ্যের বাট, ধাতু মুদ্রা ও মণিরত্ন। রাজস্ব ব্যবস্থা কোম্পানীর হাতে যাওয়ার পর থেকেই স্বর্ণ-রৌপ্যের বাট প্রভৃতি আমদানী বন্ধ হয়ে যায়। কোম্পানির উদ্বৃত্ত রাজস্ব দিয়ে ব্রিটেন বাংলার পণ্যদ্রব্য ক্রয় করত। কিন্তু বাংলাকে ব্রিটিশ মালপত্র ক্রয় করতে হত ব্রিটিশ উৎপাদক ও ব্যবসায়ীদের নির্ধারিত দরে। ব্যক্তিগত হিসাবে মারফত ও পাঠান হত প্রচুর অর্থ। এর মধ্যে থাকত কোম্পানীর দালাল-গোমস্তা অথবা কর্মচারীদের বেতন থেকে সঞ্চিত আয়, ব্যক্তিগত ব্যবসা থেকে অর্জিত মুনাফালব্ধ অর্থ এবং কোম্পানির নিজস্ব ব্যবসা থেকে অর্জিত অর্থ। রাজস্ব সঞ্চয়সহ এই অর্থের কিছু অংশ রেলপথ অথবা জনহিতকর কার্যে বিনিয়োগের উদ্দেশ্যে পরবর্তীকালে উচ্চ সূদে ভারতে ফিরে এসেছে। ফলে বিরাট হয়ে জমে উঠেছে ভারতের সরকারী ঋণের বোঝা। এই বোঝা আরো ভারী হয়ে উঠেছে অপর একটি কারণে। বিভিন্ন যুদ্ধে ইংরেজদের যে অর্থ ব্যয় হত তার দায় তারা চাপিয়ে দিতে ভারতের কাঁধে।

বৃটিশরা এদেশে ব্যাঙ্ক ব্যবস্থার প্রচলন করল দুটি উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে। আর্থিক কারসাজির মাধ্যমে দেশীয় ব্যবসায়ী মৃৎসুদ্দী শ্রেণীকে বৈদেশিক বাণিজ্যের অঙ্গন থেকে হটিয়ে দিয়ে অন্তর্মুখী করে তোলা এবং সূদকে ব্যবসার আকর্ষণীয় বিকল্প বানিয়ে স্থানীয় উৎপাদনের বিনাশ করা। আর্থিক নীতি নির্ধারণের মাধ্যমে তারা অর্থনীতির উপর নিয়ন্ত্রণ শুরু করল। শোষণের দ্বার অবারিত করল সুদ ব্যবস্থায়

www.pathagar.com

প্রচলন ঘটিয়ে। এদেশের উৎপাদন এবং বাণিজ্যের সাথে সংশ্লিষ্টরা ক্রমশ উৎসাহ হারাতে থাকে। এদেশী ভোক্তাদের প্রয়োজনীয় পণ্যের বাড়তি মূল্য গুনতে হত। বৃটিশরা এদেশে তাদের কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার আগে তাঁতশিল্পে বাংলার অগ্রগতি বিশ্ববাজারে শ্রেষ্ঠত্বের দাবী রাখত। এই শিল্পে বৃটিশরা হস্তক্ষেপ করে এবং শিল্পের সংশিষ্টদের নিপীড়নের লক্ষবস্তু বানিয়ে পরিকল্পিতভাবে এ শিল্পকে ধ্বংস করে।

উইলিয়াম বোল্ট নামে একজন ইংরেজ বণিক বাংলার তাঁতীদের উপর কোম্পানীর নিপীড়নের বিবরণ দিতে গিয়ে বলেন– 'ইংরেজ এবং তাদের অনুগত হিন্দু বেনিয়া এবং গুমস্তাগণ নিজেদের মর্জি মাফিক কাপড়ের দর বেঁধে দিয়ে সেই নির্দিষ্ট দরে কাপড় সরবরাহে বাধ্য করত। নীলকরদের মত তারা বাধ্য করত তাঁতীদের স্বার্থবিরোধী চুক্তি স্বাক্ষর করতে। কোম্পানীর বেঁধে দেয়া বাজার দর থেকে শতকরা ১৫ থেকে ৪০ ভাগ কম হত। তাদের নির্দেশ অনুযায়ী নির্দিষ্ট সময়ে বস্ত্র সরবরাহ করতে না পারলে তাঁতীদেরকে বেত্রাঘাত করা হত।' পরবর্তীতে কোম্পানী বাংলার বস্ত্রশিল্পকে ধ্বংস করার জন্য বাংলার উৎপাদিত বস্ত্র ইংল্যান্ডে না এনে কাঁচামাল হিসাবে রেশম এবং কার্পাস আমদানী করত। ইউরোপে শিল্প বিপ্লবের ফলে বাংলার তাঁত শিল্প ধ্বংসের ক্ষেত্রে আর একমাত্রা যোগ হয়। স্থানীয় উৎপাদিত যন্ত্রের উপর কোম্পানী শুল্ক নির্ধারণ করার ফলে ইংল্যান্ড থেকে আমদানীকৃত বস্ত্রের সাথে প্রতিযোগিতায় এদেশের তাঁতীরা কুলিয়ে উঠতে পারে না। এভাবে দেশের তাঁতশিল্প পর্যায়ক্রমে মার খেতে খেতে তার অস্তিত্ব হারাতে থাকে। বৃটিশের নীতি ছিল এদেশের তাঁতী সম্প্রদায়কে নির্মূল করা।' (মধ্যবিত্ত সমাজের বিকাশ ঃ আব্দুল মওদুদ)

এদেশের ভাগ্যহত তাঁতীদের দুঃখ দূর্দশা সম্পর্কে পন্ডিত জওয়াহেরলাল নেহরু বলেন– 'এসব তাঁতীদের পুরানো পেশা একেবারে বন্ধ হয়ে গেল। নতুন কোন পেশার দ্বারও উন্মুক্ত ছিল না। উন্মুক্ত ছিল শুধু মৃত্যুর দ্বার। মৃত্যুবরণ করলো লক্ষ লক্ষ। লর্ড বেন্টিংক ১৮৩৪ সালের রিপোর্টে বলেন, তাদের দুঃখ-দুর্দশার তুলনা নেই বাণিজ্যের ইতিহাসে। ভারতের পথঘাট পূর্ণ হয়েছে তাঁতীদের অস্থিতে। (Pandit Nehru Discoeveryof India, P-352)

'উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রিটিশরা অধিকতর লাভজনক দু'টি বিকল্প ক্ষেত্রের সন্ধান পায়। একটি হলো পাট, অপরটি চা। পাটের ক্ষেত্রে একমাত্র শিকার হয় বাংলা এবং চায়ের ক্ষেত্রে প্রথমে আসাম ও তারপর বাংলা। বাংলা থেকে অর্থ সংগ্রহের

www.pathagar.com

মূখ্য উপায় হয়ে দাঁড়ায় পাট। কিন্তু তাতে চাষী বা বাংলার কোন লাভ হয়নি। বাজারে কারচুপি আর প্রত্যক্ষভাবে ঠকাবার দরুন চাষের খরচ ওঠার মত দামও পাটচাষীর ভাগ্যে জুটত না। মুনাফা লুঠতো একমাত্র ব্যবসায়ীরা এবং পরবর্তীকালে পাটকলের মালিকরাও। ক্রীতদাসদের খাটানোর জন্য আমেরিকায় যেভাবে লোক নিযুক্ত করা হতো চা চাষের ক্ষেত্রে ব্রিটিশরাও সেই একই পন্থা অনুসরণ করতো। শ্রমিকদের চুক্তিপত্রে স্বাক্ষর করিয়ে নিয়ে, তারপর খাটান হত রুক্ত পানি করে। লাভ যা হত সব পাঠান হত ব্রিটেনে। (নতুন সফর, ঢাকা)

ঔপনিবেশবাদী বৃটেন তাদের শাসনকালের দুইপ্রান্তে দুটো মন্বন্তর উপহার দিয়েছিল বাংলাকে। ছিয়াত্তরের মন্বন্তর এবং পঞ্চাশের মন্বন্তর। ১৭৬৯ সালে সংঘটিত দুর্ভিক্ষের ১ কোটি বাংলার মানুষ অনাহারে মৃত্যুবরণ করে। ১৯৪৩ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালীন সময়ে অনাহারে মৃত্যুবরণ করে ৩৫ লাখ আদম সন্ত ান। জে আর ডি টাটো ১৯৪৫ সালে মে মাসে লন্ডনে বলেন যুদ্ধ এবং যুদ্ধে ভারতের সাহায্যের ফলে বাংলার দুর্ভিক্ষে লক্ষ মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে।

এই অবস্থায় মুসলিম উচ্চবিত্তদের আয় কমে গেলো। হিন্দু মধ্যবিত্তরা সরকারী সকল প্রকার চাকরি বাকরি থেকে মুসলমানদের বহিষ্কার করে দিল। রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের ফলে নেতৃস্থানীয় মুসলিম পরিবারগুলো বিনষ্ট হয়ে গেল।

বৃটিশদের মানসিক ভীতি হিন্দুদের প্রতিরোধস্পৃহা যুক্ত হয়ে নিত্য নব নব কৌশলে মুসলমানদের ওপরে দিনের পর দিন চলতে থাকল জুলুম অত্যাচার আর শোষণ। বাংলার সমৃদ্ধশীল মুসলিম জনগোষ্ঠী কড়ির কাঙালে পরিণত হল। নৈরাজ্যের নিছিদ্র অন্ধকারে নিমজ্জিত হল। নিক্ষিপ্ত হল অজ্ঞানতা ও কুসংস্কারের অতল গহবরে। বর্ণহিন্দুদের ষড়যন্ত্রের শিকারে পরিণত হল মুসলমানরা। মুসলমানদের জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের হিন্দু ষড়যন্ত্র আর বৃটিশদের কায়েমী প্রভুত্বের দাপট থেকে নিস্কৃতির পথ রচনা করতে চেয়েছে। ১৮৫৭ সালের সিপাহী বিপ্লবের বিপর্যয় পর্যন্ত ভারতের ইতিহাস বৃটিশ আর বর্ণহিন্দুদের যৌথ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে মুসলমানদের একটানা বিদ্রোহ সংঘাত আর লড়াইয়ের ইতিহাস। লক্ষ লক্ষ মুসলমানদের তাদের বুকের রক্ত উজার করে মুসলমানদের সভ্যতা সংস্কৃতি আর লুপ্ত গৌরবকে ফিরিয়ে আনাতে চেয়েছে, তারপর হিম্মতহারা মুসলমান রণাঙ্গন পরিহার করে পরিবর্তিত পরিস্থিতির সাথে সঙ্গতি রেখে বাঁচতে চেয়েছে। কিন্তু হিন্দু ষড়যন্ত্র আর শোষণের রাজনীতি মুসলমানদের মাথা গুড়িয়ে দিয়েছে।

www.pathagar.com

অষ্টম অধ্যায়

বঙ্গ ভঙ্গ ও মুসলমানদের নব চেতনার উন্মেষ

১৯০৩ সালে বড় লাট লর্ড কার্জন ঢাকায় সফরে এলে নওয়াব সলিমুল্লাহ পূর্ব বাংলার সমস্যাগুলো তুলে ধরে এতদাঞ্চলের দারিদ্র পিড়ীত জনগোষ্ঠীর জন্য গ্রহণযোগ্য কিছু একটা করার আবেদন জানান। ওদিকে আসামের উৎপাদিত চা ও অন্যান্য পণ্য বিদেশে রপ্তানীর ব্যাপারে পরিবহন ব্যয় হ্রাসের উদ্দেশ্যে কোলকাতার বদলে চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারের চিন্তা করে বৃটিশরা এই সাথে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীর প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের ভাবনাও চলতে থাকে। বৃটিশদের বাণিজ্যিক স্বার্থ এবং নবাবের আবেদন যুক্ত হয়ে খুব অল্প সময়ের ব্যবধানে বাংলা বিভাজনের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্তের প্রেক্ষিতে পলাশী উত্তর ভাগ্যবান জনগোষ্ঠী ব্রাহ্মণ্যবাদীরা জ্বলে উঠল। কোলকাতা কেন্দ্রীক বুদ্ধিজীবি ব্যবসায়ীদের তীব্র প্রতিবাদ সত্বেও ১৯০৫ সালে পূর্ব বঙ্গ ও আসাম নিয়ে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশ গঠন করা হল। বঙ্গভঙ্গ বর্ণ হিন্দুদের জন্য মোটেও সুখদায়ক হয়নি। বঙ্গভঙ্গের উপর আঘাত হানার জন্য শ্রেণী স্বার্থে তৎপর হয়ে উঠল তারা। ১৯০৩ সালের ডিসেম্বর থেকে ১৯০৫ সালের অক্টোবর পর্যন্ত অন্তত ৩০০০ প্রকাশ্য জনসভায় বঙ্গভঙ্গের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান হল এবং প্রতিটি জনসভায় ৫০০ থেকে ৫০,০০০ শ্রোতা উপস্থিত থাকতে দেখা গেছে।

দলিত নেতা ডক্টর আম্বেদকর লিখেছেন– বাঙালী হিন্দুরা সমগ্র বাংলা উড়িষ্যা আসাম এমনকি ইউপিকেও তাদের কর্মক্ষেত্রে পরিণত করেছিল। এসব অঞ্চলের সিভিল সার্ভিসের পদসমূহে তারাই অধিষ্ঠিত ছিল। বাংলা বিভাগের অর্থ ছিল তাদের বিরাট কর্মক্ষেত্রের ক্ষতি হওয়া। বাঙালী মুসলমানরা যেন পূর্ব বাংলায় তাদের স্থান দখল করতে না পারে সেটাই ছিল হিন্দুদের কাম্য। বিশেষত এসব কারণেই তারা বঙ্গ বিভাগের বিরোধিতা করেছিল।

১৮৮৫ সালে সর্বভারতীয় জাতীয় সংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়। হিন্দু জনগোষ্ঠী শিক্ষা-দীক্ষার অগ্রগামী হওয়ার কারণে এর সার্বিক নেতৃত্বে তারাই সমাসীন হন। ভারতবাসীর একক সংগঠন হিসাবে কংগ্রেস তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রাখে। ১৮৭৭ সালে আমীর আলীর উদ্যোগে 'সেন্ট্রাল মোহমেডান এ্যাসোসিয়েশন' গঠনের সাথে স্যার সৈয়দ আহমদ দ্বিমত পোষণ করে। তিনি মুসলমানদেরকে

www.pathagar.com

রাজনীতি থেকে বিরত থাকার উপদেশ দিয়েছিলেন। কিন্তু সংগ্রেস আত্মপ্রকাশ করার পর হিন্দি এবং উর্দুর বিরোধ সৃষ্টি হলে মুসলমানদের স্বার্থের ব্যাপারে সৈয়দ আহমদ সচেতন হয়ে উঠেন এবং ১৮৮৯ সালে রাজনৈতিক সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে 'ইউনাইটেড ন্যাশনাল ডিফেন্স এ্যাসোসিয়েশন' গঠন করেন (১৮৮৯)। ১৮৯৩ সালে উত্তর ভারতে মোহমেডান 'এ্যাংলো ওরিয়েন্টাল ডিফেন্স অরগানাইজেশন অব আপার ইনডিয়া' গঠিত হয়। ১৯০৩ সালে শাহরানপুরে মুসলিম রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। ১৯০৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে পাঞ্জাবে 'মুসলিম লীগ' নামে একটি রাজনৈতিক সংস্থা গঠিত হয়। এইভাবে উপমহাদেশে সব অঞ্চলের মানুষ রাজনীতি সচেতন হয়ে উঠে এবং স্থানীয় পর্যায়ে সংগঠিত হতে থাকে। কিন্তু সকলেই তাদের সীমাবদ্ধতার ব্যাপারেও অবগত ছিলেন। বৃটিশ ভারতের সমস্যা মোকাবেলার জন্য স্থানীয় পর্যায়ের রাজনৈতিক শক্তি মোটেও যথেষ্ট ছিল না। এ কারণে সর্বভারতীয় সংগঠনের ব্যাপারে আগ্রহ সবার অবচেতন মনে দানা বেঁধেছিল। এদিকে বঙ্গভঙ্গের প্রতিক্রিয়ায় সমগ্র ভারত জুড়ে হিন্দু জনগোষ্ঠীর তুলকালামী কাণ্ড এবং মুসলিম বিদ্বেষের ঝড় বয়ে যাওয়ায় স্যার সলিমুল্লাহকে দারুণভাবে ভাবিয়ে তোলে। তিনি সর্বভারতীয় পর্যায়ে মুসলিম ঐক্যের কথা ভাবতে শুরু করেন। তিনি মনে করেন হিন্দু ষড়যন্ত্রের প্রতিরোধ সর্বভারতীয় পর্যায়ে হওয়া প্রয়োজন।

১৯০৬ সালের নভেম্বরে সলিমুল্লাহ সমগ্রভারতে বিশিষ্ট নেতৃবৃন্দের নিকট পত্রালাপে নিজের অভিপ্রায় তুলে ধরলেন এবং সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘের প্রস্তাব রাখলেন। এর প্রতিক্রিয়া হল দারুণ। সকলেই এমন একটি প্রস্তাবের প্রতীক্ষায় ছিলেন। সলিমুল্লাহর ডাকে সকলেই সাড়া দিলেন। ১৯০৬ সালের ২৮-৩০শে ডিসেম্বর সর্বভারতীয় শিক্ষা সম্মেলন আহুত হল। শাহবাগে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে সমগ্র ভারতের প্রায় ৮ হাজার প্রতিনিধি যোগ দিলেন।

নবাব সলিমুল্লাহ 'অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফেডারেসী' অর্থাৎ সর্বভারতীয় মুসলিম সংঘ গঠনের প্রস্তাব দেন; হাকিম আজমল খান, জাফর আলী এবং আরো কিছু প্রতিনিধি প্রস্তাবটিকে সমর্থন করেন। কিছু প্রতিনিধির আপত্তির প্রেক্ষিতে কনফেডারেসী শব্দটি পরিত্যাগ করে লীগ শব্দটিতে গ্রহণ করা হয়।

অবশেষে সলিমুল্লাহর নেতৃত্বে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ গঠিত হয়। ঢাকায় এই ঐতিহাসিক সম্মেলনে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন এবং বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের নিন্দা করা হয়। এ সংগঠনের ব্যাপারে শুরু থেকেই হিন্দু জনগোষ্ঠী বিরূপ অবস্থান নেয়। সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জী সম্পাদিত দি বেঙ্গলী পত্রিকা নবগঠিত মুসলিম

www.pathagar.com

লীগকে সলিমুল্লাহ লীগ হিসাবে অভিহিত করে একে ভাতাভোগী তাবেদারদের সমিতি বলে বিদ্রূপ করা হয়। তা সত্বেও নিরাশার তীরে বসে থাকা মুসলিম জনগোষ্ঠী চঞ্চল হয়ে উঠে।

বঙ্গভঙ্গের ফলে সুদীর্ঘকালের অবহেলিত পূর্ববাংলায় নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। সরকার এই প্রদেশের উন্নয়নের ব্যাপারে অনেকটা গা ঝাড়া দিয়ে উঠে। অত্যন্ত দ্রুত শিক্ষার প্রসার হয়। মাত্র ৫ বছরের মধ্যে ৩৫ শতাংশ ছাত্র বৃদ্ধি পায়।

বঙ্গভঙ্গকে কেন্দ্র করে হিন্দু এবং মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে দূরত্ব রচিত হয়। বর্ণবাদী হিন্দু জমিদার ব্যবসায়ী এবং বুদ্ধিজীবিদের প্ররোচনায় সামগ্রিকভাবে হিন্দু জনগোষ্ঠী হিংস্র হয়ে উঠে। সমগ্র উপমহাদেশব্যাপী মুসলিম বিদ্বেষ এবং বৈরিতার ঝড় বয়ে যায়। মুসলমানদের উপরে হিন্দুরা হিংস্র এবং খড়গহস্ত হয়ে উঠে। ঐতিহাসিক এম. এ. রহিম এনসি ঘোষের উদ্ধৃতি দিয়ে লিখেছেন– 'বঙ্গভঙ্গের ফলে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিদ্বেষ দেখা দেয়। মুসলমানদের প্রতি হিন্দুদের এইরূপ বিতৃষণার সঞ্চার হয় যে তাহাদের মধ্যকার বন্ধুত্ব ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন স্বদেশী আন্দোলন থেকে ব্যাপক সন্ত্রাসবাদী আন্দোলনের রূপ নেয়। পরে ক্রমশ সীমিত হয়ে আসে। লর্ড মার্লো লর্ড মিন্টো ও বৃটিশ সরকারের বড় কর্তা ছোট কর্তারা মুসলমানদের আশ্বাস দিয়েছিলেন যে বঙ্গ বিভাগ ব্যবস্থা একটা Settled fact কখনও এর পরিবর্তন হবে না। ১৯১১ সালে বৃটিশ সরকার সম্পূর্ণ গোপনে এমনকি বৃটিশ পার্লামেন্টকে না জানিয়ে সম্রাটের অনুশাসন হিসাবে Settled fact কে unsettled করে দিল। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ উল্লসিত হয়ে উঠলেন, মুসলিম নেতৃবৃন্দ প্রচন্ড আঘাতে মুহ্যমান হলেন।

১৯১২ সালে মার্চ মাসে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির ভাষণে নওয়াব সলিমুল্লাহ বলেন– 'যখন বঙ্গ বিভাগ সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত পর্যায়ে তখন প্রতিপক্ষগণ বিরূপ হয়েছিলেন বাস্তবে এর ফলে আমাদের বিশেষ লাভ হয়নি। কিন্তু যেটুকু আমরা পেয়েছিলাম তাও আমাদের স্বদেশবাসীরা আমাদের নিকট থেকে কেড়ে নেয়ার তীব্র আন্দোলন চালিয়েছে। হিন্দু জমিদাররা মুসলমানদেরও এ আন্দোলনে নামানোর চেষ্টা করেছে মুসলমানরা এতে সাড়া দেয়নি। ফলে হিন্দু মুসলিম বিরোধ হয়েছে।'

মওলানা মোহম্মদ আলী বঙ্গভঙ্গ রদ প্রসঙ্গে বলেন ঃ এ যেন মুক্তিপ্রাপ্ত গোলামকে আবার গোলামীতে আবদ্ধ করা হল। এরপর মুসলমানরা আরো সচেতন ও সতর্ক হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

ঢাকায় একটি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে বৃটিশরা পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের আহত আত্মায় কিছুটা সান্ত্বনার প্রলেপ দেয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু কোলকাতায় বর্ণ হিন্দুরা সেটাকেও সহ্য করতে পারল না। সুরেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় একদল হিন্দু প্রতিনিধি সহকারে ভাইসরয়ের সাথে সাক্ষাৎ করে ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার তীব্র প্রতিবাদ জানান।

বঙ্গভঙ্গ রদ ছাড়াও আরো কতিপয় বৃটিশ কর্মকান্ড মুসলমানদের বিক্ষুদ্ধ অন্তরের জ্বলন্ত অঙ্গারে তেল ঢালে। বৃটিশ সরকার ইটালীর ত্রিপোলী আক্রমণকে সমর্থন জানায়। আলীগড়ে মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনের ব্যাপারে সরকার গড়িমসি করতে থাকে। এর ফলে মুসলিম জনগোষ্ঠী আরো বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। সমকালীন মুসলমানদের বিক্ষুব্ধ চেতনা মুসলিম লীগকে এমনি প্রভাবিত করে যে, শেষ পর্যন্ত মুসলিম লীগ প্রবীণদের রাজভক্তির নীতি পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয় এবং বৈপ্লবিক কর্মসূচী গ্রহণ করে। ১৮৯২ সালে ৩১শে ডিসেম্বর বাকীপুরে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের সভায় মাওলানা মোহাম্মদ আলী, সৈয়দ ওয়াজির হাসান এবং মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর উদ্যোগে গৃহীত প্রস্তাবে বলা হয় ভারতে স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠা মুসলিম লীগের লক্ষ্য। স্বাধীনতাকামী প্রগতিশীলদের সমাবেশ হওয়ার ফলে মুসলিম লীগ ক্রমশ গতিশীল হয়ে উঠে।

মুসলিম অভিজাত শ্রেণীর অভ্যস্ত সৌজন্যের নীতি বর্জন করে ১৯১৩ সালের এপ্রিলে বাংলার ব্যবস্থাপক পরিষদের সদস্যরূপে ভাষণ দানকালে এ কে ফজলুল হক বলেন– 'মুসলমানদের দাবীর প্রতি ক্রমাগত উপেক্ষা করে চললে বিপদের সম্ভাবনা আছে।... আমরা সরকারের বহু প্রস্তাবের মধ্যে প্রচুর আশ্বাসের কথা শুনেছি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের বাস্তব সত্য যেরূপ মুসলমানদের উপকারে আসেনি।

ফজলুল হক আরো বলেন– 'আমি বঙ্গভঙ্গ রদের বিষয় উল্লেখ করে শুধু এটাই বুঝতে চাচ্ছি যে সময়ের ব্যবধান হলেও মুসলমানরা এমন কোন ব্যবস্থা মেনে নিতে পারেনা যার ফলে তার আত্মসম্মানে আঘাত লাগতে পারে।' ফজলুল হকের এই বক্তব্যের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগে তারুণ্যের অগ্রযাত্রা শুরু হয়।

সর্বশেষ সতর্ক সংকেত

১৯৩৫ সালের শাসনতন্ত্র অনুযায়ী ১৯৩৭ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এতে কংগ্রেস ৬টি প্রদেশে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করতে সক্ষম হয়। ১৯৩৭ সালের ১লা জুলাই থেকে ১৯৩৯ সালের ১৫ই নভেম্বর/২২ই ডিসেম্বর পর্যন্ত কংগ্রেস প্রাদেশিক মন্ত্রীসভায় ক্ষমতাসীন ছিলো।

www.pathagar.com

ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ যে হিংস্রতা যে বর্বরতা ও আদিম আক্রোষের বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়ে ছিল সেটাই মুসলমানদেরকে তাদের অনিবার্য পরিণতির ব্যাপারে সতর্ক করে দিয়েছিল। কংগ্রেসী শাসনের অভিজ্ঞতা এমন এক উদ্যাম প্রেরণার সৃষ্টি করেছিল যে তারা ভারত ভেঙে পাকিস্তান অর্জন না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত হয়নি।

এই কংগ্রেসী শাসনামলে উপমহাদেশের মুসলমানরা যে তিক্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিল সেটাই পরবর্তীকালে স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে মূল প্রেরণা হিসাবে কাজ করেছিল। দু' বছর কাল স্থায়ী সংগ্রেসী মন্ত্রীসভায় ত্রিশটি সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামা অনুষ্ঠিত হয়। ফয়েজাবাদের টান্ডা নামক ছোট শহরে ৭০ জন মুসলমান পুলিশের গুলীতে নিহত হয়। ২শ' জন মুসলমানকে শিকল বেঁধে রাস্তায় রাস্তায় ঘুরানো হয়। এমনকি মসজিদের মধ্যে প্রবেশ করে তাদের দড়ি দিয়ে বাধা হয়। মধ্য প্রদেশের চাঁদপুরে চারশো মুসলমানকে দড়ি দিয়ে পা বেঁধে টেনে হেঁচড়ে আদালতে হাজির করান হয়। সরকারী কর্তৃপক্ষ ১৫০ জন নরনারী ও শিশুর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। দু'জন মুসলমানকে মৃত্যুদণ্ড দেয়া হয় এবং ২৪জনকে দেয়া হয় দ্বীপান্তর।

এ সময় শেরে বাংলা ফললুল হক তার বিবৃতিতে বলেন– 'কংগ্রেসী নীতির দরুন এমন অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে, যেখানে অদলীয় সরকারসমূহ কর্তৃক আরোপিত বিধি নিষেধের বেড়া মারমুখো হিন্দুরা ভেঙ্গে ফেলেছে। মুসলিম সংখ্যালঘুদের ওপর তারা নিজেদের ইচ্ছা চাপিয়ে দিতে চাচ্ছে। এই ইচ্ছা কি?... গোমাতাকে সম্মান দেখাতে হবে। মুসলমানদের গরুর গোস্ত খেতে দেয়া হবে না। মুসলমানদের ধর্মকে অবমাননা করতে হবে। কেননা এটা হিন্দুদের দেশ, সে কারণে আযান বারণ করা, নামাজের সময় মসজিদের সম্মুখে হৈহুল্লোর করা ও বাজনা বাজিয়ে মিছিল করে নিয়ে যাওয়ার মত কাজ হচ্ছে। সুতরাং মর্মান্তিক ঘটনার পর মর্মান্তিক ঘটনা যদি ঘটে এবং দুধের নহরের পরিবর্তে রক্তের স্রোত যদি বয়ে যায় তাহলে বিস্ময়ের কি আছে?

ষ্টেটসম্যানের সম্পাদক আয়ান ষ্টিফেন লেখেন : যুক্ত প্রদেশ ও অন্যান্য স্থানের প্রাদেশিক মন্ত্রীরা রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নকে বাস্তাবায়িত করার বিষয়টা নিজেদের দৈনন্দিন কাজের অঙ্গীভূত করে নেন। এতে অহিন্দুদের মধ্যে বিরূপতা দেখা দেয়। মুসলমানদের ওপর সব রকম চাপ ও হয়রানী শোনা যেতে লাগল। স্কুলের ছাত্রদের হিন্দু পদ্ধতিতে জোড়হাতে মিঃ গান্ধীর প্রতিকৃতি পূজা করার ব্যবস্থা চালু করা হয়। বঙ্কিমচন্দ্রের আপত্তিকর উপন্যাসের বন্দে মাতরম সঙ্গীত

www.pathagar.com

ছাত্রদের গাইতে বলা হয়। গরুর গোস্ত খাওয়া বন্ধ করার জন্য সক্রিয় প্রচেষ্টা চলে। উর্দুভাষা ও বর্ণমালা বন্ধ করার ব্যবস্থা করা হয়। বড় বড় চাকুরিতে হিন্দুদের নিয়োগ করা হতে লাগল। দাঙ্গার সময় প্রশাসন হিন্দুদের পক্ষাবলম্বন করে।

কুপল্যান্ড লিখেছেন : কংগ্রেস পাশ্চাত্য গণতান্ত্রিক নীতি উপেক্ষা করে নিজেদেরকে পুরোপুরি ও চিরস্থায়ীভাবে জাতীয় সরকার হিসেবে গণ্য করতে শুরু করে। দুটো ছোটখাট ঘটনা থেকে এর প্রমাণ মেলে। প্রথমত ক্ষমতা লাভের সংগে সংগে স্থানীয় কতৃপক্ষ পরিচালিত সংস্থাসমূহের ভবনের ওপর নিজেদের ত্রিবর্ণ পতাকা উড়ানো এটা সংখ্যালঘুদের ওপর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ স্বরূপ। দ্বিতীয়ঃ আইন পরিষদের উদ্বোধনীতে বন্দেমাতরম সংগীত গাওয়া। এটাও সংখ্যালঘুদের ওপর ছিল একটা চ্যালেঞ্জ। আর এটা ছিল অধিকতর আক্রমণাত্মক। কারণ বন্দে মাতরম সংগীতের কোন কোন ছত্রে ইসলামকে ক্ষুন্ন করে হিন্দুধর্মকে উচ্চাসন দিয়েছে। ফলে মুসলিম সদস্যরা ওয়াক আউট করেন।

ডক্টর বেনী প্রসাদ লিখলেন : এর পরেই কংগ্রেসী সরকার বিদ্যামন্দির চালু করার ব্যবস্থা করলেন। কথাটা যে শুধু সংস্কৃত তা নয়, পরন্তু এর অর্থ হচ্ছে বিদ্যার মন্দির। মন্দির কথাটি মূর্তিপূজা বিরোধীদের নিকট আপত্তিকর। মুসলমানদের তীব্র বিরোধিতার মুখে কংগ্রেস এ ধরণের চালু করেছিলেন বটে কিন্তু আইন অমান্য আন্দোলনের চাপে শেষ পর্যন্ত নতি স্বীকার করতে বাধ্য হলেন।... মুসলিম লীগ অনুভব করেছিল যে, সংখ্যালঘুদের সুযোগ সুবিধার প্রতি সংখ্যাগরিষ্ঠরা মোটেও মনোযোগ দিচ্ছে না। ১৯৩৭ সালেই মুসলমানরা নিজেদের ভবিষ্যত ভেবে শঙ্কিত হয়ে পড়ে।

এল এফ রাশ ব্রুক উইলিয়াম লিখলেন : কংগ্রেস শাসন থেকে সংখ্যালুঘুরা এই সত্যই উপলব্ধি করতে পারলো যে প্রশাসনিক এমনকি শাসনতান্ত্রিক রক্ষাকবচ তাদের রক্ষা করতে পারবে না। কেননা বিষয়টা শাসকগোষ্ঠীর মানসিকতার সাথে জড়িত। আর শাসক দল অপরাপর দলগুলিকে রাজনীতির ক্ষেত্রে পরাজিত বলে মনে করে। তাছাড়া সমঝোতা বলে কোন শব্দ কংগ্রেসের ইতিহাসে আছে বলে মনে হয় না। কংগ্রেস কেবল নিজেকে প্রগতি প্রজ্ঞা ও দেশপ্রেমের সোলএজেন্ট বলে মনে করে।

জিন্নাহ বললেন সামান্য ক্ষমতা হাতে পাওয়া মাত্রই শুরুতেই ক্ষমতাসীন সংখ্যাগরিষ্ঠ সম্প্রদায় এটাই সুস্পষ্ট করে তুলে ধরেছে যে হিন্দুস্থান হচ্ছে হিন্দুদের জন্য।'

www.pathagar.com

ফ্রাঙ্ক মরিয়মের মতে নির্বাচনের পর যদি কংগ্রেস মুসলিম লীগের সাথে সতর্কভাবে ব্যবহার করত তাহলে হয়তো পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হতো না।

আজন্ম লালিত বৈরিতা ও মুসলিম বিদ্বেষ পোষন করা সত্বেও মুসলমানরা উপমহাদেশের স্বাধীনতার সৌজন্যে মৈত্রির দুটো হাত বাড়িয়ে দেয়। কিন্তু সাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতৃত্ব মুসলমানদের উদ্দেশ্যে কেবল নিক্ষেপ করে ঘৃণা ঘৃণা এবং ঘৃণা। স্বাভাবিকভাবে নিরাপত্তাহীন মুসলমানরা তাদের নিশ্চিত বিপর্যয় থেকে নাজাত পাওয়ার জন্য নিজস্ব পথ এবং পদ্ধতির তালাশ করে। দূরদর্শী বিচক্ষণ কায়দে আযম হিন্দু মুসলিম ঐক্যের সপক্ষে সংগ্রাম করে ব্যর্থ হন। হিন্দু ষড়যন্ত্রের গভীরতা আঁচ করে ফিরে আসেন তার আপন বলয়ে। উপমহাদেশের ১০ কোটি মুসলমানদের চূড়ান্ত পরিণতির কথা ভেবে তিনি শিউরে উঠেন। অবশেষে তার অনুভূতির গভীর থেকে উৎসারিত চেতনার নির্বাস দিয়ে দ্বিজাতি তত্ব পেশ করেন। জাতি যেন এর প্রতীক্ষায় ছিল এতদিন। তার এ তত্বের বাস্তবতা ঝড় তোলে টেকনাফ থেকে খাইবার পর্যন্ত। অভিন্ন এক চেতনার সেতু নির্মিত হয় এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত। এখানে ভাষা উপক্ষিত হয়। আঞ্চলিকতা উপেক্ষিত হয়। শ্রেণী উপেক্ষিত হয়। উপমহাদেশের আবালবৃদ্ধবনিতা দলমত নির্বিশেষে প্রতিটি মুসলমান একই চেতনার প্লাবনে ভেসে যায়।

পণ্ডিত নেহেরু যখন কোলকাতায় ঘোষণা করলেন আজকের ভারতে মাত্র দুটো শক্তি রয়েছে একটি বৃটিশ সাম্রাজ্যবাদ অন্যটি কংগ্রেস। জিন্নাহ এর জবাব দিলেন না দুটো নয় আর এক তৃতীয় শক্তি রয়েছে সেটা হল ভারতের ১০ কোটি মুসলমানের প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ।

১৯৪০ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারী হিন্দু ষড়যন্ত্র সম্বন্ধে মুসলমানদের উদ্দেশ্য করে বললেন : সেটা যদি আপনারা আজও বুঝে না থাকেন তাহলে আমি বলি আপনারা কখনও বুঝবেন না।... গ্রেট বৃটেন ভারত শাসন করতে চায়। মিঃ গান্ধী ও কংগ্রেস ভারত ও মুসলমানদের শাসন করতে চান। আমরা বলি বৃটিশ অথবা মিঃ গান্ধীকে মুসলমানদের ওপর শাসন করতে দেব না।

৬ই মার্চ বললেন... 'যদি বৃটিশ সরকার মুসলমানদের স্বার্থবিরোধী কোন প্রকার সমঝোতা কংগ্রেসের সংগে করে আমরা তা টিকতে দেব না।

www.pathagar.com

নবম অধ্যায়

পাকিস্তান প্রস্তাব ও মুসলমানদের নবযাত্রা

হিন্দুদের বৈরিতা ও সংঘাতপূর্ণ ঘটনা প্রবাহের মধ্যে মুসলমানদের চেতনায় ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই ঐক্যবদ্ধ চেতনাই ১৯৪০ সালের ২৩শে মার্চ পাকিস্তান প্রস্তাব হিসাবে প্রকাশ পায়। লাহোরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় মুসলিম সম্মেলনে শেরে বাংলা ফজলুল হক এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের তৃতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় : ভৌগোলিক অবস্থান অনুযায়ী সীমানা সুসামঞ্জস্য করে এ সকল অঞ্চল এমনভাবে নির্দিষ্ট করতে হবে যাতে ভারতের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের যে সকল স্থানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই সকল অঞ্চলসমূহকে যেন স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত করা যায় এবং এই রাষ্ট্র গঠনকারী অংশসমূহ স্বায়ত্ব শাসিত ও সার্বভৌম হবে।

কংগ্রেসের দাবী ছিল প্রথমত কংগ্রেসই ভারতবাসীর একমাত্র প্রতিনিধিত্বশালী প্রতিষ্ঠান দ্বিতীয়ত স্বাধীন ভারত হবে অখন্ড। কংগ্রেসের এই দাবীকে মুসলিম লীগ চ্যালেঞ্জ করে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রমাণ করতে চাইল মুসলমান ভারতের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান মুসলিম লীগ। ডিপি মেনন লিখেছেন– 'মুসলিম লীগ ইতিপূর্বে ঘোষণা করেছিল যে পাকিস্তানের প্রশ্নে এবং মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের একমাত্র প্রতিনিধিত্বকারী প্রতিষ্ঠান এই দাবীতে তারা নির্বাচন সংগ্রামে অবতীর্ণ হচ্ছেন, জিন্নাহ ও লীগের অন্য মুখপাত্রগণ ঘোষণা করেন যে তাদের লক্ষ্য হচ্ছে পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বাংলা ও আসাম প্রদেশগুলির সমন্বয়ে সামগ্রিকভাবে পাকিস্তান নামক একটি স্বতন্ত্র সার্বভৌম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এই দাবীর প্রেক্ষিতে ১৯৪৫ সালের ডিসেম্বরে অনুষ্ঠিত কেন্দ্রীয় পরিষদের নির্বাচনে ৩০টি মুসলিম আসনের ৩০টিতে বিজয়ী হয় মুসলিম লীগ। ১৯৪৬ সালের ফেব্রুয়ারীতে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক পরিষদের ৪৯৫টি আসনের মধ্যে ৪৩৪টি আসনে জয়লাভ করে মুসলিম লীগ। ওয়াল ব্যাঙ্ক লিখছেন– 'জিন্নাহর প্রতিষ্ঠান যে ভারতের জনগণের মুখপাত্র এ ব্যাপারে আর কোন সন্দেহ রইল না।'

www.pathagar.com

১৯৪৬ সালে ৯ই এপ্রিল ৪৭০ জন মুসলমান পরিষদ সদস্যবর্গের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সম্মেলনে সর্বসম্মাতিক্রমে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাবের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদে বলা হয় : ভারতীয় সমস্যা সমাধানের জন্য ভারতের উত্তর পূর্ব অঞ্চলের বাংলা ও আসাম এবং উত্তর পশ্চিম অঞ্চলের পাঞ্জাব, উত্তর পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ সিন্ধু ও বেলুচিস্তান অঞ্চলসমূহ যেখানে মুসলমানেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, সেগুলোর সমন্বয়ে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র করা হোক, এবং পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দ্ব্যর্থহীন প্রতিশ্রুতি অবিলম্বে দেয়া হোক। লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল দলীয় সম্মেলনে যেখানে বলা হয়েছিল উপমহাদেশে এক বা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্রের কথা। কিন্তু দিল্লীতে গৃহীত এক পাকিস্তানের প্রস্তাব অধিক গুরুত্বের দাবী রাখে। কেননা একদিকে দিল্লী সম্মেলন দলীয় সম্মেলন অন্যদিকে একে বলা চলে মুসলমানদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মেলন। এ সম্মেলনের এক পাকিস্তান গঠনের পরিকল্পনা দ্বারা আগের প্রস্তাবের আংশিক নাকচ হয়ে যায়।

বাংলা বিভক্তির ষড়যন্ত্র

১৯৪৭ সালের ২০ শে ফেব্রুয়ারী বৃটিশ সরকার ভারত ত্যাগ ও ভারত বিভাগের সিদ্ধান্তের কথা প্রকাশ করে। এই ঘোষণার পর পরই কংগ্রেসের সাম্প্রদায়িক চক্র ও হিন্দু মহাসভার বর্নহিন্দুরা বাংলার ভবিষ্যতের ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে ওঠে। বাংলা বিভাজনের ষড়যন্ত্র শুরু হয়। প্রকাশ্য জনমত গঠনের জন্য হিন্দু নেতৃবৃন্দ মাঠে নেমে পরে এবং এনিয়ে নেপথ্য প্রাসাদ ষড়যন্ত্র শুরু হয়। হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জী ২৩শে ফেব্রুয়ারী বাংলার গর্ভনর বারোদের সাথে সাক্ষাতের পর সংবাদপত্রে বিবৃতি দেন। এতে বলা হয়, মুসলমানদের জন্য যদি ভারত বিভক্ত হয় তাহলে হিন্দুদের জন্য বাংলা বিভক্ত হতেই হবে। এই বিবৃতি দানের মাধ্যমে শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ণহিন্দুদের বঙ্গভঙ্গ বিরোধী চেতনা সাম্প্রদায়িকতার শানিত ছুরি দিয়ে নির্মমভাবে হত্যা করা হল। তারপর তারা নব আঙ্গিকে নতুনরূপে নতুন ষ্ট্রাটেজীতে বাংলাকে খণ্ডিত করার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। অবশ্যি বঙ্গভঙ্গ বিরোধীতা এবং বাংলাকে খন্ডিত করার আন্দোলনের মধ্যে প্রকৃতিগত পার্থক্য মোটেও ছিল না। নতুন বোতলে সাম্প্রদায়িকতার পুরাতন মদ। দুটোতে একই সত্য বিদ্যমান ছিল, ছিল মুসলিম বিদ্বেষ, হিন্দু সাম্প্রদায়িকতার উন্মাদনা।

www.pathagar.com

বাংলা খণ্ডিত হল বর্ণ হিন্দু ষড়যন্ত্রে

কায়দে আযমের অক্লান্ত পরিশ্রম তার সদিচ্ছা ক্ষুরধার যুক্তি যুক্তির প্রেক্ষিতে ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী ভারত বিভক্তির প্রশ্নটি যখন চূড়ান্ত হল, তখন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী অখণ্ড বাংলার স্বাধীনতার জন্য সক্রিয় হয়ে উঠলেন। শরত বসু তার সমর্থনে এগিয়ে এলেন। মুসলিম ভারতে অবিসংবাদিত নেতা কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ আপত্তি না জানিয়ে স্বাগত জানালেন। কিন্তু বর্ণ হিন্দুরা বাংলা বিভাজনের জন্য তৎপর হয়ে উঠল। হিন্দু মহাসভার নেতা ডক্টর শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী ২৩ ফেব্রুয়ারী এক বিবৃতিতে বললেন– 'মুসলমানদের জন্য যদি ভারত বিভক্ত হয় তাহলে হিন্দুদের জন্য বাংলা বিভক্ত হতেই হবে। ৫ই এপ্রিল তারকেশ্বরে অনুষ্ঠিত প্রাদেশিক হিন্দু মহাসভা সম্মেলনে স্বতন্ত্র হিন্দু বাংলা গঠনের জন্য ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জীকে ক্ষমতা প্রদান করা হয়। বাংলা কংগ্রেসের ডাঃ বিধান চন্দ্র রায় দলভুক্ত নেতা ও কর্মীরা বাংলা বিভাগের দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠে। প্রবল ইঙ্গহিন্দু বিরোধীতার মুখে বাংলার অখণ্ডতা রক্ষার শেষ প্রয়াস হিসাবে বঙ্গীয় বিধান সভার সদস্যদের বৈঠক আহবান করা হয়।

১৯৪৭ সালের ২০ জুন বিধানসভার হিন্দু ও মুসলমান সদস্যদের যৌথসভা অনুষ্ঠিত হয়। বড়লাটের পার্সোনাল রিপোর্ট নং ১০ (২৮ শে জুন) মোতাবেক এই সভায় ১২৬ জন সদস্য এইমর্মে এক প্রস্তাবের সপক্ষে ভোট দেন যে, বাংলা অখণ্ড থাকবে এবং পাকিস্তানে যোগ দেবে। প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট পড়ে ৯০টি। একই দিন বঙ্গীয় বিধান সভার মুসলমান ও হিন্দু সদস্যরা পৃথক বৈঠকে মিলিত হন। মুসলিম সদস্যদের বৈঠকে সভাপতিত্ব করেন জনাব নূরুল আমীন এবং হিন্দু সদস্যদের বৈঠকে উদয়চাঁদ মেহতা। হিন্দুদের বৈঠকে ৫৮ জন সদস্য বঙ্গ ভঙ্গ এবং হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলসমূহের ভারতের সাথে যোগদেয়ার ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। মুসলিম সদস্যরা পূনর্বার অখণ্ড বাংলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। তবে ১০৫ জন সদস্য এইমর্মে প্রস্তাব গ্রহণ করেন যে, যদি বাংলাকে হিন্দুদের অনমনীয় ভূমিকার জন্য ভাগ করতেই হয় তাহলে পূর্ববঙ্গ আসামের সিলেটসহ পাকিস্তানে যোগদান করবে। (খণ্ডিত বাংলাদেশ, দৈনিক ইনকিলাব ১ জানুয়ারী, ১৯৯১)

কিন্তু শেষ অবধি অখণ্ড বাংলার স্বপ্ন হিন্দুর ষড়যন্ত্রের কারণে অর্জিত হল না। এমনকি আসামও যুক্ত হল না পূর্ববাংলার সাথে।

www.pathagar.com

কোলকাতা নিয়ে বৃটিশ হিন্দু ষড়যন্ত্র

যেহেতু পূর্ব বাংলায় কোন বন্দর ছিল না। পূর্ব বাংলার আমদানী রপ্তানীর জন্য কোলকাতা উভয় রাষ্ট্রের জন্য উন্মুক্ত হওয়া বাঞ্ছনীয় ছিল। এছাড়াও পূর্ব বাংলার কাঁচা মালের উপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছিল কোলকাতার শিল্প বিশেষ করে জুট মিলগুলো। এজন্য উন্মুক্ত বাজার হিসাবে কোলকাতা উন্মুক্ত থাকা একান্তভাবে বাঞ্ছনীয় ছিল কিন্তু সেটা হতে দিল না বৃটিশ এবং বর্ণ হিন্দু যৌথভাবে। জিন্নাহর দাবী ছিল অবিভক্ত বাংলা ও আসাম স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে। এ দাবী যখন অগ্রাহ্য হল তখন কোলকাতাসহ পূর্ববঙ্গ ও আসাম এবং একটি করিডোর চেয়েছিলেন। যাতে করে পূর্ব ও পশ্চিমের সংযোগ রক্ষা করা যায়। যখন এটাও অগ্রাহ্য হল তিনি চাইলেন পূর্ববঙ্গের সাথে কোলকাতা। জিন্নাহর ভাষায় 'কোলকাতা বিহিন পূর্ববঙ্গ নিয়ে কি করব?' সর্বশেষে তিনি কোলকাতায় গণভোট দাবী করলেন যদিও কোলকাতার মোট জনসংখ্যার এক চতুর্থাংশ মুসলমান ছিল। কিন্তু তার ভরসা ছিল তফসিলি সম্প্রদায় যা মোট জনসংখ্যার অর্ধেক। গণভোট হলে তারা পাকিস্তানের সপক্ষে ভোট দেবে। তার এই প্রচেষ্টাকেও ইংরেজ ও হিন্দুচক্র বানচাল করে দেয়। অতঃপর দাবী করা হয় কোলকাতাকে ফ্রি সিটি হিসাবে বহাল রাখার। কিন্তু সেটাও অগ্রাহ্য হল। সোহরাওয়ার্দী অনুরোধ করলেন, বাংলা বিভাগের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়েই গেছে তখন কোলকাতাকে মুক্ত শহর হিসাবে থাকতে দেয়া হোক। যদি এটাও সম্ভব না হয় অন্তত ৬ মাসের জন্য কোলকাতাকে মুক্ত রাখা হোক। এ ব্যাপারে ভাইসরয় কংগ্রেসের মতামত জানতে চাইলে প্যাটেল বলেন, Not even for six hours. এখানে ভাইসরয় কোন ভূমিকা নেননি। নাটক মঞ্চস্থ হওয়ার আগেই সুনির্দিষ্ট সংলাপের রিহার্সাল দেয়া হয়েছে অনেক দিন ধরে।

পাকিস্তান দাবীর প্রেক্ষিতে হিন্দু নেতৃবৃন্দ

স্বাধীন ভারতের স্থপতি ও প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহারলাল নেহেরু বলেন ঃ পরিণাম যাই হোক কংগ্রেস কখনও পাকিস্তানের দাবী স্বীকার করবে না। (টেটসম্যান, ১৬ এপ্রিল, ১৯৪৭)

হিন্দু ভারতের আপোষহীন নেতা স্বাধীন ভারতের ডিপুটি প্রধানমন্ত্রী সরদার প্যাটেল বলেন ঃ পাকিস্তানের বিষয়ে কংগ্রেস কখনও আপোষ করতে পারে না। (প্রাগুক্ত)

www.pathagar.com

অহিংসনীতির অবতার ভারতের জাতির পিতা করমচাঁদ গান্ধী বলেন ঃ সারা ভারত যদি জ্বলতে থাকে তাহলেও আমরা পাকিস্তান দেব না, এমনকি মুসলমানরা যদি তলোয়ারের মুখে দাবী করে তাহলেও না। (প্রাগুক্ত ঃ ৩০ শে ১৯৪৭)

সম্ভাবনাহীন ভূখণ্ড নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু

অখণ্ড ভারত কেন্দ্রিক চূড়ান্ত স্বাধীনতা দানের উদ্দেশ্য নিয়েই লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ভাইসরয়ের দায়িত্ব নিয়ে এসেছিলেন। কিন্তু কায়দে আযমের অনমনীয় মনোবৃত্তি এবং আপোসহীন নেতৃত্বের বলিষ্ঠ যুক্তির কাছে পরাজিত হয়ে ষড়যন্ত্রকারী লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন হিন্দু নেতৃত্বের সহযোগিতায় এমন একটি 'কাটা-ছেঁড়া পোকায় খাওয়া পাকিস্তান' দিলেন যা নিজস্ব অর্থনৈতিক বৃত্ত রচনা করতে সক্ষম হবে না, যা দুনিয়ার বুকে স্বনির্ভর হয়ে কোন দিনও দাঁড়াতে পারবে না। অখণ্ড ভারতে বিশ্বাসী মাউন্ট ব্যাটেনের ধারণায়– 'ভবিষ্যতের পাকিস্তান প্রকৃতিগতভাবেই হবে ক্ষণস্থায়ী। নিজের অন্তর্নিহিত গলদের দরুন, তাকে ধ্বংস হবার সুযোগ দিতে হবে। পরিণতিতে যাতে মুসলমানরা অখণ্ড ভারতের পথে ফিরে আসে।'

ভাইসরয় আরো বলেন– 'পূর্ব বাংলার সাথে সিলেট থাকলেও অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সেটা টেকসই হবে না এবং ধীরে ধীরে ধ্বংস হতে বাধ্য হবে। (Freedom at Midnight, P-114)'

তার ভাষায় ঃ যেভাবে পাকিস্তান দেয়া হল তাতে সিকি শতাব্দীর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তান আলাদা হয়ে যাবে। (Freedom at Midnight, P-127)

হিন্দু নেতৃবৃন্দেরও ধারণা ছিল অনুরূপ। একারণে বাংলার সবকটি সম্ভাবনাহীন এলাকা পূর্ব বাংলা অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে বরাদ্দ করে। যে ভূখণ্ড উন্নত নয় এমন সম্ভাবনাহীন ভূখণ্ড নিয়েই পাকিস্তান যাত্রা শুরু করে নিয়তির উপর নির্ভর করে।

হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রত্যাশা

প্যাটেল মনে করেছিলেন, পাকিস্তান গ্রহণ দ্বারা মুসলিম লীগকে তিক্ত শিক্ষা দেয়া হবে। অল্পদিনের মধ্যে পাকিস্তান ধ্বংস হয়ে যাবে এবং বিচ্ছিন্ন প্রদেশগুলিকে অকথ্য অসুবিধা ও দুর্ভোগে পড়তে হবে।

www.pathagar.com

প্যাটেল তার বন্ধু কাণ্ডী দ্বারকাদাসকে এক পত্রে বলেন– 'পূর্ববঙ্গ পাঞ্জাবের একাংশ, সিন্ধু, বেলুচিস্তান বাদেও ভারতের কেন্দ্র এত শক্তিশালী হবে যে বাকী অংশ (পাকিস্তানের এলাকাসমূহ) অবস্থার গতিকে আবার ফিরে আসবে ভাবতে।' নেহেরুর প্রত্যাশা ধ্বনিত হয়েছে ভাইসরয়ের ৩১ শে মের কার্যবিবরণীতে– 'In this opinion Eastern Bengal was likely to be a great embarrassment to Pakistan. Presumably Pandit Nehru considered that eastern Bengal was bound sooner or later to rejoin India' অর্থাৎ 'তার মতে পূর্ববাংলা পাকিস্তানের জন্য একটি বিরাট বিব্রতকার অবস্থার সৃষ্টি করবে। সম্ভবতঃ পণ্ডিত নেহেরু ধারণা করেছিলেন যে, আজ হোক আর কাল হোক পূর্ববাংলাকে আবার ভারতে যোগদান করতে হবেই।'

কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট আচার্য ক্রিপালিনী বললেন ঃ খণ্ডিত মাতৃভূমিকে একত্রীকরণের জন্য আমাদের সব রকম শক্তি ও সামর্থকে কেন্দ্রীভূত করতে হবে।

পণ্ডিত নেহেরু বললেন ঃ ভারতের হৃদয় ভাঙ্গলেও এর একত্রীকরণ সম্ভাবনা ধ্বংস হয়নি।

সরদার প্যাটেল বললেন ঃ ভারত বিভাগের যদিও সিদ্ধান্ত হয়েছে। কিন্তু এখনও এটা অবাস্তব পরিকল্পনা... ভারত একক এবং অখন্ড একটি দেশ। কেউ সাগরকে অথবা প্রবহমান জলরাশিকে স্বতন্ত্র করে রাখতে পারে না।

গান্ধীর ধারণায় বিভক্ত ভারত পুনরায় অখণ্ড ভারতে পরিণত হবে। তার ধারণায় মুসলিম লীগই ভারতের সাথে পাকিস্তানের সংযুক্ত হওয়ার কথা বলবে। তারা নেহেরুকে ডাকবে এবং নেহেরু তাদের ফিরিয়ে নিয়ে আসবে।

সক্রিয় সাম্প্রদায়িক সংগঠনসমূহ যেমন হিন্দু মহাসভা, স্বয়ং সেবক সংঘ এবং সংখ্যালঘু অধিকার সংরক্ষণ আন্দোলন সীমান্তরেখা নির্মূল করতে দাবী জানাল এবং শক্তি প্রয়োগ করে পূর্ববাংলাকে ভারতের অংশে পরিণত করতে অথবা অর্থনৈতিক চাপের সম্মুখীন করার পরামর্শ দিল।

কেথ কেলার্ড বলেন– 'ভারতীয়দের অনেকে মনে করেন পাকিস্তানের সৃষ্টিটাই হল এক বেদনাদায়ক ভ্রান্তি। এই ভুলের সংশোধন হওয়া দরকার। অন্তত পূর্ব পাকিস্তানের ভারতে অন্তভুক্তি ব্যাপারটা তারা চিন্তা করে থাকেন।

...পাকিস্তানীদের জীবনকে দুঃসহ করে তোলার জন্য ভারত সবরকম উদ্যোগ নিয়েছিল।

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানকে পশ্চিম বাংলার সাথে সংযুক্ত করার ব্যাপারে পশ্চিম বাংলার নেতৃবৃন্দের আগ্রহের কারণ রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দুটোই। তারা আশা করে যে সীমান্ত রেখা মুছে ফেলা সম্ভব হলে পূর্ব বাংলায় তাদের আধিপত্য কায়েম হবে এবং শিল্প কারখানার জন্য কাঁচামালের বাজার হবে অবারিত।

দিল্লীর সাম্প্রদায়িক নেতৃত্বের চূড়ান্ত লক্ষ্য ছিল পাকিস্তানকে খন্ডিত ভারতের মানচিত্র সংযুক্ত করে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা। এই উদ্দেশ্য সামনে রেখে তারা সুপরিকল্পিতভাবে তাদের তৎপরতা শুরু করে।

www.pathagar.com

দশম অধ্যায়

বিভাগোত্তর পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক অবস্থা

তৎকালীন বিভাগোত্তর অর্থনৈতিক পরিস্থিতি কি দারুণ সংকটের মধ্যে ছিল সেটা কুম্যুনিষ্টদের একটি গ্রন্থ থেকে উদ্ধৃত এবং উত্তেরাধিকার সূত্রে পূর্বপাকিস্তানের ভাগে কি প্রাপ্তিযোগ হয়েছিল। তা ভারত বর্ষ তথা বাঙ্গালা বিভক্তির পর তৎকতালীন পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশ (বর্তমান বাংলাদেশ) সে সময় (১৯৪৭) কি–কি ভাগে পেয়েছিল তার একটি মোটামুটি ধারণা অবশ্যই শ্রমিক শ্রেণীর জানা থাকা দরকার।

পূর্ববঙ্গ পেয়েছিল ৪ কোটি ২০ লক্ষ জনসংখ্যা অধ্যুষিত ৫৪,৫০১ বর্গমাইল এলাকা। আর এজনসংখ্যার প্রায় ৮০ শতাংশই ছিলেন আধা-সর্বহারা বা সর্বহারা।

এখানকার অধিকাংশ জমিদারই ছিলেন হিন্দু-সম্প্রদায়ের। ধনশালী আর সম্পদশালী ছিলেন তাঁরাই। পূর্ববঙ্গের বড় ব্যবসায়ী ও মহাজন প্রায় সবই হিন্দু-সম্প্রদায়েরই ছিলেন। তাঁদের বৃহৎ অংশই অর্থাৎ ধন-সম্পদশালীদের প্রায় সবই যা কিছু গড়েছিলেন বা বিনিয়োগ করেছিলেন তার প্রায় সবই কলিকাতা ও হুগলী ভিত্তিক এবং বাঙ্গালা বিভক্তির পর তাঁরা পূর্ববঙ্গ ছেড়ে চলে যাওয়ার ফলে তাদের পূঁজি-সঞ্চিত অর্থসহ অন্যান্য মূল্যবান সামগ্রী সবই ভারতে চলে যায়। জ্ঞান চক্রবর্তী তাঁর "ঢাকা জেলার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অতীত যুগ" বইয়ের ১৩১ পৃষ্ঠায় বলেছেন, "ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রকে হিন্দু জনসাধারণ প্রথম হইতেই আপনার বলিয়া মনে করিতে পারে নাই। ফলে দেশ বিভাগের পরেই হিন্দুরা ব্যাপকভাবে দেশত্যাগ শুরু করে। হিন্দু সরকারী কর্মচারীরা প্রায় সকলেই অপশনের ব্যবস্থা অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে চলিয়া যায়। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের কর্মীরাও, বিশেষ করিয়া আর, এস, পি, ও ফরোয়ার্ড ব্লকের লোকেরা তাহাদের পরিবারসহ দেশত্যাগ করে।"

ঐ পর্যায়ে মুসলমান সম্প্রদায়ের হাতে মূলতঃ তেমন কোন মূলধন ছিল না। এমনকি এ অঞ্চলের একমাত্র অর্থকরী ফসল পাট ব্যবসাটিও মুলতঃ হিন্দু মাড়ওয়ারীদের হাতেই ছিল। তারা আবার মুনাফার টাকাটা ভারতেই বিনিয়োগ বা স্থানান্তরিত করতেন।

www.pathagar.com

পূর্ববঙ্গের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলির অধিকাংশই প্রতিষ্ঠিত ছিল হিন্দু সম্প্রদায়ের দ্বারা। তাই কয়েক হাজার সম্পদশালী হিন্দু পরিবার পূর্ববঙ্গ থেকে চলে যাওয়ার ফলে শুধু যে পূর্ববঙ্গের অর্থনীতি ভেঙ্গে পড়েছিল তাই নয়, এখানকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিও মারাত্মকভাবে বিপর্যয়ের সম্মুখীন হয়েছিল।

সে বিপর্যস্ত অর্থনীতির পাশাপাশি ভারত থেকে আসতে থাকল লক্ষ লক্ষ নিঃস্ব বাস্তুত্যাগী মানুষের ঢল যার সংখ্যা সরকারী হিসাবেই সাত লক্ষ বলে বলা হল।

পুর্ববঙ্গের ভাগে চাষযোগ্য জমি পড়েছিল সর্বমোট দুই কোটি চল্লিশ লক্ষ একরের মত, যার মধ্যে ঐ সময়কালে এক কোটি আশি লক্ষ একরের মত চাষ করা সম্ভব হত; আর এর মধ্যে আঠার লক্ষ একরের মত পাট চাষযোগ্য জমি ছিল। অর্থকরী ফসল বলতে ছিল একমাত্র পাট। কিন্তু বাঙ্গালার ৬৮,২৫৮টি তাঁত সম্বলিত ১১৩টি পাটকলের মধ্যে একটি পাটকলও পূর্ববঙ্গের মাটিতে ছিল না। আর এখানে খাদ্যশস্য যা উৎপন্ন হত তা আবার এই প্রদেশের জনসংখ্যার প্রয়োজনের তুলনায় ছিল কম; তাই ছিল খাদ্য ঘাটতি সমস্যা।

শিক্ষার দিক থেকে পূর্ববঙ্গের মুসলমানরা পিছিয়ে ছিলেন যথেষ্ট পরিমাণে। তাই চাকুরীর ক্ষেত্রেও এখানকার হিন্দু সম্প্রদায়ই অগ্রগামী ছিলেন; তাদের মধ্যকার সক্ষম অংশও তখন ভারতে চলে গেলেন। এ প্রসঙ্গে একটি মাত্র উল্লেখ থেকেই তখনকার পূর্ববঙ্গের বাকি অবস্থাটা বুঝতে পারা যাবে, তাহল এই যে সে সময় সুপেরিয়ার সিভিল সার্ভিসের মধ্যে মাত্র একজন তিনিও নবিনেটও এখানকার মুসলমান কর্মচারী ছিলেন।

(এর ফলে যে প্রশাসন যন্ত্র পূর্ববঙ্গের জনগণের উপর চেপেবসে তা গঠন করতে হয় পাকিস্তানের অন্যান্য প্রদেশের লোক ও বাস্তুত্যাগীদের মধ্য থেকেই।)

খনিজ সম্পদ বলতে পূর্ববঙ্গ কিছুই পায়নি। তবে এখানে মৎস্য সম্পদ ছিল। আর ছিল দুই লক্ষ হস্তচালিত তাঁত।

বন সম্পদ যা পাওয়া গিয়েছিল তা রাজেন্দ্র প্রসাদ-এর 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড' বইয়ের ২৯০ পৃষ্ঠায় উল্লেখিত তথ্যই যথেষ্ট। তিনি বলেছেন ঃ "ঐ সময়ের (বিভাগপূর্ব) সমস্ত বাঙ্গালার ৬,৫৮,০৩৩ টাকা সরকারী রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চলের মধ্যে যে অংশ পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়ে তার সরকারী রাজস্বের পরিমাণ ছিল মাত্র ২,০০,০০০ টাকার কিছু উপরে। আর পশ্চিমবঙ্গে পেয়েছিল ৪,৫০,০০০ টাকা রাজস্ব আয়ের বনাঞ্চল।"

www.pathagar.com

অর্থাৎ পূর্ববঙ্গের ভাগে বনসম্পদ পড়েছিল রাজস্ব আদায়ের অনুপাতে সমগ্র বাঙ্গালার বন সম্পদের ১৩ ভাগের ৪ ভাগ মাত্র।

পুর্ববঙ্গের স্থলপথ ছিল অত্যন্ত নিম্নমানের। তেমন উল্লেখযোগ্য পরিমাণের পাকা রাস্তা এখানে ছিল না। তবে রেলপথ উন্নত ছিল এবং রেলপথ পাওয়া গিয়েছিল ১,৬১৯ মাইল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় এই রেলপথগুলি খুব বেশী ব্যবহারের ফলে ইঞ্জিন ও গাড়ী যা পাওয়া গিয়েছিল তার অবস্থা প্রায় ভগ্নদশায় এসে দাঁড়িয়েছিল।

শিল্প বলতে যা বুঝায় তা পূর্ববঙ্গের ভাগে যা পড়েছিল তা অতি নগণ্য-তেমন উল্লেখযোগ্য শিল্প এখানে স্থাপিত ছিল না। এ প্রসঙ্গে প্রফেসর আর, কুপল্যান্ড-এর খতিয়ানটি উল্লেখযোগ্য। তিনি তাঁর (ভারতের ভবিষ্যৎ) বইয়ের ৯৬ পৃষ্ঠায় বলেছেন যে, "বৃটিশ ভারতের শতকরা ২০ ভাগ লোকের বাস বাঙ্গালায় এবং শিল্পীয় শ্রমিকের সংখ্যার হিসাবের অনুপাতে বৃটিশ ভারতের শিল্প মাত্র ২.৭ শতাংশ।"

অর্থাৎ বৃটিশ ভারতের সমগ্র শিল্পের মধ্যে বাঙ্গালায় ছিল ৩৩ শতাংশ শিল্প। তার মধ্যে পূর্ববঙ্গ পেল ঐ ৩৩ শতাংশের মধ্যে মাত্র ২.৭ শতাংশ, আর বাকি ৩০.৩ শতাংশ শিল্পের অধিকারী হল ভারতভুক্ত পশ্চিবঙ্গ। তাছাড়া বৃটিশ ভারতের সমগ্র বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রগুলির মধ্যে মাত্র ৩ শতাংশ উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র পড়েছিল সমগ্র পাকিস্তানের ভাগে।

রাজেন্দ্র প্রসাদ 'ইন্ডিয়া ডিভাইডেড্' বইয়ের ২৯৫-২৯৬ পৃষ্ঠায় এ প্রসঙ্গে যা বলেছেন তা হল ঃ পূর্ববঙ্গ, পশ্চিম পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, বেলুচিস্তান ও সিন্ধু (অর্থাৎ তদানিন্তন পাকিস্তান-লেখক) অংশে বৃটিশ ভারতের ২৬.৭ শতাংশ লোকের বাস ছিল; কিন্তু এ সকল অঞ্চলে সম্মিলিতভাবে শিল্পের অবস্থান বৃটিশ ভারতের মাত্র ১৩.৯ শতাংশ। আর বৃটিশ ভারতের শিল্পে নিযুক্ত শ্রমিকদের মধ্যে মাত্র ৭.৩৬ শতাংশ শ্রমিক এ সকল অঞ্চলের (অর্থাৎ তদানিন্তন সমগ্র পাকিস্তান-লেখক) শিল্পে নিযুক্ত ছিল।

আদতে শিল্পের দিক থেকে পূর্ববঙ্গ পরিপূর্ণভাবেই অবহেলিত ছিল। এমনকি বিখ্যাত রাজনীবিদ এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং খাজা নাজিমুউদ্দীনও এক্ষেত্রে কোন উল্লেখযোগ্য অবদানের অধিকারী হতে পারেননি।

পূর্ববঙ্গে কি-কি শিল্প তখন ছিল না বা পশ্চিমবঙ্গে কি-কি শিল্প পড়ল তা বলে বক্তব্য দীর্ঘায়িত করব না। শুধু পূর্ববঙ্গ তখন শিল্প বলে যা পেয়েছিল তাই এখানে উল্লেখ করছি আর তা হল ঃ

www.pathagar.com

১. ৫০,০০০ টন উৎপাদন ক্ষমতা সম্পন্ন একটি মাত্র সিমেন্ট ফ্যাক্টরী ছাতকে।
২. ৭টি কাপড়ের কল ২৬০০ লুম ও ১,১২,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত।
৩. ৫টি চিনির কল।
৪. ৩৫ থেকে ৪০টির মত জুট বেলিং প্রেস।
৫. ৬০/৬৫টি ধান ভাঙ্গান কল।
৬. ছোট ছোট কয়েকটি ছাপাখানা।
৭. ছোট-খাট কয়েকটি এঞ্জিনিয়ারিং ওয়ার্কশপ ও ডক।
৮. মাত্র ৭,৭০০ একরের চা বাগান।
৯. সৈয়দপুর ও পাহাড়তলীতে শুধু মেরামতযোগ্য দু'টি রেলওয়ে ওয়ার্কশপ।
১০. ছোট ছোট ৪টি ম্যাচ (দিয়াশলাই) কারখানা।

এর বাইরে উল্লেখ করার মত আর কোন শিল্প পূর্ববঙ্গের ভাগে পড়েনি। পূর্ববঙ্গ আর যা পেয়েছিল তা হল ঃ

(ক) মাত্র ৭২৮৬ কিলোওয়াট বিদ্যু উৎপাদন ক্ষমতাসম্পন্ন বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র।
(খ) নদী পথে চলাচলের জন্য যাত্রীবাহী কিছু জাহাজ ও লঞ্চ ছিল।
(গ) নদী পথে মাল চলাচলের জন্য বার্জ, ফ্লাট, স্টিমার ও টাগ প্রভৃতি ছিল।
(ঘ) সে সময়কালে বছরে মাত্র ৫ লক্ষ টনের মত মাল হ্যান্ডলিং করার ক্ষমতাসম্পন্ন চট্টগ্রাম বন্দর।
(ঙ) ঢাকায় একটি ছোট বিমান ঘাটি ছিল্

এ প্রসঙ্গে আর উল্লেখ করার মত কিছু পূর্ববঙ্গ পায়নি।'

অনেক টানা-পোড়নের পর বৃটিশ এবং কংগ্রেস শর্ত সাপেক্ষে পাকিস্তান প্রস্তাব মেনে নিতে সম্মত হল। শর্ত ছিল বাংলা এবং পাঞ্জাবের বিভক্তি। তৎকালীন বাংলার প্রধান মন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী এবং তার সহকারীরা অর্থনৈতিক দিক দিয়ে পূর্ব বাংলা টেকসই হবে না ভেবে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়ে। অন্য সব সংকট বাদ দিলেও শুধু মাত্র খাদ্য ঘাটতি পূর্ব পাকিস্তানকে বিপন্ন করবে এমন একটা ধারণা তখন বিরাজ করছিল। তাদের স্থির বিশ্বাস ছিল পূর্ব পাকিস্তান টিকবে না। পূর্ব পাকিস্তান নিয়ে বিব্রতকর পরিস্থিতি এড়িয়ে যাবার উদ্দেশ্যে তারা মরিয়া হয়ে অবিভক্ত বাংলার দাবীতে সক্রিয় হয়ে উঠলেন। এমনকি উপমাহাদেশের মুসলমানদের প্রাণের দাবী পাকিস্তানের বাইরে অবস্থান নিয়ে হলেও যুক্ত বাংলার দাবীতে সোচ্চার হয়ে উঠলেন। তার উদ্বেগের পেছনে যথেষ্ট

www.pathagar.com

কারণ ছিল মাউন্ট ব্যাটেন পূর্ব বাংলাকে সম্ভাবনাহীন অজ গ্রাম হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এই দুর্বহ বোঝা স্বেচ্ছায় কাঁধে তুলে নেয়ার জন্য তিনি জিন্নাহর প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করেন (Mount Baten paper file 196)। মাউন্ট ব্যাটেনের আগে বাংলার গভর্নর আর জি ক্যাসী এই ভীতি আর উদ্বেগের প্রশ্নটি ব্যাপক প্রচার করে বাংলার মুসলিম নেতৃবৃন্দকে পাকিস্তানের দাবী থেকে সরে আসতে এবং অবিভক্ত ভারতের পক্ষে সমর্থনের জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চেয়েছেন।

সূচনা পর্বে পূর্ব পাকিস্তানের অবকাঠামো শুধুমাত্র অর্থনৈতিক উন্নয়নের অনুপযোগী ছিল তা নয়, রাজধানীর উপযোগী একটি শহরও ছিল না। পূর্ব বাংলা ছিল অশিক্ষিত পশ্চাৎপদ জনগোষ্ঠী সমৃদ্ধ। প্রশাসনিক ও টেকনিকালী অদক্ষ মানুষে পূর্ণ ছিল পূর্ব বাংলা। এখানে তেমন কোন শিল্প গড়ে উঠেনি। একটিও পাটকল অথবা হাইড্রোলিক জুট প্রেসিং ছিল না। শুধু মাত্র ৫টি কটন মিল এবং ৪টি সুগার মিল ছিল। এসবের মালিক এবং পরিচালক সকলেই ছিল হিন্দু। (এস মুজিবুল্লাহ, নতুন সফর, এপ্রিল ১৯৯৬)। পূর্ব বাংলার আয়ের প্রধান উৎস ছিল কাঁচা পাট। যা দিয়ে ৯ কোটি টাকা বার্ষিক আয় হতো। কিন্তু পাটের বাণিজ্য পুরোটাই ছিল হিন্দু মারোয়ারীদের হাতে। এরা তাদের লভ্যাংশ ভারতে পাচার করতো। এটা সত্য যে কোলকাতার পাটকলগুলো পূর্ব বাংলায় উৎপাদিত পাটের প্রধান ক্রেতা ছিল এবং বিশ্ব বাজারে পাট রপ্তানী হতো কোলকাতা বন্দর দিয়ে। যে কারণে পাট থেকে বাংলার মূল আয়ের পুরোটাই নির্ভর করত দিল্লীর মেজাজ মর্জির উপর। স্বাধীনতা উত্তর প্রাথমিক পর্যায়ে বাণিজ্য বিষয়ে পাকিস্তানী প্রতিপক্ষের সাথে আলাপ আলোচনাকালে ভারতীয় বাণিজ্য প্রতিনিধিরা স্পষ্টতই জানিয়ে দেয় আপনারা পাট নিয়ে কি করবেন আমাদের কাছে পাট বিক্রি ছাড়া আপনাদের ভিন্ন কোন পথ নেই। এসব আপনারা পুড়িয়ে ফেলুন অথবা বঙ্গোপসাগরে নিক্ষেপ করুন।'

শুরুতে এই প্রদেশে মাত্র ৫ কিলোমটার শক্তি সম্পন্ন বেতার কেন্দ্র ছিল। একটি দৈনিক পত্রিকা ছিল না। কোন প্রকাশনা শিল্প, আধুনিক ছাপাখানা এমন কি ব্লক তৈরীর কোন ব্যবস্থাও ছিল না। যখন দৈনিক সংবাদ পত্র প্রকাশ হল তখন করাচী থেকে ব্লক তৈরী হয়ে বিমানে ঢাকায় আনা হতো। পূর্ব বাংলায় তখন ১০,৭০০ কিলোমিটার বিদ্যুৎ উৎপাদন হতো। শহরের ৮০ শতাংশ সম্পত্তির মালিকানা ছিল হিন্দুদের এবং এখানকার ৮০ শতাংশ সম্পদের মালিকও ছিল হিন্দু।

www.pathagar.com

শিক্ষার সম্পূর্ণটাই ছিল হিন্দুদের দখলে। প্রায় সবকটি হাই স্কুল এবং কলেজ হিন্দুদের অর্থানুকুল্যে এবং তাদের দ্বারাই পরিচালিত হত। উচ্চ শিক্ষিত মুসলমানদের সংখ্যা ছিল হাতে গোনা। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় মুসলমানদের উচ্চ শিক্ষার জন্য। ১৯৪৭ সাল অবধি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মুসলিম ছাত্র সংখ্যা ছিল অত্যল্প এবং মুসলিম শিক্ষকের সংখ্যা ছিল অনুল্লেখযোগ্য। দ্বিতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজের অবস্থা এর চেয়ে উত্তম ছিল না। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের প্রাধান্য ১৯৫০ সাল অবধি একই রকম বিরাজ করছিল। এদের পরীক্ষা নেওয়া হতো কোলকাতা বিশ্ব বিদ্যালয়ে। এই প্রদেশে প্রশাসনিক জ্ঞান সম্পন্ন জনশক্তি ও স্থানীয় নেতৃত্ব ছিল না যাদের উপর নির্ভর করে উন্নয়ণ প্রক্রিয়া এগিয়ে নেয়া যায়। এখানে ২০/২৫ জন ডিপূটি ম্যাজিষ্ট্রেট এবং সাব ডিপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ছিলেন। পুলিশ অফিসার এবং কনষ্টেবলের সংখ্যা ছিল ন্যূনতম প্রয়োজনের এক পশ্চমাংশ। অন্যান্য প্রয়োজনীয় প্রতিষ্ঠানে যেমন রেলওয়ে জনশক্তিতে পূর্ব বাংলার মানুষ ছিল প্রায় অনুপস্থিত। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা ছিল প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে। মাত্র ২শ' জন শক্তি নিয়ে একটি সেনা বাহিনী গড়ে তোলা সম্ভব ছিল না। তখন প্রশাসনিক সামরিক কোন ক্ষেত্রেই পূর্ব বাংলা স্বনির্ভর হওয়ার মত প্রয়োজনীয় পরিমাণ দক্ষ জন শক্তি ছিল না। ভারত থেকে আসা অবাঙালী দক্ষ জনশক্তি ও প্রশাসনিক জনশক্তি তৎকালীন পূর্ব বাংলার জন্য অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল। তখন খাদ্য ঘাটতিও ছিল তীব্র। এই খাদ্য ঘাটতি সুচিত হয় সিরাজের পতনের পরবর্তী পর্যায় থেকে। স্বাধীনতার উত্তর প্রাথমিক পর্যায়ে চট্টগ্রামে খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠলে সিন্ধুর গভর্নরের আবেদন ক্রমে সংগৃহীত তহবিল দিয়ে পর্যাপ্ত খাদ্য চট্টগ্রামে প্রেরণ করে আসন্ন দুর্ভিক্ষের মুকাবিলা করা হয়।

অগ্রসর হিন্দু জনগোষ্ঠীর অসহযোগিতা এবং দিল্লীর প্ররোচনায় হিন্দুস্থানে পাড়ি জমানোর ফলে যে ভযাবহ শূন্যতার সৃষ্টি হয়েছিল। ভারতের বিভিন্ন এলাকা থেকে আসা অবাঙালী মুসলিম দক্ষ প্রশাসনিক কর্মকর্তা ও কর্মচারী দিয়ে পূরণ করা হয়। এখানকার অগ্রসর দক্ষ জনগোষ্ঠী কখনোই পূর্ব বাংলার স্বাধীনতাকে তাদের স্বাধীনতা মনে করেনি যে কারণে সাত চল্লিশে স্বাধীনতার আগেই তারা তাদের অর্থ বিও নিয়ে হিন্দুস্থানে পাড়ি জমায়। এই অর্থ বিত্ত ও দক্ষ জন শক্তিহীন পশ্চাৎ পদ অঞ্চল নিয়ে কায়দে আযম কখনই নিরাশ্যে ভেঙে পড়েননি। কৃষি নির্ভর এ অঞ্চল উন্নয়নের ব্যাপারে তিনি ছিলেন অতি আশাবাদী।

www.pathagar.com

যদিও এ কথা সত্য যে তৎকালীন পাকিস্তানে তথা পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প-বিপ্লব শৈশবকালীন অবস্থায় ছিল, তবুও স্বীকার করতেই হবে যে এখানকার বুর্জোয়ারা তাদের সাম্রাজ্যবাদী মাতা-পিতার হাত ধরে হাঁটি-হাঁটি পা-পা করে পা ফেলতে ফেলতে এগোচ্ছিল। ১৯৪৭ সালে পূর্ববঙ্গে (পরবর্তীতে পূর্ব পাকিস্তান, বর্তমান বাংলাদেশ) একটি পাটকলও ছিল না অথচ ১৯৭০ সালের মধ্যে ২৪,৩৩৪টি লুম সম্বলিত ৬৮টি পাটকল স্থাপিত হল; ১৯৪৭ সালে যেখানে ২৬০০ লুম ও ১,১২,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত মাত্র ৭টি কাপড়ের কল ছিল সেখানে ১৯৭০ সালের মধ্যে তা ৭,০০০ লুম ও ৭,৫০,০০০ স্পিন্ডল সম্বলিত ৪৪টি কাপড়ের কলে উন্নীত হয়; চিনিকল ছিল ৫টি তা ১৯৭০ সালের মধ্যে ১৫টিতে উন্নীত হল; ম্যাচ ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ক্ষমতা যেখানে সমগ্র পাকিস্তানে ১৯৪৭ সালে ছিল ৮০ লক্ষ গ্রুস বাক্স শুধুমাত্র পূর্ব পাকিস্তানেই ১৯৭০ সালে উৎপাদন হল ১১৩ লক্ষ গ্রুস বাক্স; রেলওয়ে ওয়ার্কসপ (উন্নত মানের) তৈরি হল দুইটি, খুলনায় তৈরী হল শিপইয়ার্ড, নারায়ণগঞ্জে ডক ইয়ার্ড নির্মিত হল; স্টিল মিল হল একটি, গালফ্রা হাবিব নামে জুট মিল স্পেয়ারস তৈরির কারখানা হল; ক্যাবল ফ্যাক্টরী হল, রসায়ন শিল্প হল, অক্সিজেন তৈরির কারখানা হল, অ্যারড্‌ন্যানস ফ্যাক্টরী হল; দুইটি কাগজ কল, একটি নিউজপ্রিন্ট মিল ও একটি হার্ডবোর্ড মিল হল; বৃহৎ মুদ্রণ শিল্প স্থাপিত হল; সার কারখানা হল; গাড়ী সংযোজন কারখানা হল মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী হল, ইলেক্ট্রিকাল ইকুইপমেন্ট তৈরির কারখানা হল; বাই-সাইকেল সংযোজন-তৈরি কারখানা হল; তৈল শোধনাগার হল; যেখানে কোন সিগারেট ফ্যাক্টরী ছিল না সেখানে সিগারেট ফ্যাক্টরীর উৎপাদন ১৯৬৯-৭০ সালে এক হাজার সাত শত কোটি সিগারেট-এ উন্নীত হল; ১৯৬৯-৭০ সালে কস্টিক সোডা উৎপাদন হল ৩,৩৫০ টন, সালফিউরিক এসিড উৎপাদন হল ৬,৪৫০ টন, ক্লোরিন উৎপাদন হল ২,৯০০ টন, বাস, ট্রাক, কার ও জীপ এসেম্লিং হল ৪৫৫টি, ইউরিয়া ফার্টিলাইজার উৎপাদন হল ৯৬,০০০ টন; চট্টগ্রাম ও চালনা বন্দরের মাধ্যমে ১৯৬৭-৬৮ সালে রপ্তানী হয়েছিল ১৪ লক্ষ টনের উপর এবং আমদানী হয়েছিল ৪২ লক্ষ টনের উপর মালামাল; ১৯৪৭ সালে বিদ্যুৎ উৎপাদন ক্ষমতা ছিল মাত্র ৭,২৮৬ কিলোওয়াট তা ১৯৭০ সালের মধ্যে ৫,৪৮,০০০ কিলোওয়াট উৎপাদন ক্ষমতা সম্বলিত উৎপাদন কেন্দ্রে উন্নীত হল; ১৯৪৭ সালে সমগ্র পাকিস্তানে কার, জীপ, ট্যাক্সী, বাস, ট্রাক, ব্যাবিট্যাক্সী, মোটর সাইকেল প্রভৃতি রাস্তায় চালিত যানের সংখ্যা ছিল ২৫,৪৩৫ তা ১৯৭০ সালের মধ্যে শুধু

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের ৭০,০৮৬টিতে উন্নতি হয়েছিল; ১৯৪৭ সালে সমগ্র পাকিস্তানে টেলিফোনের সংখ্যা ছিল ৩৫ হাজার তা ১৯৬৮ সালে পূর্ব পাকিস্তানে দাঁড়িয়েছিল ৪৫,৬৫৭টিতে; নতুন রেলপথ নির্মিত হল ১৫৭ মাইল; ১৯৫২ সালে যেখানে উন্নতমানের পাকা রাস্তা ছিল ৫৯৪ মাইল ও নিম্নমানের পাকা রাস্তা ছিল ১,০২৮ মাইল, সেখানে ১৯৬৯-৭০ সালের মধ্যে তা উচ্চামান সম্পন্ন পাকা রাস্তা হল ৪,৪৮১ মাইল আর নিম্নমানের পাকা রাস্তা হল ১৮৭৪ মাইল। ১৯৬৯-৭০ সালে কৃষিতে রাসায়নিক সার ব্যবহার হল ২,৭৭,০০০ টন; পাওয়ার পাম্প ও নলকুপের সাহায্যে জল সেচের ব্যবহার হল ঐ বছর ৮ লক্ষ একরেরও বেশী জমিতে।

বিদ্যুৎ, রাস্তা, যোগাযোগ, পরিবহণ, সেচ, বন্দর প্রভৃতি ক্ষেত্রে উন্নয়নের পাশাপাশি প্রায় ১৫০টি বৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান ছিল তাছাড়া রেল, নৌ ও সড়ক পরিবহণ শিল্পের উন্নতি নিশ্চয়ই সামন্ততান্ত্রিক কায়দায় শোষণের উদ্দেশ্যে প্রতিষ্ঠিত হয়নি। ১৯৬৯-৭০ সালে শুধুমাত্র রেলওয়েতে চালান দেওয়া মালের ওজন ছিল ৪৮ লক্ষ টন।

এর পাশাপাশি ১৯৪৭ সালে মাত্র, ৭,৭০০ একরের চা বাগান শিল্প উন্নীত হয়ে ১৯৬৯ সালের মধ্যে এক লক্ষ একরে দাঁড়িয়েছিল; জুট প্রেসও প্রায় ৭০টিতে উন্নীত হয়েছিল। এ ছাড়া গড়ে উঠেছিল মাঝারি ও ছোট আকারের অনেক রি-রোলিং মিল, ইঞ্জিনিয়ারিং কারখানা, মুদ্রণ, প্রকাশনা ও প্যাকেজিং শিল্প, সংবাদপত্র শিল্প, ঔষধ প্রস্তুত শিল্প, চামড়া শিল্প, পাদুকা উৎপাদন কারখানা কাঁচের দ্রব্যাদি প্রস্তুত শিল্প, লৌহ কারখানা, ঢালাই কারখানা, এলুমিনিয়াম ফ্যাক্টরী, মেরামত কারখানা ও ডকইয়ার্ড, ইট তৈরি শিল্প ফার্নিচার তৈরি শিল্প, স-মিল, আটা-চাল-তৈল-ডাল ভাঙ্গান কল, ময়দা শিল্প লবণ তৈরি কারখানা, বিস্কুট ও বেকারী শিল্প, প্লাষ্টিক ও রাবার শিল্প, টায়ার উৎপাদন শিল্প, হোসিয়ারী শিল্প, ইলেক্ট্রিক তার, বাল্ব, পাখা ইত্যাদি তৈরি শিল্প; মৎস্য প্রক্রিয়াজাতকরণ ও আলু হিমায়িতকরণ শিল্প, প্রসাধনী সামগ্রী প্রস্তুত শিল্প, ব্যাটারি উৎপাদন শিল্প, সাবান কারখানা, পিচবোর্ড ও কাগজের দ্রব্য প্রস্তুত কারখানা, বিভিন্ন ধরনের সংযোজন ও মেরামত কারখানা, পোশাক তৈরি শিল্প প্রভৃতি কয়েক হাজার শিল্প-যার মধ্যে ১৯৭০ সালে সরকারীভাবে রেজিস্ট্রিকৃত ছিল সাড়ে তিন হাজারের উপর, আর চীফ ইনসপেক্টর অব ফ্যাক্টরীজ এন্ড ইষ্ট্যাবলিশমেন্টস-এর ১৯৬৯ সালের রেকর্ড অনুযায়ী ছিল ৫,৫৪১টি শিল্প প্রতিষ্ঠান। ১৯৭০ সালে চলচ্চিত্র গৃহের সংখ্যা ছিল ১৬৬টি।

www.pathagar.com

আরও ছিল অগণিত হস্তচালিত তাঁত (সরকারীভাবে স্বীকৃত হ্যান্ডমুল ফ্যাক্টরী ছিল প্রায় সাড়ে সাত শত) শিল্প ও বিভিন্ন কুটির শিল্প, অলংকার প্রস্তুত শিল্প, বিড়ি তৈরি কারখানা, নির্মাণ শিল্প, টেইলারিং সপ, বই বাঁধাই কারখানা ইত্যাদি। যাতে নিযুক্ত ছিল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। এর পাশাপাশি ছিল হাজার হাজার বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান ও দোকান। ছিল ইম্পোর্ট–এক্সপোর্ট ব্যবসা, ক্লিয়ারিং-ফরোয়ার্ডিং ব্যবসা, ক্যারিং ব্যবসা, কনসাল্টিং ফার্ম, ব্যাংক ও বীমা শিল্প ইত্যাদি। ১৯৬৯-৭০ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের টাকার পরিমাণ ছিল যথাক্রমে ১৮১ কোটি ও ১৬৭ কোটি টাকা। সে সময়ে এক টন পাটজাত দ্রব্যের গড় রপ্তানী মূল্য ছিল ১,৫৫৫৩.০০ টাকা ও এক টন কাঁচা পাটের গড় রপ্তানী মূল্য ছিল ১,২২৩.০০ টাকা এবং এক পাউন্ড চা-র গড় রপ্তানী মূল্য ছিল এক টাকা পঞ্চাশ পয়সার মত। প্রশ্ন হচ্ছে, পুঁজিবাদের বিকাশ ছাড়া এসব হল কী করে? আর এর থেকে কি পূর্ববর্তী সামাজিক অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটেনি?

রাশ ব্রুক উইলিয়াম ১৯৭১ সালে লিখেছেন– 'আমার পর্যবেক্ষণ আমাকে এই উপসংহার টানতে বাধ্য করেছে যে মাত্র শতাব্দীর এক চতুর্থাংশ অর্থাৎ ২৫ বছরের মধ্যে পাকিস্তান যেভাবে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে অগ্রগতির নতুন দিগন্ত রচনা করেছে অতীতের লম্বা ইতিহাসের কোন পর্যায়েই এমন অগ্রগতি অর্জিত হয়নি। সফল স্থাপনা কাপতাইবাধ, চট্টগ্রামকে প্রধান সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে প্রতিষ্ঠা, চন্দঘোনা পেপার মিল, ফেঞ্জুগঞ্জ সার কারখানা যা পাকিস্তানের যে কোন স্থানে নির্মিত হতে পারত। কিন্তু সেটা ছিলো কেন্দ্রের উদ্যোগ। কেন্দ্রের উদ্যোগে প্রাইভেট সেক্টরেও উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে।'

১৯৬৭-৬৮ সাল নাগাদ ৯২৭টি বৃহত শিল্প ৬ শতাংশ জিডিপি অর্জন করে। (সি এম আই রিপোর্ট ইসলামাবাদ ১৯৬৯) ১৯৭১ সাল পর্যন্ত আরো অগ্রগতি হয়েছে। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এবং শোষণ বঞ্চনার বিরুদ্ধে পঞ্চম বাহিনীর নায়ক শেখ মুজিব যখন বিষোদগার করছেন তখন পর্যন্ত ৭৯টি জুট মিল, ৪২টি কটন মিল ২০টি চিনির মিল, তিনটি সার কারখানা, ২টি পেপার মিল, একটি নিউজ প্রিন্ট মিল দুটো পেপার বোর্ড মিল, ২টি রেয়ন মিল, একটি সিমেন্ট ফ্যাক্টরী, একটি মেশিন টুলস ফ্যাক্টরী একটি রিফাইনারী এবং অসংখ্য চামড়া ট্যানিং ফ্যাক্টরী প্রতিষ্ঠিত ছিল। তখন পর্যন্ত পিচঢালা সড়ক নির্মিত হয়েছিল ৩ হাজার মাইল। রেল পথ বর্ধিত হয়েছিল ১৮০০ মাইল পর্যন্ত এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন ছিল ১ লক্ষ কিলোয়াট। জমিদারী প্রথা উচ্ছেদ হয়েছিল ১৯৫০ সালেই উচ্চ বর্ণের

www.pathagar.com

হিন্দু সাংসদদের বিরোধীতা সত্ত্বেও মুসলিম বায়তদের মালিকানা স্বত্ব প্রদান করা হয়। স্থবির কৃষি সেক্টরে প্রাণ চাঞ্চল্যের সূচনা করা হয়েছিল এমন ভাবে যে দুর্ভিক্ষ কোন দুর্ভিক্ষই তার কালো হাত বাড়াতে পারেনি। ষাটের দশকে পূর্ব বাংলা খাদ্যে স্বয়ং সম্পূর্ণতা অর্জনে সক্ষম হয়।

১৯৪৭ সাল নাগাদ যেখানে পুর্ব বাংলায় মাত্র একটি বিশ্ব বিদ্যালয় একটি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল অর্ধডজন ডিগ্রি কলেজ ছিল সেখানে পাকিস্তান যুক্ত করেছে ৫টি বিশ্ব বিদ্যালয় (তিনটি সাধারণ, একটি ইঞ্জিনিয়ারিং এবং একটি কৃষি)।

এছাড়া এখানে ৩টি ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ ৬টি ইঞ্জিনিয়ারিং স্কুল ৮টি পলিটেকনিক এবং ৫টি মেডিক্যাল কলেজ এবং অসংখ্য মেডিক্যাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত করা হয়। বিজ্ঞান কলা ও বাণিজ্য অধ্যয়নের জন্য ২ শতেরও অধিক কলেজ প্রতিষ্ঠিত করা হয়।

শিক্ষিত হিন্দুরা দেশ ত্যাগের পর পূব´পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল প্রায় শূন্যের কোঠায়। পাকিস্তান আমলে শিক্ষিতের হার দাঁড়ায় ১৯ শতাংশ অথচ পশ্চিম পাকিস্তানে শিক্ষিতের হার ছিল ১৮ শতাংশ।

১৯৪৯-৫০ সালে পাকিস্তানের পাবলিক সার্ভিস কমিশনের প্রতিযোগীতামূলক পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয় যারা লিখিত পরিক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এমন বাংলাভাষী ৪০ জনকে কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন শাখায় নিয়োগ দেয়া হয় সরকারী নির্দেশে। ১৯৪৯-৫০ সালে পাবলিক সার্ভিস কমিশনের পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে মেধা ভিত্তিক নিয়োগ দেয়া হয় ২০ শতাংশ বাকী ৮০ শতাংশ পদ পূর্বও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যে সমানভাবে ভাগ করে দেয়া হয়। (R symond, the British and their Successors 44-90) অথচ পূর্ব পাকিস্তানের কতিপয় পরিচিত মুখ এর বিরোধীতা করে। ষাটের দশকের মধ্যভাগ থেকে সিএসপিদের ৩ বছর কম সময় অতিক্রান্ত হলে তাদের নিজ প্রদেশে প্রত্যাবর্তন করানো শুরু হয়। ১৯৫৫ সালের প্রাথমিক পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানী সিএসপির অনুপাত ৩৫ শতাংশে পৌছে। ১৯৭১ সালে নাগাদ এদের সংখ্যা পশ্চিম পাকিস্তানীদের সমপর্যায়ে উন্নীত হয়। ১৯৪৭ সালে এখানে কয়েকজন কমিশন অফিসার, ৫০/৬০জন জুনিয়ার কমিশন এবং ২০০ জন জোয়ান ছিল। ১৯৭১ সাল নাগাদ এ সংখ্যা দাঁড়ায় ৪০ হাজারে।

হিন্দু প্রতিযোগীদের অবর্তমানে মুসলমানরা ব্যবসা বাণিজ্য ক্ষেত্রে অগ্রগতি ও বিস্তৃতির যথেষ্ট সুযোগ পেয়েছিল। পাকিস্তানোত্তর পূর্ব বাংলার মুসলমানদের

www.pathagar.com

মধ্যে খুব দ্রুত শিক্ষার বিস্তৃতি ঘটে। সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অর্জন করেছে নবতর মর্যাদা। যেমন এর আগে হিন্দুদের সাথে সম্পর্কের ক্ষেত্রে হীনমন্যতা অনুভব করতো খুব সহজে এই হীনমন্যতা অতিক্রম করেছে। (জিপি ভট্টাচার্য১৯৭৩, ১১৯, ২০) শুরু থেকে হিন্দুরা মুসলমানদের এই উত্থান অসহ্য মনে করেছে।

স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে পাকিস্তানের সব মুসলমানই ভাবতে শুরু করে তারা উচ্চ শ্রেণীর তারা শাসকের বংশধর এবং হিন্দুরা তাদের অধীন। একজন ঠেলাগাড়ী চালক ও একজন প্রভাবশালী হিন্দুকে একথা বলার সাহস রাখতো যে আপনাদের দ্বিধা সংকোচের কোন কারণ নেই, নির্ভয়ে চলাফেলা করুন। কেননা মুসলমানরা অর্থাৎ তারা শাসক এবং হিন্দুদের নিরাপত্তা দেয়া তাদেরই দায়িত্ব। এটাই ছিল মুসলমানদের মানসিকতার প্রাণবন্ত উত্থান। (পিসি লাহিরী ১৯৪৬ : ৮-৯)

পরিস্কার ভাবে একথা বলা যায় যে পাকিস্তান সামাজিক অর্থনৈতিক মনোস্তাত্বিক মুক্তির ব্যাপারে কয়েক শতাব্দীরও রুদ্ধ দ্বার উন্মুক্ত করেছে যা তাদের মধ্যে এনে দিয়েছে সার্বিক উন্নয়নের সামর্থ। এসত্বেও এটা ঠিক যে উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত বৈষম্য নিয়ে পাকিস্তানের যাত্রা শুরু হয়েছিল সেই বৈষম্যের পূর্ণাঙ্গভাবে দূরীভূত করা তখনও সম্ভব হয়নি।

বৈষম্য নিরসনের উদ্যোগ

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য অনাকাঙ্খিত হলেও এটা অস্বাভাবিক ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তান বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অধীনে হয় পলাশীর শত বছর পরে। যে কারণে বাংলার মানুষ যেভাবে বৃটিশ এবং তাদের সহযোগী বর্ণ হিন্দুদের ধারাবাহিক নির্যাতনের সম্মুখীন হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণ ব্যক্তিগত পর্যায়ে এবং সামগ্রিক ভাবে তেমন শোষণ বঞ্চনার সম্মুখীন হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানে বাংলার মত কোন হিন্দু জমিদারদের নিষ্পেষণ এবং মহাজনদের দৌরাত্ব ছিল না। অথবা বাংলার মত আধুনিক শিক্ষা ও কর্মের ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ ছিল না। তদুপরি সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের কৌশলগত গুরুত্বের কারণে সেখানে কখনো প্রশাসনিক ঔদাসীন্যও পরিলক্ষিত হয়নি। পশ্চিম পাকিস্তানের এলাকা সমূহে কৃষি ব্যাপক সেচ সুবিধা পেয়েছে। যোগাযোগ ব্যবস্থা এবং অন্যান্য অবকাঠামো গত সুবিধা থেকে সংশ্লিষ্ট অঞ্চল লাভবান হয়েছে। মোটের

www.pathagar.com

উপর দ্রুত অর্থনৈতিক অগ্রগতি অর্জনের প্রয়োজনীয় উপাদান সেখানে মওজুদ ছিল। (জিপি ভট্টাচার্য, ১৯৭৩ : ১১৯-২০)

১৯৪৮ সালের মার্চে পূর্ব পাকিস্তান সফর কালে জিন্নাহ উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের বৈষম্য অনাকাঙ্খিত বলে উল্লেখ করেন। তিনি সহযোগিতা প্রদান এবং ধৈর্য ধারনের আহ্বান জানিয়ে যতদ্রুত সম্ভব পূর্ব ও পশ্চিমের বৈষম্য দূরীকণের আশ্বাস দেন। কায়দে আযমের এই আশ্বাস সংবিধান রচনার ক্ষেত্রে গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। ১৯৫৬ এবং ৬২ সালে উভয় সংবিধানে রাষ্ট্রের উভয় অংশের মধ্যকার বিরাজমান বৈষম্য দূরীকরণের এবং জাতীয় পরিষদে এ ব্যাপারে পর্যালোচনা করার প্রয়োজনীয়তার উপর গুরুত্বারোপ করা হয়েছে।

আইয়ুব খান ১৯৪৮ সালে জানুযারীতে যখন পূর্ব পাকিস্তানের জিওসির দায়িত্ব প্রাপ্ত হলেন তখন এখানে সেনা বাহিনীর মাত্র ৫টি কোম্পানী সহকারে দুটো ব্যাটেলিয়ান ছিল। জেনালের আইয়ুব তার আত্মজীবনী 'ফ্রেন্ডস নট মাষ্টার' গ্রন্থে লিখেছেন- 'সেনাবাহিনীর সদর দপ্তরে কোন টেবিল চেয়ার বা ষ্টেশনারী ছিল না বলতে গেলে আমাদের কিছু ছিল না। এমনকি পূর্ব পাকিস্তানের একটি মানচিত্র পর্যন্ত ছিল না। পূর্ব পাকিস্তান সফরকালে জিন্নাহ সেনাবাহিনীতে অধিক সংখ্যক পূর্ব পাকিস্তানের জোয়ানদের নিয়োগ দেয়ার জন্য ব্যক্তিগতভাবে উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং একজন পূর্ব পাকিস্তানী মেজর আব্দুল গণিকে ইষ্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট গঠন করার দায়িত্ব প্রদান করেন। পরবর্তীতে ডকিং সুবিধা সহ একটি নেভাল বেজ চট্টগ্রামে স্থাপন করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের রিক্রুটের জন্য একটি ডিপো, অনেক বিক্রুটিং সেন্টার এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনা করা হয়। অন্য আর একজন পূর্ব বাংলার কর্নেল আব্দুল কাইয়ুম চৌধুরীকে পূর্ব পাকিস্তানের তরুণদের যুগোপযোগী দক্ষ হিসাবে ভবিষ্যত নেতৃত্বের জন্য গড়ে তোলার ব্যাপারে ক্যাডেট কলেজ স্থাপনের দায়িত্ব অর্পন করা হয়। ৬৯ থেকে ৭১ সালের মধ্যে ৪টি রেজিমেন্ট গড়ে তোলা হয় শুধু মাত্র পূর্ব পাকিস্তানীদের নিয়ে। এর উপরে পাঞ্জাব, বেলূচ এবং এবং ফ্রন্টিয়ার রেজিমেন্ট গড়ে তোলার সময় ২৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানীকেও রিক্রুট করা হয়। পূর্ব পাকিস্তানীদের এত দ্রুত নিয়োগ দেয়া হচ্ছিল যে ঢাকার ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্টাল সেন্টার সেনাবাহিনীর মান হ্রাস হওয়ার ব্যাপারে উদ্বেগ প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

আইয়ুব শাসনামলের প্রাথমিক পর্যায়ে দেখা গেছে অর্থনৈতিক উন্নয়নের দৌড়ে পূর্ব পাকিস্তান অনেক পিছিয়ে রয়েছে। পুর্ব পাকিস্তানের মাথা পিছু গড় আয়ের বৃদ্ধি সত্ত্বেও এখানকার তুলনায় পশ্চিম পাকিস্তানের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির হার বেশী। এটা সম্ভব হয়েছিল প্রাথমিক পর্যায়ের সুযোগ সুবিধা ও অবকাঠামো থাকার কারণে স্বাভাবিকভাবে গড় পড়তা আয়ের ক্ষেত্রে উভয় প্রদেশের মধ্যে বৈষম্য ব্যাপক হতে থাকে। ১৯৫১-৫২ সালে গড় পড়তা আয়ের ক্ষেত্রে বৈষম্য ছিল ১৮ শতাংশ ১৯৬৭-৬৮ সালে বৃদ্ধি পেয়ে ৩০ শতাংশে দাঁড়ায়। (রিপোর্ট অব দি প্যানেল ইকোনমিষ্ট অন দি সেকেন্ড ফাইভ ইয়ার প্ল্যান) কেন্দ্রীয় সরকারের প্লানিং কমিশনের মধ্যকার বেশ কিছু পূর্বপাকিস্তানী অর্থনীতিবিদ এবং অর্থনৈতিক মন্ত্রনালয় মনে করে গড়পড়তা আয়ের পার্থক্য সূচিত হয় অধিক হারে বিনিয়োগ এবং পূর্ব পাকিস্তান থেকে পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের কারণে। দৃষ্টিভঙ্গীগত পার্থক্যের জন্য তারা বিভিন্ন পরিসংখ্যান ও ধারণার আশ্রয় গ্রহণ করে। পশ্চিম পাকিস্তানী সহযোগীরা তাদের কিছু অভিযোগের ব্যাপারে বাধ সাধে। এর জবাবে তারা অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলে যে কেন্দ্রীয় সরকার পরিচালনার ব্যয় প্রতিরক্ষা সেক্টরের ব্যয়, আন্ত প্রদেশ বাণিজ্য উদ্বৃত্ত এবং ব্যাঙ্কিং ও বীমার মাধ্যমে পূর্ব পাকিস্তানের সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তানে পাচার হচ্ছে। (ইসলামিক রিলেসন বিটুইন ইষ্ট এন্ড ওয়েষ্ট পাকিস্তান) তাদের বিদ্যমান বৈষম্যের ব্যাপারে এবং তাদের বিশ্লেষনের ব্যাপারে বিপরীত মত ছিল না। ক্রমে বিতর্ক গুরুত্ববহ হয়ে উঠে। কেন্দ্রীয় সরকার বৈষম্য বিরোধী পদক্ষেপ নেয়ার ফলে যখন কেন্দ্রীয় সরকারের পূর্ব পাকিস্তানীদের প্রতিনিধিত্বের আশানুরূপ অগ্রগতি হচ্ছিল তখন পূর্ব পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের বিলাপ বেসুরো হয়ে বাজছিল।

সরকারের সিনিয়র অর্থনৈতিক উপদেষ্টাদের দ্বন্দ্ব চলাকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির অধ্যাপকরা পশ্চিম পাকিস্তানের কথিত ঔপনিবেশিক শোষনের বিরুদ্ধে সোচ্চার হয়ে উঠে। এদেরই একজন প্রস্তাব দেয় যে পাকিস্তানের দুই অংশের জন্য দুটো অর্থনীতি পৃথকভাবে সংগঠিত ও পরিচালিত করতে হবে।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব বিষয়টির উপর গুরুত্বরোপ করেন এবং অর্থনীতি পৃথকীকরণের পক্ষে কাজ শুরু করেন। ১৯৬২ সালের প্রথমার্ধে শিল্প, রেল বিদ্যুৎ ও পানি যা কেন্দ্রীয় সরকারের অধিক ব্যায়ের খাত সেসব প্রাদেশিক সরকারের অধীনে ন্যাস্ত করা হয়। এসব হল পাকিস্তান শিল্প উন্নয়ন কর্পোরেশন,

www.pathagar.com

পাকিস্তান রেলওয়ে বোর্ড এবং পানি ও বিদ্যুৎ উন্নয়ন সংস্থা। প্রাদেশিক সরকারকে সংশ্লিষ্ট বিভাগ উন্নয়নের পরিকল্পনা নেয়া এবং এসব বাস্তবায়নের অধিকার দেয়া হয়। ৭০ শতাংশ বিক্রয় কর সহ কেন্দ্রীয় সরকারের ৫৪ শতাংশ ট্যাক্স রেভিনিউ এবং অন্যান্য ট্যাক্স এবং ডিউটির সম্পূর্ণটাই পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয়। (এইচ জাহির, ১৯৯৪ : ৯২-৯৩)

তদুপরি ১৯৬৩-৬৪ সালে পাবলিক সেক্টর উন্নয়ন ব্যয় ৫০ শতাংশে বর্ধিত করা হয়। এ সত্ত্বেও আওয়ামী লীগ এবং বামপন্থী ছাত্ররা পূর্ব পাকিস্তানকে অবহেলা করার অভিযোগ উত্থাপন করে এবং নতুন যুক্তির অবতারনা করে বলে যে অধিক বরাদ্দই যথেষ্ট নয়, এটা হতে হবে মাথা পিছু গড় আয়ের উপর ভিত্তি করে এবং আরো বলা হয় যে বৈষম্য নিরসনের সাংবিধানিক বাধ্যবাধকতার ব্যাপারে আইন আদালত যদি শক্তি প্রয়োগ করতে না পারে তাহলে সেটা হবে অর্থহীন। এসত্ত্বেও পূর্ব পাকিস্তানের অনুকূলে সরকারী উদ্যোগ অব্যাহত থাকে।

১৯৫৮-৫৯ সালে উন্নয়ন বরাদ্দ ছিল পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ১৯৬৬ কোটি টাকা পূর্ব-পাকিস্তানের জন্য ছিল ২৫.০৯ কোটি টাকা। ১৯৬৬-৬৭ সালে বরাদ্দ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ৯৫.৪০ কোটি টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৩৬.৩৩ কোটি টাকা। আইয়ুব শাসনামলে কেন্দ্রীয় বাজেটের অধিক পরিমাণ বরাদ্দ করা হয় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য। কেন্দ্র ও প্রদেশের মধ্যকার অর্থনৈতিক সম্পর্কের ব্যাপারে রেইজ ম্যান রোয়েদাদ পরিবর্তন করা হয় এবং প্রদেশের অর্থনৈতিক উৎস বর্ধিত করার উদ্যোগ নেয়া হয়। ১৯৬২-৬৩ সালে পূর্ব পাকিস্তানের রুরাল ওয়ার্কস প্রোগ্রাম শুরু করা হয়। পশ্চিম পাকিস্তানে শুরু হয় এক বছর পর। এই কর্মসূচীর জন্য পশ্চিম পাকিস্তানের তুলনায় পূর্ব পাকিস্তানের জন্য অধিক পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়। তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার জন্য ৫২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। এর মধ্যে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৭০০ কোটি টাকা পক্ষান্তরে পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ করা হয় ২৫০০ কোটি টকা। শিল্প উন্নয়ন ত্বরান্বিত করার জন্য ট্যাক্স হলিডে ব্যবস্থা চালু করা হয়। পূর্বপাকিস্তান এটা ভোগ করে ৪-৬ বছর। অপর দিকে পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্পোদ্দোক্তরা ট্যাক্স হলিডে ভোগ করার সুযোগ পায় ২-৪ বছর। আশা করা হয়েছিল এ অবস্থা চলতে থাকলে ১৯৮৫ সালের মধ্যে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া সব ধরনের বৈষম্য দুর করা সম্ভব হতো। (জিপি ভট্টাচার্য-১৯৭৩ : ১৫২-৫৩)

www.pathagar.com

১৯৬৮-৬৯ সালে উন্নয়ন ঋণ বরাদ্দ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১.০৬০ মিলিয়ন টাকা এবং পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৭৮০ মিলিয়ন টাকা। ১৯৬৯-৭০ সালের উন্নয়ন ঋণ বরাদ্দ হয়েছিল পূর্ব পাকিস্তানের জন্য ১২৯০ মিলিয়ন পশ্চিম পাকিস্তানের জন্য ৯১০ মিলিয়ন। একই রকম দেখা যায় এক্সপোর্ট ক্রেডিটের ক্ষেত্রে ১৯৬৫-৬৬ থেকে ১৯৬৯-৭০ অর্থবছর অবধি পূর্ব পাকিস্তান গ্রহণ করে ২১০ মিলিয়ন ডলার পশ্চিম পাকিস্তান গ্রহণ করে ১৯২ মিলিয়ন ডলার (এল এফ রাস ব্রুক উইলিয়ম, ১৯৭৩ : ১৫২, ৫৩)

অতি প্রয়োজনীয় কিছু জিনিস পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে আমদানী ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হত। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে সিমেন্ট আমদানীর ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হতো। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানে আমদানীর ক্ষেত্রে সাবসিডি দেয়া হতো না। আন্তর্জাতিক বাজার থেকে অধিক দামে পূর্ব.পাকিস্তানের পণ্য বিক্রি করার সুযোগ দেয়া হত। যেমন পূর্ব পাকিস্তানের চা আন্তর্জাতিক বাজার থেকে ৭গুণ বেশী দামে পশ্চিম পাকিস্তানে বিক্রি হত। (অমৃতবাজার পত্রিকা, কোলকাতা ২৪ মে, ১৯৭৪)

একাত্তরে যুদ্ধকালীন সময়ে ইন্ডিয়ান ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এ্যাফেয়ার্সের চেয়ারম্যান আর পি কাপুর এর বক্তব্যে সবকিছু পরিস্কার হয়ে যায়। তিনি লিখেছেন– বাংলাদেশের ঘটমান পরিস্থিতির যৌক্তিক ব্যাখ্যা হিসাবে পূর্ব পাকিস্তানে পশ্চিম পাকিস্তানীদের শোষণের ধুয়া তোলা হয় সেটা সবৈব অন্যায় এবং পরিস্থিতির অতি সহজ এবং লঘু ব্যাখ্যা।' (আর পি কাপুর : ১৯৭১)

ওরা জানতো বিচ্ছিন্ন হলে কি ভয়ঙ্কর মূল্য দিতে হবে

একাত্তরের যুদ্ধকালীন সময়ে কোলকাতার স্টেটসম্যান পত্রিকার সম্পাদকীয়তে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক সম্ভাবনার উপর আলোকপাত করে ভবিষ্যৎবাণী করা হয় যে বাংলাদেশ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভায়াবল অর্থাৎ টেকসই হবে না। অন্যদিকে বৈরি ভারতের অর্থনীতিবিদরা পূর্ব পাকিস্তানকে অর্থনৈতিক দিক দিয়ে সমৃদ্ধ করার ব্যাপারে পাকিস্তানের অবদানকে স্বীকারই করেন না পাকিস্তান থেকে বাংলাদেশ বিচ্ছিন্ন হওয়ার মাসখানেক আগে পশ্চিম বাংলার সিনিয়র অর্থনীতিবিদ সতর্ক করে বলেন যে ১৯৭১ সালের আগেকার অবস্থানও মর্যাদা বাংলাদেশ অদুর ভবিষ্যতে অর্জন করতে সক্ষম হবে না এবং বাংলাদেশীদের উদ্দেশ্যে তিনি এই বলে উপদেশ দেন যে তাদের ও অনগ্রসতার সাথে মানিয়ে

www.pathagar.com

নেয়ার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। (বাংলাদেশ ইকনমি প্রবলেম এন্ড পার্সপেকটিভ) পাকিস্তানোত্তর এই বাংলাদেশে জাতি ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেকটি মানুষের ঘরে ঘরে অর্থনৈতিক হতাশা ও বিপর্যয় আসতে দেরী হয়নি।

একাত্তরে গৃহ যুদ্ধ চলাকালে বাংলাদেশের ক্ষতির পরিমাণ ছিল ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। কিন্তু বিচ্ছিন্ন হওয়ার প্রথম বছরেই বাংলাদেশ ২ বিলিয়ন মার্কিন ডলার অর্থনৈতিক সাহায্য পেয়েছিল। এতে বাংলাদেশের লাভ হয়েছিল ১ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। এটাই সবকিছু নয়। পাকিস্তানোত্তর বাংলাদেশ ২৩ বছরে পেয়েছে ৩০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এইড হিসাবে। অখণ্ড পাকিস্তান যে বৈদেশিক সাহায্য পেয়েছিল তার চার গুণ হল বাংলাদেশের এসব প্রাপ্ত বৈদেশিক মুদ্রা। তদুপরি তথাকথিত শোষণ এবং পশ্চিম পাকিস্তানে সম্পদ পাচারের অভিযোগের প্রশ্নতো আর নেই। তা সত্ত্বেও মুজিবের সোনার বাংলা আজ অবধি মরিচিকা হয়ে রয়েছে। বাংলাদেশের উন্নয়ণ প্রশাসন নিরীক্ষণ করে দিলাওয়ার বিশ্ববিদ্যালয়ের গণ প্রশাসনের অধ্যপক উইলিয়ম ডব্লিউ বয়ার উপসংহার টেনে লিখেছেন পাকিস্তান আমলে এদেশের মানুষ অর্থনৈতিক দিক দিয়ে অনেক ভাল অবস্থায় ছিল। (ইভিনিং জার্নাল দেলাওয়ার) এমনকি ৮০ দশকের শেষ দিকে মার্কিন রাষ্ট্রদূত উল্লেখ করেন যে বাংলাদেশের শিল্প উৎপাদন ৬০ এর দশকের পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প উৎপাদনের ৮৬ শতাংশের মত। (সি বাক্সটার এবং এস রহমান হিস্ট্রিকাল ডিকসনারী অব বাংলাদেশ ১৯৮৯ : ৬০-৬১) একাত্তরে সসস্ত্র সংঘাত শুরু হওয়ার কয়েক দিন আগে পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী কূটনৈতিক আনওয়ারুল করীম চোধুরী মার্কিন কূটনীতিককে কোলকাতায় বলেছিলেন যে বিশ্ববাজারের ক্রমহ্রাসমান পাটের চাহিদার প্রেক্ষিতে নিজস্ব অর্থনীতি নির্মানের সামর্থ্য বাংলাদেশের সামান্যই অবশিষ্ট থাকবে। এটা দুর্বল এবং অস্থিতিশীল হতে বাধ্য। (আরখান, দি আমেরিকান পেপারস সেকরেট এন্ড কনফিডেন্সিয়াল ইনডিয়া পাকিস্তান বাংলাদেশ ১৯৬৪-৭৩) আমেরিকার নিজস্ব মূল্যায়ন ও অনুরূপ। আমেরিকার পক্ষ থেকে বলা হয়েছে– 'কেমন করে রাষ্ট্রটি সময়ের দীর্ঘ পরিক্রমায় তার মৌলিক চাহিদা পূরণ করবে। বাহিরের বড় অঙ্কের সাহায্য প্রদান করে হলেও এর অর্থনীতির উন্নতি বিধান করা উচিত।'

যখন বিচ্ছিন্নতা অথবা তথাকথিত স্বাধীনতার উন্মাদনা চরমে সে সময় কোলকাতার একজন খ্যাতিমান চিকিৎসক জনৈক নেতৃপর্যায়ে বিচ্ছিন্নতাবাদীর

www.pathagar.com

চোখ খুলে দেন এই বলে যে বিভিন্ন উপলক্ষে আমি কয়েক বার পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বালাদেশ) সফর করেছি। সেখানকার মুসলিম মধ্যবিত্তের জীবন যাপনের মান দেখে আমি ইর্ষান্বিত হয়েছি। অনেক অধ্যাপক ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার সাংবাদিক, লেখক, শিল্পী এবং অফিসারদের গাড়ী বাড়ী মালিক হতে দেখে আমি হতবাক হয়েছি। তাদের অহরহ বিদেশ ভ্রমনের গল্প শুনে আমি ইর্ষা অনুভব করেছি। আপনি কি বলতে পারেন বাংলাদেশের মুসলমানরা তাদের উন্নত মানের সমৃদ্ধ জীবনের হাতছানি উপেক্ষা করে কেন স্বাধীনতা যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ল?

এর জবাব মিলেছে একজন বিচ্ছিন্নতাবাদী বুদ্ধিজীবির পক্ষ থেকে :

ভারতের পশ্চিম বাংলার সাথে তুলনা করা হলে দেখা যাবে আমরা পূর্ব বাংলার মধ্যবিত্তরা পাকিস্তান আমলে অনেক উন্নত ও বিলাস বহুল জীবন যাপন করেছি যখন আমরা মুজিব নগর (কোলকাতা) থেকে ফেরার পর এটা আমরা অনুভব করেছি।

করাচী লাহোর ইসলামাবাদের বড় বড় মানুষরা কোলকাতা সফরের অনুমতি দিত না ভারত বৈরিতার কারণে এই আশঙ্কায় যে পশ্চিম বাংলা সাংস্কৃতি আমাদের বিভ্রান্ত করবে। এই কারণে আমরা পশ্চিম বাংলার আমাদের আবস্থার তুলনা করতে পারিনি। অন্যদিকে তারা আমাদের ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, প্রফেসর, ছাত্র রাজনীতিবিদ ও অফিসারদের প্রায়ই পশ্চিম পাকিস্তান সফরের আয়োজন করতো পাকিস্তানের সংহতির নামে। পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্য বিত্তদের সাথে তুলনা করে আমরা নিজেদের অবহেলিত ও বঞ্চিত মনে করতাম। আমরা ছিলাম পাকিস্তানের জনসংখ্যার ৫৬ শতাংশ এই প্রেক্ষিতেই আমাদের অধিকাংশকে মুক্তি যুদ্ধে তাড়িত করেছে। (এম আর আখতার মুকুল, ১৯৮৪ : ১৬৮-৬৯)

নেতৃস্থানীয় আওয়ামী লীগ এমপি এবং শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত বন্ধু এম এ মুহাইমেন এর বক্তব্যও অনুরূপ তিনি বলেন– 'সীমান্ত পেরিয়ে আমরা পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যবিত্তবা উপলব্ধি করলাম আমাদের অর্থনীতি এবং জীবন যাপনের মান কত উন্নত। পশ্চিম বাংলার মধ্যবিত্তের তুলনায় আমরা কত সুখী ও সমৃদ্ধ। এমনকি সে সময় অধিকাংশ মধ্যবিত্ত পরিবারে টিভি এবং ফ্রিজ রয়েছে অথচ সীমান্তের ওপারে ৮০ শতাংশ মধ্য বিত্তের ঘরে এসব নেই। (দুই দশকের স্মৃতি, ১০৯)

www.pathagar.com

এটা সত্য নয় যে পূর্ব পাকিস্তানীদের পশ্চিম বাংলা ভ্রমনে বাধা ছিল। শুধুমাত্র ১৯৬৫ সালে পাক ভারত যুদ্ধের প্রেক্ষিতে জরুরী আইন বলবত থাকাকালীন সময় ছাড়া সবসময় পশ্চিম বাংলা অথবা ভারত সফরে বাধা ছিল না। কোলকাতার চিকিৎসকদের অবাধে ঢাকা সফরের উক্তিই পশ্চিম বাংলা সফরের ক্ষেত্রে পাকিস্তানের নিষেধাজ্ঞা সংক্রান্ত উক্তিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। বাস্তবতার নিরিখে বিছিন্নতাবাদী পঞ্চম বাহিনীর মোহভঙ্গ হলেও নিজেদের ভুল পদক্ষেপের পক্ষে যুক্তির অবতারণা করছে অন্যকে দোষারোপ করে। আমরা বিশ্বাস করি না যে এম আর আখতার মুকুল একাত্তরের আগে পশ্চিম বাংলায় পা রাখেননি। তিনি বহুবার পশ্চিম বাংলা সফর করেছেন। কিন্তু তার বোধদয় হয়নি। এক দুর্নিবার মোহ তার মত অসংখ্য বুদ্ধিজীবীকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে ভারতে। হতে পারে সেটা আবেগ জনিত কারণে অথবা প্রাপ্তি যোগের কারণে। যদি অর্থনৈতিক বৈষম্যের কারণে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অপরিহার্য হয়ে থাকে তাহলে পশ্চিম বাংলার ক্ষেত্রে সেটা আরো অপরিহার্য ছিল। ১৯৭২ সালে আনন্দ বাজার কেন্দ্রের বিরুদ্ধে পশ্চিম বাংলার মুখ্য মন্ত্রীর জ্যোতিবসুর অভিযোগ সম্বলিত এক সংবাদে বলা হয়েছে সেখানে থেকে কেন্দ্রে ৫০০ কোটি টাকা আয় করলেও দিল্লী পশ্চিম বাংলাকে ৫০ কোটি টাকা প্রদান করে। এমন অভিযোগ থাকা সত্ত্বেও কোলকাতার বুদ্ধিজীবি ও রাজনীতিকরা দিল্লী থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কথা স্বপ্নেও ভাবেনি কেন?

www.pathagar.com

একাদশ অধ্যায়

ভাষা আন্দোলন একটি পরিকল্পিত ষড়যন্ত্র

পঞ্চাশ দশকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যেটা ঘটেছিল সেটা হলো ৫২ সালের ভাষা আন্দোলন। সময়ের দাবীর প্রেক্ষিতে আন্দোলন, আইন-শৃংখলার অবনতি, প্রশাসনের সাথে সংঘাত, গুলী বর্ষণ, খুন জখম, আন্দোলনের সাফল্য অথবা ব্যর্থতা তৃতীয় বিশ্বের রাজনীতির চলমান ঘটনা প্রবাহ। কিন্তু ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য ঘটনা প্রবাহের মধ্য মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান রয়েছে। অন্য সব আন্দোলনের দাবী স্বীকৃত হলে প্রেক্ষিত গৌণ হয়ে পড়ে। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সেটা হয়নি। হিন্দু এবং বৃটিশ বেনিয়াচক্রের যৌথ ষড়যন্ত্র নস্যাৎ করে অনেক ত্যাগ তিতিক্ষার বিনিময়ে অর্জিত জাতিসত্তার বিভাজন হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে ভাষার দাবী স্বীকৃত হলেও ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক যে ঘুর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছিল সেটা ৫৪ সালে মুসলিম লীগ সরকারের পতন ঘটিয়েছিল। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করেছিল এবং প্রশাসনকে দুর্বল করেছিল। এর ধারাবাহিকতার মধ্যদিয়ে বৈরীতা তুঙ্গে উঠেছিল, গণ বিদ্রোহ সূচিত হয়েছিল, অসহিষ্ণুতার সূচনা হয়েছিল, উগ্র আঞ্চলিকতার বিকাশ হয়েছিল এবং জঙ্গী মনোভাব এবং অস্থিরতা বেড়ে গিয়েছিল। যা থেকে আজো জাতির নিষ্কৃতি মিলেনি। একারণে ভাষা আন্দোলন বৃটিশ পরবর্তী উপমহাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা।

উপমহাদেশে ভাষা নিয়ে বিরোধ ছিল, কিন্তু সেটা খুব পুরানো বলা যাবে না। শুরু হয়েছিল উনিশ শতকের শেষ পর্যায়ে, উর্দু, এবং হিন্দি নিয়ে বিরোধ। মুসলিম শাসনামলের রাষ্ট্রীয় কার্যক্রম পরিচালিত হত ফারসীর মাধ্যমে। বৃটিশরা তাদের সুবিধার জন্য ফারসীর বদলে ইংরেজীকে অফিস আদালতের মাধ্যম হিসাবে চালু করে। কিন্তু কোন সময়ই ভাষা নিয়ে বিরোধ হয়েছে এমনটি ইতিহাস বলে না।

১৯৩৭ সালের নির্বাচনোত্তর কংগ্রেস শাসিত প্রদেশসমূহের হিন্দুচেতনাকে সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর ওপর চাপিয়ে দেয়ার চেষ্টা নেয়া হয়। এই সাথে দেবনাগরী লিপির প্রচলন করা হয়। এটা করা হয় এ কারণে যে তারা উর্দুকে মুসলমানদের

www.pathagar.com

ভাষা হিসেবে মনে করত। কেননা উর্দূর স্বরলিপি আরবীর অনুরূপ। উর্দুতে আরবী শব্দ এবং পরিভাষায় প্রাচুর্য থাকায় বর্ণবাদী হিন্দুচক্র এটাকে মনে করতো মুসলমানী ভাষা। এরা ত্রিশ দশকের শেষার্ধে সীমিত ক্ষমতা পেয়েই উর্দূ লিপির ব্যবহার অচল করার লক্ষ্যে দেবনাগরী লিপির প্রচলন করে। তখন থেকেই ভাষা নিয়ে হিন্দু মুসলিম বিরোধের সূচনা হয়।

'ইংরেজ আমলে আমাদের দেশে ভাষা সমস্যা বলতে মনে করা হতো হিন্দি-উর্দূর সমস্যা। হিন্দুরা সমর্থন করতো হিন্দির দাবীকে। আর মুসলমানরা সমর্থন করতো উর্দূর দাবীকে। বিখ্যাত ভাষা তাত্ত্বিক সুনীতিকুমার চট্টপাধ্যায় তার বহুল পঠিত 'ভারতের ভাষা ও ভাষা সমস্যা' নামক পুস্তকে সমর্থন করেন হিন্দিকে ভবিষ্যতে স্বাধীন ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার। রবীন্দ্রনাথ সুনীতিকুমারের সঙ্গে এ বিষয়ে একমত ছিলেন। সুনীতিকুমার বাবুর বইটি প্রকাশিত হয় বিশ্বভারতী থেকে। পক্ষান্তরে মুসলমানরা সমর্থন করতে থাকেন উর্দূর দাবীকে। ১৯৩৭ সালে লক্ষ্ণৌ অধিবেসনে মুসলিম লীগ তার ১১নং প্রস্তাবে উর্দূর উপর গুরুত্ব আরোপ করে এবং এটাকে টিকিয়ে রাখার জন্য মুসলমানদের প্রতি আহ্বান জানান হয়। ১৯৩৮ সালে বাংলার বিখ্যাত মুসলিম নেতা একে ফজলুল হক, All India Muslim Educational Conference- এর সভাপতির ভাষণে বলেন, হিন্দি নয়, উর্দুকেই গ্রহণ করতে হবে ভারতের সাধারণ ভাষা বা লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা (Lingua Franca) হিসেবে। বাংলা যে, কোনো সময় কোনো দেশের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে, তা সে সময় কেউ কল্পনাই করতে পারেনি। (এবনে গোলাম সামাদ, দৈনিক ইনকিলাব ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮)

সর্বোপরি ১৯৪৭ সালে সাধারণ মত ছিল, হিন্দি ও উর্দূ হবে ভারত ও পাকিস্তানের সরকারী ভাষা। শুধুমাত্র মুসলিম জাতীয়তাবাদী নয় কমিউনিষ্টরাও এটাকে সেটেল্ড ফ্যাক্ট হিসাবে মনে করতো।

উপমহাদেশের মুসলমানদের দাবী ও আন্দোলনের কারণে ভারত খণ্ডিত হলে হিন্দি ও উর্দূর বিরোধ স্তিমিত আঙ্গিকে ভাষা সংক্রান্ত বিরোধের সূচনা হয়। এ প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের একজন সৈনিক অধ্যাপক আবদুল গফুর সাহেব লিখেছেন– 'একথা এখন নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, পার্টিশন না হলে, পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত না হলে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলা সম্ভব হতো না। লাহোর প্রস্তাব পূর্ণভাবে বাস্তাবায়িত হলে পূর্ব পাকিস্তান নামেই হোক, আর যে নামেই হোক উপমহাদেশের মুসলিম অধ্যুষিত পূর্বাঞ্চলে যে রাষ্ট্র গঠিত হত,

www.pathagar.com

বাংলাই হত সেই রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা এবং এ নিয়ে কোন দ্বন্দ্ব সৃষ্টির কোন অবকাশই আসত না। সাতচল্লিশের পার্টিশনের প্রাক্কালে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী, আবুল হাশিম, শরতচন্দ্র বসু প্রমুখের প্রস্তাবিত সার্বভৌম বৃহত্তর বাংলার রাষ্ট্রভাষা হত বাংলা। কোন আন্দোলনের প্রয়োজন পড়ত না। সাতচল্লিশে লাহোর প্রস্তাবের আংশিক বাস্তবায়ন হয়েছিল এবং পাস্তিানের মোট জনসংখ্যার মেজরিটির মাতৃভাষা বাংলা ছিল বলেই সেদিন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে বাংলার দাবী তোলা সম্ভব হয়েছিল। ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকলে সেখানে মেজরিটি জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষা বাংলা এ যুক্তিতে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবী তোলা যেত না। এমনকি রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত স্বাধীন (অখন্ড) ভারতের সরকারী ভাষা হিসেবে হিন্দির বাইরে ইংরেজি ছাড়া অন্য কোন ভাষার কথা চিন্তা করতে পারেননি এবং এ প্রশ্নে ডক্টর মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহর সঙ্গে তাঁর যে মতবিরোধ হয়েছিল তা অভিজ্ঞ ব্যক্তিমাত্রেরই জানা থাকার কথা। ভারতবর্ষ অখণ্ড থাকলে বরং হিন্দির বিপরীতে মুসলমানদের উর্দূকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীই অধিকতর হত। কারণ নিখিল ভারতীয় সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলে হিন্দুদের হিন্দির বিপরীতে মুসলমানরা উর্দূকেই তাদের নিজেদের ভাষা বিবেচনা করত। যারা উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে চেয়েছিলেন তারা বঙ্গদেশেরও বাংলাভাষার বৈশিষ্ট্যের কথা ভুলে অখন্ড ভারতীয় পরিবেশে হিন্দি উর্দূর দ্বন্দ্বকেই যে অধিক স্মরণে রেখেছিলেন, তা সুস্পষ্ট।

১৯৪৬ সালের দিল্লী সম্মেলনের আগ পর্যন্ত লাহোর প্রস্তাবকেই মনে করা হত পাকিস্তান আন্দোলনের মূলমন্ত্র। সেই হিসাবে চল্লিশের দশকে ঢাকার পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সংসদ ও কলিকাতার পূর্ব পাকিস্তান রেনেসাঁ সোসাইটিতে "পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা" হিসাবে বাংলার কথাই আলোচিত হত। ১৯৪৬ সালের সাধারণ নির্বাচনে পাকিস্তান দাবীর সপক্ষে জনগণের সুস্পষ্ট রায় ব্যক্ত হবার এবং দিল্লীর কনভেনশনে লাহোর প্রস্তাবের আংশিক সংশোধন করে উপমহাদেশের উত্তর পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলিম অধ্যুষিত এলাকায় একটি মাত্র (পাকিস্তান) রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হওয়ার পরই প্রস্তাবিত পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে কথাবার্তা ও লেখালেখি শুরু হয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার অনতিপূর্বে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর ডঃ জিয়াউদ্দিন উর্দূকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব দিলে তার প্রতিবাদ জানান ডক্টর মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ। (দৈনিক ইনকিলাব, ১১ মার্চ, ১৯৯৮)

www.pathagar.com

বিভিন্ন দিক থেকে ভিন্ন ভিন্ন দাবী উচ্চারিত হলেও নের্তৃত্বস্থানীয় ব্যক্তিত্ব সমূহের অধিকাংশ তা সে মুসলিম জাতীয়তাবাদী হোক কমিউনিষ্ট অথবা ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রী হোক তাদের প্রায় সকলে লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হিসাবে উর্দূ এর পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসনিক এবং গণ নির্দেশনার ভাষা বাংলার পক্ষে মতামত প্রকাশ করেন। (এ এন জিল ২০০০ : ১৩৫) এটাই ছিল মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের সুদূর প্রসারী বৃহত্তর অবস্থান। এ সত্ত্বেও একটি জিজ্ঞাসা প্রকট হয়ে উঠে, ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে বাংলা ভাষাকে প্রাদেশিক ভাষা ঘোষণার পরও কেন আন্দোলন? এই প্রশ্নের আলোকে আর এক জিজ্ঞাসা এসে যায় আঞ্চলিকতার বিষ বাষ্প থেকে এবং পঞ্চম বাহিনীর অপতৎপরতা এবং তাদের ক্রীড়নক হওয়া থেকে সতর্ক থাকার ব্যাপারে কায়দে আযমের মুখে মুহুর্মুহু সতর্কবাণী উচ্চারিত হচ্ছিল কেন? এটা কি শুধুমাত্র রাজনৈতিক চাপাবাজি?

না, অর্থহীন রাজনৈতিক চাপাবাজির ইতিহাস জিন্নাহ জীবনে কখনই ছিল না। বর্ণবাদী হিন্দুদের নিছিদ্র ষড়যন্ত্রের বেড়া ভেঙে এবং অখণ্ড ভারত ভেঙে যে মহামানুষ মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র আবাস ভূমি পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছিলেন একমাত্র তার পক্ষেই জানা সম্ভব সমকালীন ষড়যন্ত্রের গভীরতা। সময়ের প্রেক্ষিতে বর্ণবাদী হিন্দু নেতৃত্ব বাংলাকে পাকিস্তানের একটি অংশ হিসাবে মেনে নেয় এই আশায় যে পূর্ববাংলাকে এক সময় গ্রাস করা সম্ভব হবে। অথবা পূর্বপাকিস্তানীরা নিজস্ব যন্ত্রনায় ভারতের সাথে স্বেচ্ছায় একীভূত হতে চাইবে। এ কারণে তারা পূর্বপাকিস্তানীদের জন্য যন্ত্রনাকর পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে থাকে প্রথম থেকেই। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই কতিপয় বুদ্ধিজীবীকে কিনে ফেলে ওরা। দীর্ঘদিনের বুদ্ধিবৃত্তিক অভিজ্ঞতা দিয়ে লাঙ্গলের পেছন থেকে আসা হালে গজিয়ে ওঠা বুদ্ধিজীবীদের প্রভাবিত করে অতি সহজে। পূর্ব বাংলায় আগ্রাসন পরিকল্পনা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ইন্ডিয়ান ইন্টালিজেন্স ব্যুরোর প্রধান হিসেবে অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া হয় একজন বাঙালী বর্ণবাদী এন মল্লিককে। তিনি প্রধান মন্ত্রী মতিলাল নেহেরুর সাথে প্রত্যক্ষ যোগাযোগ রাখতেন। (দি সানডে কোলকাতা ১১৮-২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৮৮) তদুপরি বিশেষ পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য ১৯৪৯ সালে কোলকাতায় সন্নিকটে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞজনদের একটি সেল সংগঠিত করা হয় ত্রিগুণা সেনের নেতৃত্বে। একই অবস্থান থেকে পূর্ব ও পশ্চিম বাংলা সম্প্রীতি সমিতি গঠন করা হয় অজিত রায়ের নেতৃত্বে এবং তাদের পত্রিকা এপার বাংলা ওপার বাংলা প্রকাশ করা হয়। একাত্তরের পরে একই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক এবং এপার বাংলা ওপর বাংলার কো এডিটর ১৯৭১

www.pathagar.com

এর পরে লিখেছেন– 'অজিত রায় এক সময় নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসুর নির্দেশনায় ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য জাপান ও দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার দেশসমূহে কাজ করেছেন পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের স্বাধীনতার জন্য সর্বাত্মকভাবে আত্ম নিয়োগ করেন। বাংলাদেশে তার রাজনৈতিক স্বার্থ ছিল। বাংলাদেশের রাজনীতিতে তার নীরব ও সক্রিয় ভূমিকা অনেকেরই অজানা। (জিপি ভট্টাচার্য, ১৯৭৩)

পৃথিবীর মানচিত্রে পাকিস্তান দৃশ্যমান হওয়ার আগেই অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার স্বপ্নাবিষ্ট বর্ণ হিন্দুরা সক্রিয় হয়ে ওঠে। সম্ভাব্য টার্গেট সামনে রেখে পূর্ব পাকিস্তানের কিছু কিছু তরুণকে হরেক রকম আশা ও আশ্বাস দিয়ে অখণ্ড ভারতের সপক্ষে প্রভাবিত করে।

১৯৪৭ সালে ১৪ই আগস্ট পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার দুই সপ্তাহ আগে কতিপয় তরুণ গণ আজাদী লীগ গঠন করেন। এদের মধ্যে ছিলেন কামরুদ্দিন আহমদ মোহম্মদ তোহা, ওলী আহাদ এবং তাজুদ্দিন আহম্মদ। এরা পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন করার ব্যাপারে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছেন একাত্তর পর্যন্ত। এখন প্রশ্ন এসে যায় সুদীর্ঘ ১৯০ বছর পরাধীনতার পর স্বাধীনতায় উত্তরণের ক্রান্তিকালে কোন্ অশুভ শক্তির ইশারায় পূর্ব পাকিস্তানের মাটিকে উত্তপ্ত করার লক্ষ্যে তারা একটি রাজনৈতিক দল গঠনের জন্য সক্রিয় হল। দলের মেনিফ্যোষ্টোতে বলা হয়েছে পাকিস্তানের বাঙালীদের অর্থনৈতিক স্বাধীনতাই তাদের লক্ষ্য। এদের কি বলা যাবে, হয় তারা নির্বোধ অথবা কোন অপশক্তির দালাল এরা। নির্বোধ বলা হচ্ছে এই কারণে যে সদ্য মুক্ত দেশ পাকিস্তানের প্রশাসন চালানোর মত লোকবল অর্থবল কিছুই ছিল না, মুসলিম বিশ্বের সহানুভূতিশীলদের অর্থ সাহায্যে সরকারী কর্মচারীদের বেতন ভাতা দিতে হত, এমতাবস্থায় তাদের আবার অর্থনৈতিক মাথা ব্যাথা শুরু হল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার আগেই। কি বিচিত্র! অশুভ শক্তির দালাল বলা হল এই কারণে যারা পাকিস্তানকে সহ্য করতে পারেনি, যারা পাকিস্তানের ন্যায্য পাওনা থেকে বঞ্চিত করেছে এই উদ্দেশ্যে যে পূর্ব পাকিস্তান যেন নিজস্ব যন্ত্রনায় ভারতের সাথে একীভূত হতে চাই। তাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য যদি কেউ সক্রিয় হয় তাকে দালাল ও পশ্চম বাহিনী ছাড়া কি বলা যাবে! এদের পরবর্তী কর্মকাণ্ড এটাই প্রমাণ করেছে এই অপশক্তির ক্রীড়নকরা ভাষা বাংলার দাবীর জন্য স্বোচ্চার হয়েছিল।

www.pathagar.com

পাস্তিানের বয়স যখন ২ সপ্তাহ তখন ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের পদার্থ বিদ্যার প্রভাষক গণ আজাদী লীগের অন্যতম সদস্য আবুল কাশেম তমুদ্দুন মজলিস গঠন করেন। যদিও এর উদ্দেশ্য লক্ষ্য ছিল ইসলামী সমাজ ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত করা এবং এই সাথে এদের তাৎক্ষণিক লক্ষ্য ছিল রাষ্ট্র ভাষা বাংলার দাবী আদায় করা। শামসুল আলম, একে এম আহসান এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম তমুদ্দুন মজলিসকে দিক নির্দেশনা দেয়। কিন্তু এরা মজলিসের কর্মকান্ডে জড়িত ছিলেন না। কিন্তু ধর্মনিরপেক্ষ জাতীয়তাবাদী কামরুদ্দিন এবং কমিউনিষ্ট তোহা মজলিসের সাথে জড়িত ছিলেন। আবুল কাশেম মজলিস প্রতিষ্ঠার ১৫ দিনের মধ্যে একটি পুস্তক প্রকাশ করেন বাংলা ও উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা দাবী করে। একটি হিন্দু প্রেস পুস্তকটি ছাপিয়ে দেয়। একজন হিন্দু ম্যাজেসিয়ান পিসি সরকার তহবিল সংগ্রহ করে দেন। এই পুস্তিকার জন্য চাঁদা প্রদান করে আবুল মনসুর আহমদ এবং ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। ডক্টর শহীদুল্লাহ ডক্টর এমামূল সহ অন্যান্য প্রায় সব বুদ্ধিজীবী দুরদর্শী ভাবনা পরিত্যাগ করে হালকা হাওয়ায় ভাসতে থাকেন। আসলে উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতি এবং বর্ণবাদী হিন্দুদের গভীর চক্রান্ত আঁচ করার মেধা সম্ভবত এদের কারো ছিল না। বাংলা ভাষার পক্ষে সংসদে সোচ্চার কণ্ঠ শোনা যায় ধীরেন্দ্র নাথ দত্ত সহ অন্যান্য সংগ্রেস নেতৃবৃন্দের। মুসলিম সাংসদরা ছিলেন নির্বাক দর্শক। তারা স্বাধীনতার প্রথম প্রভাতে অনাহুত সমস্যার উটকো যন্ত্রনায় বিব্রত বোধ করছিলেন। হিন্দু সাংসদরা যা করছিলেন সেটা ছিল দ্বিজাতি তত্বকে অকার্যকর করা এবং অখণ্ড বর্ণ হিন্দুদের অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর প্রথম সোপান হিসাবে ব্যবহার করতে। কোন এক বর্ণবাদী বাঙালী বুদ্ধিজীবি কথা প্রসঙ্গে বলেছেন, What Bangali thinks to day all India tninks tomorrow' এখানে বাঙালী বলতে বুঝানো হয়েছে পশ্চিম বঙ্গের উচ্চ বর্ণের হিন্দুদের। যারা আমাদের চেয়ে দেড়শত বছর আগে শিক্ষা এবং জ্ঞানের জগতে প্রবেশ করেছে। আমাদের যাত্রা শুরু হয়েছে তাদের চেয়ে দের শত বছর পর। তাদের মেধা তাদের জ্ঞান চর্চা, তাদের উপলব্ধি তাদের বোধ শক্তি ও চেতনা আমাদের চেয়ে সন্দেহাতীত ভাবে অগ্রসর হবে এটাই স্বাভাবিক। তারা শুধু বাংলার মুসলমানদের চেয়ে অগ্রসর ছিলেন তা নয়। দলমত নির্বিশেষে সমগ্র ভারতের মধ্যে অগ্রসর ছিলেন সামাজিক, রাজনৈতিক, শিক্ষা ও সংস্কৃতিক সব ক্ষেত্রে। এ সত্ত্বেও তারা অকপটে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মেনে নিয়েছেন কোন রকম বাদ প্রতিবাদ না করে। অথচ তারাই পুর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের ইন্ধন যুগিয়েছে

www.pathagar.com

অর্থ ও কৌশল সরবরাহ করেছে। আর আমাদের লাঙ্গলের পেছনে থেকে আসা সদ্য শিক্ষাপ্রাপ্ত তরুনদের মন মস্তিস্কে গরল ঢেলে আত্ম হননের দিকে টেনে নিয়ে গেছে। অন্যদিকে আমাদের অগ্রজ অপরিনামদর্শী বুড়োরা হয় নীরব দর্শকের ভূমিকা নিয়ে গেছে অথবা বুদ্ধি পরামর্শ এবং পৃষ্ঠপোষকতা দান করে পূর্ব বাংলার তরুণদের অপ্রতিরোধ্য আত্মঘাতী করে তুলেছে।

ওরা এখানকার দেশ প্রেম নয় ভাষা প্রেমের রাজনৈতিক উন্মদনায় উদ্দীপ্ত করেছে বৃহত্তর লক্ষ্য অর্জনের জন্য। ভাষা কেন্দ্রিক আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ২শ বছরের বঞ্চনার ধকল কাটিয়ে ওঠার আগেই আর এক শোষণ বঞ্চনার কৃত্রিম আবহ সৃষ্টি করে ওরা সম্ভাবনাময় তরুনদের মারমুখো মরিয়া করে তোলার নীল নক্সা বাস্ত বায়নে অনেকটা অগ্রসর হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে । কংগ্রেস নেতৃত্বের দাবী হল ধর্ম নিরপেক্ষ গণতন্ত্রী গণ প্রজাতন্ত্র এবং কমিউনিষ্টরা চেয়েছে ইউনাইটেড ষ্টেট অব সোসালিষ্ট রিপাবলিক। যদিও বাহ্যিক দিক দিয়ে দুটো পরিভাষার মধ্যে বিশাল পার্থক্য অনুভূত হবে। কিন্তু পাকিস্তানের ইসলামী পরিচিতি এবং মুসলমানদের আশা আকাঙ্খা কেড়ে নেয়ার উদ্দেশ্যে প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের নামে কেন্দ্রকে দুর্বল করার ব্যাপারে কংগ্রেস ও কমিউনিষ্ট পার্টি ছিল ঐক্যবদ্ধ। দুই সংগঠনেরই অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক উৎস ছিল কোলকাতা। কমিউনিষ্ট পার্টির মুসলিম সদস্যরা তখনও, সম্ভবত এখনও জানেন না যে উপমহাদেশের কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ছিলেন বর্ণবাদী হিন্দুরা। এদের সাম্যবাদী শ্লোগান ও উম্মাদনা থাকলেও কংগ্রেসের মত আধিপত্যবাদী লক্ষ্য রয়েছে তাদের মুখোশের অন্তরালে। যেহেতু কোলকাতা থেকে চালিত হত কমিউনিষ্ট পার্টি, কংগ্রেস এ কারণে উভয় শক্তিই বিঘুর্নিত হয়েছে একই লক্ষ্য কেন্দ্র করে। সেই লক্ষ্য আর কিছু নয় অখন্ড ভারতের পুনঃপ্রতিষ্ঠা, দ্বিজাতি তত্ত্ব এবং এর অর্জিত সবকিছুকে ধ্বংস করা। একারণে তারা ভাষাভিত্তিক ঐক্য যে কোন মূল্যে টিকিয়ে রাখতে চাইল। কিন্তু সরকারের ইতিবাচক পদক্ষেপের ফলে ভাষা আন্দোলন অনেকটা স্তিমিত হয়ে এল। দীর্ঘ আলাপ আলোচনা এবং বাদ প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে একটি রেজাল্ট বেরিয়ে এল পূর্ব পাকিস্তানের আইন প্রশাসনের মাধ্যম হবে বাংলা। কিন্তু পাকিস্তানের লিঙ্গুয়া ফ্রাঙ্কা হবে উর্দু।

এসত্বেও তমুদ্দুন মজলিস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে এক প্রতিবাদ সভায় প্রকাশ্যে সরকারকে দোষারোপ করল। ক্ষমতাসীন পার্টি মুসলিম লীগের প্রাদেশিক সভাপতি হিসাবে মাওলানা আকরাম খান একটি বিবৃতি দিয়ে এবং

www.pathagar.com

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে ভাষণ দিয়ে বললেন পূর্ব পাকিস্তানে বাংলাকে উৎখাত করে উর্দু চাপিয়ে দেয়ার কোন প্রশ্নই নেই। বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষা। ওদিকে মজলিস নতুন ছাত্র সংগঠন ছাত্র লীগ, ছাত্র ফেভারেশন এবং গণতান্ত্রিক যুগ লীগকে নিয়ে ভাষা কমিটি নতুন করে সংগঠিত করল। এ সময় পূর্ব পাকিস্তান জমিয়তে ওলামায়ে ইসলাম রাষ্ট্র ভাষা উর্দুর দাবীতে তাদের নিরন্তর প্রয়াস অব্যাহত রাখে। উর্দুর দাবীতে তারা সিগনেচার ক্যাম্পেইন শুরু করে। ইতিমধ্যে সেক্রেটারিয়েটের কেরানীদের মধ্যে বাংলা ও উর্দুর সমর্থকদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়। ১৯৪৮ সালের প্রথম দিকে কমিউনিষ্ট পার্টি পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষা ও প্রশাসনের ভাষা হিসাবে বাংলাকে মেনে নিয়ে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষার দাবী পরিহার করে এবং সেটা জনগণের সিদ্ধান্তের উপর ছেড়ে দেয়। (তোহা ১৯৮১)। গণ আজাদী লীগও অনুরূপ সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৮ সালে ২৭ ফেব্রুয়ারী তমুদ্দুন মজলিস মুসিলম ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের সমন্বয়ে বর্ধিত কলেবরে সংগ্রাম কমিটি পুনর্গঠিত হল। ১১ মার্চ প্রতিবাদ দিবস সফলভাবে পালিত হল। হরতাল ও বিক্ষোভ প্রদর্শিত হল। মিছিলে পুলিশের হামলা হল। গ্রেপ্তার হলেন অনেকে। কিন্তু বিক্ষোভ থামল না। ১৪ই মার্চ পর্যন্ত বিক্ষোভ অব্যাহত রইল। ১৫ মার্চ রাষ্ট্রভাষা সংক্রান্ত চুক্তি স্বাক্ষরিত হল। ১৯ মার্চ কায়দে আযম ঢাকায় এলেন।

এ সময় সব চেয়ে বেশী দায়িত্বহীনতার পরিচয় দিলেন লঘুচেতা শেরে বাংলা একে ফজলুল হক তার অতীত কর্মকান্ড থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে। তিনি তখন এডভোকেট জেনারেল হিসাবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ১১ মার্চের বিক্ষোভ মিছিলে আকস্মিকভাবে যোগ দিলেন তার বার্ধক্য সত্ত্বেও। তিনি ১৯৩৯ সালে কোলকাতা নিখিল ভারত মুসলিম কনফারেন্সে উর্দূর উপর গুরুত্বারোপ করেন। এমনকি তিনি আরবী বর্ণমালায় বাংলা লেখার পক্ষপাতি ছিলেন। ১৯৪৭ সালের ৫ ডিসেম্বর পূর্ব বাংলা মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভায় পরিষ্কার করে দেয়া হয় বাংলা হবে প্রদেশের শিক্ষা নির্দেশনা ও প্রশাসনের ভাষা। এর কয়েক মাস পর কায়দে আযম ২১ মার্চ ঢাকায় এক ভাষণে বললেন– Whether Bengali shall be the state language of this province is a matter for the elected representative of the people of this province to decide... let me tell you in the clearest language that there is no truth that your normal life is going to touched or disturbed as for your Bengali language is concern.'

www.pathagar.com

জিন্নাহর দ্ব্যর্থহীন বক্তব্যের স্বল্প সময়ের ব্যবধানে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক পরিষদ আনুষ্ঠানিকভাবে বাংলাকে পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে অনুমোদন করে।

অদুরদর্শী তারুণ্যের আবেগজনিত কর্মকাণ্ডকে যৌক্তিকতার প্রলেপ দিয়ে আজকের প্রবীণ নেতা জনাব অলি আহাদ লিখেছেন– 'স্বাধীনতার পর কায়দে আযম প্রথম পূর্ববঙ্গ সফর উপলক্ষ্যে ১৯ মার্চ ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করিলে তাহাকে অশ্রুত ও স্বতস্ফূর্ত ঐতিহাসিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ঢাকা বিমান বন্দর হইতে রেসকোর্স পর্যন্ত লোকে লোকারণ্য ছিল। তিল ধারণের স্থান কোথাও ছিল না। হর্ষোৎফুল্ল জনতার এই ঢল দেখিয়া কে বলিবে, মাত্র দুই দিন পূর্বে ও ঢাকা শহরে সরকার বিরোধী আন্দোলনের উত্তাল তরঙ্গ ঢাকার কর্তাব্যক্তিদের মসনদকে টলটলায়মান করিয়া তুলিয়াছিল। দেশবাসীর কি অকৃত্রিম ভালবাসাই না ছিল রাষ্ট্রের জনকের প্রতি। অতি পরিতাপের বিষয় কায়দে আযম ২১শে মার্চ রেসকোর্সে অনুষ্ঠিত জন সমাবেশে ভাষণ দানকালে দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ঘোষনা করিলেন, যে, উর্দূই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হইবে এবং ভাষা আন্দোলন বিদেশী চক্রান্ত বিশেষ।

কায়দে আযমের আমন্ত্রণে ২৪শ মার্চ সর্বজনাব শামসুল হক, নইমুদ্দিন আহমদ, আজিজ আহমদ, কামরুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, তাজুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, অধ্যাপক আবুল কাশেম, মোঃ তোয়াহা এবং আমি রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ হইতে তাহার সহিত পূর্ববঙ্গ সরকারের চীফ সেক্রেটারী আজিজ আহমদের বাসভনে (পরবর্তী মিন্টু রোডস্থ গণভবন) এক বৈঠকে মিলিত হই। পরস্পরের শুভেচ্ছা বিনিময়ের পর কায়দে আযমের সহিত আলাপ আলোচনা শুরু হয়। আলোচনার প্রারম্ভে কায়দে আযম মন্তব্য করেন যে, একাধিক রাষ্ট্রভাষা রাষ্ট্রের সংহতির পক্ষে ক্ষতিকর। ইহার জবাবে কমরুদ্দিন আহমদ বলেন যে, সুইজারল্যান্ড ও কানাডায় একাধিক রাষ্ট্রভাষা জাতীয় সংহতি বৃদ্ধি করিয়াছে।

কায়দে আযম তদুত্তরে অসহিষ্ণু স্বরে বলেন যে, তাহাকে ইতিহাস শিখাইতে হইবে না, তিনি ইতিহাস জানেন। অবচেতনভাবে আমি প্রতিউত্তরে বলিয়া ফেলিলাম যে, ইতিহাস নিশ্চয় আপনি জানেন, তবে রাষ্ট্রভাষা বিষয়ে ঐতিহাসিক সত্যকে অস্বীকার করছেন। অতঃপর কায়দে আযম ধীরস্থির শান্ত কণ্ঠে পাকিস্তান সংগ্রামের ইতিবৃত্ত চুম্বুক ভাষায় বিবৃত করিয়া আবেগের মুহূর্তে আমাদের

www.pathagar.com

ইংরেজিতে বলিলেন– In the interest of integrity of Pakistan, if necessary you will have to change your mother tounge অর্থাৎ পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে প্রয়োজনবোধে তোমাদিগকে মাতৃভাষা পরিবর্তন করিতে হইবে।'

অতি সম্প্রতি (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ মার্চ, ১৯৯৮) এক সাক্ষাৎকারে জনাব অলি আহাদ বলেছেন– 'কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ছিলেন সত্যবাদী স্পষ্টভাষী। ধোকা কাকে বলে তিনি জানতেন না। গান্ধীজি, পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরুসহ ভারতের নামকরা প্রায় সব রাজনীতিবিদদেরই জীবন পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে তারা ছিলেন প্রতারক। কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ সমগ্র অখন্ড ভারতের কোন প্রসঙ্গে যার মধ্যে দোদুল্যমানতা ছিল না। ছিল সত্যবাদিতা, স্পষ্টবাদিতা। আমরা তার নেতৃত্বে কাজ করছি। কিন্তু পরবর্তী কালে সে মানের নেতৃত্ব আমরা পাইনি।'

আর এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন– 'একমাত্র কায়দে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর অনুসারী আমি।' (দৈনিক ইনকিলাব, ৪ মার্চ, ১৯৯৮)

পূর্ব পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে বাংলাকে অনুমোদন দানের পর পরিস্থিতি বলতে গেলে নিয়ন্ত্রণে চলে আসে। ১৯৫২ সাল পর্যন্ত বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠার দাবী কিছু সংখ্যক ছাত্র এবং বুদ্ধিজীবীর সীমিত পরিসরে বিঘুর্ণিত হতে থাকে। কংগ্রেস এবং কমিউনিষ্ট পার্টির রাজনৈতিক অঙ্গনে এ সংক্রান্ত আলাপ আলোচনা অব্যহত থাকলেও এর অবস্থান শক্তি সঞ্চার করতে পারেনি। ভাবাবেগ জোরদার হয়ে উঠে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারী কমিউনিষ্টদের উদ্যোগে আহুত ছাত্রদের বিক্ষোভ মিছিলে পুলিশের গুলিতে তিন জনের মৃত্যুর পর। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র আবুল বরকত ছিলেন। এই ঘটনা সংঘটিত হয় জিন্নাহ এবং লিয়াকত আলীখানের মৃত্যুর পর। তখন থেকে স্বার্থবাদী রাজনীতির ধারা শুরু হয়। শুরু হয় ক্ষমতার দ্বন্দ্ব। মুসলিম লীগের গতিশীলতা ক্রমশ ক্ষীয়মান হতে থাকে। মুসলিম লীগের সম্প্রসারন ও সদস্য সংগ্রহ সীমাবদ্ধ করা হয়। তাদের ছাত্র ফ্রন্টের তৎপরতা বন্ধ হয়ে যায়। উপনির্বাচনে মুসলিম লীগের নিদারুন পরাজয় সাধারণ মানুষকে স্তম্বিত করে দেয়। এসবের মধ্য দিয়ে মুসলিম লীগ গণবিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে।

কংগ্রেস কমিউনিষ্ট পার্টি এবং নব গঠিত সেকুলার দল আওয়ামী মুসলিম লীগ কেন্দ্রকে দুর্বল করার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। মিথ্যাচার গুজব অপপ্রচার গণমনে

www.pathagar.com

স্থান পেতে থাকে। এর পেছনে কারণ ছিল একটি, সেটা হল সংবাপত্র ও পত্র পত্রিকা সবগুলো ছিল কমিউনিষ্ট অথবা সেকুলারিষ্টদের দখলে। পাকিস্তান বিরোধী প্রচারনা ষড়যন্ত্র ও তৎপরতা চলাকালীন সময়ে পাকিস্তানের প্রধান মন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন বক্তব্য দিয়ে পরিস্থিতিকে ঘোলাটে করে ফেললেন। ১৯৫২ সালের ২৭ জানুয়ারী ঢাকায় সফরে এলে তিনি বলেন জাতীয় পরিষদের মূল নীতি নির্ধারক কমিটি পাকিস্তানের সরকারী ভাষা হিসাবে উর্দূকে অনুমোদন দিয়েছে।

এই ঘোষণার প্রতিবাদে ছাত্ররা অনেক বিক্ষোভমিছিল ও সমাবেশ করে। একটি সভার সভাপতিত্ব করেন আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রেসিডেন্ট আব্দুল হামিদ খান ভাসানী। তিনি এর আগে বাংলাভাষা আন্দোলনের জন্য অঙ্গীকারবদ্ধ হয়েছিলেন। একটি সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটি গঠিত হল। এই কমিটি ২১ ফেব্রুয়ারী সাধারণ ধর্মঘট পালনের ডাক দিল এই দিন প্রাদেশিক পরিষদের অধিবেসন হওয়ার কথা। সরকার ২১ ফেব্রুয়ারী সভা সমাবেশ নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। ২০ ফেব্রুয়ারী আব্দুল হামিদ খান ভাসানীর অবর্তমানে আবুল হাশিম-এর সভাপতিত্বে সংগ্রাম কমিটির সভা হল। এতে আইনের প্রতি আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য ২১ ফেব্রুয়ারীর পরিবর্তে ২২ ফেব্রয়ারী বিক্ষোভ সমাবেশের সিদ্ধান্ত নেয়া হল। কিন্তু ২০ মার্চ রাত্রিতে যুব লীগের নেতারা তাদের কমিউনিষ্ট গুরুদের প্ররোচনায় সংগ্রাম কমিটির সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য করার সিদ্ধান্ত নিল এবং বিক্ষোভ মিছিল নিয়ে অগ্রসর হল এবং খুন জখমের মধ্য দিয়ে মিছিলের সমাপ্তি হল। কংগ্রেস সদস্যরা সরকারকে দোষারোপ করে পরিষদ কক্ষ ত্যাগ করলেন। বেশ কিছু মুসলিম সদস্য তাদের অনুসরণ করলেন। দৈনিক আজাদের সম্পাদক মুসলিম লীগ থেকে পদত্যাগ করলেন এবং দৈনিকটিও সরকার বিরোধী অবস্থান নিল। যদিও আজাদের মালিক তখন ও মুসলিম লীগের প্রাদেশিক প্রেসিডেন্ট হিসাবে দায়িত্ব পালন অব্যাহত রাখলেন। পরদিন ২২ ফেব্রুয়ারী মুসলিম লীগ সমর্থিত দৈনিক মর্নিং নিউজ এবং সংবাদের কার্যালয় আক্রমন করে পুড়িয়ে দেয়া হল। যেখানে পুলিশের গুলি বর্ষণ করা হয়েছিল সেখানে শহীদ মিনার গজিয়ে উঠল। সরকার উদ্যোক্তাদের অনেককে গ্রেপ্তার করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনল এবং হাইকোর্টের একজন ইংরেজ বিচারকের উপর বিচার বিভাগীয় তদন্তের দায়িত্ব অর্পন করা হল। ইতিমধ্যে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্র ভাষা হিসাবে স্বীকৃতির ঘোষণা দিলেন। (ডন করাচী, ২৩ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২)

www.pathagar.com

এক মাস পর মুখ্য মন্ত্রী নুরুল আমিন প্রাদেশিক পরিষদে কমিউনিষ্ট এবং ভারতীয় এজেন্টের রাজনীতির ছদ্মাবরণে ধ্বংসাত্মক কাজে লিপ্ত থাকার অভিযোগ তুলে তৎকালীন পরিস্থিতির বিস্তৃত বিবরণ দেন। তিনি বলেন সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে ব্যাপক পরিমাণ ধ্বংসাত্মক প্রচার পত্র উদ্ধার করা হয়। নারায়ণগঞ্জের মিছিলে জয়হিন্দ এবং যুক্ত বাংলা চাই শ্লোগান দেয়া হয়। নব গঠিত আওয়ামী লীগের নেতা এবং এম এল এ এবং জনৈক মারোয়ারীর সাথে সম্পৃক্ত পাট ব্যবসায়ী ওসমান আলীর বাসগৃহ থেকে ধ্বংসাত্মক লিফলেট উদ্ধার করা হয় এবং একই অবস্থান থেকে ভারতীয় হিন্দু যুবকদের গ্রেফতার করা হয়। একই ধরনের গ্রেফতার হয় চট্টগ্রাম রাজশাহী এবং আরো কিছু স্থানে। (বি আল হেলাল ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ৪৪৯-৫০)। ছাত্র লীগের নেতৃবৃন্দ যারা বিক্ষোভে অংশ নিত তারা প্রতিদিন বুলেটিন প্রকাশ করত। বুলেটিনের হেড লাইন ছিল এ ধরনের যেমন– পূর্ব বঙ্গে রক্তাক্ত বিপ্লবের প্রথম পদক্ষেপ, পূর্ব বঙ্গ কমিউনিষ্ট পার্টির নেতৃত্বে ভাষা আন্দোলনের ব্যাপক অগ্রগতি ইত্যাদি। (এম, এ মোহাইমেন, ১৯৮৬ : ২১)।

কোলকাতার কমিউনিষ্ট পার্টির মূখপাত্র নিয়মিত এ সংক্রান্ত রিপোর্ট প্রকাশ করতো এবং তাদের এক সম্পদকীয়তে জেলা এবং কেন্দ্রীয় পর্যায়ে কমিউনিষ্টদের দিক নির্দেশনার দাবী করা হয়। (স্বাধীনতা, কলিকাতা, ১০ এবং ১১ মার্চ ১৯৫২) তমদ্দুন মজলিসের মুখপাত্র সৈনিকটি একথা স্বীকার করে যে রাজনৈতিক সুযোগ সন্ধানী এবং পাকিস্তান বিরোধী চক্র ভাষা আন্দোলনকে তাদের স্বার্থে ব্যবহার করেছে। (ঢাকা, ২৬ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫২)। সমকালীন চীফ সেক্রেটারী প্রায় দু'দশক পর স্বীকার করেন যে গোয়েন্দা পুলিশের রিপোর্টে বলা হয়েছিল বেশ কিছু ভারতীয় অনুপ্রবেশ করেছে এবং কমিউনিষ্টরা অত্যন্ত তৎপর। (এ এন্ড এ দীল ২০০০: ১৮৩) অর্থপূর্ণ কারণে ২১ ফেব্রুয়ারী গুলিবর্ষণকারী পুলিশ অফিসারদের চিহ্নিত করার ব্যাপারে সহায়তা করার পরিবর্তে নেতৃস্থানীয় আন্দোলনকারীদের অধিকাংশ এলিস কমিশন থেকে দূরে অবস্থান করে। জাষ্টিস এলিস বলেন আন্দোলনকারী নেতৃবৃন্দ সকলে সহযোগীতা করলে তদন্ত যথাযথ হতে পারত। (এ ওহাব, বি ওমর ১৯৮৫ : ১৬৬-৭০) জাতীয় প্রফেসর আব্দুর রাজ্জাক অবশেষে আলোড়ন সৃষ্টিকারী তথ্য প্রকাশ করেন। সেটা হল ২১ ফেব্রুয়ারী যার মৃত্যুর কারণে সংকটের সূচনা হয়েছে সেই আবুল বরকত পুলিশের ইনফরমার ছিল। পুলিশের উপর প্রবল আক্রমণের সময় তার মৃত্যু হয়। (বিচিত্রা ঈদ সংখ্যা ১৯৮৮)

www.pathagar.com

দীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা এবং সময়ের বাস্তবতার মধ্য দিয়ে অনেকেই কায়দে আযমকে নতুন করে উপলব্ধি করছে। ১৯৪৮ সালে ভাষায় প্রশ্নে জনাব অলি আহাদ এবং আরো অনেকেই কায়দে আযমকে বিব্রত করেছিলেন। উপমহাদেশের সামগ্রিক পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কোনটা সঠিক ছিল এখনো সেটা নিরূপিত না হলেও আগামী দিনের ইতিহাস নিরূপণ করবে। কায়দে আযম এ কারনেই অসহযোগ আন্দোলন এবং খিলাফত আন্দোলনকে সমর্থন দেননি। সময় বলে দিয়েছে জিন্নাহর সিদ্ধান্তই সঠিক ছিল। জিন্নাহ ছিলেন ভাবাবেগ বর্জিত নিঃস্বার্থ দূরদর্শী মহান নেতা। জিন্নাহর ভাষা উর্দু ছিল না এমনকি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাও উর্দু ছিল না। তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ভাষাকে বাঙালীদের উপর চাপিয়ে দেননি এবং বাংলাকে আঞ্চলিক ভাষা হিসাবে ব্যবহার করতেও নিষেধ করেননি। তিনি রাষ্ট্রীয় ঐক্য এবং সংহতির জন্য একটি ভাষার উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। যদিও অন্যান্য অনেক দেশে একাধিক ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে চালু রয়েছে। কিন্তু অন্যদেশ এবং পাকিস্তানের প্রেক্ষিত ছিল ভিন্ন। পাকিস্তানের অস্তিত্ব অস্বীকারকারী শত্রু পরিবেষ্টিত ছিল পাকিস্তান। দুই অংশের ব্যবধান ছিল ১২০০ মাইল। তিনি সবকিছু বিবেচনা করে রাষ্ট্রীয় ভাষা উর্দু করার চেষ্টা নিয়েছিলেন। ভারতের রাষ্ট্রীয় ভাষা হিন্দি হওয়াতে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালীরা আন্দোলন করেনি কারণ জাতীয় সংহতির জন্য সেটা ছিল অপরিহার্য। অথচ পূর্ববাংলার মানুষের চেয়ে পশ্চিম বাংলার মানুষ শিক্ষা দীক্ষা কৃষ্টি কালচারের দিক দিয়ে ছিল অগ্রগামী। আজো ভাষার প্রশ্নে হিন্দুস্থানের কোথাও কোন অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেনি। অথচ কোলকাতার পত্রিকাগুলো ভাষা আন্দোলন জোরদার করার জন্য আমাদেরকে অনুপ্রেরণা ও নির্দেশনা খয়রাত করতো। কিন্তু কেন এটুকু তলিয়ে দেখেনি আমাদের আবেগপ্রবণ লঘুচেতা নেতৃবৃন্দ। ভাষার প্রশ্নে কায়দে আযমের সিদ্ধান্তকে অনেকেই এখন আবেগহীন বাস্তবতা দিয়ে বিশ্লেষণ করে দেখার চেষ্টা করেছেন। যেমন আওয়ামী লীগের সাবেক নেতা এবং এমপি জনাব এম এ মোহাইমেন তার সাম্প্রতিক প্রকাশিত এক গ্রন্থে লিখেছেন–

'উর্দুকেই একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার পীড়াপীড়ির পিছনে জিন্নাহ বিরোধীরা তাঁর বাঙ্গালী বিদ্বেষী মনোভাব ও পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থ রক্ষার ঐকান্তিক আগ্রহের প্রমাণ বলে মনে করেন। পূর্ব বাংলার অধিকাংশ মানুষের ধারণা জিন্নাহ সাহেবের মাতৃভাষা ছিল উর্দূ। তাই উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবির পিছনে জিন্নাহ সাহেবের স্বীয় ভাষার প্রতি পক্ষপাতিত্বের নিদর্শন মনে করে বাঙ্গালী মাত্রই ক্ষুব্ধ হয়ে

www.pathagar.com

উঠে। কিন্তু অধিকাংশ বাঙ্গালীই জানেনা যে জিন্নাহ সাহেবের মাতৃভাষা ছিল গুজরাটি; উর্দূ নয়। উর্দূকে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে তাঁর উদ্দেশ্যে ছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাভাষী পাঁচটি রাষ্ট্রকে একই ভাষার মাধ্যমে এক জাতিতে পরিণত করা। ভাষা যেহেতু জাতি গঠনের মাধ্যম হিসাবে অনন্য অবদান রাখতে সক্ষম তাই এক ভাষার মাধ্যমে ভিন্ন ভিন্ন ভাষা ও সংস্কৃতিসম্পন্ন মানুষগুলোকে একজাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধ উদ্বুদ্ধ করার জন্যও উর্দূকে মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর ধারণা ছিল উর্দূ যেহেতু বাংলা, পাঞ্জাব, সিন্ধু, সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তান কারোই ভাষা নয়, তবে সব প্রদেশগুলোতেই এ ভাষা মোটামুটি বোধগম্য তাই এ ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করলে অন্যান্য প্রদেশ থেকেও তাদের ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উঠবে না। উর্দু যেহেতু পাকিস্তানের কোন প্রদেশের ভাষা নয়, এটি যুক্তপ্রদেশের মুসলমানদের ভাষা যার সঙ্গে সারাভারতের মুসলমানরা মোটামুটি পরিচিত তাই এ ভাষা রাষ্ট্রভাষা হিসাবে গ্রহণ করতে পাকিস্তানের সকল অংশের মানুষ সহজে রাজি হবে।

এক জাতি গঠনের লক্ষ্যে জিন্নাহ সাহেব যে এ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন এর পিছনে তার কোন সংকীর্ণ মনোভাব ছিল না– এর প্রমাণ পাওয়া যায় ভারতে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার সিদ্ধান্ত থেকে। হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে কি উদ্দেশ্য ও মনোভাব প্রধানমন্ত্রী হিসাবে জওহরলালের চিন্তাকে প্রভাবিত করেছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় তাঁর রচিত Glimses of World History থেকে। তিনি যখন ১৯১২ সনে সানইয়াং সেনের সঙ্গে দেখা করার জন্য চীন যান তখন তাঁর অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে তিনি লিখেছেন, চীনের উত্তর অঞ্চল মানচুরিয়া থেকে দক্ষিণে নানকিং পর্যন্ত এ সাড়ে তিন হাজার মাইলের বিরাট দেশে সমস্ত মানুষই চীনা ভাষার কথা বলে, যদিও উত্তর আর দক্ষিণের মধ্যে উচ্চারণে স্থানীয় কিছু কিছু পার্থক্য রয়েছে। এ পার্থক্য সত্ত্বেও উত্তর থেকে দক্ষিণ পর্যন্ত এ বিরাট দেশের লোক একজনের কথা আরেকজন সহজে বুঝতে পারে। এর ফলে এই বিরাট দেশের মানুষগুলোর মধ্যে একটা অখণ্ড জাতীয়তা ও ভ্রাতৃত্ববোধ গড়ে উঠেছে যেটা ভারতে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। চীনের ঐক্য ও জাতীয়তাবোধের প্রেক্ষিতে তিনি দুঃখ করে বলেছেন, হায়-রে আমার ভারতবর্ষ সেখানে বাঙ্গালী গুজরাটির ভাষা বুঝে না, গুজরাটি আবার মারাঠিদের ভাষা বুঝে না, মারাঠিরা আবার তামিলদের ভাষা বুঝে না। তারা প্রত্যেকে একজন থেকে আর একজন সম্পূর্ণ আলাদা স্বতন্ত্র জীবন-যাপন করছে। কারও মধ্যে ভাষার বিভিন্নতার কারণে চিন্তার দিক থেকে কোন ঐক্যবোধ নেই। এক জাতি হিসেবে

www.pathagar.com

নিজেদেরকে এরা চিন্তাই করতে পারে না। চীনের অভিজ্ঞতার কথা বলতে গিয়ে তিনি লিখেছিলেন, ভারত যদি কখনো স্বাধীন হয় তবে এই বিভিন্ন ভাষাভাষী মানুষগুলোকে এক জাতিতে পরিণত করার জন্য ভাষাই হবে একমাত্র বন্ধন। স্বাধীনতার পরবর্তীকালে হিন্দিকে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে খুব সম্ভব তাঁর এ মনোভাবই কাজ করেছিল। তিনি ভেবেছিলেন হিন্দি মোটামুটি সকলে বুঝতে পারে তাই তিনি ভারতের বিভিন্ন ভাষাভাষী অঞ্চলের মানুষদেরকে এক ভারতীয় জাতি হিসাবে গড়ে তুলবার মানসে হিন্দিকে ভারতের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ ভারতের উত্তর অঞ্চলে তিনি সফল হলেও দক্ষিণ অঞ্চলে অদ্যাবধি সফল হন নাই। দক্ষিণের তামিল তেলেগু অর্থাৎ বৃহত্তর মাদ্রাজ অঞ্চল আজও হিন্দিকে গ্রহণ করেনি। যেমন বাংলাদেশ উর্দুকে গ্রহণ করেনি। হিন্দিকে ভারতে রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে জওহরলালের যেমন সৎ ইচ্ছাই ছিল, কোন কু-মতলব ছিল না, তেমনিই আমাদের মনে হয় উর্দুকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার পিছনে জিন্নাহ সাহেবেরও সৎ উদ্দেশ্যই ছিল, কোন প্রকার উদ্দেশ্যপ্রণোদিত দুরভিসন্ধি ছিল না। তাঁর গৃহীত নীতি হয়তো ভুল হতে পারে তবে এর পিছনে যে তাঁর কোন অসৎ উদ্দেশ্য ছিল না এটা নিঃসন্দেহে বলা চলে।

জিন্নাহ সাহেবের প্রতি দ্বিতীয় অভিযোগ হল যে, তিনি ১৯৪৬ সনের মার্চ মাসে দিল্লীতে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগ কনভেশনে দুই সার্বভৌম স্টেট্‌সকে এক স্টেটে রূপান্তরিক করেন। '৪০ সনের মূল লাহোর প্রস্তাবে ছিল পূর্ব ও পশ্চিম সীমান্তে দুইটি সার্বভৌম স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠন হবে। '৪৬ সনে তিনি দুই রাষ্ট্রের জায়গায় এক রাষ্ট্র করে বাংলার মুসলমানদের পশ্চিম পাকিস্তানীদের অধীন করার ষড়যন্ত্র করেছিলেন। আমাদের পূর্ব পাকিস্তানের বুদ্ধিজীবীরা জিন্নাহর '৪৬ সনের এই পরিবতর্নকে বাঙালী জাতির প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হিসেবে চিহ্নিত করে তাঁকে বাঙালীর শত্রু হিসাবে প্রতিপন্ন করার প্রয়াস চালিয়ে আসছিল।

জিন্নাহ সাহেবের গণতন্ত্রের চেতনা, তাঁর নির্লোভ চরিত্র ও যুক্তিবাদী চিন্তার সঙ্গে যারা পরিচিত তাদেরকে তাঁর শেষ মুহূর্তে এ সিদ্ধান্ত নেয়ার পেছনে জাতীয় স্বার্থের দৃষ্টিকোণ থেকে কোন তাগিদ ছিল কিনা এ ব্যাপারে গভীরভাবে ভাবিয়ে তুলেছিল। জিন্নাহ্ সাহেব জন্মসূত্রে পশ্চিম পাকিস্তানের লোক ছিলেন না। তাঁর মাতৃভাষা উর্দূ ছিল না। ধন দৌলতের প্রতি তাঁর কোন মোহ ছিল না। খ্যাতনামা ব্যারিষ্টার হিসেবে বিপুল অর্থ উপার্জনের মারফত যে অগাধ সম্পত্তির মালিক

www.pathagar.com

তিনি হয়েছিলেন সে অর্থ নিজের একমাত্র কন্যাকে দান না করে দেশের জন্য তিনি দান করে গিয়েছিলেন। এহেন ব্যক্তির কাছে পূর্ব এবং পশ্চিম পাকিস্তানের স্বার্থকে আলাদা চোখে দেখার কোন কারণ ছিল বলে মনে হয় না। দুই অঞ্চলের লোকের স্বার্থকে তাঁর মত সচ্চরিত্র ও ন্যায়নিষ্ঠ ব্যক্তির সমান দৃষ্টিতে দেখাই ছিল স্বাভাবিক। এই সম্পর্কে গভীরভাবে যারা চিন্তা করেছেন তাদের কাছে এটাই মনে হয়েছে পূর্বাঞ্চলের অধিবাসীদের স্বার্থেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিতে বাধ্য হয়েছিলেন। (নতুন সফর, ১৭ সেপ্টেম্বর, ১৯৯৭)

বলশেভিকরা সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্ষমতাসীন হওয়ার পর তাদের আদর্শ সুমুন্নত করার জন্য বর্ণমালা এবং পরিভাষার পরিবর্তন করে। এর কারণ আবিষ্কারের জন্য কোন ষড়যন্ত্র তালাশ না করে বরং বলা যায় নতুন প্রজন্মকে সাবেকী আমলের বুর্জোয়া সাহিত্যের আবিলতা মুক্ত রাখার মহৎ উদ্দেশ্য ছিল এর পেছনে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল নির্ভেজাল কমিউনিস্ট গড়ে তোলো। (শিক্ষা দীক্ষা নাজেদা ক্রুপস্কায়া)

অনুরূপভাবে তুরস্কে কামাল আতার্তুক ক্ষমতা দখল করে আরবী বর্ণমালা পরিবর্তন করেন। তার উদ্দেশ্য ছিল ইসলাম নয় পাশ্চাত্যের চিন্তাধারায় তার দেশের মানুষকে গড়ে তোলা। তার এ পদক্ষেপ সঠিক ছিল না বেঠিক ছিল আমরা সেই আলোচনায় অবতারণা না করে বলতে পারি যে সেকুলার চিন্তাধারা বাস্তাবায়নের জন্য কামাল পাশার এই পদক্ষেপ অপরিহার্য ছিল।

প্রত্যেকটি জাতির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকে। এই লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য সামনে রেখে সেই দেশের নীতি কৌশলও পরিকল্পনা প্রনয়ণ করা হয়। পাকিস্তান আন্দোলনের পিছনে ছিল একটি আদর্শ এবং চেতনা। এই চেতনাকে সমুন্নত করার দায়িত্ব ছিল তারই যে হিন্দু ও বৃটিশ ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে লড়াই করে উপমহাদেশের নিগৃহীত মুসলমানদের জন্য ছিনিয়ে এনেছিলেন স্বাধীন স্বতন্ত্র আবাসভূমি। কায়দে আযম জানতেন ষড়যন্ত্রের গভীরতা। তিনি মুসলমানদের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য তাদের কাছ থেকে পাকিস্তান ছিনিয়ে এনেছিলেন। যারা মুসলমানদের স্থায়ীভাবে গোলাম বানিয়ে রাখার জন্য অখন্ড ভারতের অকৃত্রিম প্রবক্তা হয়ে পাকিস্তান আন্দোলনের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিলেন, কোন অবস্থায় তারা পাকিস্তানের দাবীকে স্বীকার করে নেয়নি। একান্ত বাধ্য হয়ে যখন ভারতকে খন্ডিত করতে হলো, তখন তারা পরিকল্পনা নিল যে-কোন মূল্যের বিনিময়ে পাকিস্তানকে অখন্ড ভারতের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। কায়দে আযম তার

www.pathagar.com

ধীশক্তি এবং দূরদর্শী অনুভব দিয়ে ভাষা আন্দোলনের অনিবার্য পরিণতি আঁচ করেছিলেন। তিনি জানতেন বাঙলার মুসলমানদের দৈন্যতা ও অশিক্ষার সুযোগে হিন্দুরা ভাষার উপর যে দখলীস্বত্ব কায়েম করে আছে যেভাবে হিন্দু সভ্যতা ও সংস্কৃতি দ্বারা মুসলমানরা প্রভাবিত হয়ে আছে তা থেকে নতুন প্রজন্মকে বাঁচিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে উঠবে এবং এ অঞ্চলের মুসলমানরা রাজনৈতিক স্বাধীনতা লাভ করেও এক ধরনের গোলামীকে স্বেচ্ছায় বরণ করে নিবে। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে কায়দে আযমের অনুভব এবং দুরদর্শিতা কত গভীর ছিল।

ডঃ এবনে গোলাম সামাদ লিখেছেন– 'ভাষা আন্দোলন বিশ্লেষণ হওয়া উচিত বাংলাভাষী মুসলমানদের ইতিহাসের ধারায় কারণ কেবল তারাই করেছিলেন এই আন্দোলন। (দৈনিক ইনকিলাম, ২১ ফেব্রুয়ারী, ১৯৯৮)

জনাব এবনে গোলাম সামাদের প্রত্যাশিত ঔচিত্য বোধের সীমা অতিক্রম করেছিল পঞ্চাশের দশকেই। এই আন্দোলন শুরু করেছিলেন সেই মুসলমানরা যারা আন্তরিকভাবে ইসলামী তাহজিব তমুদ্দুনে বিশ্বাসী ছিলেন। মজলিসের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মুসলিম ছাত্রলীগ ও অন্যান্য সংগঠনের সম্মিলিত আন্দোলন '৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারী কতিপয় মূল্যবান জীবনের বিনিময়ে যে সাফল্য অর্জন করেছিল সেটা তাদের সামনেই প্রবাহিত হয়েছিল ভিন্ন খাতে। নিরুপায় অবস্থান থেকে তাদের অনেককেই আমি লোকচক্ষুর অন্তরালে কাঁদতে দেখেছি। আজকের পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে এদের অনেকেরই নাম ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস থেকে মুছে ফেলার চেষ্টা নেয়া হচ্ছে। যেমন করে জামায়াতে ইসলামীর কেয়ার টেকার ফর্মূলার পথ ধরে জামায়াতের ঘাড়ে পা রেখে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে জামায়াতকে বৃদ্ধাঙ্গুলি দেখিয়েছে। মসনদকে সুসংহত করে হাসিনা এখন জামায়াতকে ডান্ডা দেখাতেও কসুর করেনি। আর জামায়াতে ইসলামী উদ্বেগ হতাশা এবং বঞ্চনার তীরে দাঁড়িয়ে অধ্যাপক গোলাম আযমকে কেয়ারটেকার সরকারের রূপকার হিসাবে উপস্থাপন করে নির্বোধোচিত আত্মতৃপ্তি পাওয়ার চেষ্টা করছে। অনুরূপভাবে তমুদ্দন মজলিসের সাথে সংশ্লিষ্টরা এবং সমকালীন দেশপ্রেমিক ইসলামীপন্থী তরুণ নেতৃত্ব প্রৌঢ়ত্বের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে নিজেদের ভাষা আন্দোলনের উদ্যোক্তা হিসাবে কল্পনা করে আত্মপ্রবঞ্চনার অতৃপ্ত আনন্দ পেতে চাচ্ছেন।

তমুদ্দন মজলিস, মুসলিম ছাত্রলীগ এবং অন্যান্য দেশপ্রেমিক বুদ্ধিজীবি ও সংগঠনসমূহের উদ্যোগে সৃষ্ট '৫২ সালের ভাষা আন্দোলন সফলতার দ্বারপ্রান্তে

www.pathagar.com

এসে উপনীত হলে ছাত্র ইউনিয়ন নামে একটি নতুন ছাত্র সংগঠন ছাত্র আন্দোলনে আবির্ভূত হয়। এই সংগঠনটি ছিলো কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ছাত্র শাখা। কমিউনিস্টদের শীর্ষস্থানীয় নেতৃবৃন্দ ছিলেন হিন্দু। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির দিক নির্দেশনায় এদেশে কমিউনিস্ট আন্দোলন পরিচালিত হতো। আর কমিউনিস্টরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে ছিল অত্যন্ত সচেতন। হাওয়াকে নিজেদের দিকে প্রবাহিত করার অসীম দক্ষতা ছিল এদের। এর কারণ হলো রাজনীতির শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ দিয়ে কর্মীদের সচেতন এবং দক্ষ করে তোলার প্রক্রিয়া এ সংগঠনে শুরু থেকেই অব্যাহত ছিল। আবেগপ্রবণ উঠতি বয়সের তরুণদের তারা মহান আদর্শবাদের ইউটোপিয়া দিয়ে আচ্ছন্ন করে ফেলতো। তাদের প্রথম এবং প্রধান কাজ ছিল মুসলিম তরুণদেরকে ইসলাম বিমুখ করে তোলা। ভাষা আন্দোলনের ছিদ্রপথ দিয়ে, ভাষা আন্দোলন কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ব্যঞ্জনা দিয়ে অতি সহজেই তারা তরুণদের উপর প্রভাব বিস্তার করে ফেলে। তাদেরই পরোক্ষ ইন্ধনে মুসলিম ছাত্রলীগের লেজ কাটা হয় অর্থাৎ মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে হিন্দুদের সন্তুষ্ট করার উদ্যোগ নেয়া হয়। '১৯৬৮ সালে ছাত্রলীগের ঘোষণাপত্রে বলা হয়– রক্তক্ষয়ী বায়ান্নর পর ১৯৫৩ সালের কাউন্সিল অধিবেশনে এ প্রস্তাব (মুসলিম শব্দটি পরিহার করা) চূড়ান্তভাবে কার্যকরী করা হয়। (বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, ডক্টর এম এ হান্নান, পৃ.-১৯)

আওয়ামী লীগও নামের আগে মুসলিম শব্দটি পরিহার করে। কাজী জাফর আহমদের প্রতিবেদনে (১৯৬৩) এ বিষয়ে একটি বিবরণ রয়েছে। প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়– '১৯৫৬ সালে আমাদের তৃতীয় কেন্দ্রীয় সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। এই সময়ে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে। পূর্ব পাকিস্তানের অন্যতম বৃহত রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান নিজেদের অসাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠানরূপে ঘোষনা করে এবং দলের নাম হতে মুসলিম শব্দটি উঠিয়ে দেয়া হয়।'

পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠার পর আদর্শিক কার্যকারণে পরিত্যক্ত অপসৃয়মান হিন্দুস্থানী জাতীয় বীর ও মনীষী এবং বুদ্ধিজীবীরা ধীরে ধীরে এদেশের জাতীয় বীরের আসনে সমাসীন হতে থাকে। কাগমারী সম্মেলনের মধ্য দিয়েই এ কাজের উদ্বোধন হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের পথ ধরেই বাঙালী সংস্কৃতির নামে হিন্দু কালচার প্রথমত কোমলমতি তরুণদের, পরবর্তীতে সমগ্র জাতিকে গ্রাস করে। প্রথম দিকে শহীদ দিবস পালিত হত মিলাদ মাহফিলের মাধ্যমে। পরবর্তীতে হিন্দু কালচার এসে শহীদ মিনার পূজার মন্ডপে পরিণত করে। যে রবীন্দ্রনাথ পূর্ববাংলার স্বতন্ত্র অস্তিত্বকে স্বীকার করতে পারেনি এবং বংশ পরম্পরায়

www.pathagar.com

পূর্ববাংলায় জমিদারীর সুবাদে এদেশের মানুষকে লুট করেছিল সেই রবীন্দ্রনাথ আত্মার আত্মীয়ে পরিণত হল ভাষা আন্দোলনের ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। সবকিছু সংঘটিত হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে তরুণদের আবেগকে প্রভাবিত করে। এর পেছনে ছিল বিত্তবান হিন্দুদের সাহায্য এবং ইন্ধন। এছাড়াও এর পেছনে ছিল ভারতীয় দূতাবাসের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ সহযোগিতা। কিন্তু যারা সত্যিকার অর্থে পাকিস্তানে বিশ্বাসী ছিল, কায়দে আযমের নেতৃত্বের প্রতি যাদের ছিল গভীর আস্থা তারা আবেগের বাইরে থেকে নীরবে অশ্রুপাত করেছে। নজরুলের ভাষায় তাদের অবস্থা হয়েছিল 'বাহিরে ঝড় বহে, নয়নে বারি ঝরে।'

কায়দে আযমের দিক নির্দেশনার প্রতি পূর্ববাংলার মানুষের অনাস্থাও আনুগত্যহীনতাকে মূসা (আ) ও তার কাওমের কর্মকাণ্ডের সাথে তুলনা করা যায়। ফেরাউনের জুলুম নিপীড়ন ও গোলামী থেকে মুক্ত করে মূসা (আ) তার কওমকে শান্তি স্বস্তি এবং মুক্তির নতুন উপত্যকায় নিয়ে এলেন। বনি ইসরাইলীরা সুখ সমৃদ্ধির দিগন্ত রচনা করল। সেখানে তারা পেল আযাদীর মুক্ত হাওয়ার সন্ধান। অতপর যখন মূসা (আ) আল্লাহর নির্দেশে স্বীয় জাতিকে ডেকে বললেন– 'হে আমার জাতি! খোদার অবদান স্মরণ কর। তিনি তোমাদের মধ্যে অনেক নবীর জন্ম দিয়েছেন। এখন তিনি তোমাদের বাদশাহী দান করেছেন। যা আজ পর্যন্ত কাউকে দেয়া হয়নি। তাই সাহস ও দৃঢ়তার সাথে এগিয়ে চল। তার শাসনভার শুধু তোমারদেরই ভাগ্যে লেখা হয়েছে। কখনো পৃষ্ঠ প্রদর্শন করো না। এর পরিণাম ব্যর্থতা এবং হতাশা ছাড়া কিছু নয়। (সূরা মায়েদা ২০-২১)

মূসার (আ) জাতি জবাব দিল কোরআনের ভাষায়– 'হে মূসা তুমি তোমাদের খোদাকে নিয়ে লড়াই করো আমরা এখানে বসে তামাশা দেখব।' (সূরা মায়েদা ২৪)

নবীর আদেশ এবং নেতার নির্দেশ অগ্রাহ্য করার জন্য সমগ্র কওমের উপর শাস্তির ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ বললেন, বাইতুল মোকাদ্দাসে প্রবেশ তাদের জন্য ৪০ বছর নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হল। এখন থেকে এই এলাকায় তারা নত মস্তকে চলবে। (সূরা মায়েদা)

দীর্ঘ সংগ্রামের মাধ্যমে বর্ণবাদী হিন্দু ও বৃটিশদের সম্মিলিত চক্রান্ত নস্যাৎ করে কায়দে আযম যে জাতিকে শৃংখল মুক্ত করলেন, একটানা ২শ' বছরের গোলাম থেকে যে জাতিকে আযাদ করলেন, এই সদ্যমুক্ত জাতিকে তিনি যখন তার সুদূর প্রসারী ভাবনা ও প্রজ্ঞা দিয়ে দিক নির্দেশণা দিলেন তখন সেটা প্রত্যাখ্যান করা

www.pathagar.com

হল। তিনি পাকিস্তান আন্দোলনের পটভূমি বিশ্লেষণ করে বললেন– 'পাকিস্তানের সংহতির খাতিরে প্রয়োজন বোধে মাতৃভাষা পরিবর্তন করতে হবে।' কায়দে আযমের এই দিকনির্দেশনা অগ্রাহ্য করা হল। ধারাবাহিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে পাকিস্তানকে ধ্বংস করা হল। সাতচল্লিশের কাংখিত উপত্যকা পরিত্যাগ করে আমরা নতুন উপত্যকায় এলাম। এখানে এই উপত্যকায় এসে আমাদের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির যোগ হলো না। এখানে আমতো মিললইনা ছালা হারানোর সম্মুখীন হলাম। এখানে স্বাধীনতা মৌলিক অধিকার, অর্থনীতি এবং রাজনীতি প্রশ্নবোধক চিহ্নের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। ঐশী নির্দেশে বনি ইসরাইলীদের বাইতুল মোকাদ্দাস প্রবেশ ৪০ বছরের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল, গর্বিত বনি ইসলাইলীদের মাথা হেট হয়েছিল। জাতির দুর্দিনে খোদার দান হিসাবে যে নেতাকে আমরা পেয়েছিলাম, তার নির্দেশ উপেক্ষা এবং অগ্রাহ্য করার কাফফারা হিসাবে সত্যিকার স্বাধীনতার তোরণদ্বারে প্রবেশ করার জন্য এ জাতিকে কত বছর অপেক্ষা করতে হবে আল্লাহই ভাল জানেন।

www.pathagar.com

দ্বাদশ অধ্যায়

যুক্ত ফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে

প্রায় ২শ' বছর বৃটিশ হিন্দুর যৌথ ষড়যন্ত্র থেকে মুক্ত হয়ে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পূর্ববাংলার মানুষ আবেগপ্রবণ হয়ে উঠে। যৌক্তিক মানসিকতাকে উন্মাদনা ঘিরে ধরে। আর উন্মাদনা সৃষ্টির জন্য কোন নীতি অথবা কৌশলের প্রয়োজন পড়ে না। আবেগময় বক্তব্য, ভিত্তিহীন গুজব এবং অকল্পনীয় মিথ্যাচারই এর জন্য যথেষ্ট। এসবের অনুশীলন শুরু হয় পাকিস্তান সৃষ্টির প্রথম প্রভাত থেকে। দীর্ঘদিনের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কমিউনিষ্ট কর্মীরা এ কারণেই এ জাতির আবেগ নিয়ে খেলবার সুযোগ পায়।

দেশপ্রেমিক ইসলামী শক্তি ভাষা আন্দোলনের সূচনা করলেও আন্দোলনের ধারাবাহিকতার মধ্য দিয়ে এর নিয়ন্ত্রণ এসে পড়ে কমিউনিষ্টদের হাতে। তৎকালীন হিন্দুস্থানে কমিউনিষ্টদের উপর দলন পীড়ন অব্যাহত থাকলেও দিল্লী পূর্ব পাকিস্তানের কমিউনিষ্টদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে শুধুমাত্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বের মুলে হিন্দু নেতৃবৃন্দ থাকার কারণে হিন্দুস্থানী সাহায্য অবারিত হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের পরবর্তী পর্যায়ে তারা রাজনীতি এবং সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোমাত্রায় সক্রিয় হয়ে উঠে। প্রথমতঃ তারা বাঙালী জাতীয়তাবাদ কেন্দ্রিক সাংস্কৃতিক ধারার সূচনা করল পাকিস্তান থেকে বাংলাভাষীদের মানসিকভাবে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্য নিয়ে। দ্বিতীয় পর্যায়ে রাজনৈতিক অঙ্গনে মুসলিম লীগকে পরাজিত করে রাজনৈতিক শক্তিকে দুর্বল করতে চাইল। নির্বাচনকে সামনে রেখে নেপথ্য থেকে তারা মুসলিম লীগ বিরোধী ফ্রন্ট গঠনের উদ্যোগ গ্রহণ করল। 'এ পরিস্থিতিতে কমিউনিষ্ট পার্টির সম্মুখে নতুন কর্তব্য এসে হাজির হল। কারণ যুক্তফ্রন্ট গঠনের নেপথ্যে মূল কাজটি সম্পাদন করে যাচ্ছিল কমিউনিষ্ট পার্টি। প্রকাশ্য রাজনীতিতে কার্যত নিষিদ্ধ এই পার্টি যুক্তফ্রন্ট গঠনে প্রধান ভূমিকা পালন করে তার মতাদর্শ প্রভাবিত ছাত্র সংগঠন ছাত্র ইউনিয়ন গণতন্ত্রী দল ও আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কর্মরত শুভানুধ্যায়ীদের দ্বারা। (মোহাম্মদ হাননান : বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাসা, পৃঃ ২৫)

www.pathagar.com

কমিউনিষ্ট পার্টি মূলত ছাত্র সংগঠনসমূহের মাধ্যমে রাজনৈতিক মেরুকরণ প্রক্রিয়া শক্তভাবে শুরু করে। ছাত্ররা কোথাও ঠান্ডা মাথায় রাজনীতিকদের যুক্তি দিয়ে প্রভাবিত করে, কোথাও চাপ প্রয়োগ করে আবার কোথাও ভীতি প্রদর্শন করে যুক্তফ্রন্ট গঠনের তাগাদা দিতে থাকে। রাজনীতিতে শক্তি প্রদর্শনের নতুন ধারার সূচনা হয় সেই সময় থেকে। রাজনীতিকরা ছাত্রদের পথনির্দেশ করার বদলে রাজনীতিকরাই পরিচালিত হতে থাকে লঘুচেতা ছাত্রদের ধারা মত। বলতে গেলে তখন থেকেই শুরু হয় এই অশুভ প্রবণতা। 'দলগতভাবে কৃষক শ্রমিক পার্টি এবং এ কে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট গঠনের বিরোধী ছিলেন। ছাত্ররা এ ব্যাপারে এক বিরাট বিক্ষোভ মিছিল সংগঠিত করে এবং শেরে বাংলার বাসভবন ঘেরাও করে রাখে। শেষ পর্যন্ত ফজলুল হক যুক্তফ্রন্টের ব্যাপারে তার মতামত পরিবর্তন করলে ছাত্ররা তাকে কাঁধে নিয়ে উল্লাস করতে করতে ফিরে আসে।' (প্রাগুক্ত পৃষ্ঠা, ২৫)

সাধারণ দৃষ্টিতে দেখতে গেলে মনে হবে যুক্ত ফ্রন্ট সরকার বিরোধী একটি জোট, মুসলিম লীগের ব্যর্থতার উপর যারা রচনা করতে চেয়েছিল সাফল্য এবং সুখ সমৃদ্ধির নতুন দিগন্ত। কিন্তু নেপথ্য থেকে যারা যুক্তফ্রন্ট গঠনে ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের উদ্দেশ্য ছিল ভিন্ন। তাদের লক্ষ্য ছিল পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার মূল সাংগঠনিক শক্তি মুসলিম লীগকে ধ্বংস করা, পাকিস্তানের আদর্শিক চেতনা থেকে জনগণকে বিচ্ছিন্ন করা এবং রাজনৈতিক দ্বন্দ্বকে প্রকট করে তোলা। কালক্রমে সমস্যা ও সংকটের ভারে সদ্য স্বাধীনতাপ্রাপ্ত পাকিস্তানকে মৃয়মান করে তোলা। যে কারণে 'যুক্তফ্রন্টে নেজামে ইসলাম দলকে গ্রহণ করার ব্যাপারে ফ্রন্টের মূল সংগঠকদের আপত্তি ছিল। ফজলুল হক নতুন জটিলতার অবতারণা করেন। তিনি দাবী করেন ফ্রন্টে নেজামে ইসলামকে নিতে হবে। এ দলকে ছাড়া তিনি যুক্তফ্রন্টে যাবেন না। বস্তুত যে লক্ষ্য উদ্দেশ্য নিয়ে যুক্তফ্রন্ট গঠন হতে যাচ্ছিল, তাতে নেজামে ইসলামকে নেয়ার ব্যাপারে নৈতিক প্রশ্ন জড়িত ছিল। কিন্তু শেরে বাংলা ফজলুল হককে ছাড়াও যুক্তফ্রন্টের মূল উদ্দেশ্য সাধিত হয় না। ফলে যুক্তফ্রন্ট গঠনের সঙ্গে জড়িত দলগুলো নেজামে ইসলামকে নিতে শেষ পর্যন্ত রাজী হল।

কিন্তু নেজামে ইসলাম যুক্তফ্রন্টের সদস্য হয়েই প্রথম কমিউনিষ্ট পার্টি সম্পর্কে আপত্তি তুললে শেরে বাংলা ফলজলুল হক তাকে সমর্থন করেন। ফলে ঐক্যবদ্ধভাবে নির্বাচনী লড়াই সম্পর্কে জটিলতার উপাখ্যানের অবতারণা হয়।

www.pathagar.com

আওয়ামী মুসলিম লীগের মওলানা ভাসানী, খেলাফতে রাব্বানী পার্টির আবুল হাশিম গণতন্ত্রী দলের মাহমুদ আলী প্রমুখ কমিউনিষ্ট পার্টিকে জোটে নেয়ার পক্ষে জোর প্রচেষ্টা চালান। (প্রাগুক্ত, পৃঃ স২৫)

এমনি টানাপোড়েনের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টি যুক্তফ্রন্ট থেকে দূরে অবস্থানের সিদ্ধান্ত নিয়ে যুক্তফ্রন্টকে টিকিয়ে রাখে। কোন ঠুনকো অজুহাতে ফ্রন্ট ভেঙ্গে গেলে কমিউনিষ্ট পার্টির সমস্ত নেপথ্য পরিকল্পনা ধ্বংস হওয়ার সম্ভাবনা ছিল। এ কারণে কমিউনিষ্টরা কোন বিতর্কের অবতারণা না করে নীরবে সরে গেলেন। কিন্তু ফ্রন্টের উপর তাদের অদৃশ্য কর্তৃত্ব কখনোই খর্ব হয়নি। যুক্তফ্রন্টের সাথে সংশ্লিষ্ট দেশপ্রেমিক যারা ছিলেন তাদের দূরদর্শিতার অভাব এবং চিন্তার সীমাবদ্ধতার কারণে কমিউনিষ্ট পার্টি এবং পঞ্চমবাহিনীর অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য আঁচ করতে পারলেন না।

নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল। যুক্তফ্রন্ট ২১ দফা কর্মসূচী নিয়ে নির্বাচনে অংশগ্রহণ করল। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর মুসলিম লীগ তার সীমাবদ্ধতার কারণে অঙ্গীকার পূরণ করতে না পারায় জনগণের মধ্যে যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেটাকে পুরোপুরি কাজে লাগাল যুক্তফ্রন্ট। স্বাধীনতা উত্তর মুসলিম লীগের সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সংগঠন প্রসারিত না হয়ে সংকুচিত হয়ে পড়ে।

সীমাবদ্ধ সাংগঠনিক শক্তি দিয়ে সর্বদলীয় ঐক্যবদ্ধ আক্রমনের মোকাবেলা করা মুসলিম লীগের পক্ষে সম্ভব হয়ে উঠেনি। পঞ্চমবাহিনী, হিন্দু জনগোষ্ঠী এবং কমিউনিষ্ট পার্টি যা চেয়েছিল, নির্বাচনী ফলাফল তার চেয়েও চমকপ্রদ হয়েছিল। যারা মুসলিম লীগের বিরুদ্ধে তাৎক্ষণিকভাবে সংগঠিত হয়েছিল তাদের মধ্যে আগে থেকেই ছিল অন্তর্বিরোধ। স্বাভাবকিভাবে ক্ষমতার ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে কখনো নেপথ্যে, কখনো প্রকাশ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়।

হক সাহেবের মতিভ্রম

১৯৫৪ সালের ৩ এপ্রিল যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ফজলুল হক মুখ্যমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। যুক্তফ্রন্টের চমকপ্রদ বিজয় ফজলুল হককে দারুণভাবে উৎসাহী করে তুলে। এই অভূতপূর্ব বিজয়ের পেছনে যে শক্তিসমূহ সক্রিয় ছিল তিনি তাদেরকে সন্তুষ্ট রেখেই সম্ভবত রাজনীতি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। অনেকটা সুবিধাবাদীর মত। এ ধরনের সুবাবিধাবাদী চরিত্রের প্রতিফলন তার

www.pathagar.com

অতীত কর্মকাণ্ডেও দেখা গেছে। ক্ষমতা হাতে পেয়েই ফজলুল হক পশ্চিম বাংলা সফরে গেলেন সেখানে তাকে মোহিত করার মত বিপুল সংবর্ধনা দেয়া হয়েছিল। এটা যে ছিল ব্রাহ্মণ্য চক্রের সাজানো নাটক, সেটা তিনি বুঝলেন না। আবেগে আপ্লুত হয়ে উঠলেন। তার সংবর্ধনার জবাবে তিনি বললেন–

'রাজনৈতিক কারণে বাংলাকে বিভক্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু বাংলার শিক্ষা সংস্কৃতি এবং বাঙালীত্বকে কোন শক্তিই কোন দিন ভাগ করিতে পারিবে না। দুই বাংলার বাঙালী চিরকাল বাঙালীই থাকিবে।' ফজলুল হকের এই উক্তি যেন উগ্র হিন্দু জাতীয়তাবাদী নেতা সরদার প্যাটেলের উক্তির পুনরাবৃত্তি। ভারত খন্ডিত হওয়ার পর ১৯৪৭ সালে সরদার প্যাটেল বিলাপ করেন এই বলে- To day the partition of India a settled fact and yet it is an unreal fact. The partition would remove the poison from the body politic of India... India is one an indivisible. One cannot devide the sea or split running water of a river. (G. W. Chawdhury: Pakistun Relation with India, Page : 84)

শেরে বাংলা এর মধ্যে আর এক ধুয়াশার সৃষ্টি করেন। 'নিউইয়র্ক টাইমস সংবাদদাতা মুখ্যমন্ত্রী শেরেবাংলার সহিত সাক্ষাৎকারের বিবরণীতে বিচ্ছিন্নতা-বাদের আভাস দান করেন। মিঃ কালাহানের এক প্রশ্নোত্তরে শেরে বাংলা নাকি বলিয়াছিলেন 'পূর্ববাংলা স্বাধীনতা ঘোষণা করিবে।' (অলি আহাদ জাতীয় রাজনীতি : ২১৬)

পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের ভাবমূর্তি বিনষ্ট করার জন্য কমিউনিষ্ট এবং পঞ্চম বাহিনী চক্র কর্ণফুলী পেপার মিলে বাঙালী অবাঙালী দাঙ্গার সৃষ্টি করে। এর উদ্দেশ্য অন্য একটি ছিল পাকিস্তানের একমাত্র পেপার মিলকে অচল করে দেয়া। এশিয়ার সর্ববৃহত পাটকল আমজী জুটমিলে একইভাবে দাঙ্গার সূচনা করা। এতে প্রায় দেড় হাজার শ্রমিকের মৃত্যু হয়। যদিও যুক্তফ্রন্ট নেতৃবৃন্দ কেন্দ্রীয় সরকারকে দায়ী করে, কিন্তু সমকালীন পর্যবেক্ষকদের ধারণা ছিল উল্টো। শুরু থেকেই এদেশের শ্রমিকদের উপর বামপন্থীদের প্রাধান্য ছিল। বাংলাভাষী শ্রমিকদের মধ্যে কমিউনিষ্ট পার্টির যেমন প্রভাব ছিল অবাঙালী শ্রমিকদের মধ্যে তাদের প্রভাব ছিল আরো বেশি। রাজনৈতিক ফায়দা আদায়ের জন্য তারা পরিকল্পিতভাবে দাঙ্গার সৃষ্টি করে। পাকিস্তানকে বিশৃংখল করে তোলার জন্য হিন্দুস্থানও ইন্ধন যোগাতে কার্পণ্য করেনি। আবার শেখ মুজিবকে মন্ত্রীসভায় না নেয়ার জন্য ফজলুল হকের ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন করার জন্য শেখ মুজিবও এর পেছনে পরোক্ষ মদদ দিয়ে থাকতে পারেন।

www.pathagar.com

যাই হোক পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার লক্ষ্যে পঞ্চমবাহিনী তৎপর হয়ে উঠে। এর পেছনে কমিউনিষ্টদের তৎপরতা ছিল সবচেয়ে বেশি। বিচ্ছিন্নতার ধ্যান ধারণা কোলকাতার বর্ণবাদী হিন্দুরা পূর্ব বাংলায় পাচার করে। কমিউনিষ্ট নেতৃত্বে হিন্দু নেতৃবৃন্দের প্রাধান্য থাকায় তাদের মাধ্যমে বর্ণবাদী হিন্দুরা তাদের সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণায় মার্কসবাদী দর্শনের রঙ ছড়িয়ে পূর্ববাংলার আবেগপ্রবণ তরুণদের গ্রহণযোগ্য করে তুলে। দৃষ্টান্ত হিসাবে দেবেন সিকদারের কথা বলা যায়– 'দেবেন সিকদারের ১৯৫৬ সালের স্বাধীনতার দাবীর প্রশ্নটির সত্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে হয়তো, তবে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক নেই যে দেবেন সিকদার বরাবরই প্রথম থেকে বাংলার পূর্ণ স্বাধীনতার বিষয়টি পার্টিতে তুলেছেন এবং কর্মী মহলে প্রচার করেছেন। (মোহাম্মদ হাননান, বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৬)

'১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের কমিউনিষ্ট পার্টির পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় কমিটির যে সম্মেলন কোলকাতায় আয়োজন করা হয়েছিল তাতে কুমার মৈত্র বাবু বাংলার স্বাধীনতার প্রস্তাব তুলেছিলেন।' (দেবেন সিকদার উপমহাদেশে কমিউনিষ্ট বিভ্রান্তি, পৃঃ ১১০)

পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা মওলানা ভাসানীও পিছিয়ে থাকলেন না ১৯৫৭ সালে কাগমারীতে সাংস্কৃতিক সম্মেলন করলেন বিদেশী এবং বিজাতীয় মনিষীদের নামে অসংখ্য তোরণ নির্মাণ করে সংশ্লিষ্ট জাতিসমূহের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। সমকালীন পর্যবেক্ষকদের ধারণা কোন বিদেশী শক্তির ইংগিতে এবং তাদের অর্থনৈতিক সহযোগিতায় এই সম্মেলনের আয়োজন করা হয়েছিল। এই সম্মেলনে সোহরাওয়ার্দীর উপস্থিতিতে ভাসানী পাকিস্তান থেকে পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার প্রচ্ছন্ন ইংগিত দিলেন। বললেন– 'পূর্ববাংলার স্বায়ত্তশাসন আদায় না হলে আসসালামু আলাইকুম।'

মওলানা ভাসানীর ভারসাম্যহীন উক্তি প্রসঙ্গে নেজামে ইসলাম দলের সভাপতি মওলানা আতাহার আলী বলেন– 'জনাব ভাসানী পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের মধ্যে বিদ্বেষ ও তিক্ততার প্রচারণা চালাইয়া ও পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তান ইসলামী জামহুরিয়া হইতে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার ভয় দেখাইয়া ক্ষান্ত হন নাই, লেনিন গেট, গান্ধী গেট, সুভাষ গেট প্রভৃতির নামে তোরণ নির্মাণ করিয়া পাকিস্তানকে কি ধাঁচে গড়িয়া তুলিতে চান তাহার প্রমাণ দিয়াছেন। সমকালীন দৈনিক আজাদের সম্পাদকীয়তে মন্তব্য করা হয়– 'পাকিস্তান সম্পর্কে কোন পাকিস্তানীর

www.pathagar.com

মুখে পাকিস্তান বিচ্ছেদের মারাত্মক কথা যে এমন হালকাভাবে উচ্চারিত হতে পারে ইহা কে কবে ভাবিতে পারিয়াছিল?... পাকিস্তানের প্রতি ইহা রাষ্ট্রদ্রোহের উক্তি ছাড়া আর কিছু নয়। (দৈনিক আজাদ, ১২ ফেব্রুয়ারী, ১৯৫৭)

যখন প্রত্যেকটি দল এবং অদূরদর্শী নেতৃবৃন্দ জনগণের আবেগে সুরসুড়ি দিয়ে আঞ্চলিক মনোভাব জাগিয়ে তোলার ব্যাপারে প্রতিযোগিতায় মেতে উঠেছিল। সেই সময় ১৯৫৭ সালের ৩ এপ্রিল পূর্ববঙ্গ প্রাদেশিক পরিষদে স্বায়ত্তশাসন দাবীর প্রস্তাব নেয়া হয়। অধ্যাপক মোজাফফর আহমদ এক সাক্ষাৎকারে বলেন যে প্রস্তাবটি তিনিই তুলেছিলেন এবং আওয়ামী লীগের বিরোধিতা সত্ত্বেও শেখ মুজিব তা সমর্থন করেছিলেন। স্বায়ত্ব শাসনের প্রস্তাব-উত্থাপনের মধ্যে দোষের কিছু নেই। কিন্তু এর নেপথ্যে যারা ছিলেন তাদের উদ্দেশ্য তো ভিন্ন ছিল। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের বিরোধী রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের রূপকার কমিউনিষ্ট পার্টির একটি রাজনৈতিক চিঠিতে (১৫ই জুলাই '৬২) তাদের উদ্দেশ্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এতে বলা হয়– 'এই রাষ্ট্রের অন্তর্গত বিভিন্ন আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের আন্দোলণ যত জোরদার হইবে পাকিস্তান রাষ্ট্রের আদর্শগত ভিত্তিও তত দুর্বল হইবে।' (বাংলাদেশে ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ৬৮)

পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী আওয়ামী লীগ প্রধান তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শহীদ সোহরাওয়ার্দী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের এক সমাবেশে বিষয়টি উত্থাপন করে বলেন : 'পূর্ব পাকিস্তানীদের মধ্যে প্রাদেশিকতার মনোভাব উস্কে দিয়ে কিছু ব্যক্তি নায়ক হতে চাচ্ছেন এবং এর ফলে পশ্চিম পাকিস্তানীদের মনে এমন ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে পূর্ব পাকিস্তানীরা তাদের সাথে একত্রে থাকতে চাই না।' (সাপ্তাহিক বিচিত্রা ২৩ আগস্ট, ১৯৬৫)

কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর পূর্ব পাকিস্তানে অবস্থান করে ভারতীয় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শে পাকিস্তান ধ্বংস প্রক্রিয়ার আঞ্জাম দিতে থাকেন। উচ্চাভিলাষী এবং অদূরদর্শী মুজিবকে তারা তাদের লক্ষ্য অর্জনের জন্য বেছে নেন। মুজিবের সামনে তুলে ধরা হয় এক উজ্জ্বল ভবিষ্যতের স্বপ্ন। ১৯৫৬ সালে মুজিবের সাথে মনোরঞ্জন ধরের আলাপ আলোচনার ভিত্তিতে কংগ্রেস-আওয়ামী লীগ গোপন চুক্তি হয় যা পঞ্চশীল নামে পরিচিত। এ চুক্তি অনুযায়ী আওয়ামী লীগ কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন হয়ে পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি বাতিল করবে এবং সংবিধানের ইসলামী চরিত্র হনন করে তাকে ধর্ম নিরপেক্ষ ও গণতান্ত্রিক করতে হবে। এই সাথে ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্য সব ব্যাপারে সমান অধিকার নিশ্চিত করবে।

www.pathagar.com

(জ্যোতিসেন গুপ্ত হিসট্রি অব ফ্রিডম মোভমেন্ট ইন বাংলাদেশ) এই গোপন চুক্তির পর থেকে হিন্দু জনগণ এবং হিন্দুস্থানের সমর্থন ও সহযোগিতার দ্বার মুজিবের জন্য অবারিত হয়। তাকে সামনে রেখেই হিন্দুস্থান পাকিস্তানের চূড়ান্ত ভাঙন খেলার দিকে পরিস্থিতি এগিয়ে নিয়ে চলে। এদিকে পৃথক নির্বাচন বাতিল হওয়ায় সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠী এখানে ক্ষমতার ভারসাম্যে পরিণত হয়।

পাগলা-গারদে পরিণত হল পরিষদ কক্ষ

স্বার্থান্ধ সংকীর্ণ রাজনীতিকদের সমন্বয়ে গঠিত মুসলিম লীগ বিরোধী যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতাসীন হওয়ার পর থেকেই দেশের মানুষকে হতাশ করল। জনগণের প্রত্যাশার সাথে প্রাপ্তির যোগ হল না। বর্ণচোরা রাজনীতিকরা স্বমূর্তি ধারণ করলেন। দেশের মানুষের স্বার্থ সমুন্নত করার জন্য সম্মিলিত উদ্যোগ নেয়া হল না। নির্লজ্জ দালালীতে মেতে উঠল সকলে। শুরু হল ক্ষমতার জন্য অন্তর্দ্বন্দ্ব এবং নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। ভাঙ্গা-গড়া চলতে থাকল সমানে। রাজনৈতিক অস্থিরতা বেড়ে গেল। খাদ্য সংকট তীব্র হয়ে উঠল। প্রশাসন ভেঙে পড়ল। একদিকে দুর্ভিক্ষের হাহাকার অন্যদিকে চলল ক্ষমতা দখলের নির্লজ্জ প্রতিযোগিতা। তেজারতের পণ্য হয়ে উঠল রাজনীতিকরা। ক্ষমতার হাতবদল নিত্যনৈমিত্তক ব্যাপার হয়ে উঠল।

ক্ষমতাপাগল রাজনীতিকরা পরিষদ কক্ষকে পাগলা গারদে পরিণত করল। ২২ জুলাই স্পীকারকে পাগল সাব্যস্ত করেও প্রস্তাব গৃহীত হল। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী দায়িত্ব নিলেন। কিন্তু তাতেও স্বার্থান্ধ ক্ষমতা পাগলদের উন্মত্ততা থামল না। যদিও ফটো সাংবাদিকরা পরিষদ কক্ষের উন্মুক্ত অবস্থার চিত্র ধারণ করেছে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ঠান্ডা মাথায় পরিকল্পিতভাবে শাহেদ আলীকে হত্যা করা হল ২৩শে সেপ্টেম্বরে। ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী হত্যা প্রসঙ্গে তৎকালীন প্রাদেশিক পরিষদ সদস্য জনাব হাশিম উদ্দিন আহমদ অতি সম্প্রতি দৈনিক ইনকিলাবে সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিয়েছেন। প্রতক্ষ্যদর্শীর বিবরণে তিনি বলেন– 'ডেপুটি স্পীকার শাহেদ আলী ছিলেন শান্ত স্বভাবের লোক। অপর দিকে স্পীকার আবদুল হাকিম ছিলেন শক্ত লোক। কারো ইচ্ছা অনিচ্ছায় সংসদ চালাতেন না। আবদুল হাকিমকে ষড়যন্ত্র করে আওয়ামী লীগের সদস্যরাই সরিয়ে দেয়। শাহেদ আলী কে এস পির লোক হলেও শান্ত স্বভাবের কারণে ক্ষমতাসীনরা তাকেই পছন্দ করে স্পীকারের আসনে বসায়। এ নিয়ে মিশ্র

www.pathagar.com

প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় এসেম্বলিতে। শাহেদ আলী এসম্বলিতে ঢোকার সময় শেখ মুজিব ও মোহন মিয়া ধস্তাধস্তি করছিল। শাহেদ আলীকে ঢোকার সময় জিজ্ঞেস করলাম কেন এসেছেন? জবাবে শাহেদ আলী বললেন– আপনাদের দেখতে এসেছি। বিরোধী দলের সদস্যদের বিরোধিতায় শাহেদ আলী ঘাবড়ে গিয়েছিলেন। খুব সম্ভব ভীতির কারণে তিনি আওয়ামী লীগের সদস্যদের বিরুদ্ধে কিছু বলার চেষ্টা করছিলেন ও কৃষক শ্রমিক পার্টি (কে এস পি) সদস্যদের কিছু বলার চেষ্টা করেন। বাজেট নাকি অন্য কোন বিষয়ে বলতে গেলে আওয়ামী লীগ সদস্যরা ভীষণ ক্ষেপে যান শাহেদ আলীর উপর। একটা পেপার ওয়েট নিক্ষিপ্ত হয় শাহেদ আলীর কপালে। কে মেরেছিল আন্দাজ করতে পারলাম না উনি কপালে হাত চেপে ধরেছিলেন। তবে সেদিন শেখ মুজিব হাউসকে শান্ত করার পরিবর্তে গরম করেছিলেন সবচেয়ে বেশি। প্রথমেই দেখলাম চেয়ার নিয়ে স্পীকারের দিকে তেড়ে যেতে। মুজিবের অন্য সাঙ্গ পাঙ্গরা সাথে ছিল পুরো অধিবেশনে ভীষণ হট্টগোল লেগে গেল। লাউড স্পীকার বন্ধ। পরে দেখলাম শাহেদ আলীকে রক্তাক্ত অবস্থায় পুলিশ তুলে নিয়ে যাচ্ছে। তার কয়েকদিন পরে শাহেদ আলী পাটোয়ারী মারা গেলেন। (দৈনিক ইনকিলাব ২২ এপ্রিল, ১৯৯২)

সবকিছু দেখে সাধারণভাবে মনে হয় এসব ঘটনা ক্ষমতা প্রেমিকদের অর্ন্তদ্বন্দ্ব থেকে উদ্ভূত। কিন্তু যারা এসব অপকান্ডের মাধ্যমে দেশকে হতাশার দিকে নিয়ে চলছিল তারা কিন্তু কাজ করছিল সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার ছক ধরেই। উপমহাদেশের মুসলমানদের কাংখিত পাকিস্তান ছিল একটি ভুল পদক্ষেপ, এটাই প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন তারা। যুক্তফ্রন্ট শাসনামলে তারা আংশিক ভাবে সফলও হয়েছিলেন। তথাকথিত প্রগতিবাদীদের সপক্ষীয় লেখক ডক্টর এম এ হান্নান তার গ্রন্থে লিখেছেন– '১৯৫৪ থেকে ১৯৫৮ সাল পর্যন্ত পূর্ববাংলার রাজনৈতিক জীবনে এক ভয়ঙ্কর দুঃসহ যন্ত্রণাদায়ক পরিস্থিতি বিরাজ করছিল। এর পেছনে প্রতিক্রিয়াশীল গোষ্ঠীর ষড়যন্ত্র ছিল এ সম্পর্কে কোন বিতর্ক নেই। কিন্তু তৎকালীন রাজনীতিবিদদের ছেলেমিপনা এবং দায়িত্বহীনতা সেদিন জাতিকে যেভাবে দুর্যোগপূর্ণ পরিস্থিতিতে নিপতিত করে দেয় তাতে একমাত্র প্রতিক্রিয়াশীলদের ঘাড়ে দোষ চাপালে আসল ঘটনা চাপা দেয়া হয় এবং বলা চলে সে সময় তাদের কাণ্ডজ্ঞানহীনতা ছিল প্রতিক্রিয়াশীলতারই নামান্তর। (বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ৪৯)

সমকালীন রাজনৈতিক নেতা এবং দলসমূহের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড এবং আত্মস্বার্থপরতার অনিবার্য পরিণতি হিসেবে সামরিক আইন জারি হল সামগ্রিক

www.pathagar.com

হতাশার মধ্যে আশার আলো দেখল মানুষ। পাকিস্তানের বিরোধিতা এবং সামরিক আইনের তীব্র সমালোচনা করেও জনাব এম এ হান্নান তার গ্রন্থে স্বীকার করেছেন– 'তাই একথা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে প্রথম সামরিক আইন জারীর সংবাদ মানুষ শুধু মেনেই নিল না তারা এ থেকে অতিরিক্ত আশাবাদীও হয়ে উঠল। সারা দেশে কথিত দুর্নীতি ও অনিয়মের বিরুদ্ধে সামরিক শাসন, সাধারণেরা ইতিবাচক পদক্ষেপ হিসাবেই গ্রহণ করল। পাশাপাশি রাজনীতিবিদ ও ছাত্র নেতাদের নির্বিচার গ্রেফতার ও নির্যাতনকে মানুষ এ থেকে আলাদা করে দেখতে চাইল না।' (প্রাগুক্ত, পৃঃ ৪৪)

বিচ্ছিন্নতাবাদী বাম তৎপরতার সাথে আওয়ামী নেতৃবৃন্দ

সামরিক বিপ্লবের সাথে সাথে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড বেআইনী ঘোষিত হওয়ায় পরিস্থিতি অত্যন্ত শান্ত বলেই মনে হয়েছিল। দেশের পরিস্থিতি পরিপূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকা সত্ত্বেও অদৃশ্য প্রক্রিয়ায় রাজনৈতিক ধারাবাহিকতা রক্ষার প্রয়াস চলছিল সর্বত্র। ছাত্ররা সাংস্কৃতিক সংগঠনের আড়ালে তাদের প্রচারাভিযান এবং সাংগঠনিক তৎপরতা অব্যহত রেখেছিল। বিশেষ করে কমিউনিষ্টদের তৎপরতায় প্রাণসঞ্চার হয়েছিল বেশি করে। এর কারণ এরা গোপন তৎপরতায় ছিল সিদ্ধহস্ত। এছাড়াও এদের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা এবং আদর্শিক লক্ষ্য থাকার কারণে নিয়মিত প্রশিক্ষণের মধ্য দিয়ে দক্ষ রাজনৈতিক কর্মী সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়। এরাই সময়ের স্রোতধারায় এক সময় আবেগপ্রবণ ও মেধাশূন্য আওয়ামী লীগ কর্মীদের রাজনৈতিক গুরুতে পরিণত হয়। এরাই তরুণদের মধ্যে বিপ্লবের মন্ত্র দিতে থাকে। এদের প্ররোচনায় সামরিক বিপ্লবের পরবর্তী মাসে বৃহত্তর ময়মনসিংহ জেলার জামালপুরে ইস্টবেঙ্গল লিবারেশন পার্টি গঠিত হয়। কতিপয় আওয়ামী লীগ ও ন্যাপ কর্মী সমন্বয়ে গঠিত এই গোপন সংগঠনের মূল লক্ষ্য ছিল সসস্ত্র বিপ্লবের মাধ্যমে পূর্ববাংলাকে মুক্ত করা। ডিসেম্বরে নেত্রকোনা এবং টাঙ্গাইলে এর বিস্তৃতি ঘটে।

১৯৫৯ সালের ফেব্রুয়ারীতে ব্রহ্মপুত্র নদীতে একটি বড় নৌকায় সংগঠনের সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ১৯৫৯ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকায় এ পার্টি তার প্রথম শাখা খোলে।

www.pathagar.com

এরপর পার্টির নেতৃস্থানীয় কর্মীরা ভারতে চলে যায়। অস্ত্র ও অর্থ সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ভারত থেকে তারা কিছু পোস্টার ও প্রচারপত্র ছাপিয়ে আনে। এগুলি প্রধানত রাজনৈতিক নেতা ও প্রদেশের বিভিন্ন বার লাইব্রেরী, স্কুল ও কলেজের নামে ডাকে পাঠানো হতো। শেরেবাংলা এ, কে, ফজলুল হক, শহীদ সোহরাওয়ার্দী প্রমুখ নেতৃবৃন্দ এদের তৎপরতা সম্বন্ধে অভিহিত ছিলেন। শেখ মুজিবের সাথে লিবারেশন ফ্রন্টের কর্মীরা যোগাযোগ রাখতো এবং শেখ মুজিব তাদের অর্থ সাহায্য করতেন তার একাধিক প্রমাণ পাওয়া যায়। (স্বাধীনতার দলিল অষ্টম খণ্ড, পৃঃ ৩১)

অন্য এক সূত্রে জানা যায় এদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করেন সোহরাওয়ার্দীর সহকর্মী আবুল মনসুর আহমদ। ১৯৫৯ সালে এইসব অতি বিপ্লবীরা সোহরাওয়ার্দী এবং ইত্তেফাক সম্পাদক মানিক মিয়ার সাথে সাক্ষাৎ করে এবং পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার পরিকল্পনার কথা বলে। দু'জনেই এ ব্যাপারে নিরুৎসাহি মনোভাব প্রদর্শন করে। কিন্তু আবুল মনসুর আহমদের সহযোগিতায় তারা ভারতীয় কুটনীতিক বি এম ঘোষের সাথে সাক্ষাৎ করে এবং দিল্লীতে প্রধামন্ত্রী পণ্ডিত নেহেরুর সাথে কথা বলে। নেহেরু তিনি এ দেশের তরুণদের উৎসাহিত করলেও এজন্যে বৈষয়িক সাহায্য সহযোগিতা দেয়ার ব্যাপারে অঙ্গীকার করেননি। তবে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে প্রচারপত্র ছাপিয়ে দেয় এবং গোয়েন্দা বিভাগের সহযোগিতায় নিরাপদে সীমান্ত অতিক্রমের ব্যবস্থা করে। কিন্তু ফেরার পথে তারা তাদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারী পরোয়ানার কথা জানতে পারে। কয়েকজন গ্রেফতারও হয়। (মেজর রফিকুর ইসলাম, মুক্তিযুদ্ধের প্রেক্ষাপট)

আটককৃত তরুনদের জবানবন্দী অনুসারে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীকে অভিযুক্ত করা হয়। কেন্দীয় গোয়েন্দা সংস্থার রিপোর্টের ভিত্তিতে ১৯৬২ সালের ৩০ শে জানুয়ারী সোহরাওয়ার্দীকে গ্রেফতার করা হয়। এই গ্রেপ্তারীর প্রতিবাদে ১লা ফেব্রুয়ারী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র ধর্মঘট অনুষ্ঠিত হয়। তৎকালীন স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রেরিত পুলিশ কর্মকর্তার প্রতিবেদনে বলা হয়– '১৯৬১ সালের শেষার্ধ থেকে বে-আইনী ঘোষিত কমিউনিষ্ট পার্টি এবং আওয়ামী লীগের মধ্যে কয়েক দফা বৈঠক হয়। সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী এ ব্যাপারে দুই দলের মধ্যে মধ্যস্থতা করেন। আওয়ামী লীগ থেকে শেখ মুজিব ও তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া এবং কমিউনিষ্ট পার্টি থেকে মনি সিংহ ও খোকা রায় এসব গোপন

www.pathagar.com

বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন। আন্দোলনের প্রশ্নে কয়েকদফা কার্যক্রমের খসড়া তারা অনুমোদন করেন। ঠিক হয় আইয়ুবের প্রস্তাবিত শাসনতন্ত্র জারী হওয়ার সাথে সাথে বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস থেকে ছাত্রদের দিয়ে প্রথম আন্দোলনের সূত্রপাত হবে এবং পরবর্তী সময়ে আওয়ামী লীগ ও বামপন্থীরা সম্মিলিতভাবে সারা দেশে ছড়িয়ে দেবে।'

আন্দোলনের রূপরেখা ও কর্মসূচী প্রণয়ন করেছিল কমিউনিষ্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি। বিচিত্র ঈদ সংখ্যা, ১৯৭৭)

বৈঠকে আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিব কর্মসূচীতে স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান দাবীকে অন্তর্ভুক্ত করার প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি বৈঠকে বলেন– 'ওদের সাথে আমাদের আর থাকা চলবে না। তাই এখন থেকেই স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের জন্য আন্দোলন গড়ে তুলতে হবে।'

'কমিউনিষ্ট পার্টি অবশ্য নীতিগতভাবে এ ব্যাপারে একমত ছিলেন। তারা মনে করতেন এ দাবীর মধ্যে জাতীয় আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকারের প্রশ্নটি নিহিত রহিয়াছে। ভবিষ্যতে পূর্ব পাকিস্তানে একটি স্বতন্ত্র স্বাধীন জাতীয় রাষ্ট্র গড়িয়া উঠা আমরা অস্বাভাবিক বা অসম্ভব মনে করি না।' (খোকা রায়, সংগ্রামের ৩ বছর, পৃঃ ১৮২)

লাহোর প্রস্তাবের সংশোধন এবং এক পাকিস্তানের প্রস্তাবক হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পঞ্চাশ দশকে পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনার বিকাশে মর্মাহত হলেও এর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা নিতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তাকে ঘিরেই বিচ্ছিন্নতাবাদীরা পাকিস্তান ধ্বংসের প্রস্তুতি নিচ্ছিল। তিনি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারলেন না কেন? যে শেখ মুজিবকে সোহরাওয়ার্দী 'ইলিটারেট গ্রাজুয়েট' হিসাবে অভিহিত করতেন, যে মুজিব সম্পর্কে তিনি বলতেন– 'শেখ মুজিব যদি ঘটনাচক্রে দেশের সর্বোচ্চ নেতা হয় তাহলে সে প্রথম দেশ ধ্বংস করবে পরে তার নির্বুদ্ধিতার জন্য সে নিজেকেও ধ্বংস করবে।' (কনসেপ্ট, ১৯৮৯), অপরিনামদর্শী শেখ মুজিব সম্পর্কে সঠিক ধারণা পোষণ করা সত্ত্বেও সোহরাওয়ার্দী তাকে শুরু থেকেই প্রশ্রয় দিয়েছিলেন, তার অগ্রগতির সোপান রচনা করেছিলেন, তার সব অপকর্মের বৈধতার প্রলেপ দিয়েছেন এবং তার মাথার উপরে ছায়া বিস্তার করে রেখেছিলেন। কিন্তু কেন?

এর কারণ একটিই সেটা হল রাজনৈতিক সুবিধাবাদ। তার নিস্পৃহতার কারণে বিচ্ছিন্নতাবাদী চেতনা এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছিল যে তিনি এর বিরুদ্ধে

www.pathagar.com

কঠোর হলেই তাকে অনেক নেতা ও কর্মীকে হারাতে হত। তিনি সর্বশেষ বার্তায় বিচ্ছিন্নতার ব্যাপারে সতর্ক হওয়ার আহবান জানালেও তার দলে এর কোন প্রতিক্রিয়া হয়নি। তিনি মরে বেঁচেছিলেন। বিশাল জন সমর্থনের সম্মান নিয়ে তিনি আজো বেঁচে আছেন। আর এই সোহরাওয়ার্দীই যদি আরো কিছুদিন বেঁচে থাকতেন তাহলে হয় তাকে বিচ্ছিন্নতাবাদের সহযোগী হতে হতো অথবা তার অনুসারীদের দ্বারাই তিনি প্রত্যাখ্যাত হতেন।

প্রয়োজন হল একটি রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব

পাকিস্তান বিরোধী ভিন্ন চিন্তার উদগাতা মূলত কমিউনিষ্ট পার্টি হলেও তারা এগুতে চাচ্ছিল অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এবং সুপরিকল্পিতভাবে ধারাবাহিক পদ্ধতির মধ্য দিয়ে। তারা পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার মহাপরিকল্পনা নিয়ে অত্যন্ত সতর্ক পদক্ষেপে এদেশের রাজনীতির উপর প্রভাব বিস্তার করে চলছিল। পাকিস্তানের বিরুদ্ধে নতুন প্রজন্মের মনমানসিকতা বিষিয়ে তুলেছিল। সব রকম ঝুঁকি এড়িয়ে এমনভাবে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছিল যাতে পাকিস্তান সরকারের আক্রোশ তাদের উপর এসে না পড়ে। তাদের প্রয়োজন ছিল একজন লঘুচেতা আনাড়ী অদূরদর্শী রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব যাকে দিয়ে বিচ্ছিন্নভাবে সমুদয় কাজ করানো সম্ভব হবে। প্রথম তারা ভাসানীকে ব্যবহার করার চেষ্টা নেয়। তাকেই বামপন্থীরা রাজনৈতিক ঢাল হিসাবে ব্যবহার করে। ঝানু কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ তার উপর কখনোই আস্থা রাখতে পারেননি। এর মূল কারণ তার ধর্মীয় অনুভূতি। এ ছাড়াও দিল্লীর স্বার্থের পক্ষে ভাসানীকে ব্যবহার করা সম্ভব হবে না এটা ভাল করেই জানতেন কমিউনিষ্ট নেতৃবৃন্দ। তারা এটুকু ভাল করেই বুঝতেন যে মওলানা ভাসানীর প্রশ্নাতীত দেশপ্রেম তাকে হিন্দুস্থানের ক্রীড়ানক হতে বাধা দিবে। এমনকি আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে তিনি বেঁকেও বসতে পারেন। সোহরাওয়ার্দীকে কমিউনিষ্টরা কোন কোন বিশেষ ক্ষেত্রে ব্যবহার করতে সক্ষম হলেও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে তার মত দূরদর্শী নেতাকে ব্যবহার করা সম্ভব হয়নি। যে কারণে উচ্চ পর্যায়ের নেতৃবৃন্দের দিক থেকে কুচক্রীরা তাদের দৃষ্টি ফিরিয়ে নেয়। চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্জনের জন্য তাদের প্রয়োজন ছিল দেশপ্রেমশূন্য আত্মস্বার্থপর অদক্ষ মাঝারী পর্যায়ের ব্যক্তিত্ব। পঞ্চাশের দশকে রাজনৈতিক কর্ম প্রবাহের মধ্য দিয়ে বাবুচক্র এবং বামপন্থীরা সেই প্রত্যাশিত ব্যক্তিকে আবিষ্কার করে, যার মধ্যে ছিল উচ্চাভিলাষ এবং দুর্নিবার ক্ষমতার মোহ। বামপন্থী,

www.pathagar.com

বাবুচক্র এবং কোলকাতা কেন্দ্রিক বুদ্ধিজীবীরা মুজিবকেই লক্ষ্য অর্জনের কেন্দ্রবিন্দু করার উদ্যোগ নেয়। মুজিবকে সাধারণ মানুষের গ্রহণযোগ্য করে তোলার জন্য ব্যাপক প্রচার প্রোপাগান্ডার উদ্যোগ নেয়া হয়। সে সময় এদেশের মিডিয়াসমূহ বামপন্থীদের দখলে থাকায় বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন এবং শেখ মুজিবের ভাবমূর্তি গড়ে তোলার কাজটি সহজভাবে সম্পন্ন হয়। কমিউনিষ্ট এবং বাবুচক্র পাকিস্তানকে ধ্বংস করার দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার বাস্তবায়ন পর্যায়ক্রমে শুরু করলেও ক্ষমতালোভী শেখ মুজিব ও তার সহযোগীরা ষড়যন্ত্রের ফাঁদে পা দেয়ার পর অপরিপক্ক বিচ্ছিন্নবাদের পরিকল্পনা আন্দোলনের দিকে অগ্রসর হতে থাকে। যেটাকে কমিউনিষ্ট পার্টি বিপদজনক মনে করতো।

স্বায়ত্ব শাসন দাবীর আড়ালে বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন

কমিউনিষ্ট পার্টির ভাষায়– 'স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তানের দাবী একটি হটকারী দাবী তাই বর্তমানে আমরা পরিপূর্ণ স্বায়ত্তশাসনের দাবী উত্থাপন করিব।... কিন্তু যাহারা স্বাধীন পূর্ববাংলা দাবী উত্থাপন করিবেন আমরা তাদের প্রতি সহানুভূতিশীল থাকিব। (খোকারায়, সংগ্রামের তিন দশক, পৃঃ ১৮২)

মনিসিং ও অমল সেন দুটি ভিন্ন সাক্ষাৎকারে বলেন– 'সত্যকথা বলতে কি আমরা ভাবিনি পূর্ব পাকিস্তানের স্বাধীনতার বিষয়টি এত দ্রুত আগাবে। তবে আকাঙ্খা ছিল এবং বিশ্বাসও ছিল।'

'১৯৬২ সালে ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান নতুন সংবিধান জারি করেন। এবং সংবিধান মোতাবেক এপ্রিল মাসের ২৮ তারিখ জাতীয় পরিষদ নির্বাচন ও মে মাসের ৬ তারিখে প্রাদেশিক নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে সময় নির্বাচন এবং সংবিধান বিরোধী আন্দোলনের প্রস্তুতি চলতে থাকে। সোহরাওয়ার্দী সংবিধান বাতিলের পক্ষপাতি ছিলেন। তিনি নির্বাচনকেও নাকচ করেননি। অথচ রাজনীতিকদের একাংশ সরকার বিরোধী আন্দোলনের নামে দেশকে গভীর সংকটের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছিল।

তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তান সরকারের স্বরাষ্ট্র (রাজনৈতিক) দপ্তরের (১৪ই ফেব্রুয়ারী, ১৯৬২) প্রতিবেদনে বলা হয়– কিছু নিষিদ্ধ ঘোষিত রাজনৈতিক দলের সমর্থকরা বিশেষতঃ কমিউনিষ্টরা এবং অন্যান্য উগ্রপন্থীরা গন্ডগোল সৃষ্টি করে আইন শৃংখলা পরিস্থিতিকে গুরুতরভাবে ঘোলাটে করার জন্য বদ্ধপরিকর।

www.pathagar.com

সংবিধান বিষয়ে লেশমাত্র ধারণা না থাকা সত্ত্বেও, কমিউনিষ্টরা এবং আওয়ামী লীগের সেই অংশ বিশেষ দাবী তুলতে আরম্ভ করেছে যে সংবিধান একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়, তা বাদ দিতে হবে। মনে হয় যে, তাদের কর্মপন্থা হবে ছাত্রদের উস্কিয়ে দিয়ে তাদের মাধ্যমে মিছিল বের করা, রাষ্ট্রপতির ছবি পুড়িয়ে নষ্ট করে তাকে অপমান করা অর্থাৎ প্রকৃত সরকারী কর্মকর্তাদের এতদূর উত্যক্ত করা যে শেষ অবধি যাতে শক্তি ব্যবহারের কথা হয় এবং তখন সেই শক্তি প্রয়োগের ঘটনাকে ভিত্তি করে কর্মকর্তাদের বিরুদ্ধে ব্যাপক আন্দোলন গড়ে তোলা।'

সরকার গোয়েন্দা সংস্থা রিপোর্টের ভিত্তিতে পূর্ব পাকিস্তানের ক্রমবর্ধমান বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতা লক্ষ্য করে অত্যন্ত সতর্ক হয়ে উঠে। সাধারণ মানুষের যদিও এ ব্যাপারে কোন রকম ভ্রুক্ষেপ ছিল না। কিন্তু দেশপ্রেমিক নেতৃবৃন্দ এ ব্যাপারে নির্বিকার ছিলেন এমনটি বলা যাবে না। সকলেই কম বেশী পরিস্থিতি আঁচ করেছিলেন যথাসময়ে। যেমন– 'বিচ্ছিন্নতাবাদী কার্যকলাপে উদ্বিগ্ন পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কাউন্সিল) সভাপতি খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে নভেম্বর (১৯৬২) রাত্রিতে অনুষ্ঠিত কাউন্সিল সভায় ভাষণ দানকালে মন্তব্য করেন– 'পাঁচ বৎসর কাল ঢাকায় অবস্থানকালে বিভিন্ন স্তরের লোকজন যাহার অধিকাংশই আমার বন্ধুবান্ধব ও সহকর্মী আমার সহিত সাক্ষাৎ করিয়াছেন। তাহাদের নিকট হইতে আমি জানিতে পারিয়া ব্যথিত হইয়াছিলাম যে বৃহৎ জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিছিন্ন হইবার ব্যাপারে কানাঘুষা চলিতেছে। দু'র্ভাগ্যবশত পশ্চিম পাকিস্তানীদেরও একটি অতিক্ষুদ্র অংশ এই মতের সমর্থক। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, পৃঃ ৩৩২)

বিচ্ছিন্নতাবাদে মার্কিন ইন্ধন

চীন ভারত যুদ্ধের কারণে ভারতে মার্কিনীদের ঢালাও সাহায্যের প্রেক্ষিতে পাকিস্তান মার্কিনীদের প্রতি বিরূপ হয়ে উঠে। চীনের সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক স্থাপনের কারণে আমেরিকাও পাকিস্তানের প্রতি অসন্তুষ্ট হয়। পাকিস্তানে মার্কিন বিমান ঘাঁটি তুলে দেয়া হয়। ফলে মার্কিনীরা পাকিস্তানের প্রতি আরও ক্ষুব্ধ হয়। আইয়ূব সরকারকে বিপর্যস্ত করার উদ্দেশ্যে গণআন্দোলন গড়ে তোলার জন্য আমেরিকা তার আভ্যন্তরীণ লবিকে প্রয়োজনীয় মদদ দিয়ে সক্রিয় করে তোলে। সমাজতান্ত্রিক চীনের সাথে বন্ধুত্ব স্থাপন এবং রাশিয়ার সাথে সুসম্পর্ক স্থাপনের সৌজন্যে তাদের আভ্যন্তরীণ লবীগুলোকে সরকার প্রশ্রয় দিতে থাকে।

www.pathagar.com

জাতীয়তাবাদী আওয়ামী লীগের সক্রিয়তার প্রেক্ষিত সমাজতান্ত্রিক দলগুলো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং সরকার বিরোধীতায় পরস্পরের প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হয়। অন্যদিকে লবি বহির্ভূত নির্ভেজাল দেশপ্রেমিক শক্তিসমূহ আন্দোলনে পিছিয়ে রইলো না। মোটের ওপর মার্কিন মদদপূষ্ট হয়ে আওয়ামী লীগ শক্ত অবস্থান নিতে সক্ষম হয়। পাকিস্তানের প্রতি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রচ্ছন্ন বৈরিতা বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে আওয়ামী লীগকে অনুপ্রাণিত করে।

'১৯৬৩ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত ঘোষণা করেন যে পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত মার্কিনী সাহায্য হইতে পূর্ব পাকিস্তানীদের অংশ পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্তানীরা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেই পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে অধিকতর সহানুভূতিশীল মনে করিবার ইন্ধন পাইয়া গেল। সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনতাকে উস্কানী দান করাই ছিল উপরোক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব এই সময়ে সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব চীন সোভিয়েতের সহিত ঘনিষ্ঠ হওয়ার কারণে সাম্রাজ্যবাদী সামরিক জোটের প্রতি উৎসাহ হারিয়ে ফেলেন। কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্যই মার্কিন সরকার নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। এই প্রচেষ্টায় শেখ মুজিব দাবার ঘুঁটি হইতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠাবোধ করেন নাই। শক্তিশালী দোসর হিসাবে তাহার সহিত যোগ দেয় দৈনিক ইত্তেফাক।

পক্ষান্তরে আইয়ুব সরকার কর্তৃক পুনঃ পুনঃ লাঞ্ছিত হওয়া সত্ত্বেও শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের সংহতি একাত্বতাও অখণ্ডত্ব রক্ষায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেন। কোন প্রকার প্রলোভন প্ররোচনা তাহাকে লক্ষ্যভ্রষ্ট ও বিচলিত করিতে পারে নাই।' (প্রাগুক্ত পৃঃ ৩৩২)

সংহতির পক্ষে সোহরাওয়ার্দী

১৯৬২ সালে গ্রেপ্তারের পর কারাগার থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে লেখা এক পত্রে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী বলেন– 'পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হলে পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হবে, পদানত হবে এবং ধ্বংস প্রাপ্ত হবে। সোহরাওয়ার্দী কখনই পাকিস্তান থেকে পূর্ব বাংলাকে বিচ্ছিন্ন করার কথা কল্পনাও করেননি। তার কাছে পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হওয়ার ধারণা ছিল অচিন্তনীয় অসম্ভব এক সমীকরণ। পত্রে তিনি লেখেন– 'পূর্ব পাকিস্তানকে হিন্দুস্থানের গোলামীতে আবদ্ধ

www.pathagar.com

করার কথা একজন মুসলমান কি কখনো চিন্তা করতে পারে?' তিনি আরো বলেন– 'ভারত বর্ষের মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমির জন্য পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছে। এ বিশ্বাসের ভিত্তিতে আমরা লড়াই করেছি। তিনি সু-নির্দিষ্ট করে বলেন- পাকিস্তান এক এবং অভিভাজ্য। এই জন্য আমরা জীবনবাজি রেখেছিলাম।' (ডক্টর সাজ্জাদ হোসেন, দি ওয়েষ্টেজ অব টাইম পৃঃ ২৩৮)

আওয়ামী লীগ নেতা হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী পাকিস্তানের ঐক্য ও সংহতির সপক্ষে থাকা সত্ত্বেও তার মানস সন্তান শেখ মুজিব তার উচ্চাভিলাস চরিতার্থ করার জন্য পাকিস্তান বিরোধী চক্রের সাথে হাত মিলিয়েছিলেন। নিখিল পাকিস্তানের প্রেক্ষাপটে রাজনৈতিক উত্তরনের সম্ভাবনা যাচাই করে শেখ মুজিব হতাশ হয়েছিলেন। তার অর্থ কড়ি, বিদ্যাবুদ্ধি রাজনৈতিক প্রজ্ঞা এবং সামাজিক অবস্থান কোনটিই ছিল না যা রাজনৈতিক উত্তরনের জন্য একান্তভাবে অপরিহার্য। এ সবের বাইরে তার কিছু গুণাবলী ছিল যা তার ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার জন্য কার্যকরী ভূমিকা রেখেছে। প্রথমতঃ তার ছিল দুঃসাহস এবং ঝুঁকি নেবার মত মানসিক শক্তি। দ্বিতীয়তঃ, তিনি ছিলেন আবেগময় বক্তা। অসংখ্য মিথ্যাচার এবং কাল্পনিক সম্ভাবনার আলো দেখিয়ে হ্যামিলনের বংশীবাদকের মত তরুণ সমাজকে সম্মোহিত করার দক্ষতা তার মধ্যে ছিল। এছাড়াও তার সাংগঠনিক শক্তিরও কোন রকম ঘাটতি ছিল না। এ কারণে প্রথম পর্যায়ে শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীর হাত ধরে রাজনীতির বেশ কিছুটা পথ অগ্রসর হলেন। অতঃপর যখন তার নিজস্ব প্রভাব বলয় সৃষ্টি হল তখন থেকে তিনি ভিন্ন আঙ্গিকে ভাবতে শুরু করলেন। কংগ্রেস নেতা মনোরঞ্জন ধর, মনিসিং প্রমুখ নেতৃবৃন্দ অর্থাৎ কমিউনিষ্ট এবং বাবুচক্রের সাহচর্যে নতুন সূত্রের সন্ধান পেলেন। পাকিস্তান বিরোধী চক্র মুজিবের মধ্যে খুঁজে পেল তাদের ইপ্সিত লক্ষ্য অর্জনের প্রয়োজনীয় উপাদান। দুটো অভিন্ন লক্ষ্য এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। মুজিব দেখলেন পূর্ববাংলাকে বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব হলে তিনি, একমাত্র তিনিই হয়ে উঠবেন একচছত্র নেতা। আর এ ব্যাপারে হিন্দুস্থান তাকে মদদ যোগাবে তাদের নিজস্ব স্বার্থে। অর্থ সম্পদের ঘাটতি হবে না কখনো। আন্তর্জাতিক পর্যায়েও ভারত তার ভাবমূর্তি গড়ে তুলবে। এছাড়াও পূর্ববাংলার দু'শতাব্দীর সীমাহীন বঞ্চনাকে পাকিস্তানের ঘাড়ে চাপিয়ে আবেগপ্রবণ জনগণকে উদ্দীপ্ত করা যাবে অতি সহজে। শেখ মুজিব তার রাজনৈতিক গুরুকে না জানিয়েই হিন্দুস্থানের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিলেন। এটাকেও তিনি তার রাজনৈতিক উত্তরণের জন্য যথেষ্ট মনে করলেন না। অন্যদিকে ইউসুফ হারুন ভ্রাতৃদ্বয়ের মাধ্যমে আমেরিকা অর্থাৎ

www.pathagar.com

সিআইএর এজেন্ট হিসাবেও রাজনৈতিক ময়দানে কাজ শুরু করলেন। আমি আগেই বলেছি আমেরিকাও চাচ্ছিল আইয়ুব সরকারকে শায়েস্তা করতে। মুজিবের মাধ্যমে সিআইএ তার কার্যক্রম শুরু করে। আপাতত মুজিবের জন্য আমেরিকা এবং ভারতের মদদ সোনায় সোহাগা বলে পরিগণিত হল। এর ফলেই শেখ মুজিব প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন অব্যাহত রাখতে সক্ষম হলেন। জাতীয়তাবাদী বামপন্থী এবং হিন্দু এলিটদের সম্মিলিত প্রয়াসে সাংস্কৃতিক অঙ্গনে পুরোটাতেই পাকিস্তান বিরোধী চক্রের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। ১৯৪৮ সাল থেকে ভারতীয় দূতাবাস এদেশী বুদ্ধিজীবীদের উপর যেভাবে প্রভাব বিস্তার করে আসছিল সেটা ইতিমধ্যে পোক্ত হয়ে উঠেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরা Two economy theory বিশ্লেষণ করার পর পূর্ব পশ্চিমের মানসিক ব্যবধান দ্রুত বাড়তে থাকে। বিশ্লেষণে পূর্ব পশ্চিমের অর্থনৈতিক বৈষম্য প্রকটভাবে উপস্থাপন করা হয়। অবিশ্য এটা করা হয় ১৯৪৭ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে উত্তরাধিকার সূত্রে পাওয়া অর্থনৈতিক অবস্থান বিবেচনায় না এনে। অধ্যাপকদের এই বিশ্লেষণে বিচ্ছিন্নতাবাদী প্রবণতায় আর একমাত্রা যুক্ত হয়। ষড়যন্ত্রকারীরা যৌক্তিক অবস্থানে দাঁড়িয়ে তাদের তৎপরতা চালানোর সুযোগ পায়।

সোহরাওয়ার্দী কারাগার থেকে বেরিয়ে এসে দেখলেন দেশের রাজনৈতিক শূন্যতা এবং রাজনীতিকদের বিভ্রান্তিকর পদচারণা। অনেক ভেবেচিন্তে তিনি ভিন্ন রাজনৈতিক পদক্ষেপ গ্রহণ করলেন। সংবিধান বাতিলের আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্যায়ে সংবিধান গণতন্ত্রায়নের আওয়াজ তুলে দেশের বিভ্রান্তিকর উচ্ছৃংখল রাজনীতিকে গঠনমূলক আন্দোলনের দিকে ধাবিত করতে চাইলেন। কিন্তু সোহরাওয়ার্দী বেশীদূর অগ্রসর হতে পারলেন না। মরণ ব্যাধি তাকে দেশান্তর করল। তিনি চিকিৎসার উদ্দেশ্যে লন্ডন গমন করলেন। সোহরাওয়ার্দীর অনুপস্থিতির কারণে এন ডি এফ অর্থাৎ জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টের রাজনৈতিক তৎপরতা স্তিমিত হয়ে পড়ে। দেশ নিক্ষিপ্ত হয় ষড়যন্ত্র চক্রান্ত ও বিচিছন্নতাবাদের কুটিল আবর্তে। সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন জাতীয় ভিত্তিক সার্বজনীন আবেদন নিয়ে রাজনীতি করতে, চেয়েছিলেন এর মাধ্যমেই আঞ্চলিক সমস্যার সমাধান। কিন্তু তার সহকর্মী শেখ মুজিব চেয়েছেন সুদূর প্রসারী জাতীয় ভাবনা পরিত্যাগ করে তার রাজনৈতিক উত্থানে জন্য আঞ্চলিকতাকে উৎকটভাবে ব্যবহার করতে। সোহরাওয়ার্দী চেয়েছিলেন এনডি-এফ এর মাধ্যমে জাতীয় ঐক্য। কিন্তু শেখ মুজিব চেয়েছিলেন আওয়ামী লীগ পুনর্জীবিত করে ঐক্যবদ্ধ

www.pathagar.com

শক্তিকে খন্ডিত করতে। সোহরাওয়ার্দীর ছিল সুদূরপ্রসারী ভাবনা শেখ মুজিবের ছিল নগদ প্রাপ্তির আকাঙ্খা। এর ফলে ষড়যন্ত্রের রাজনীতিতে মেতে উঠলেন মুজিব। ষড়যন্ত্রের রাজনীতির সাথে জড়িত করতে চাইলেন তার রাজনৈতিক গুরু সোহরাওয়ার্দীকে। কিন্তু শেষ অবধি শেখ মুজিব সোহরাওয়ার্দীকে ব্যবহার করতে সক্ষম হননি।

১৯৬৪ সালে সোহরাওয়ার্দী চিকিৎসার জন্য লন্ডনে থাকাকালীন সময়ে শেখ মুজিব তার সাথে সাক্ষাত করেন। পূর্ববাংলাকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলনের জন্য অনুমোদন চাইলে সোহরাওয়ার্দী বিক্ষুদ্ধ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন এবং যশোহরের মিয়া আবদুর রশিদের মাধ্যমে প্রেরিত এক চিঠিতে ষড়যন্ত্রের ব্যাপারে দলীয় নেতৃবৃন্দকে সাবধান করে দেন। এ ছাড়াও শেখ মুজিবের আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাবের মধ্যেও সোহরাওয়ার্দী জাতীয় স্বার্থ বিরোধী এক গভীর ষড়যন্ত্র আঁচ করতে সক্ষম হন। 'তাই জনগণের সার্বভৌমত্ব প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের একনিষ্ঠ সোহরাওয়ার্দী তাহার রোগশয্যা পার্শ্বে দন্ডায়মান শেখ মুজিবর রহমানের আওয়ামী লীগ পুনরুজ্জীবনের প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন এবং জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্টকে শক্তিশালী করার ব্যাপারে তাহাকে নির্দেশ দান করেন। ইহা সহজেই অনুমেয় যে, শেখ মুজিবর রহমান তা হৃষ্টচিত্তে গ্রহণ করিতে পারেন নাই।' (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৩৭)

সেই একাই লন্ডন সফরে শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্ন করার আন্দোলনে ফিডেল ক্যাষ্ট্রোর সহযোগিতার জন্য কিউবার দূতাবাসের সাথেও যোগাযোগ করেন। (আফসান চৌধুরী স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রস্তুতি পর্ব সাপ্তাহিক বিচিত্রা, পৃঃ ৩৩৭)

এককালের আওয়ামী লীগের প্রেসিডিয়াম সদস্য মিঞা আব্দুর রশিদ "দৈনিক মিল্লাত"–এ ০৫-১২-১৯৮৯ইং তারিখে শহীদ সোহরাওয়ার্দীর জীবনের শেষ দিনগুলো" নামে এক দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখেন। তার সংগে আওয়ামী লীগ প্রধান হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দীর লণ্ডনের ১১ নং ব্রুক ল্যান্ড রাইস ছিল" বাসায় যে কথা হয়েছিল তা এখানে হুবহু উল্লেখ করছি। যা পূর্বে উল্লেখিত মরহুম আশরাফুদ্দিন চৌধুরীর কথার সংগে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

"পরবর্তীতে গঠিত DAC-NDF এবং PDP এর নেতৃবৃন্দ তাঁর (সোহরাওয়ার্দী) নেতৃত্বে একটি Common platform গঠন করে আইয়ুব খানের সামরিক

www.pathagar.com

শাসনের বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন গড়ে তোলার জন্য মিঞা আব্দুর রশিদকে লন্ডনে পাঠান। নভেম্বর মাসের শেষ কোন একদিন সকালে বিমান থেকে নেমে সোজা সোহরাওয়ার্দী সাহেবের কামড়ার সামনে পৌঁছলে তিনি ভিতরে সোহরাওয়ার্দীর হুংকার শোনতে পান। তাই মিঞা সাহেব ভিতরে না ঢুকে বাইরে দাঁড়িয়ে থাকনে কিছুক্ষণ। যে নেতাকে তিরস্কার করা হয়েছে সেই নেতা (শেখ মুজিব) কামড়া থেকে বের হয়ে গেলে তিনি (মিঞা আব্দুর রশিদ) ভিতরে ঢুকেন। ঢুকার সংগে সংগেই তাকে সোহরাওয়ার্দী সাহেব বলতে থাকেন ঃ This scoundrel wants to destroy the country and I coun't he a party to that. I must to back to Dhaka to save my country from the Indian conspiracy. You must be careful, he will not only destroy your country but he will destroy all of you. দৈনিক মিল্লাত : তারিখ ০৫-১২-১৯৮৯ইং।

"রাজ বিরুধী পুস্তকের ১৮৩/১৮৪ পৃষ্ঠায় রাজ বিরুধী আশরাফুদ্দিন আহম্মদ চৌধুরী পাকিস্তানের আনুগত্যের সিদ্ধান্ত ছিল চূড়ান্ত জীবন সায়াহ্নে ১৯৭০ সালের নির্বাচন কালের সেই প্রচন্ড গণজোয়াড়ের মোখমুখি এসে দাঁড়িয়েছেন আশরাফুদ্দিন... আশরাফের বাড়ীর চার পাঁচ মাইলের মধ্যে জনসভা দেশের ছেলেরা তাকে রুকে দাঁড়ালো। ছাব্বিশটি সুনির্দিষ্ট প্রশ্নের জবাব দেওয়ার জন্যে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে তাকে। নইলে আরম্ভ করা সম্ভব হচ্ছে না উত্তেজিত ছেলেদের উচ্ছৃংখলতায়। তথাকথিত বাংগালী জাতীয়তাবাদের এক দুশমণকে তারা আজ পেয়ে গেছে.... একথা বলে মাইকের সামনে ধরলাম ও অসংযত বিদ্রূপ ধ্বনিতে ....বাধা প্রাপ্ত হলেন। এ বিচ্ছৃংখলার মধ্যে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে রইলেন আশরাফ কিছুক্ষণ। হঠাৎ নিকটেই একটা ঢিল পড়লো। সংগে সংগেই প্রচণ্ড ধমক ফেটে পড়লো। শোন, তোমাদের প্রশ্নের জবাব দু'মিনিটে আমি দিয়ে দিচ্ছি। ভবিষ্যতের জন্যে লিখে রাখ আমার কথাগুলো ঃ (১) ইসলামের মাজহাব একটি। তা হচ্ছে মুসলিম। (২) পূর্ব্ব দিকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে ভারতীয় সীমান্ত। তোমাদের নেতা ও তোমরা সে দিকেই চলতে শুরু করেছ। তোমরা বুঝ আর না বুঝ, আমি পরিস্কার দেখতে পাচ্ছি তোমরা কোথায় যাচ্ছ। আমি ১৯৪৭-এর ১৪ই আগস্ট কুমিল্লা টাউন হল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে পাকিস্তান জাতীয় পতাকাকে তসলিম জানিয়ে ছিলাম। আজও আমি সেখানেই আছি। খোদা হাফেজ"

রাজ বিরুধী পৃষ্ঠা ঃ ১৮৩/১৮৪
আশরাফুদ্দিন চৌধুরী।

www.pathagar.com

অর্থনীতির এই অলংঘনীয় নিয়মকে কোন তন্ত্রের পক্ষে বদলে দেয়া সম্ভব নয়। অথচ মার্ক্সবাদ লেনিনবাদ শ্রমজীবী মানুষের চোখের সামনে এক ভবিষ্যতের স্বপ্ন তুলে ধরে। যাতে মনে হয় বড় লোক না থাকলে সমাজে আর সমস্যা বা অভাব বলে কিছু থাকবে না। কিন্তু তা যে সম্ভব হয় না এটা রাশিয়া ও চীনের অভিজ্ঞতা থেকে আজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

যাই হোক, অব্যাহত কমিউনিষ্ট ষড়যন্ত্রের পাশাপাশি আর এক ষড়যন্ত্র বিকশিত হচ্ছিল। তথাকথিত ইনটেলিকচুয়ালদের ড্রইংরুমের সীমাবদ্ধ চত্বর পেরিয়ে সর্বত্র পল্লবীত হচ্ছিল ধীরে ধীরে। পর্দার অন্তরাল থেকে জাতীয়তাবাদ পা পা করে এগিয়ে আসছিল রাজনৈতিক মঞ্চের দিকে। এই জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ বৃটিশ শাসনামলে দ্বিজাতিতত্ত্বের বিরোধিতা করে এসেছে। শুরু থেকে শেষ অবধি এরাই জাতীয় মুক্তি আন্দোলনে মুসলিম লীগের সাথে একাত্ম না হয়ে স্বতন্ত্র স্রোতধারা প্রবাহিত করার চেষ্টা করে। এরা ছিল উপমহাদেশে হিন্দু প্রভুত্বের ছায়াতলে অবস্থানে বিশ্বাসী। এরা হিন্দু সংস্কৃতি ও হিন্দু মনমানসিকতার সাথে চিন্তা চেতনার দিক দিয়ে একাকার হয়ে গিয়েছিল। সাতচল্লিশে দেশ বিভাগের পর অর্থাৎ দ্বিজাতি তত্ত্বের বাস্তবায়ন হলে এরা রাজনৈতিক দিক দিয়ে হয়ে পড়েছিল দেউলিয়া। এদের কর্মতৎপরতা ড্রইংরুমের সীমাবদ্ধ চত্বরে বন্দী হয়ে পড়েছিল। এইসব জাতীয়তাবাদী খোঁড়া রাজনীতিকদের আগামী দিনগুলো নিক্ষিপ্ত হয়েছিল অনিশ্চয়তার অন্ধকারে। আবুল মনসুর আহমদ প্রমুখ অনেকেই মুসলিম লীগে শামিল হয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নেবার চেষ্টা করছিলেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও সত্য যে জিন্নাহর মৃত্যুর পর নবাব জমিদার সামন্তশ্রেণী ও আমলাদের হাতের খেলনা হয়ে গণ সংগঠন মুসলিম লীগ রাজনীতিতে কুয়াশা আর ঘোলা পানির আবর্ত সৃষ্টি করে। এই ঘূর্ণাবর্তে পাক খেয়ে জীবনমৃত জাতীয়তাবাদীরা তাজা হয়ে ওঠে। গা ঝাড়া দিয়ে ময়দানকে মাতিয়ে তোলার প্রয়াস নেয়। পর্দার অন্তরাল থেকে বাবুচক্র তাদের সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করে।

ওদিকে সোহরাওয়ার্দীর প্রতি সরকারও কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের আচরণ তাকে নতুন দল গঠনে উদ্বুদ্ধ করে।

মুসলিম লীগ নেতা মওলানা ভাসানী আসাম থেকে হিজরত করে তার প্রত্যাশিত পাকিস্তানে এলেও বৃটিশ যুগের বিদ্রোহী মানসিকতা পরিবর্তন করতে পারেননি। শীর্ষ স্থানীয় মুসলিম লীগের কর্মকান্ড তাকে আরও অস্থির উদভ্রান্ত করে তোলে।

www.pathagar.com

তিনি সদ্য স্বাধীন দেশে বিদ্রোহের আগুন না ছড়িয়ে গঠনমূলক ধীর পদক্ষেপে জাতীয় নেতৃত্বের যথাযথ পরিবর্তন আনতে পারতেন। তা না করে তিনি মুসলিম লীগ বিরোধী পাল্টা এক সংগঠন গড়ে তোলার ব্যাপারে অতি উৎসাহী ভূমিকায় অবতীর্ন হন।

গঠন হয় আওয়ামী মুসলিম লীগ। চিহ্নিত জাতীয়তাবাদীরা মুসলিম লীগ বিরোধী এই মোর্চার নিরাপদ আশ্রয়ে মাথা গুঁজে তাদের পুরানো সাবেকী মানসিকতা নিয়ে। জনাব সোহরাওয়ার্দীর চিন্তা চেতনা ও মন মানসকিতা আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদী ও একপেশে ছিল বলে মনে হয় না। তিনি তার নতুন সংগঠনের মাধ্যমে দেশসেবায় আত্মনিয়োগ করতে চেয়েছিলেন। যদিও এক সময় তার জাতীয়তাবাদী ধ্যান-ধারণা ছিল। যে কারণেই তিনি একদিন যুক্তবাংলার স্বপ্ন দেখেছিলেন। তার আজন্ম লালিত যুক্তবাংলার স্বপ্ন বাস্তবায়নে কায়েদে আযম তার হাত সম্প্রসারিত করলেও রামরাজ্য প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বিভোর হিন্দু নেতৃবৃন্দ তার প্রস্তাবিত যুক্তবাংলার পকিল্পনাকে ধ্বংস করে দেয়। এর পরেই তিনি তার জাতীয়তাবাদী ধ্যান ধারণাকে গঙ্গার জলে বিসর্জন দেন। তার জীবনের অত্যন্ত বাস্তব অথচ তিক্ত অভিজ্ঞতার আলোকে সম্ভবত পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগের প্রধান হিসাবে তিনি তার সংগঠনের নাম পরিবর্তন করতে চাননি। তিনি জাতীয়তাবাদীদের তথাকথিত ভাষার 'অসাম্প্রদায়িকীকরণ' অর্থাৎ মুসলিম শব্দ বাদ দিয়ে শুধুমাত্র আওয়ামী লীগ নামকণের বিরোধী ছিলেন। পক্ষান্তরে সংগঠনের সাম্প্রদায়িক চরিত্র পরিবর্তনের প্রবক্তা ছিলেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী।

১৯৫৫ সালের ২১-২৩ মে সদরঘাটে অবস্থিত রূপমহল সিনেমা হলে অনুষ্ঠিত আওয়ামী মুসলিম লীগের অধিবেশনে সংগঠনের নাম পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে রোপিত হয়েছিল ধ্বংসের বীজ। সোহরাওয়ার্দীর উপলব্ধি সম্ভবত এমনই ছিল যে সংগঠনের নাম পরিবর্তন হলে আগামী একদা এই সংগঠন পাকিস্তান ধ্বংসপ্রয়াসী হিন্দু কুচক্রীদের ক্রীড়নকে পরিণত হবে। জনাব সোহরাওয়ার্দী সংগঠনের নামের সাথে মুসলিম শব্দটি বাদ না দেয়ার ব্যাপারে ছিলেন অবিচল। কিন্তু কর্মীদের মনোভাব লক্ষ্য করে অনেক ভাবনা,অনেক চিন্তার পর ২২ মার্চ ভোর চারটায় তিনি তার আপত্তি প্রত্যাহার করেন। পরবর্তী ঘটনা প্রবাহ প্রমাণ করে যে সোহরাওয়ার্দীর আশঙ্কা মোটেওই অমুলক ছিল না। আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র এদেশী হিন্দুদের ক্রীড়নকে পরিণত হয়, তা নয়। ৫০ দশকেই আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে দিল্লীর দালালীতে উন্মত্ত হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে

www.pathagar.com

দেশকে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ হিন্দুস্তানের হাতে তুলে দিয়ে আজ অবধি জাতীয় স্বার্থ বিরোধী সর রকম অপকান্ডে নিয়োজিত রয়েছে।

মওলানা ভাসানীর আবেগ ছিল, উদ্দাম কর্মস্পহা ছিল, দুঃস্থ গণমানুষের জন্য ছিল অপরিসীম দরদ ও অন্তহীন সমবেদনা। তার উন্নাদনা ছিল কিন্তু তাতে প্রজ্ঞার যোগ ছিল না। দূরদর্শিতা ও ভারসাম্যের অভাবেই ভাসানীর কর্মকাণ্ড ভায়োলেন্সমুখী হয়ে ওঠে। পরবর্তীতে এই একমাত্র অনুভূতিপ্রবণ জনদরদী নেতাকে সমাজতন্ত্রী ও কমিউনিষ্টরা তাদের আত্মরক্ষার বর্ম হিসাবে ব্যবহার করে। মওলানা ভাসানী আমরণ অক্লান্ত পরিশ্রম করেও জাতিকে মুক্তি, প্রগতি ও সমৃদ্ধির দোর গোড়ায় আনতে ব্যর্থ হন। আমৃত্যু তিনি বুকভরা শূন্যতা নিয়ে অসীম আকাশের দিকে তাকিয়ে বিষের বাঁশী বাজিয়ে গেলেন। গেয়ে গেলেন ভাঙার গান। আর জাতির জন্য রেখে গেলেন একরাশ হতাশা।

আসামের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী স্যার সদরুল্লাহকে পাকিস্তানে এসে রাজনীতিতে অংশগ্রহণ করার জন্য সরকারীভাবে আমন্ত্রণ জানান হলে উত্তরে তিনি বলেন, মওলানা ভাসানী-রাজনৈতিক আবহাওয়াকে যেভাবে উত্তপ্ত করে চলেছে। সে উত্তাপ নিরসনের ক্ষমতা আমার নেই। পাকিস্তানকে ধ্বংস করার জন্য ভাসানীর উপস্থিতিই যথেষ্ট।

যাইহোক, পাকিস্তান ধ্বংস-প্রয়াসী হিন্দুরা এবং কমিউনিষ্ট ও সমাজতন্ত্রীরা আওয়ামী লীগ তথা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে জেঁকে বসে। অন্যদিকে সাহিত্যের নামে সংস্কৃতির নামে আর্টের নামে সমগ্র জাতিকে এমনই অন্ধমাতাল করে রাখা হয় যেন এদেশের মানুষেরা তার নিজস্ব আদর্শ ও আপন জাতীয় সত্তার গভীরে প্রবেশ করতে ব্যর্থ হয়। ফলে সমস্ত বাংলাদেশী অতল জলের আহবানে ডুবতে থাকে মহাসমুদ্রের গভীরে।

পাকিস্তানের স্বপ্নদ্রষ্টা দার্শনিক কবি আল্লামা ডঃ ইকবাল উপমহাদেশে সামগ্রিক মুসলিম নেতৃত্বের দুর্বলতা আঁচ করেছিলেন অনেক আগে। ১৯৩২ সালে ২১ শে মার্চ লাহোর অনুষ্ঠিত নিখিল ভারত মুসলিম সম্মেলনে এ প্রসঙ্গে দ্ব্যর্থহীনভাবে তিনি বলেন ঃ "আমাদের স্বীকার করতে হবে যে, বর্তমানে যারা রাজনৈতিক সংগ্রামে ভারতীয় মুসলমানদের কার্যকলাপের পথ নির্দেশ করছেন বলে মনে করা হয়, তাঁদের রাজনৈতিক চিন্তাধারার মধ্যে এখনও এক ধরনের বিশৃংখলা রয়েছে। এ পরিস্থিতির জন্য অবশ্য জাতির ওপর দোষারোপ করা চলে না।

www.pathagar.com

দেশের যেসব বিষয়ের সাথে মুসলিম জনগণের ভাগ্য জড়িত রয়েছে তার জন্য আত্মত্যাগের মনোভাব তাদের মোটেও নেই।...জাতিকে যে পথ নির্দেশ দেয়া হয় তা সবসময়ে স্বাধীনভাবে পরিকল্পিত নয়। তার ফল হচ্ছে সংকট মুহূর্তে আমাদের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ভাঙ্গন। এই কারণেই এসব প্রতিষ্ঠান রাজনৈতিক সংহতির জীবন ও শক্তির পক্ষে অপরিহার্য প্রয়োজনীয় ধরনের শৃংখলা সঠিকভাবে গড়ে তুলতে পারে না।'

৫৪ সালে যুক্তফ্রন্ট ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয়। এরপর থেকে ক্ষমতার দ্বন্দ্ব আরও তীব্র আর ও প্রকট আকার ধারণ করে। রাজনীতিতে তখন ত্রিমুখী ধারা প্রবল হয়ে উঠে। শীর্ষ নেতারা জাতীয় স্বার্থ ভুলে পরস্পর সংঘাতে লিপ্ত হয়। হক ভাসানী ও সোহরাওয়ার্দী কেন্দ্রিক রাজনৈতিক নেতা ও তাদের কর্মীদের মধ্যে কতিপয় ক্ষুধার্ত গৃহিনীর অর্ধমৃত লাশ নিয়ে টানা হেচরার প্রবণতা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক অস্থিরতা তীব্র থেকে তীব্রতর হতে থাকে। হতবাক দেশপ্রেমিক জনতা অনাহুত আশঙ্কায় উদ্বিগ্ন হয়ে ওঠে। নেপথ্য কুচক্রী, সমকালীন উমিচাঁদ, জগৎ শেঠদের ঘরে ঘরে তখন উৎকট আনন্দ। পরিষদ ভবনে স্পীকার শাহেদ আলীকে হত্যা করে নেতৃবৃন্দ ফ্যাসীবাদী কর্মকাণ্ডের চেয়েও ভয়াবহ বর্বতার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। নেতৃবৃন্দের এই দ্বন্দ্ব সংঘাত আর হানাহানির ফাঁকে হিন্দু বুর্জোয়া এবং এ দেশী পঞ্চমবাহিনী সম্মিলিতভাবে ৯শো কোটি টাকার সম্পদ হিন্দুস্থানে পাচার করে দেয়। সরকারী নথিপত্র থেকে জানা যায় প্রত্যেক বছর এ দেশে উৎপাদিত ১০ লক্ষ টাকা মূল্যের খাদ্যশস্য সীমান্ত অতিক্রম করে ওপার বাংলার গুদামে জমা হতো। সমগ্র দেশে কালোবাজারীর এত বিস্তৃতি ঘটেছিল যে, সামরিক বিপ্লবের কয়েক সপ্তাহের মধ্যে সাগরে অভিযান চালিয়ে সাড়ে ৪ টন সোনা উদ্ধার করা হয়। ক্রাইম বিশেষজ্ঞদের ধারণা এই পরিমাণ সোনা প্রত্যেক মাসে বিদেশে পাচার হত। বাংলাদেশের পাটের ষাট শতাংশ ব্যবসা কোলকাতার মারোয়ারীদের হাতে ছিল। তারা কালোবাজারীর মাধ্যমে কোটি কোটি টাকার পাট এদেশ থেকে টেনে নিত। নৌবাহিনীর Close door operation রাজনৈতিক চাপের মুখে ব্যর্থ হয়। দেশের খাদ্যশস্য মওজুতদারী কবলিত হওয়ায় সাধারণ মানুষ দুর্ভিক্ষের হাহাকারে নিপতিত হয়। দুর্ভিক্ষাবস্থা ও খাদ্য সংকট এমন তীব্র আকার ধারণ করে যে এর মোকাবিলা করার জন্য সেনাবাহিনীকে ময়দানে নামতে হয়। 'ওজারতির ২ বছর' গ্রন্থে জনাব আতউর রহামন খান একথা স্বীকার করেন। পূর্ব পাকিস্তানের চোরাচালান নির্মূলের জন্য তিনি সামরিক কর্তৃপক্ষের সাহায্য গ্রহণ করেন।

www.pathagar.com

বিচ্ছিন্নতাবাদে বিদেশী ইন্ধন

১৯৬৫ সালে সম্মিলিত বিরোধী দলের প্রার্থী কায়েদ আযমের বোন মিস ফাতেমা জিন্নাহর বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিজয় যেমন আইয়ুব খানকে আত্মবিশ্বাসে ভরপুর করেছিল অনুরূপভাবে বিরোধী দলকে ঘিরে ধরেছিল নৈরাশ্য। বিরোধী দলের ব্যর্থতার মূল কারণ হিসাবে তারা মনে করতে শুরু করল আইয়ুব খানের প্রচলিত মৌলিক গণতন্ত্রকে। নির্বাচনে পরাজয়ের জন্য তাদের ক্ষোভ মৌলিক গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে পুঞ্জীভুত হল। ওদিকে আইয়ুব খানের সাফল্য তাকে এতই অভিভূত করে ফেলেছিল যে আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপর দৃষ্টিপাত করার কোন প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন না। বৈদেশিক নীতিকে সুসংহত করার জন্য আন্তর্জাতিক পর্যায়ে পদচারণা শুরু করলেন। এ সময় প্রেডিডেন্ট আইয়ুব একসাথে পিকিং, মস্কো, ওয়াশিংটন সফরের পকিল্পনা নেন। সাফল্যের সাথে এবং ব্যাপক প্রচারণার মধ্য দিয়ে পিকিং ও মস্কো সফর সম্পন্ন হলেও প্রেসিডেন্ট নিক্সন প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ওয়াশিংটন সফর কর্মসূচী অসৌজন্যমূলকভাবে বাতিল দেওয়ায় এতে দেশে বিদেশে আইয়ুবের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছিল। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ওয়াশিংটন সফর কর্মসূচী অসৌজন্যমূলকভাবে বাতিল করে দিলে পর এতে দেশে বিদেশে আইয়বের ব্যাপারে ওয়াশিংটন নিরুত্তাপ হয়ে পড়ে। ওয়াশিংটনের সাথে পাকিস্তান সরকারের সম্পর্কের জেল্লা হারালেও বিরোধী দলের সাথে সিআইএর সখ্যতা বৃদ্ধি পায়। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের রাজনৈতিক বিপর্যয় ত্বরান্বিত করার জন্য সিআই এ তৎপর হয়ে উঠে। '১৯৬৩ সালেই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদুত ঘোষণা করেন যে, পাকিস্তানের জন্য নির্ধারিত মার্কিনী সাহায্য হইতে পূর্ব পাকিস্তানের অংশ পূর্বাহ্নেই নির্দিষ্ট করিয়া দেওয়া হইবে। ইহার ফলে পূর্ব পাকিস্তান কেন্দ্রীয় সরকারের চাইতে ওয়াশিংটনকে অধিকতর সহানুভূতিশীল মনে করিবার ইন্ধন পাইয়া গেল। সুকৌশলে কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে পূর্ব পাকিস্তানী জনতাকে উস্কানী দান করাই ছিল উপরোক্ত মন্তব্যের লক্ষ্য।... কেন্দ্রীয় সরকারকে বেকায়দায় ফেলিবার জন্য মার্কিন সরকার নানাভাবে প্রচেষ্টা চালাইতে থাকে। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৩)

www.pathagar.com

১৯৬৫ সালে জানুয়ারী নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের নিরঙ্কুশ বিজয় এবং মার্চে অনুষ্ঠিত জাতীয় পরিষদের নির্বাচনের পর প্রেসিডেন্ট আইয়ূব আন্তর্জাতিক পর্যায়ে কূটনীতিক পদচারণার ফলে এক্ষেত্রে পিছিয়ে থাকা পাকিস্তান ভারতের সমকক্ষতা অর্জন করলেও আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে আইয়ুবের অমনোযোগিতার কারণে আমেরিকা এবং ভারত উভয়েই এ ব্যাপারে সক্রিয় হয়ে উঠে। তারা আইয়ুব সরকারের দুর্বলতা অন্বেষণ করে তাকে ঘায়েল করার ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। এ ব্যাপারে উভয়েই দাবার ঘুঁটি হিসাবে সমানভাবে ব্যবহার করে শেখ মুজিবকে। অন্যান্য দলগুলোর উপরে আমেরিকার যে প্রচ্ছন্ন প্রভাব ছিল সেটাকে কাজে লাগাতেও আমেরিকা পিছিয়ে রইল না।

পাকিস্তান সরকারের উপর আমেরিকার আশীর্বাদ না থাকায় এবং আইয়ুব প্রশাসনের উপর মার্কিন বৈরিতা ও অসন্তোষ স্পষ্ট হয়ে উঠার ফলে ভারতের জন্য এক অপূর্ব সুযোগ এসে উপস্থিত হয়। পাকিস্তানের উভয় অংশে ভারত ছোটখাট সীমান্ত সংঘর্ষের সূচনা করে। পরবর্তীতে এক পর্যায়ে পাকিস্তানের উপর এক ভয়াবহ যুদ্ধ চাপিয়ে দেয়। সেই সময় আমেরিকা যুদ্ধ আক্রান্ত পাকিস্তানের দিকে ফিরেও তাকায়নি। পাকিস্তান তার শক্তি সামর্থ্য দিয়ে বিরোচিত প্রতিরোধ করে। আমেরিকা পাকিস্তানে সমরাস্ত্র এবং প্রয়োজনীয় খুচরো যন্ত্রাংশ সরবরাহ বন্ধ করে দেয়। ফলে পাকিস্তানকে বিজয়ের দোর গোড়ায় এসেও পিছিয়ে আসতে হয়। অনিচ্ছা সত্বেও আইয়ুব খান তাসখন্দ ঘোষণায় স্বাক্ষর দান করলেন। চীনের চাপের মুখে হিন্দুস্থান পূর্ব পাকিস্তানের দিকে চোখ তুলে তাকাল না। যুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধোত্তর দেশ পুনর্গঠন এবং আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে যখন আইয়ুব খান মনোযোগী হতে চাইলেন সে সময় আইয়ুবের কর্তৃত্বের উপর যুদ্ধের প্রভাবের ব্যাপারে বলতে হয় যে বহু সেনাবাহিনীর অফিসার এমন কি কিছু জেনারেলও এই যুদ্ধ চীনা সাহায্য নিয়ে চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন। সুকর্নোর ইন্দোনেশিয়া ও পাকিস্তানকে সাহায্য করতে রাজী ছিল। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসাররা অনুভব করল যে আইয়ুব খান বাইরের চাপের মুখে যুদ্ধবিরতি ও পরবর্তীতে তাসখন্দ চুক্তি করেছেন এবং নিজের আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক ব্যবস্থাকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছেন।... আইয়ুব তার সীমাবদ্ধ রাজনৈতিক ভিত্তি নিয়ে তার নিজের ও শাসক এলিটদের কায়েমী স্বার্থকে বাদ দিয়ে চীনা সাহায্যে একটা গণযুদ্ধ চালাতে পারতেন না।... তাসখন্দ বৈঠকে কথিত জাতীয় স্বার্থ জলাঞ্জলি দেয়ার জন্য আইয়ুবের ভাবমূর্তি অনেকটা স্তিমিত হয়ে পড়ে– যাকে ভূট্টো ১৯৬৯ সালের রাজনৈতিক আন্দোলনের সময় আইয়ুব বিরোধী ব্যাপক

www.pathagar.com

আন্দোলনের ভিত্তি হিসাবে ব্যবহার করেন। (অখণ্ড পাকিস্তানের শেষদিনগুলো, জিডব্লিউ চৌধুরী, পৃঃ- ৩০) সে সময় বিদেশী চক্র তাদের প্রভাবিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলগুলোর মাধ্যমে ভিন্ন খেলায় মেতে উঠল।

সর্বপ্রথম মাঠে নামলেন মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদী ও জামায়াতে ইসলামী। যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে আইয়ূব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে জামায়াতে ইসলামী। শেখ মুজিব ৬ দফা কেন্দ্রিক বিচ্ছিন্নতার ধুয়া তোলার কারণে, পরবর্তীতে কারা অন্তরীণ থাকার কারণে এবং এই সাথে আওয়ামী লীগ ও ছাত্রলীগের প্রতি সরকারের কঠোরতা অবলম্বনের কারণে আওয়ামী লীগ রাজনৈতিক ময়দানে প্রকাশ্য কর্মকাণ্ড থেকে দূরে সরে দাঁড়ায়। এককভাবে জামায়াতে ইসলামী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করতে থাকে দীর্ঘদিন ধরে। আর সব দল ছিল শুধুমাত্র নেতা সর্বস্ব।

আইয়ুবের বৈদেশিক নীতি একান্তভাবে ওয়াশিংটনমুখিতা পরিহার করায় মওলানা ভাসানী আইয়ুবকে পরোক্ষ সহযোগিতা দান শুরু করেন।

একমাত্র জামায়াতে ইসলামীর নিবেদিত প্রাণ কর্মীরা গণতান্ত্রিক আন্দোলনের জন্য এবং জনমত সৃষ্টির জন্য ময়দানে তৎপর হয়ে উঠে। তাসখন্দ চুক্তির বিরোধীতা দিয়েই আন্দোলনের শুভ সূচনা হয়। পূর্ব পশ্চিম উভয় অংশের জনগণ তাসখন্দ ঘোষনাকে সহজভাবে মেনে নিতে পারেনি। জামায়াতে ইসলামী সাধারণ মানুষকে একথা বোঝানোর চেষ্টা নেয় যে আইয়ুব খান ডিক্টেটর হওয়ার কারণে তাসখন্দ ঘোষনার স্বাক্ষরের আগে বিরোধীদলসমূহের সঙ্গে বোঝাপড়ার প্রয়োজন মনে করেনি। বিদেশী চাপের মুখে নিশ্চিত বিজয় জেনেও রণাঙ্গন পরিহার করে।

তাৎক্ষণিকভাবে না হলেও জনমনে এর প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। ধীরে ধীরে আন্দোলনের পালে হাওয়া লাগতে শুরু করে। জামায়াতে ইসলামী জনগণের আবেগ এবং ক্ষোভকে আন্দোলনের শক্তিতে পরিণত করার উদ্যোগে নেয়। ওদিকে যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে জাতীয়তাবাদী শক্তি ও বামপন্থী চক্র ভিন্ন প্রক্রিয়ায় জনগণকে বিক্ষুদ্ধ করার প্রয়াস নেয়। তারা সঙ্গোপনে একথা ছড়িয়ে দেয় যে যুদ্ধকালীন সময়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার দিকে পশ্চিম পাকিস্তানীরা ফিরে তাকায়নি। পাকিস্তানের সমর শক্তি শুধুমাত্র পশ্চিম পাকিস্তানের নিরাপত্তা বিধানে ব্যস্ত থেকেছে। তারা পূর্ব পশ্চিমের বৈষম্যটা প্রকট করে তুলে ধরে

www.pathagar.com

ব্যাপক প্রচারণা চালায়। পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা জনিত সমস্যা এদেশের বুদ্ধিজীবী এবং তরুণ সমাজের মনে দারুণভাবে রেখাপাত করে। ধীরে ধীরে প্রত্যন্ত অঞ্চলের জনগণের মন মানসিকতায় জাতীয়তাবাদীদের প্রচারণা ক্রিয়াশীল হতে থাকে। যদিও জাতীয়তাবাদীদের সাংগঠনিক তৎপরতা ছিল না, তা সত্ত্বেও বিচ্ছিন্ন এবং বিক্ষিপ্তভাবে পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ক্ষোভ সৃষ্টির আঞ্জাম দিতে থাকে তারা। যদিও যুদ্ধোত্তর পর্যায়ে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তার প্রশ্নে আইয়ুব খান যথেষ্ট গুরুত্বারোপ করেছিলেন তা সত্ত্বেও জনগণের ক্ষোভ নিরসনের মত খুব বেশী কিছু করতে সক্ষম হননি। পত্র পত্রিকাসমূহে বামপন্থীদের প্রাধান্য থাকায় দেশের সংহতির বিরুদ্ধে পরিকল্পিত এবং সূক্ষ্ম প্রচারণা প্রকটভাবে চলতে থাকে। তাসখন্দ ঘোষণার প্রেক্ষিতে জনগণ এবং সেনাবাহিনীর অসন্তোষের প্রতিধ্বনি হতে থাকে বিরোধীদল সমূহের রাজনৈতিক দলসমূহের চলমান প্রক্রিয়ার মধ্যে। কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলন আহব্বান করেন। জাতীয় গণতান্ত্রিক ফ্রন্ট নেতা জনাব নূরুল আমীন লাহোর সম্মেলনের পূর্বে ঢাকায় এক সাংবাদিক সম্মেলনে যুদ্ধ বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করে শাসনতান্ত্রিক জটিলতা নিরসনের আহবান জানান।

মুজিবের চাতুরীপূর্ণ অবস্থান

পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবর রহমান লাহোর সম্মেলনে যোগ দেন। ৫ ও ৬ ফেব্রুয়ারী অনুষ্ঠিত লাহোর সম্মেলনে সাংবিধানিক সমস্যা নিরসনের জন্য ৬ দফা পেশ করেন। সাংবাদিকরা তাকে ৬ দফা বিশ্লেষণের জন্য ঘিরে ধরে। তিনি করাচীতে ৬ দফা বিশ্লেষণ করার আশ্বাস দেন। সম্মেলনে সমবেত নেতৃবৃন্দের সম্মুখে ৬ দফার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করতে না পারায় তিনি বেকায়দায় পড়েন এবং সম্মেলন ত্যাগ করেন। করাচীতেও তিনি অনুরূপ বেকায়দায় পড়েছিলেন। ১১ ফেব্রুয়ারী তিনি ঢাকায় প্রত্যাবর্তন করেন এবং সাংবাদিকদের নিকট লাহোর সম্মেলনে প্রস্তাবিত দফাগুলো প্রকাশ করেন। লাহোর এবং করাচীতে শেখ মুজিব ৬ দফার যৌক্তিকতা বিশ্লেষণে ব্যর্থ হয়ে তার মেধাশূন্য কর্মীদের বাহবা নেয়ার জন্য নতুন একটা গল্পের অবতারণা করেন। তিনি বলেন, করাচীতে তাকে হত্যার প্রয়াস চলেছিল বলেই তাকে দ্রুত পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পালিয়ে আসতে হয়। কথাটা দারুণভাবে বিকিয়ে ছিল সেই সময়।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের চিন্তাশীল ব্যক্তিদের অনেকে ৬ দফাকে সহজভাবে নিতে পারেনি। আবার অনেকেই দ্বিধা দ্বন্দ্বে ভুগছিলেন। শেখ মুজিব আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের সাথে পরামর্শ না করেই ৬ দফা উত্থাপন করেন। ৬ দফা শেখ মুজিবের উদ্ভাবিত ফর্মূলা নয়, আইয়ূব শাসনকে বিপর্যস্ত করার জন্য কোন বৈদেশিক শক্তি শেখ মুজিবের উপর ভর করে তাকে দিয়েই ৬ দফা উত্থাপন করে।

৬ দফার প্রতিক্রিয়ায় আওয়ামী লীগের ভাঙন আশঙ্কা করে শেখ মুজিব আবেগপ্রবণ তরুণদের পুনর্গঠিত করার ব্যাপারে উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৩ এপ্রিল শেখ মুজিব ছাত্র নেতৃবৃন্দকে তার বাসভবনে একান্ত সাক্ষাৎকারে আমন্ত্রণ জানান। 'শেখ মুজিব এদিন ছাত্রলীগ নেতৃবৃন্দের কাছে আওয়ামী নেতাদের রাজনৈতিক চরিত্র সম্পর্কে হতাশা প্রকাশ করেন। তিনি বলেন– 'এদের অধিকাংশই মুসলিম লীগ থেকে এসেছে, (শেখ মুজিব নিজেও মুসলিম লীগ থেকে এসেছেন) হতাশ হয়ে সুযোগ সুবিধা না পেয়ে। তাদের দিয়ে ৬ দফার আদর্শ বাস্তবায়ন করা যাবে না। আওয়ামী লীগের প্রবীণ নেতাদের অধিকাংশ পাকিস্তানপন্থী বলে শেখ মুজিব এদিন তার সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনার অংশ হিসাবে জেলায় জেলায় আওয়ামী লীগের নেতৃত্ব দখল করার জন্য ছাত্রলীগের তরুণ নেতাদের নির্দেশ দেন এবং ৬ দফার ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা করতে বলেন। (বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস, পৃঃ ১৮০)

পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ১৬ বছর পর এক সাক্ষাৎকারে আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুর রাজ্জাক বলেন– '... ৬ দফা কর্মসূচী ঘোষণার পর বঙ্গবন্ধু ছাত্রলীগের তৎকালীন সভাপতি মাজহারুল বাকীও আমাকে ডাকলেন।... তিনি ছয় দফা আন্দোলন ব্যাখ্যা করলেন। বললেন, সাঁকো দিলাম ওপার যাবার জন্য। তখন আমি প্রশ্ন করলাম এত বড় সংগ্রাম, কে আমাদের এই সংগ্রামে সাহায্য করবে? তিনি কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, আমেরিকা তোদের বিরোধিতা করবে চীন তোদের সমর্থনে আসবে না। ভারত তোদের বন্ধু। আর একটা পর্যায়ে সোভিয়েত ইউনিয়ন তোদের সাহায্য করবে। ১৯৬৬ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারী তারিখে সম্ভবত আমাদের সাথে এই বৈঠক হয়। (সাপ্তাহিক মেঘনা, ৪ ফেব্রুয়ারী ১৯৮৭)

অধ্যাপক মোজফফরও একই কথা বলেছেন, ৬ দফা পরিকল্পনা পেশের সময় শেখ মুজিব তাকে এবং রুহুল কুদ্দুসকে ডেকে বলেছিলেন– 'আসলে ৬ দফা নয়, এক দফাই ঘুরিয়ে বললাম শুধু। (ডক্টর মোহাম্মদ হান্নান, পৃঃ ১৮৬)

www.pathagar.com

৬ দফার ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া

একটুখানি রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা যাদের মাথায় ছিল তারা ঠিকই বুঝেছেন ৬ দফার আন্তর্নিহিত তাৎপর্য। মওলানা ভাসানী ছয় দফার বিরোধিতা করেছেন। জামায়াতে ইসলামী ৬ দফার বিরুদ্ধে ছিল। এমনকি আওয়ামী লীগের মধ্যেও যারা ছিল দেশপ্রেমিক তাদের অনেকেই ৬ দফার প্রতিক্রিয়ায় নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়েন অথবা দলত্যাগ করেন। সরকারের কাছেও ৬ দফার উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। শুধু দেশের সাধারণ মানুষ ধুমাশায় আচ্ছন্ন ছিল।

সে সময় পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী দলসমূহ এমন এক অবস্থানে দাঁড়িয়ে ছিল যেখান থেকে তাদের ফেরানো সম্ভব হয়নি। এরা ৬ দফা বিরোধী হওয়া সত্ত্বেও তাদের রাজনীতি ৬ দফার জন্য পথ পরিষ্কার করছিল। আওয়ামী লীগ ও বামচক্র সে সময় ঠুনকো অজুহাতে হরতাল অবরোধ চালাতে শুরু করে। এদের সাথে তাল রেখে পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসীরা ও ভিন্ন আঙ্গিকে আন্দোলনের কর্মসূচী দিতে থাকে। এতে কিন্তু লাভ হয় বিচ্ছিন্নতাবাদীদের। আইন শৃংখলা পরিস্থিতির অবনতি হতে থাকে। ৬ দফা গতিশীল হওয়ার আগে একে শক্তিহীন করার উদ্যোগ নেয় সরকার শেখ মুজিবকে গ্রেপ্ততার করে।

জনাব পি এ নাজির লিখেছেন– 'এরপর শুরু হল আওয়ামী লীগ নেতা শেখ মুজিবর রহমানের গ্রেফতারের পালা। ব্যক্তিগতভাবে আমার কাছে মনে হয়েছিল দারুণ অবিবেচনা প্রসূত কাজ। একবার ছেড়ে দেয়া হয় আর একবার গ্রেপ্তার করা হয়, আবার ছেড়ে দেয়া হয়। উপর মহলে যারা এই অদ্ভুত সিদ্ধান্ত নিচ্ছিলেন তারা কি সুকৌশলে শেখ মুজিবকে জনপ্রিয় করে তুলতে চাচ্ছিলেন আমার মত অনেকেরই মনে এ প্রশ্ন দোলা খেতে দেখেছি।'

এই গ্রেপ্তারীর প্রক্রিয়াটা শুরু হয় রাজধানী ঢাকা থেকে। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল সাধারণ নিয়মে এই গ্রেপ্তারী পরোয়ানা জারী করা হতো না। উঁচু মহলে সিদ্ধান্ত নেয়া হতো সরাসরি পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগের মাধ্যমে। নির্দেশ দেয়া হত গভর্ণর হাউজ থেকে। (পি এ নাজির, স্মৃতির পাতা থেকে, পৃঃ ২৩৯)

মোনয়েম খান সম্ভবত এইভাবে পঞ্চম বাহিনীর তৎপরতা প্রতিরোধ করে পাকিস্তানের অনিবার্য ধ্বস রুখতে চেয়েছেন। জনাব অলি আহাদ বলেছেন– 'দেশের আনাচে কানাচে ছয় দফার বাণী পৌঁছাইয়া দেওয়ার প্রয়াসে শেখ মুজিবর রহমান বিভিন্ন জেলা সদরে আয়োজিত জনসভায় ভাষণ দিতে লাগিলেন। ক্ষিপ্ত গভর্ণর মোনয়েম খান বক্তৃতার কোন কোন অংশকে আপত্তিকর

www.pathagar.com

নির্ধারত করিয়া পেনাল কোডের বিভিন্ন ধারায় বিচারের জন্য তাহাকে গ্রেপ্তারের আদেশ দেন। ঢাকার পল্টন ময়দানে বক্তৃার জন্য খুলনা হইতে ঢাকা আগমন পথে একুশে এপ্রিল যশোহর জেলা শহরে গ্রেপ্ততার, যশোহর দায়রা জর্জকর্তৃক জামিন মঞ্জুর। ময়মনসিংহে বক্তৃতার অপরাধে পুনঃ সিলেট জেল গেইটে গ্রেপ্তার এবং ময়মনসিংহ দায়রা জর্জ কর্তৃক জামিন মঞ্জুর প্রাপ্ত হন। এইভাবে শেখ মুজিব পুনঃপুনঃ গ্রেপ্তার এবং দৈনিক ইত্তেফাকের নিরবচ্ছিন্ন প্রচার অভিযান পূর্ব পাকিস্তানের সর্বশ্রেণীর শ্রমিক, মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী চাকুরিজীবী ব্যবসায়ী, শিল্পপতি মহলে তীব্র আলোড়ন ও যুগান্তকারী আবেদন সৃষ্টি করে। (অলি আহাদ, জাতীয় রাজনীতি, পৃঃ ৩৩)

ছোটখাট অব্যাহত আন্দোলনের মধ্য দিয়ে বিচ্ছিন্নতাবাদী শক্তি এবং অন্যান্যরা ওয়ার্ম আপ হল। বৃহত্তর কর্মসূচী নেয়ার প্রারম্ভে ৬ দফার দাবীতে আওয়ামী লীগ সর্বাত্মক হরতালের ডাক দিলো। সেদিন রাজধানীর পরিস্থিতি অত্যন্ত ভয়াবহ ও মারমুখী ছিল এবং আওয়ামী ও বামপন্থীরা ছাত্র জনতা সমগ্র ঢাকা জুড়ে ভয়ঙ্কর তান্ডব সৃষ্টি করে। সে দিনের পরিস্থিতি সংক্রান্ত বিস্তৃত আলোচনার অবতারনা না করে সংক্ষেপে একথাই বলা যায়।

৭ই জুন ঘটনার প্রেক্ষিতে আওয়ামী লীগের অধিকাংশ নেতা কারারুদ্ধ হয়েছিল। ১৫ই জুন তোফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়াকে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৬ই জুন দৈনিক ইত্তেফাকের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা হয়। এরপর ৬ দফার আন্দোলন নিস্প্রভ হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের মহিলা সম্পাদিকা মিসেস আমেনা বেগম ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদিকার দায়িত্ব নিয়ে আওয়ামী লীগের নেভা দীপ জ্বেলে রাখার প্রয়াস নেন।

ষাটের দশকের প্রথম পর্যায়ে বামপন্থী সৃষ্ট ছাত্র আন্দোলন যে অরাজক এবং বিশৃংখল পরিস্থিতির সূচনা করে তাতে দেশপ্রেমিক ছাত্র জনতার মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হয়। তারা অনুসন্ধান করতে থাকে এমন একটি সংগঠন যারা দেশপ্রেম এবং আদর্শবাদের উজ্জীবন ঘটাতে চায়। আমি নিজেও এ ব্যাপারে তৎপর হয়ে উঠি। অনুসন্ধান করতে থাকি অনুরূপ সংগঠন।

ইসলাম পন্থীদের সুসময়

জাতির হতাশা এবং আদর্শিক শূন্যতার দুঃসময়ে আত্মবিশ্বাসে উদ্দীপ্ত কিছু মানুষের মধ্যে দেখা গেছে ঘরে ঘরে আলো জ্বালাবার অকৃতিম প্রয়াস।

www.pathagar.com

জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রচলিত রাজনীতির বাইরে ভিন্ন এক ঐশি চেতনা বিতরণ করেছে। দেশপ্রেমিক এবং সমাজ কাঠামো পরিবর্তন প্রয়াসীরা এদের পতাকাতলে জড়ো হতে শুরু করে। বিশেষ করে নতুন প্রজন্ম ইসলামী ছাত্র সংঘের দিকে ঝুঁকে পড়ে। এর ফলে এই সংগঠন দ্রুত সম্প্রসারিত হতে থাকে। পয়ষট্টির হিন্দুস্থানের আগ্রাসী হামলার পরবর্তী পর্যায়ে ইসলামী ছাত্র সংঘের পালে হাওয়া লাগে। সংঘের জন্য প্রয়োজন ছিল রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা। কিন্তু সেটা হয়নি। জামায়াতে ইসলামী ও ইসলামী ছাত্রসংঘ প্রচলিত রাজনীতির সাথে তাল দিতে গিয়ে গোল পাকিয়ে ফেলে। নেতৃত্বের সুদূরপ্রসারী ভাবনা না থাকার কারণে দ্রুত সাংগঠনিক সম্প্রসারণ নিরীক্ষণ করে তারা অতি আশাবাদী হয়ে উঠে। এরা মনে করে প্রেসিডেন্ট আইয়ূবকে ক্ষমতাচ্যুত করলেই তারা রাজনৈতিক অবস্থান নিতে সক্ষম হবে। আমি আগেই বলেছি ৭ই জুনের পর আন্দোলনের তৎপরতা থমকে দাঁড়ায়। আওয়ামী শিবিরে ভাঙনের ঢেউ লাগে। ইসলামপন্থীদের জন্য তখন ছিল দারুণ সু-সময়। রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা যত প্রলম্বিত হত ততই ইসলামী আন্দোলনের পথ সুগম হতে পারতো। কিন্তু না, সেই সুদূরপ্রসারী ভাবনার ধারে কাছে গেলনা ইসলামী নেতৃত্ব। তারা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সবচেয়ে বেশী সোচ্চার, সবচেয়ে বেশী তৎপর হয়ে উঠলেন। জামায়াতে ইসলামী ১৯৬৬ সালের শুরু থেকে তাসখন্দ ঘোষণা কেন্দ্রিক আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের সূচনা করে। পরবর্তী পর্যায়ে পয়ষট্টির যুদ্ধকে কেন্দ্র করে পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তাহীনতার যুক্তি দেখিয়ে আওয়ামী লীগ সূচনা করে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, যে আন্দোলন ৬ দফা পর্যন্ত গড়ায়। যার অর্থ দাঁড়ায় বিচ্ছিন্নতা।

৭ই জুনের পর ৬ দফার প্রবল হাওয়া ঝিমিয়ে পড়ে। কিন্তু জামায়াতে ইসলামী আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন তাদের নিরলস তৎপরতা দিয়ে সুদূর প্রত্যন্ত অঞ্চল পর্যন্ত ছড়িয়ে দেয়। আন্দোলনকে সম্প্রসারিত করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর উদ্যোগে পিডিএম (পাকিস্তান ডেমোক্রেটিক মুভমেন্ট), পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলনের আরো ব্যপ্তি আনার জন্য ডাক অর্থাৎ ডেমোক্রাটিক এ্যাকশান কমিটি গঠন করা হয়। এই দুই অবস্থানে জামায়াতের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। ওদিকে পশ্চিম পাকিস্তানে ১৯৬৬ সালের ১৮ই জুন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলিফিকার আলী ভুট্টো পদত্যাগ করেন। এর আগে মুসলিম লীগের সাধারণ সম্প্রাদকের পদ থেকে তিনি অপসারিত হয়েছিলেন। ৬৭ সালের নভেম্বরে ভুট্টো পিপলস পার্টি গঠন করেন।

www.pathagar.com

আগড়তলা ষড়যন্ত্র উদ্ঘাটন

১৯৬৭ সালের শেষ দিকে অর্থাৎ ডিসেম্বর মাসে ঢাকায় একটা গুজব ছড়িয়ে পড়ল যে পূর্ব পাকিস্তানকে কেন্দ্র থেকে বিচ্ছিন্ন করার অপরাধে কিছু সংখ্যক সামরিক ও বেসামরিক অফিসারকে গ্রেফতার করা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট আইয়ুব ডিসেম্বরের ৩১ তারিখে ন্যাপ এবং আওয়ামী লীগকে বিচ্ছিন্নতাবাদী দল ঘোষণা করে। ঢাকা শহরে গ্রেপ্তারের গুজব ঘুরপাক খেলেও সরকার এ ব্যাপারে মুখ খুলেনি। '৬৮ সালের ৬ই জানুয়ারী প্রকাশিত এ সংক্রান্ত সরকারী প্রেসনোটে ২৮ জন গ্রেপ্তারের কথা বলা হয়। প্রশাসনের সাথে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা জনাব পি এ নাজির আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার পটভূমিতে পূর্ব পাকিস্তান সরকারের উচ্চ পর্যায়ের অবস্থা বর্ণনা করেছেন তার গ্রন্থে। তিনি বলেন– 'কিন্তু এরই মধ্যে পাকিস্তানের রাজনীতিতে ঘটল একটি বিস্ফোরক ঘটনা ঃ আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা। ঢাকা গুজবের শহর বলে এমনিতেই নাম আছে তার উপর এমন একটা ঘটনা সংক্রান্ত গুজবের বন্যায় সবকিছু ভেসে গেল...

বাতাস ক্রমশ ভারী হয়ে উঠল। সরকারী বড় কর্তাদের দিকে তাকালে তাদের চেহারায় যে অভিব্যক্তি ফুটে উঠল তাতে মন হল কোথায় যেন একটা কিছু অঘটন ঘটেছে। সবাই হঠাৎ কেমন যেন গম্ভীর হয়ে গেলেন। কাউকে কাউকে বেশ আতঙ্কিত মনে হচ্ছিল। 'এ সময় হঠাৎ প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ঢাকা আগমনের খবর এলো। যথারীতি তার সফর সংক্রান্ত করণীয় বেশ গম্ভীর। এরই মধ্যে একদিন রাত ১১টার দিকে প্রেসিডেন্ট হাউজের রমনা পার্কের পাশে গেলাম। সেখানকার পরিবেশ দেখে রীতিমত অবাক হলাম। বসার কামরায় অনেক হোমরা চোমরাকে দেখলাম। নিজের মধ্যে কথা বলছেন, কিন্তু সবাইকে মনে হচ্ছিল ভীষণ গম্ভীর এবং চিন্তিত। লাট সাহেব (মোনয়েম খান) একবার ভেতর থেকে বেরিয়ে এলেন। কিন্তু আমাকে দেখার পরও তিনি আমাকে চিনতে পারলেন বলে মনে হল না। এরকম একটা অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যখন ভাবছি ফিরে যাব কিনা, হঠাৎ করে ন্যাশনাল এ্যাসেম্বলীর লিডার সবুর খান ভিতর থেকে বাইরে এলেন এবং আমাকে দেখে আমার দিকে এগিয়ে এলেন। তিনি আমাকে অবাক করে দিয়ে একটা সিগারেট অফার করলেন। তিনি আমার কাঁধে হাত রেখে এক কোনায় চলে গেলেন। কোন ভূমিকা ছাড়াই তিনি বললেন, নাজির সাহেব, ভিতরের অবস্থা খুবই উত্তপ্ত। প্রেসিডেন্ট আমাদের সবাইকে বিশেষ করে মোনয়েম খানকে চার্জ করেছেন যে পূর্ব পাকিস্তানের সিনিয়র

www.pathagar.com

অফিসারদের অনেকে আগড়তলা মামলার সাথে জড়িত। গভর্নর সাহেব অবশ্য জোরের সাথে এর প্রতিবাদ করেছেন। বলেছেন যেই রিপোট দিয়ে থাকুন তা বানোয়াট। এতে প্রেসিডেন্ট আরো ক্ষিপ্ত হয়ে বলেছেন যে তিনি কোন বানোয়াট মিথ্যা রিপোর্টের ভিত্তিতে কথা বলছেন না। তিনি যা বলেছেন তার সমর্থনে রয়েছে দলিল দস্তাবেজ। তারপর প্রেসিডেন্ট দোতালার এক কামরা থেকে একটা রিপোর্ট আনিয়ে তার হাতে তুলে দেন। এ রিপোট পড়ার পর মোনয়েম খান নিশ্চুপ হয়ে যান।

আমি সবুর খান সাহেবকে বললাম। স্যার আপনি নিশ্চয় পিন্ডি থেকে এ রিপোর্ট সম্পর্কে জানেন। যদি আপত্তি না থাকে দয়া করে বলবেন কি কোন কোন অফিসারের নাম আছে এ লিষ্টে। তিনি কোন রকম দ্বিধা না করে তিন চারজন অফিসারের নাম বললেন এবং দু' তিনজন প্রাক্তন অফিসারের নাম উল্লেখ করলেন। (পি এ নাজির : স্মৃতির পাতা থেকে, পৃঃ ২৪৫-৪৬)

১৮ জানুয়ারী ('৬৮) এক সরকারী প্রেসনোটে বলা হয় রাষ্ট্রদ্রোহী ষড়যন্ত্রে শেখ মুজিবর রহমানকে গ্রেপ্ততার করা হয়েছে। ১৯৬৬ সালের ৮ মে থেকে শেখ মুজিবর রহমান কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক ছিলেন। ১৭ জানুয়ারী গভীর রাতে তাকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে ক্যান্টনমেন্টে স্থানান্তরিত করা হয়। অভিযুক্তের ব্যাপারে দৈনিক পাকিস্তানে বলা হয়– 'এরা আগড়তলায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর লেঃ কর্নেল মিশ্র এবং মেজর মেমনের সাথে দেখা করেছিলেন। তাদের সাক্ষাতের মুখ্য উদ্দেশ্য ছিল অস্ত্রশস্ত্র সংগ্রহ। আগড়তলা ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তারের প্রেক্ষিতে জনগণের মধ্যে এমন ধারণা ছড়িয়ে দেয়া হয় যে মোনয়েম খান এবং কতিপয় কেবিনেট মন্ত্রী ষড়যন্ত্রমূলকভাবে বাঙ্গালীদের স্বাধিকার আন্দোলনের নায়ক শেখ মুজিবকে গ্রেপ্তার করেছে। মুজিব-এর হুমকিকে সবচেয়ে ফলপ্রসূভাবে মোকাবেলার জন্য মোনয়েম খান ও তার সহযোগীরা ভারতীয় মদদপুষ্ট ষড়যন্ত্রে মুজিবকে জড়িয়েছে। গুজবে আরো বলা হয় মুজিবকে রাজনৈতিকভাবে পঙ্গু করার জন্য মোনয়েম খানের প্ররোচনায় প্রেসিডেন্ট আইয়ুব আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার অবতারণা করেন। কিন্তু এ ধারণা জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরী তার লেখায় বাতিল করে দেন। তিনি বলেন– 'কিন্তু মুজিবের গ্রেপ্তারের এ রকম ব্যাখ্যা আমি দৃঢ়তার সাথে বলব সত্য নয়। ১৯৬৯ সালে আমি পাকিস্তান মন্ত্রীসভায় যোগ দেয়ার পর যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা উঠিয়ে নেয়া হয়েছিল। তখন আমি এ ব্যাপারে সামরিক ও বেসামরিক

www.pathagar.com

গোয়েন্দা রিপোর্টগুলো সযত্নে পড়ে দেখি। এ রিপোর্টগুলো অনুসারে যেগুলোর প্রতি একজন সিনিয়ার বাঙ্গালী গোয়েন্দা অফিসার জোর সমর্থন জানিয়েছিলেন যার সততা ও ন্যায়পরায়ণতা সম্পর্কে আমি সন্দেহ পোষণ করিনি এবং যিনি বাংলাদেশে মুজিব সরকারের একটি বড় পদ অধিকার করেন। মুজিবকে নিম্নের উপাত্তের ভিত্তিতে দোষী করা হয় ঃ

ঢাকায় ভারতীয় মিশনের মিঃ ওঝা মুজিবের একজন ঘনিষ্ঠ অনুসারীর সাথে পূর্ব নির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হতেন। আর এ অনুসারী বর্তমানে আওয়ামী লীগের এক গুরুত্বপূর্ণ পদে বহাল আছেন; যিনি মুজিব পরিবারের একজন সদস্যের মত ছিলেন এবং তার ঢাকার বাসায় প্রায় থাকতেন। ওঝার সাথে মুজিবের লোকজনের মেলামেশা গোয়েন্দা বিভাগের লোকজন সাবধানতার সাথে লক্ষ্য রাখতেন এবং তার ঘুরা ফিরার ছবিও ছিল। মুজিবের লোক পুরানো ঢাকার এক অজ্ঞাত জায়গায় ওঝার সাথে দীর্ঘ আলাপ আলোচনা, দেখা সাক্ষাতের পর আঁকাবাকা পথ ঘুরে ঢাকার ধানমন্ডীতে মুজিবের বাড়ী যেত। মুজিবের স্ত্রী যদিও ছিলেন একজন অশিক্ষিতা মহিলা, তিনিও ১৯৬৬ সালে মুজিবের গ্রেপ্তারীর পর রাজনীতিতে সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে শুরু করেন। মুজিবের স্ত্রী ও তার ঐ অনুসারী উভয়েই ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে যেখানে মুজিব অন্তরীণ ছিলেন সেখানে নিয়মিত মুজিবের সাথে দেখা সাক্ষাৎ করতেন। জেলের বাঙ্গালী অফিসার ও স্টাফদেরকেও তাদের সহানুভূতিপূর্ণ মনোভাবের জন্য ধন্যবাদ জানাতে হয়। যার ফলে অন্তরীণ অবস্থায়ও মুজিব যে কোন রাজনৈতিক পকিল্পনা ও ষড়যন্ত্র আলোচনা করতে মোটেই অসুবিধার সম্মুখীন হতেন না। গোয়েন্দা বিভাগের লোকদের মতানুসারে এটাই ছিল মুজিবের আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলার জড়ানোর ভিত্তি। কিন্তু জনগণ যাদের এই ভিতরের কাহিনী কখনো বলা হয়নি তারা স্বভাবতই মুজিবের গ্রেপ্তারে ক্রোধোন্মত্ত ছিল। তারা সংগতভাবে প্রশ্ন করতো যে মুজিব জেলে আবদ্ধ অবস্থায় থেকে কিভাবে ষড়যন্ত্রের অংশীদার হতে পারেন। (জ ডব্লিউ চৌধুরী, অখন্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলো, পৃঃ ৩২-৩০)

১৯৬৮ সালের শুরুতে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব মারাত্মক রোগে আক্রান্ত হন। রোগাক্রান্ত অবস্থায় তিনি দুটো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেন তিনি পেশোয়ারের বেদারের মার্কিন সামরিক যোগাযোগ কেন্দ্রটি বন্ধ করার জন্য মার্কিন সরকারকে নোটিশ দেন। অন্যটি হল পাকিস্তানের রুশ অস্ত্র আমদানীর জন্য কোসিগিনের সাথে আলাপ করেন।

www.pathagar.com

এতে যুক্তরাষ্ট্র দারুণভাবে বিরূপ হয়ে উঠে এবং প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের বিদায় ঘণ্টা বাজানোর জন্য সিআইএকে নির্দেশ দেন। ১৯৬৫ সালের পর থেকে মার্কিন সাহায্য কমে যাওয়ায় পাকিস্তান সরকারকে অনেক পরিকল্পনা কাটছাট করতে হয়েছিল। ১৯৬৭-৬৮ সালে পাকিস্তানের অর্থনৈতিক গতিশীলতা বহুলাংশে কমে যায়। যখন উন্নয়নের দশক উদযাপনের হিরিক চলছিল দেশব্যাপী এই সময় আমেরিকা অর্থনৈতিক সাহায্যের ব্যাপারে তার হাত গুটিয়ে নেয়। অর্থনৈতিক স্থবিরতার মধ্যে উন্নয়ন দশকের ব্যঞ্জনা সাধারণ মানুষের মনে রেখাপাত করতে পারেনি। ষাটের দশকে বিপুল অগ্রগতি হওয়া সত্ত্বেও সাধারণ মানুষের জীবনে বৈপ্লবিক পরিবর্তন হয়নি। সাধারণ মানুষের মধ্যে এক ধরনের ক্ষোভ জমলেও আন্দোলনের কথা কখনো তারা ভাবেনি। তারা আইয়ুব প্রশাসনকে বিকল করে দেয়ার জন্য তৎপর হয়ে উঠে। তারাই উন্নয়ন দশকে বিরূপ হয়ে বিদ্রোহের আগুন ছড়াতে থাকে। এদিকে ভুট্টো ও পীরজাদা আইয়ুব বিরোধী আন্দোলন শুরু করার জন্য গোপন চুক্তিতে পৌছেন। অন্যদিকে আমেরিকা ও ভারত তাদের নিজ নিজ দৃষ্টিকোণ থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের পতন ত্বরান্বিত করার জন্য তাদের লবিগুলোকে সক্রিয় করে তুলে এবং আন্দোলনের চূড়ান্ত লক্ষ্যে পৌছানোর জন্য সবরকম বৈষয়িক সাহায্যের দ্বার অবারিত করে। জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন– ১৯৬৯-৭০ সালে পাক ভারত সম্পর্ক ছিল খারাপ এবং বরাবরের মতই উত্তেজনাপূর্ণ। ১৯৬৮ সালের আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার সময় হতে পূর্ব পাকিস্তানের চরম বিস্ফোরোন্মুখ পরিস্থিতিতে ভারতের সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে বেসামরিক ও সামরিক গোয়েন্দা রিপোর্ট অব্যাহতভাবে ইয়াহিয়ার দপ্তরে আসছিল কিন্তু সেসবের প্রতি যথাযোগ্য মনোযোগ দেয়া হয়নি। একটি বন্ধু রাষ্ট্র ভারতীয় সংশ্লিষ্টতার ব্যাপারে অনুরূপ বর্ণনাই দিচ্ছিল। কিন্তু ইয়াহিয়া খান খুবই বিলম্বে ব্যাপারটা বুঝতে পারেন।'

ততদিনে পানি অনেক দূর গড়িয়ে গেছে। আমি আগেই বলেছি ভুট্টোর পশ্চিম পাকিস্তানের জনপ্রিয়তার ভিত্তি ছিল তাসখন্দ ঘোষণার ব্যাপারে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের সাথে কথিত মতবিরোধ এবং যুদ্ধকালীন সময়ের পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে দেশে এবং দেশের বাইরে ভারত বিরোধী জোরালো বক্তব্য। পাকিস্তানের শক্তি সামর্থ বিবেচনা সাপেক্ষে রাষ্ট্রপ্রধান হিসাবে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাক্ষর দান করেছিলেন। কিন্তু এটা ভুট্টোর মনোপূত হয়নি। মনপূত হয়নি পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের। বিদেশী সাহায্য ছাড়াই যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার পক্ষপাতি ছিলেন সেনাকর্মকর্তাদের অনেকে।

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীতে আইয়ুবের যে বিশাল ভাবমূর্তি গড়ে উঠেছিল তাসখন্দ ঘোষণার পর সেটা আর অবশিষ্ট থাকেনি। পিরজাদা ভুট্টোকে স্পষ্টই জানিয়ে দেন যে সরকার উৎখাতের গণআন্দোলনে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব সেনাবাহিনীর সমর্থন পাবেন না। এরপর ভুট্টো অত্যন্ত দুঃসাহসী হয়ে উঠেন। পশ্চিম পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে এমন ধারণা প্রকট হয়ে উঠে যে জোয়ানদের রক্তের বিনিময়ে অর্জিত জাতীয় মর্যাদা প্রেসিডেন্ট আইয়ুব তাসখন্দ ঘোষণার মধ্য দিয়ে ভুলুণ্ঠিত করেছেন। বিদেশী চাপের মুখে প্রেসিডেন্ট আইয়ুব নতি স্বীকার করেছে। এই ধারণা জামায়াতে ইসলামীর ব্যাপক প্রচারণা থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। দীর্ঘদিন ধরে সুপরিকল্পিতভাবে জামায়াতে ইসলামী যে আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল ধূর্ত শৃগালের মত চূড়ান্ত মূহূর্তে ভুট্টো সেসবের সম্পূর্ণটাই দখল করে নিল। পূর্ব পশ্চিম উভয় অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল জামায়াতে ইসলামী, অতঃপর অন্যান্য দল সম্মিলিতভাবে। তারা নিয়মতান্ত্রিক আন্দোলনের পথ ধরে এগুচ্ছিলেন। ধ্বংসাত্মক প্রক্রিয়ায় নয় গঠনমূলক প্রক্রিয়ায় আইনানুগ পন্থায় ধাপে ধাপে অগ্রসর হচ্ছিলেন।

'৬৮ সালের ৭ নভেম্বর পশ্চিম পাকিস্তানের সরকার বিরোধী তীব্র আন্দোলনের অশনি সংকেত বেজে উঠে একটি অতি তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে। রাওয়াল পিন্ডি গর্ডন কলেজের ৭০ জন ছাত্র নভেম্বরের প্রথম দিকে লান্ডিকোটালে বিদেশী মালামাল ক্রয় করে। কাষ্টমস কর্তৃপক্ষ বিধিসম্মতভাবেই ছাত্রদের কেনা বিদেশী মালামাল বাজেয়াপ্ত করে। এই তুচ্ছ ঘটনাকে নিয়ে ছাত্ররা আন্দোলন শুরু করে। ভুট্টো ছাত্রদের উৎসাহিত করেন। ৭ নভেম্বর ছাত্র পুলিশের উপর হামলা চালায়। পুলিশ গুলিবর্ষণ করলে রাওয়ালপিন্ডিতে একজন ছাত্র নিহত হয়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম পাকিস্তানে গণ আন্দোলনের বিস্ফোরণ হয়। ভুট্টো ছাত্রদের উপর পুলিশী বাড়াবাড়ির নিন্দা করে যেমন জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন তেমনি ছাত্ররাও আন্দোলনের উৎসাহিত হয়ে উঠেছিল। ১০ নভেম্বর ('৬৮) পেশোয়ারে ভাষন দানকালে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের জীবন নাশের চেষ্টা হয়। ১৩ নভেম্বর ভুট্টোকে গ্রেপ্তার করা হয়।

বিরোধীদল এবং ক্ষমতাসীনদের প্রত্যাশার বাইরে আন্দোলন উচ্চকিত হয়ে উঠে। রাজনীতিতে এয়ার মার্শাল আসগর খান এবং জাষ্টিস মোর্শেদ এই দুই আগন্তকের পদার্পণ আন্দোলনের নতুন মাত্রা যোগ করে।

www.pathagar.com

সে সময় বিরোধী দলীয় জোট পিডিএম এর উদ্যোগে মিটিং মিছিলে বাংলাদেশ সোচ্চার হয়ে উঠেছিল কোনরকম বিশৃংখল পরিস্থিতির সৃষ্টি না করেই। জামায়াত ছাড়া আরো ৫ দল পিডিএম এর সংগে সংশ্লিষ্ট থাকলেও বিশৃংখল পরিস্থিতির উদ্ভব হয়নি। জামায়াত এবং ইসলামী ছাত্রসংঘের বিপুল সংখ্যক কর্মী সংশ্লিষ্ট থাকার কারণে পিডিএম এর আন্দোলন সুশংখলভাবে চলছিল এবং ক্রমশ গতিশীল হয়ে উঠেছিল। পশ্চিম পাকিস্তানের ছাত্র আন্দোলন সোচ্চার হয়ে উঠলে আন্দোলন থেকে দূরে থাকা মওলানা ভাসানী ময়দানে এসে উপস্থিত হলেন।

এরপর থেকে পূর্বপাকিস্তানের আন্দোলন ভিন্ন রূপ নিল। নিয়মতান্ত্রিকতা উপেক্ষিত হল। আন্দোলনে জামায়াতে ইসলামী নিয়ন্ত্রণ ক্রমশ হ্রাস পেতে শুরু করল। ক্রমবর্ধমান ভাইআলানস আন্দোলনকে গ্রাস করল। এদিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আর এক খেলা সংঘটিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ ১১ দফা প্রনয়ণ করে। মুলত ছাত্রলীগ ও ছাত্র ইউনিয়নের উদ্যোগে এটা প্রণীত হয়েছিল। ১১ দফা ভিত্তিক দেশব্যাপী আন্দোলন পরিচালনার উদ্দেশ্যে ১৯৬৯ সালের ৫ই জানুয়ারী ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। আওয়ামী লীগের ৬ দফা বামপন্থীদের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার মূল দাবী এবং ছাত্রদের স্বার্থসংশ্লিষ্ট কিছু দাবী ১১ দফায় সন্নিবেশিত হয়েছিল সবচেয়ে মজার ব্যাপার হয় ১৯৬৮-৬৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলগুলোতে সরকার সমর্থিত ছাত্র সংঠন এনএসএফ এর প্রাধান্য ও শক্তিশালী অবস্থান থাকা সত্ত্বেও তারা কিভাবে ১১ দফার আন্দোলনে শরীক হল এটা অনেক পর্যবেক্ষককে হতবাক করে দেয়।

এমনও তো হতে পারে অনেকের মত এরাও সে সময় ভারতীয় দূতাবাস অথবা তাদের এজেন্টদের কাছে অর্থের বিনিময়ে বিবেক বন্ধক রেখেছিল। পিডিএম এর উদ্যোগ পরিচালিত দীর্ঘ দিনের আন্দোলন যখন একটা পর্যায়ে এসে পড়ল এবং যখন বেগবান হল, তখন বামপন্থী ও জাতীয়তাবাদী চক্র পিডিএম এর গতিশীল আন্দোলনের স্রোতে ১১ দফা আকস্মিকভাবে ভাসিয়ে দেয়। শুরুতেই ১১ দফা গতিশীল হয়ে উঠে। এই সাথে পত্র পত্রিকার প্রচারণাযুক্ত হয়ে সমগ্র দেশ ১১ দফায় একাকার হয়ে যায়। হাওয়া উল্টো দিকে বইতে শুরু করে। জামায়াতের দীর্ঘ দিনের পরিশ্রম হাইজ্যাক করে নেয় বামপন্থী-জাতীয়তাবাদী পঞ্চমবাহিনী চক্র। তৎকালীন শিক্ষাঙ্গনে উদীয়মান শক্তি ইসলামী ছাত্র সংঘ এটাকে মেনে নিতে পারল না। ইসলামী ছাত্র সংঘ তালাবায়ে আরাবিয়া ও ছাত্রশক্তিকে সংগে নিয়ে হাওয়ার বিপরীতে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

কিন্তু শেষ অবধি কুলিয়ে উঠলো না। কেননা সংবাদ পত্রের সবগুলোই ছিল বামপন্থী ও জাতীয়বাদীদের দখলে। তারা আইয়ুব বিরোধী সর্বদলীয় আন্দোলন ৬ দফার পক্ষের স্রোতে পরিণত করল। বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্রের নায়ককে পরিণত করল জাতীয় হিরোতে। আগড়তলা ষড়যন্ত্রের মূল নায়ক শেখ মুজিব কারাগার থেকে বেরিয়ে এলো মহা নায়ক হয়ে। উগ্রবাদী আন্দোলনের তোড়ে ভেসে গেল জামায়াত ও পিডিএম এর সবধরনের প্রয়াস। আন্দোলনের সাথে প্রাসাদ ষড়যন্ত্র যুক্ত হয়ে প্রেসিডেন্ট আইয়ুবকে বিদায় হতে হল। দুই পাকিস্তানে গ্রহণযোগ্য রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব আর একটিও রইল না। পাকিস্তানের দুই অংশে দুই উগ্রবাদী নেতা শেখ মুজিব ও জুলফিকার আলী ভূট্টোর প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হল। যদিও জেনারেল ইয়হিয়ার নেতৃত্বে সামরিক শাসন জারি করে রাজনৈতিক সন্ত্রাস আপাতত দূর করা হল। এ সত্ত্বেও ষড়যন্ত্র থেমে থাকল না। বিচ্ছিন্নতাবাদী পঞ্চম বাহিনীর এমন একটা বিরতির প্রয়োজন ছিল তাদের রাজনৈতিক কৌশল নির্ধারণের জন্য ষড়যন্ত্রকে বৈধতার মোড়কে উজ্জীবিত করার জন্য। প্রেসিডেন্ট আইয়ুবের ক্ষমতা ত্যাগের পরবর্তী ঘটনা প্রবাহে দেখা যাবে কিভাবে পঞ্চম বাহিনী ছলচাতুরী বানোয়াট পরিসংখ্যান ও রাজনৈতিক ধোকা দিয়ে জাতিকে বোকা বানিয়ে সর্বনাশের বৃত্ত রচনা করে পাকিস্তানকে মর্মান্তিকভাবে টুকরো করেছেন। কিভাবে সমৃদ্ধ বাংলা গড়ে তোলার বদলে তলা বিহীন ঝুড়িতে পরিণত করেছে, কিভাবে তারা হিন্দুস্তানের ক্রীড়নক হয়ে দিল্লীর আশা আকাঙ্খা পূরণ করেছে, পরবর্তী অধ্যায়ে আমি সেই বিষয়টির উপর আলোকপাত করব।

www.pathagar.com

চতুর্দশ অধ্যায়

মুজিবের প্রতারণার ফাঁদে ইয়াহিয়া

পাকিস্তান আন্দোলন চলা কালে মাওলানা ভাসানী তার প্রিয় নেতা এবং সর্বভারতীয় মুসলিম জনগণের প্রাণ প্রিয় নেতা কায়দে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহর সাথে সাক্ষাত করতে যান। যখন তিনি কায়দে আযমের মুখো মুখি হলেন তখন গভীর আবেগে ডুকরে কেঁদে ফেললেন। তিনি কায়দে আযমকে বাংলার অসহায় মুসলমানদের ভবিষ্যতের জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করার জন্য অনুরোধ করলেন। কায়দে আযম তাকে আশ্বাস দিয়ে বিদায় দিলেন। তখন সম্ভবত চৌধুরী মুহাম্মদ আলী পাশে ছিলেন তাকে কায়দে আযম বললেন– এই আবেগ প্রবন মানুষটা থেকে সাবধান থাকবেন। আবেগ তাড়িত হয়ে এই লোকটা এমন কিছু করতে পারে যা জাতির জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। পাকিস্তান আন্দোলনের অন্যতম নেতা মাওলানা ভাসানীর ব্যাপারে কায়দে আযমের মন্তব্য একেবারে অমূলক ছিলো না। আবেগ তাড়িত হয়ে তাৎক্ষনিক যা কিছু দরকার তিনি তাই করেছেন ভবিষ্যতের ভাবনা না ভেবেই।

ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের প্রাথমিক পর্যায়ে মুসলিম লীগের নেতৃত্বের মধ্যে জনগণের মুক্তির সম্ভাবনা না দেখে তিনি তৎকালিন নেতৃত্বের প্রতি বিরূপ হয়ে মুসলিম লীগ ত্যাগ করে প্রথমত আওয়ামী লীগ, পরবর্তীতে ন্যাশনাল আওয়ামী পার্টি (ন্যাপ) গঠন করেন। দেশপ্রেম এবং রাজনৈতিক আন্তরিকতা থাকা সত্বেও তার ছিল সীমাবদ্ধতা। এই সীমাবদ্ধতার কারণে তিনি আঁচ করতে পারেননি কমিউনিজমের অনিবার্য পরিণতি। সম্ভবত গরীব ও খেটে খাওয়া মানুষদের জন্য কমিউনিজমের মানবিক আবেগ তাকে আকর্ষণ করেছিল। উপমহাদেশের হিন্দু নেতৃবৃন্দের পরিচালিত কমিউনিস্টপার্টির পাকিস্তান কেন্দ্রিক ষড়যন্ত্রের গভীরতাও তিনি সময়মত বুঝতে ব্যর্থ হয়েছিলেন। তিনি বুঝেননি আঞ্চলিক জাতীয়তাবাদের অন্তিম ঠিকানা। এ কারণে একজন খাঁটি মুসলমান হয়েও আঞ্চলিকাতাবাদী ও কমিউনিস্টদের প্রেরণা এবং পৃষ্ঠপোষকে পরিণত হয়েছিলেন। জাতীয়তাবাদীরা তাকে ব্যবহার করে অনেকটা পথ অতিক্রম করেছিল। তিনি কমিউনিস্টও সমাজতন্ত্রীদের নিজের পক্ষপুটে আশ্রয় দিয়েছিলেন অথচ এদের অখণ্ড পাকিস্তান কেন্দ্রীক ন্যূনতম লক্ষ্যও ছিল না।

www.pathagar.com

পাকিস্তান আন্দোলনে মাওলানা ভাসানীর অবদান কারো চেয়ে কম ছিল না। তৎকালীন মুসলিম লীগ সরকারের দায়িত্বহীন কর্মকাণ্ড মাওলানা ভাসানীকে বিরূপ করে তুলেছিল। তার বক্তব্যে এর বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এটা সত্য। কিন্তু পাকিস্তানের ধ্বংস প্রয়াসী হিসেবে তাকে চিহ্নিত করা ঠিক হবে না। সময়ের সাথে তাল রেখে তিনি যা কিছু করেছেন এর জন্য মূলত দায়ী তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্ণর আহসান। ইয়াহিয়া মন্ত্রী সভার সদস্য এবং একজন খ্যতিমান রাষ্ট্রবিজ্ঞানী জনাব জি ডব্লিউ চৌধুরী তৎকালিন পরিস্থিতিতে ভাসানী সর্ম্পকে বলেছেন– 'ভাসানী আমাকে বলেছিলেন, যদি সরকার মুজিবকে বাংলাদেশের ৬ দফা প্রচারে স্বাধীনতা দেয় তা হলে তার স্বাধীন পূর্ব পাকিস্তান বলা ছাড়া আর কোন গত্যন্তর থাকবে না।'

যাই হোক শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের তৎপরতা এবং দেশী বিদেশী মিডিয়াসমূহের অপপ্রচারের কারণে ইসলাম পন্থীও ডান পন্থী এবং পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী সংগঠনসমূহ পাকিস্তানের দোসর হিসাবে চিহ্নিত হয়ে যায়। এর ফলে চলমান পরিস্থিতিতে তাদের বক্তব্য এবং তাদের তৎপরতা সবকিছুই জনগণের গ্রহণ যোগ্যতা হারিয়ে ফেলে। এ কারণে মুজিবের ধ্বংসাত্মক কর্মতৎপরতা প্রতিরোধে মাওলানা ভাসানীর বিকল্প কেউ ছিলেন না। গভর্নর আহসান নিবুর্দ্ধিতার কারণে অথবা কোন অদৃশ্য সুতোরটানে ভাসানীর সাথে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার বোঝা পড়ার ক্ষেত্রে সচেতন ভাবে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করেন। শুধুমাত্র তিনি প্রেসিডেন্টের কাছে মাওলানা ভাসানীকে গুরুত্বহীন করেছিলেন তাই শুধু না– মাওলানার অনুগামীদের প্রতি তিনি প্রত্যক্ষ নিপিড়ন চালিয়েছেন। গভর্নর আহসান কনফিডেন্সিয়াল রিপোর্টে মাওলানা ভাসানী এবং পিকিং পন্থী নেতৃবৃন্দকে রাষ্ট্র বিরোধী শক্তি হিসাবে চিহ্নিত করেন। গভর্নর আহসান প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে সব সময় এই ধারণা দিয়েছিলেন যে শেখ মুজিব অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী এবং তিনি কখনই পাকিস্তান ভাংবেন না। গভর্নরের বক্তব্যে আশ্বস্থ হয়ে ইয়াহিয়া আওয়ামী লীগের বিচ্ছিন্নতাবাদী বল্গাহীন প্রচারনায় বাধ সাধেননি। শেখ মুজিবও ইয়াহিয়ার সাথে আলোচনার সময় প্রতারণার আশ্রয় নিয়েছেন। ইয়াহিয়া মুজিবকে বিশ্বাস করেছেন তার প্রতি অতিরিক্ত গুরুত্বারোপ করেছেন এবং তার প্রতি সাহায্য সহানুভূতির হাত সম্প্রসারিত করেছেন। অন্যদিকে পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী দলসমূহের প্রতি বিমাতাসূলভ আচরণ করেছেন। শেখ মুজিবের প্রতি ইয়াহিয়া সরকারের সহানুভূতি ও দুর্বলতার কারণে সামরিক সরকারের নাকের ডগায় শেখ মুজিব বিচ্ছিন্নতাবাদীর আগুন গ্রাম বাংলার সর্বত্র ছড়িয়ে দিতে সক্ষম হয়।

www.pathagar.com

এই সাথে অল ইনডিয়া রেডিও থেকে প্রচারিত এপার বাংলা ওপার বাংলা অনুষ্ঠানে বাকচাতুরী ও মিথ্যার বুনোট দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে উত্তেজিত করে চলছিল। মস্কোর রেডিও পিস এন্ড প্রগ্রেস এবং বিবিসি শেখ মুজিব ও তার দলের আত্মঘাতী আবেগকে আর একবার গতিশীল করে তোলে। এই সাথে যুক্তরাষ্ট্রের কনসাল জেনারেল মিঃ ব্লাডের মুজিবের প্রতি সহানুভূতি মুজিবকে উদ্দাম করে তোলে। অবশেষে মুজিব নির্বাচনের বহু আগেই বাংলার মানুষের একমাত্র দরদী হিসাবে এবং পূর্ব পাকিস্তানের একক অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে নিজের ভাবমূর্তি প্রতিষ্ঠিত করতে সক্ষম হন।

এবার পশ্চিম পাকিস্তানের দিকে চোখ ফেরানো যাক। তৎকালীন পশ্চিম পাকিস্তানের কোন একক নেতৃত্বের প্রাধান্য ছিল না। পশ্চিম পাকিস্তানের মুসলিম লীগের প্রভাব ও প্রাধান্য দুটোই বর্তমান ছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ ছিল ত্রিধা বিভক্ত। তাদের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াসে মুসলিম লীগ পশ্চিম পাকিস্তানে বিজয় কেতন উড়াতে সক্ষম হতো। কিন্তু ত্রিধা বিভক্ত মুসলিম লীগ শেষ অবধি জনগণের মধ্যে সাড়া জাগাতে ব্যর্থ হয়।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহে জামায়াতে ইসলামীর প্রাধান্য থাকা সত্ত্বেও জামায়াত সাধারণ জনগণের মনের গভীরে প্রবেশ করতে সক্ষম হয়নি। এর একমাত্র কারণ জামায়াতের প্রতারণামূলক এমন কোন সস্তা শ্লোগান ছিল না যা জনগণকে উন্মাতাল করে তুলবে। জামায়াতে ইসলামী নিম্ন মধ্যবিত্ত সচেতন জনগোষ্ঠীর ক্ষুদ্রাংশ। আদর্শিক সংগঠন হওয়ার কারণে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণের বিশেষ প্রক্রিয়া অবলম্বন করার কারণে জামায়াত তখন পর্যন্ত দ্রুত সম্প্রসারণশীল গণ সংগঠনে পরিণত হয়নি। জামায়াত ইসলামী শাসক এলিট শ্রেণীর পৃষ্ঠপোষকতা কোন সময় পায়নি। পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত এই এলিট শ্রেণীরা প্রতিনিধি জনগণ থেকে দুরত্বের অবস্থান করেও আইয়ুব বিরোধী আন্দোলনের মধ্যদিয়ে জনপ্রিয় গণনেতায় পরিণত হলেন। কতিপয় সস্তা শ্লোগান যেমন তাসখণ্ড চুক্তির মাধ্যমে পাকিস্তানের হারিয়ে যাওয়া গৌরব পুনরুদ্ধারে এবং ইসলামী সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার উদ্ভট অঙ্গীকার করে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানকে আলোড়িত করে ফেললেন। সে সময় পশ্চিম পাকিস্তানের আলেমদের নিষ্ক্রিয় ভূমিকা পশ্চিম পাকিস্তানে রাজনৈতিক অপশক্তির উত্থান ত্বরান্বিত করে।

www.pathagar.com

ইয়াহিয়ার অঙ্গীকার

১৯৬৯ সালের ২৫ মার্চ ক্ষমতা গ্রহণ করেই প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের অঙ্গীকার করেছিলেন। মূলত তার অঙ্গীকার ছিল তিনটি ঃ

১. নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর।

২. প্রাপ্ত বয়স্ক ভোটে নির্বাচন। মৌলিক গণতন্ত্রীদের দ্বারা নয়।

৩. দেশের ভবিষ্যৎ শাসনতন্ত্র তৈরি হবে নির্বাচিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা।

অবশেষে নির্বাচনকে সামনে রেখে ১৯৭০ সালের ৩১ মার্চ অখণ্ড পাকিস্তানের জন্য ৫টি মূলনীতি সম্বলিত কাঠামো ঘোষণা করা হয়। যা লিগ্যাল ফ্রেমওয়ার্ক অর্ডার অর্থাৎ এলএফও নামে অভিহিত।

- পাকিস্তানকে অবশ্যই ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে।
- অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন সাপেক্ষে দেশটিকে একটি গণতান্ত্রিক শাসনতন্ত্র পেতে হবে।
- আঞ্চলিক অখণ্ডতাকে শাসনতন্ত্রে অবশ্যই তুলে ধরতে হবে।
- দেশের দুই অংশের মধ্যকার বৈসাম্য দূর করতে হবে। বিশেষত অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে।
- কেন্দ্র ও প্রদেশগুলোর মধ্যে ক্ষমতা অবশ্যই এমনভাবে বণ্টন করতে হবে যাতে প্রদেশগুলো সর্বাধিক পরিমাণ স্বায়ত্বশাসন পায়। কেন্দ্রকে আঞ্চলিক অখণ্ডতা রক্ষা সহ ফেডারেল দায়িত্ব পালনে যথেষ্ট ক্ষমতা প্রদানের সাথে সামঞ্জস্য পূর্ণ হয়।

গভর্ণর আহসানের দূরভিসন্ধি ও বিচ্ছিন্নতাবাদের পালে হাওয়া

আমি আগেই বলেছি বিচ্ছিন্নতাবাদের প্রবল স্রোতে বিঘ্ন সৃষ্টি করতে পারার মত একমাত্র ব্যক্তিত্ব তখন ছিলেন মাওলানা ভাসানী। এই ভাসানীর সাথে ইয়াহিয়া দূরত্ব রচনা করেছিলেন গভর্ণর আহসান শুধু মাত্র মুজিবকে নির্বিঘ্ন করার জন্য। এটা কি গভর্ণর আহসানের প্রতিভার দূর্বলতা না কি তিনিও ছিলেন আন্তর্জাতিক চক্রের সাথে সম্পৃক্ত।

www.pathagar.com

১৯৭০ সালের নভেম্বর ঘুর্ণি ঝড় ও জলোচ্ছাসে পূর্ব পাকিস্তানের সমুদ্র উপকূল ধ্বংস যজ্ঞের পর গভর্ণর আহসান এমন একটা কাণ্ড করেন যাতে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ আরো বিক্ষুদ্ধ হয়ে উঠে। তখন প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া চীন সফরে ছিলেন। তিনি রাওয়ালপিণ্ডি ফেরার পথে ঢাকায় যাত্রা বিরতি করেন। কিন্তু গভর্ণর আহসান ঘুর্ণিঝড় সম্পর্কে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে সঠিক ধারণা না দিয়ে পত্র পত্রিকার বিবরণকে অতিরঞ্জিত হিসাবে বর্ণনা করেন। ফলে ইয়াহিয়া বিষয়টির ওপর গুরুত্ব আরোপ না করে পিণ্ডি ফিরে যান। তখন এর মারাত্মক প্রতিক্রিয়া হয়। বিচ্ছিন্নতাবাদীরা এই প্রসঙ্গ অবতারণা করে কেন্দ্রীয় সরকার ও পশ্চিম পাকিস্তানীদের বিরুদ্ধে জনমনকে বিষাক্ত করে তুলে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই প্রচারণা শেখ মুজিবের পৃথক রাষ্ট্র গঠনের দুরভিসন্ধি সাধারণ বাঙালীর অতি মাত্রিক যৌক্তিক বলে বিবেচনা করতে থাকে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া তার ভুল অথবা গাফিলতি উপলব্ধি করে পুনরায় ঢাকায় আসেন এবং দূর্গতদের সংকট নিরসনে ব্যাপক সাহায্য সহযোগিতার হাত সম্প্রসারিত করেন। কিন্তু এত করেও তিনি উদ্ভূত ক্ষতির সামান্য পরিমাণ পুষিয়ে নিতে পারেননি। যদিও দুর্গতদের জন্য আওয়ামী লীগের কোন অবদানই ছিলনা। এমন কি জামায়াতে ইসলামী দূর্গতদের জন্য যতটুকু করেছিল তার ধারে কাছেও ছিল না। আওয়ামী লীগ শুধুমাত্র মিডিয়ার আনুকুল্য পেয়ে ৭০ এর ঘুর্ণিঝড় ও জলোচ্ছাস থেকে রাজনৈতিক ফায়দার সবটুকু লুটে নেয় আওয়ামী লীগ।

ঘুর্ণিঝড়ের তাণ্ডবের পর প্রত্যেকটি দলই নির্বাচন পিছিয়ে দেয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে অনুরোধ করলেন। পশ্চিম পাকিস্তানের নেতৃবৃন্দও নির্বাচন স্থগিত রাখার অনুরোধ জানালেন। মাওলানা ভাসানী প্রস্তাব দিলেন যদি ইয়াহিয়াখান নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রস্তুতি বাদ দিয়ে তার সমস্ত প্রশাসনকে দুর্গতের জন্য ত্রাণ কার্যে নিয়োজিত করেন এবং তখন যদি নির্বাচনে স্থগিত রাখার প্রশ্নে মুজিব চ্যালেঞ্জ করেন তাহলে তিনি এবং তার দল ইয়াহিয়াকে সমর্থন দিবেন মুজিবকে নয়। অন্যান্য দলও এ ব্যাপারে ইয়াহিয়াকে সমর্থন দেয়ার জন্য প্রস্তুত ছিলেন।

রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের নড়াচড়া দেখে মুজিব ঘোষণা দিলেন যদি নির্বাচন স্থগিত রাখা হয়– তাহলে সংঘর্ষে ১০ লক্ষ লোক নিহত হবে। মুজিবের সইছিল না। কারণ কৃত্রিম ভাবে সৃষ্টি জনমতের উত্তাপ থিতিয়ে যাবার সম্ভাবনায় উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন মুজিব। যে কারণে হুমকির পর হুমকি দিয়ে ইয়াহিয়াকে ভীত করে দেয়। শেষ অবধি ইয়াহিয়া মুজিবকে সন্তুষ্ট করার জন্য নির্বাচন স্থগিত না রেখে দারুণভাবে রাজনৈতিক ভুল করলেন যে ভুলের মাশুল দিতে অখণ্ড পাকিস্তান ভেঙে গেল। মুজিবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য নুরুল আমিনসহ ১১ জন জাতীয় নেতাকে পর্যন্ত সাক্ষাৎ দিলেন না ইয়াহিয়া খান।

www.pathagar.com

জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন– '১৯৭০ সালের আগস্ট নাগাদ সরকার মুজিবের আসল মতলব সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য খবর পান। জেনারেল আকবরের (পাক্ষিক) রিপোর্টসমূহ গোয়েন্দা সার্ভিস পূর্বপাকিস্তানে আঞ্চলিক প্রধান ছিলেন একজন বাঙালি, তিনি ইয়াহিয়াকে যথেষ্ট ইংগিত দেন যে মুজিবের কৌশল মনে হচ্ছে বাঙালিদের একচ্ছত্র নেতা হওয়ার ক্ষেত্রে নির্বাচনকে ব্যবহার করা, তারপর তিনি দাঁত খিঁচাবেন। ইতিমধ্যে এক বিদেশী সাংবাদিক সম্ভবত এন্থনি ম্যাসকারেনহাস যার সংগে মুজিবের গভীর সম্পর্কে ছিল তাকে তিনি একটি সাক্ষাৎকার দেন। এতে তিনি তার চূড়ান্ত লক্ষ্য হিসাবে বাঙালিদের পৃথক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কথা বলেছেন এবং এতে নয়াদিল্লীর সাথে তার গোপন যোগসূত্রের কথাও বলা হয়েছে। এই সাক্ষাৎকারটি তাৎক্ষনিকভাবে প্রকাশ না করার জন্য সেই বিদেশী সাংবাদিককে শেখ মুজিব নিষেধ করেন। কিন্তু কোন এক সূত্রের মাধ্যমে গোয়েন্দা সংস্থা পুরো রিপোর্টটি হাতিয়ে নিতে সক্ষম হয়। ইয়াহিয়া হয়তো এ ব্যাপারে মুজিবকে চ্যালেঞ্জ করতে পারতেন। দক্ষ রাজনীতিকদের মত সময়োচিত সাহসি পদক্ষেপ নেয়ার ব্যাপারে ইয়াহিয়ার পিছুটান ছিল বরাবরই।

নভেম্বরে চীন সফরকালিন সময়ে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব এবং পরবর্তী প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করে মুজিবের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা থেকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে বাধ্য হয়ে বিরত থাকতে হয়েছিল। নির্বাচনোত্তর ৬ দফা এবং বিচ্ছিন্নতার পক্ষে মুজিব যখন শক্ত অবস্থান নিলেন তখনকার পরিস্থিতি ছিল ইয়াহিয়ার জন্য বিব্রতকর।

নির্বাচনের পর মুজিব ও ভুট্টো

১৯৭০ সালের ৭ ডিসেম্বর নির্বাচন অনুষ্ঠিত হল এই নির্বাচনকে অনেকেই মনে করেন অবাধ ও নিরপেক্ষ। তৎকালীন মিডিয়া বিচ্ছিন্নতাবাদীর পক্ষে। বিচ্ছিন্নতাবাদীদের নিরঙ্কুষ বিজয় হওয়ার কারণে নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ হয়ে উঠল। প্রকৃতপক্ষে এ নির্বাচন অবাধ ও নিরপেক্ষ ছিল না।

নির্বাচনের পূর্বে শুধু ঢাকায় নয় দেশের সর্বত্র সন্ত্রাস চালিয়েছিল আওয়ামী লীগ। তারা অনাহুত সংঘাত সৃষ্টি করে জামায়াত কর্মীদের রক্তাক্ত ও ক্ষত বিক্ষত করে। এমনকি নির্বাচনের দিন জামায়াত ও অন্যান্য দলের পোলিং এজেন্টদের বুথ থেকে বের করে দিয়েছিল আওয়ামী লীগ কর্মীরা। কিন্তু প্রশাসন ছিল নীরব। অনেক স্থানে আওয়ামী লীগ ছাড়া অন্যান্য দলীয় সমর্থকদের পোলিং বুথে আসতে দেয়া হয়নি। এমনকি তারা পোলিং অফিসারদের সহযোগিতায় অজস্র জাল ভোট দিয়ে বাক্স ভর্তি করে। ভোট গ্রহণের সাথে জড়িত অধিকাংশ

www.pathagar.com

প্রিজাইডিং অফিসার ও পোলিং অফিসাররা নিরপেক্ষ ছিলেন না তথাকথিত জাতীয়তাবাদের উন্মাদনায় আক্রান্ত ছিলেন তারা।

নির্বাচন হল এভাবেই। আওয়ামী লীগ ভয়-ভীতি প্রদর্শন এবং শক্তি প্রয়োগ করে সাফল্যের সবটুকু তার ঘরে তুলে নিতে সক্ষম হল। পূর্ব পাকিস্তানের ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টি আসন হাতিয়ে নিল আওয়ামী লীগ কাষ্টিং ভোটের ৭৪ শতাংশ অর্জন করল আওয়ামী লীগ।

পশ্চিম পাকিস্তানে অনুরূপ ভুট্টোর দল পিপলস পার্টি ১৩৮টি আসনের মধ্যে ৮১টি আসন লাভের সৌভাগ্য অর্জন করে।

পূর্ব পাকিস্তানের শেখ মুজিব ও পশ্চিম পাকিস্তানের ভুট্টো উভয়েরই চারিত্রিক বৈশিষ্টের মধ্যে তেমন উল্লেখযোগ্য পার্থক্য ছিল না। দুই নেতাই পাকিস্তানের অশিক্ষিত ভোটারদের কাছে নেতিবাচক আবেদন রেখে জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। একজন পশ্চিম পাকিস্তানের বিরুদ্ধে আঞ্চলিক মনোভাব জাগ্রত করে অন্যজন ভারতীয় আধিপত্যের বিরুদ্ধে জঙ্গী মনোভাব জাগ্রত করে জন প্রিয়তার শীর্ষে আরোহণ করে। এদের কারো মধ্যে গঠনমূলক ইতিবাচক দৃষ্টি ভঙ্গী ছিল না। একজনের ছিল ইউটোপীয় ধ্যান-ধারণা সমৃদ্ধ তথাকথিত সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার লঘু আবেদন অন্যজনের ছিল হাজার বছর ভারতের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়ে যাবার এবং তাসখন্দে হারান জাতীয় সম্মান পূর্ন প্রতিষ্ঠার বাগাড়ম্বর। মুজিব ভুট্টো উভয় নেতার বাস্তব বিবর্জিত অঙ্গীকার অশিক্ষিত সাধারণ মানুষ আন্তরিকতার সাথে বিশ্বাস করল। এই বিশ্বাসই প্রতিশ্রুতিশীল দল সমূহের সর্বনাস ডেকে আনল সর্বনাস ডেকে আনল অখণ্ড পাকিস্তানের । এই দুই নেতা এবং দুটো দল এক যোগে দ্বিজাতি তত্ত্বের ভিত্তিমূল নাড়িয়ে দিল এবং রাজনৈতিকভাবে বিভক্ত হয়ে পড়ল সমগ্র জাতি।

নির্বাচনের পর মুজিব ভুট্টো উভয়েই বিকার গ্রস্থ হয়ে পড়ে। সুস্থ স্বাভাবিক অবস্থানে দু'জনের একজনও ছিলেন না। সমকালীন পর্যবেক্ষক মহল উভয় নেতাকেই পাকিস্তান বিরোধী কোন বিশেষ চক্রের ক্রীড়নক বলে ভাবতে শুরু করে।

উন্নিষশত বাহাত্তরের মার্চে কোলকাতায় প্রকাশিত সাপ্তাহিক দেশ পত্রিকায় রূপদর্শীর কলামের বিবরণ ঐ ধারনাকে বদ্ধমূল করেছে। এতে লেখা হয় –'আমার কাছে যথেষ্ট প্রমাণ রয়েছে যা থেকে বলা যাবে মুজিব ভুট্টো উভয়েই ছিলেন ভারতের এজেন্ট। পাকিস্তানের উভয় নেতা ভারতের ছক অনুসারে তাদের আচরণ করেছেন।'

www.pathagar.com

পঞ্চদশ অধ্যায়

বৈশম্য দূরীকরণে ইয়াহিয়ার উদ্যোগ

ক্ষমতাসীন হওয়ার পরই সামাজিক সুবিচারের প্রসঙ্গে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কিছু অঙ্গীকার করেছিলেন। হয়তোবা সেটা ছিল তাৎক্ষনিক রাজনৈতিক প্রয়োজনে। জি ডব্লিউ চৌধুরীর অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোর ভাষ্য অনুযায়ী যেমন তিনি বলে ছিলেন। 'পরিকল্পিত সামাজিক ইনসাফের দাবি করে পৃথক করা যায় না। যে বিরাট ব্যবধান সমাজের নানা অংশকে পৃথক করে রেখেছে তাকে সংকুচিত করতে হবে এবং যা ভারসাম্যহীনতা সামাজিক দ্বন্দ্ব ও অসন্তোষের পথ দেখায় তা দূরীভূত করতে হবে।' প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার এই আকাঙ্খা পূরণ তৎকালিন আর্থিক ও সামাজিক পটভূমিতে সম্ভব ছিল না। ১৯৬৯ সালের মে মাসে আমেরিকার সেক্রেটারী অব স্টেট পাকিস্তান সফরে এলে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া বর্ধিত অর্থনৈতিক সাহায্যের আবেদন জানিয়ে সাড়া পাননি। এতদসত্বেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে ১৯৭০-৭৫ মেয়াদের চতুর্থ পাঁচসালা পকিল্পনা গ্রহণ করতে হয়েছিল আওয়ামী লীগের বিরোধিতার মুখে। দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি অব্যাহত রাখার জন্য এবং বৈদেশিক সাহায্যের প্রবাহ অক্ষুণ্ন রাখার জন্য এই পরিকল্পনা প্রণয়ন অপরিহার্য ছিল। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতি ইয়াহিয়া খানের নির্দেশ ছিল প্রথমতঃ সামাজিক সুবিচারের প্রতি অধিকতর গুরুত্বারোপ এবং দ্বিতীয় দেশের বিভিন্ন অঞ্চলের মধ্যে অর্থনৈতিক বৈষম্যকে ব্যাপকভাবে কমিয়ে আনা।

পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী অর্থনীতিবিদদের পরামর্শ ও সুপারিশক্রমে শেষ অবধি জাতীয় অর্থনৈতিক কাউন্সিল যে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রণয়ন করে তাতে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ ছিল ৩৯৪০ কোটি টাকা, পশ্চিম পাকিস্তনের জন্য বরাদ্দ হয় ৩৫৬০ কোটি টাকা সর্বমোট বরাদ্দের ৫২.৫ শতাংশ পূর্ব পাকিস্তানের ভাগে এবং ৪৭.৫ শতাংশ পশ্চিম পাকিস্তানের ভাগে। এতেও মন্ত্রী পরিষদের বাংলাভাষী সদস্যরা সন্তুষ্ট হতে পারেনি। এর প্রতিক্রিয়ায় প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া পরিকল্পনা কমিশনের উদ্দেশ্যে বলেন– 'মন্ত্রী পরিষদে আমার ভাঙালি সহকর্মীরা আমার কাছে উল্লেখ করেছেন যে ১৯৭০-৭১ সালে পূর্ব পাকিস্তানের জন্য বরাদ্দ

www.pathagar.com

আঞ্চলিক বৈষম্য কমবে না। তা যদি হয় তাহলে আমি এর পক্ষ নিতে পারি না।' প্রেসিডেন্টের এই প্রতিক্রিয়ার ফলে পরবর্তীতে পরিকল্পনা কমিশন ঘোষণা করে যে আঞ্চলিক বৈষম্য দূর করার জন্য ৭৫০ থেকে ১০০০ কোটি টাকার সম্পদ পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তানে স্থানান্তর করা হবে। পূর্ব পাকিস্তানের উন্নয়ন বরাদ্দ তৃতীয় পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ৩৭ শতাংশ থেকে ৫২.৫ শতাংশে উন্নীত করা হবে। ১৯৭০-৭১ সালের বার্ষিক পরিকল্পনায় পূর্ব পাকিস্তানের বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য ১৫০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়। ইয়াহিয়া খান এ ব্যাপারে আরো বরাদ্দের কথা ব্যক্ত করেন। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক সরকার যথেষ্ট সংখ্যক প্রকল্প তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। অথচ পূর্ব পাকিস্তানের প্রশাসন তখন বাঙালিদের দ্বারা পরিচালিত হতো। এটা ছিল তাদের দুর্বলতা ও অযোগ্যতা। পূর্ব ও পশ্চিমের অতীত বৈষম্য দূর করার মানসিকতা ইয়াহিয়ার মধ্যে প্রবল ছিল এ ব্যাপারে পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যেও কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া পরিলক্ষিত হয়নি।

এ সত্ত্বেও একাত্তরের ঘুর্ণিঝড় পুর্ব-পকিস্তানে মরণ আঘাত হানলই। ঐক্যবদ্ধ পাকিস্তানে মহাকালের বিপর্যকর এবং মর্মান্তিক রক্তাক্ত পরিণতি দ্বিজাতি তত্ত্বকে অনেকটা ম্লান করে দিল। কিন্তু কেন? কেন এর উত্তর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে দোষারোপ করে অথবা মুজিবের ওপর দেবত্ব আরোপ করে মিলবে না। এর জবাব নিহিত রয়েছে পাকিস্তান আন্দোলনের ধারাবাহিক ইতিহাসের মধ্যে এটা ছিল হিন্দুস্থানের দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনার চূড়ান্ত পরিণতি। এটা ছিল ব্রাহ্মণ্য চক্র প্রযোজিত অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠা নাটকের শেষাঙ্ক।

আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা

বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলন কি একাত্তরের রাজনৈতিক সংকটের মধ্যে সুচিত হয়েছিল? এর জবাব আমি এই গ্রন্থে এর আগে দিয়েছি। এর প্রক্রিয়া শুরু হয় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার কয়েকমাস আগে। এর পেছনে ছিল হিন্দুস্থানের সক্রিয় ষড়যন্ত্র। তথাকতিত স্বাধীনতার পর অনেকেই একথা অকপটে দৃঢ়তার সাথে এবং নিলর্জ্জভাবে স্বীকার করেছেন।

১৯৭২ সালে ৮-৯ এপ্রিল শেখ মুজিব আওয়ামী লীগের কাউন্সিল অধিবেশনে অকপটে বলেন যে সর্বপ্রকারে সাহায্য প্রাপ্তির নিশ্চয়তার জন্য ভারতের সাথে পূর্বেই তার চুক্তি ছিল। সামরিক হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে ভারত সাহায্য ও আশ্রয় দেবে এসব চুক্তি তিনি পূর্বেই সম্পন্ন করেছিলেন।

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগ ও বাকশাল নেতা আব্দুর রাজ্জাক সাপ্তাহিক মেঘনার (১৯৮৭) এক সাক্ষাৎকারে অনুরূপ বক্তব্য দিয়েছেন তার বক্তব্য অনুসারে স্বাধীনতা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ৫০ দশকের শেষ দিকে। আগড়তলা মামলার প্রসঙ্গ টেনে তিনি এ সত্যতাকে স্বীকার করেন অকপটে। তার ভাষায়। এরপর আমাদের সময়কার উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল আগড়তলা ষড়যন্ত্র মামলা। তিনি ১৯৬২ সালে একটা ডেসপারেট মুভ নিয়ে আগড়তলা গিয়ে এরেস্ট হয়ে যান। তখনও ব্যাপারটা মাটিউআর হয়নি। রেজাই আলী নামে এক ভদ্রলোক তাকে কুমিল্লা, কুমিল্লা থেকে নোয়াখালী সীমান্ত হয়ে আগড়তলা যেতে সাহায্য করেন। আগড়তলা থেকে দেশে ফিরে ঢাকায় এসে তিনি ধরা পড়েন।

এর কিছুদিন পর দেখলাম ওদের সঙ্গে বঙ্গবন্ধুর নামও আছে। তিনি আগে থেকে জেলে ছিলেন। আগড়তলা ষড়যন্ত্র উদঘাটিত হয়েছিল ১৯৬৭ সালে। কয়েকজন সাক্ষীর সাক্ষ্য থেকে জানা যায় শেখ মুজিব এই ষড়যন্ত্রের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন। আগড়তলা ষড়যন্ত্রের পরিকল্পনা ছিল, কমান্ডো কায়দায় অতর্কিত আক্রমণ করে সামরিক ইউনিটসমূহের অস্ত্রাগার দখল করে অকেজো অথবা ধ্বংস করে দেয়া। এই উদ্দেশ্য সাধনের লক্ষ্যে ১৯৬৭ সালে ১২ জুলাই ষড়যন্ত্রকারীদের প্রতিনিধিদের সংগে হিন্দুস্থানী প্রতিনিধিদের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। একই বছর ডিসেম্বর ষড়যন্ত্রকারীদের কয়েকজন গ্রেপ্তার হয়। এদের একজনের দেয়া তথ্যে জানা যায় যে হিন্দুস্থান বিপ্লবীদের অর্থ ও অস্ত্র সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। এ ছাড়াও চূড়ান্ত মুহূর্তে দিল্লী পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে যোগাযোগের আকাশ ও সমুদ্র পথ বন্ধ করে দেবার প্রতিশ্রুতিও ছিল।

হিন্দুস্থানের সবুজ সংকেত

'মেঘনার তীর থেকে টেমসের কিনারে' গ্রন্থে লিখেছেন। হিন্দুস্থান ষড়যন্ত্র-কারীদের দেয়া তার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে একটি ফকার ফ্রেন্ডশিপ বিমান হাইজ্যাকের নাটক অবতারণা করে। দিল্লীর নির্দেশমত ভারতীয় চর কর্তৃক এই বিমানটি হাইজ্যাক করে লাহোরে অবতরণ করান হয়। হ্যাইজ্যাককারীরা তাদের দাবির ব্যাপারে আলাপ আলোচনার সময় সুযোগ না দিয়ে বিমানটিকে বোমা মেরে উড়িয়ে দেয়। পাকিস্তান বিমানের ক্রু এবং যাত্রীদের ভারত প্রত্যাবর্তনের ব্যবস্থা করে দেয়। এ সংক্রান্ত তদন্ত কমিশনের রিপোর্ট থেকে জানা যায় হিন্দুস্থানের উপর দিয়ে পূর্ব ও পশ্চিম

www.pathagar.com

পাকিস্তানের বিমান চলাচল বন্ধ করার একটা ছুঁতো দাঁড় করানোর লক্ষ্যে হিন্দুস্থানী এজেন্টরা এই ঘটনার অবতারণা করেছিল। পাকিস্তানের রাজনৈতিক ও শাসনতান্ত্রিক সংকট সৃষ্টি না করে এই ঘটনার মাধ্যমে হিন্দুস্থান পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের এই সবুজ সংকেত দিয়েছিল যে ভারত তাদের সর্বতোভাবে সাহায্য করার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন।

এই সংকেত মুজিবকে অত্যন্ত দুঃসাহসিক করে তুলে। সে সময় গার্ডিয়ান পত্রিকায় (২৪ ফেব্রুয়ারী, ১৯৭১) মুজিবের দুঃসাহসের কারণ এই ভাবে প্রকাশ করে– 'তিনি (মুজিব) বলেছেন জনসাধারণ আমাকে ভালবাসে সুতরাং আমাকে স্পর্শ করেন না। তিনি এ কথা বলেছেন, কারণ তিনি জানেন যে পূর্ব পাকিস্তানে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খানের সৈন্য সংখ্যা এত কম যে তারা বড় রকমের কিছু করার সাহস পাবে না। আর যেহেতু হিন্দুস্থানের উপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ, কাজেই সৈন্য সংখ্যা বাড়ানোও অসম্ভব।'

১৯৭১ সালে পাকিস্তান সরকার কর্তৃক প্রকাশিত শ্বেতপত্রে বলা হয়েছে– 'দিল্লী ভারতের উপর দিয়ে বিমান চলাচল বন্ধ করে ক্ষান্ত হলো না পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদীদের সাহায্যের জন্য ভারতীয় সেনাবাহিনীর বহু সৈন্যকে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তের কাছাকাছি আনা হল। জেট জঙ্গী বিমান ও পরিবহন বিমান সীমান্তের কাছাকাছি বিমান বন্দরে জড়ো করা হলো। পশ্চিম বাংলায় ৫ ডিভিশন সৈন্য সমাবেশ করা হল। এর আগে পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে মোতায়েনকৃত বি এস এফ এর কয়েকটি ব্যাটোলিয়ানের সাথে আরো কয়েকটি ব্যাটেলিয়ান যুক্ত করা হল। এই ভাবে প্রায় ২৫টি ব্যাটেলিয়ান পূর্ব পাকিস্তান পাকিস্তানের ভিতরে ঢুকতে পারে এ কারণে বি এস এফ এর চিহ্ন মুছে ফেলা হল। জীপ ও অন্যান্য যানবাহনের রঙ বদলে দেয়া হল। দিল্লী থেকে বিমান যোগে বি এস এফ সৈন্য আনা হল সব বি এস এফ কোর্স বাতিল করা হল। পুলিশ বিভাগের সব ছুটি বাতিল করা হল।

হিন্দুস্থানী এলাকার উপর দিয়ে পাকিস্তানী বিমান চলাচল বন্ধ করার সাথে সাথে সমুদ্রপথেও বাধার সৃষ্টি করল দিল্লী। এপ্রিল (৭১) হিন্দুস্থানী নৌঘাঁটি দোয়ারকার ৭০ মাইল পশ্চিমে ভারতীয় নৌবাহিনীর একটি জাহাজ ওসমান এন্ডুরেন্স নামে একটি বাণিজ্যিক জাহাজকে বিব্রত করে। জাহাজটি হাজীদের বহন করছিল। হিন্দুস্থানের দক্ষিণ সীমান্তে অনুশীলনের নামে উপকূল থেকে ১২৩ মাইল দূর পর্যন্ত ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়তে থাকে এইভাবে তারা পাকিস্তানী বেসামরিক বিমানকে আরো দক্ষিণে যেতে বাধ্য করে।'

www.pathagar.com

ইয়াহিয়ার সদিচ্ছার অভাব ছিল না

আগড়তলা ষড়যন্ত্রের সাথে জড়িত থাকা সত্ত্বেও শেখ মুজিব ও তার দলকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া কখনও কোনভাবে অসম্মানজনক আচরণ করেননি। মুজিবকে সন্তুষ্ট রাখার জন্য অন্যান্য অখণ্ড পাকিস্তানে বিশ্বাসী দলসমূহের ওপর তিনি অবিচার করেছেন লিগাল ফ্রেম ওয়ার্ক অর্ডার অর্থাৎ এল এফ ও এর সীমা লঙ্ঘন করা সত্ত্বেও মুজিব ও তার দলের প্রতি শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেননি এমন কি এ ব্যাপারে হুঁশিয়ারী ও উচ্চারণ করেননি।

নির্বাচনের ফলাফল ঘোষিত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবকে শুভেচ্ছা বার্তা দিয়ে অভিনন্দন জানালেন। সীমা লঙ্ঘন করার জন্য ইয়াহিয়ার শাসনামলে যারা বন্দী হয়েছিল শুভেচ্ছার নিদর্শন স্বরূপ ইয়াহিয়া তাদের মুক্তির নির্দেশ দিলেন। নির্বাচনের ঘোষণার পর শেখ মুজিব সীমা অতিক্রম করতে শুরু করলেন এবং ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য চাপ বৃদ্ধি করলেন।

শুধু মাত্র ক্ষমতা হস্তান্তর নয়, সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানী গণ প্রতিনিধিদের মধ্যে সমঝোতা এবং পারস্পরিক বোঝা পড়া। কিন্তু ক্ষমতা পাওয়ার জন্য মুজিব অসহিষ্ণু হয়ে উঠলেন। হিংসা বিদ্বেষ আবেগ উন্মাদনা এবং সহিংসতা ছড়িয়ে পরিবেশকে দূষিত করে ফেললেন।

প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ভবিষ্যত প্রধান মন্ত্রী শেখ মুজিবকে ইসলামাবাদ সফরের আমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু মুজিবের এ ব্যাপারে কোন প্রতিক্রিয়া না দেখে বাধ্য হয়ে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন। ১২ জানুয়ারী মুজিবের সাথে ইয়াহিয়ার ৩ ঘণ্টা স্থায়ী বৈঠক হল। কিন্তু মুজিব তার অঙ্গীকার মত সাড়া দিলেন না। শেখ মুজিব তার প্রতিশ্রুতি মত খসড়া শাসনতন্ত্র প্রনয়ণে রাজী হলেন না। কথাও ছিল দফা কিঞ্চিত পরিবর্তন করে অখণ্ড পাকিস্তানের উপযোগী শাসনতন্ত্র প্রণয়ন করবেন। ইয়াহিয়াকে মুজিব জানিয়ে দিলেন– শাসনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব তার, ইয়াহিয়ার দায়িত্ব হচ্ছে সংসদ ডাকা। শেখ মুজিবের অভদ্র অকূটনৈতিক আচারণ তার ধৃষ্টতা এবং অসৌন্যমূলক কর্ম-কাণ্ড পাকিস্তানের সেনা প্রধান হয়েও ইয়াহিয়া হাসিমুখে সহ্য করলেন এবং ঢাকা ত্যাগের প্রাক্কালে বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সম্মুখে মুজিবকে পাকিস্তানের ভবিষ্যত প্রধান মন্ত্রী বলে অভিহিত করলেন।

জি ডবলিউ চৌধুরী তৎকালিন পাকিস্তানের বাস্তব অবস্থার নিরিখে বলেছেন– 'পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষা করতে বহু সেনাবাহিনী অফিসারবৃন্দ, সিনিয়ার

www.pathagar.com

কর্মকর্তারা বড় রকমের ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত ছিলেন। সেনাবাহিনীর তরুণ অফিসারবৃন্দ এবং দূরদর্শী জেনারেলদের কাছে পাকিস্তান জাতীয়তাবাদ কোন অস্পষ্ট ও অবাস্তব ধারণা ছিল না। বরং তাদের কাছে পূর্ব ও পশ্চিম উভয় পাকিস্তানের বহু দেশপ্রেমিক জনগণের ন্যায় এর আদর্শ ও পতাকা যে কোন মূল্যে রক্ষা করা ছিল খুবই প্রিয় তারা ঐ সব মূল্যবোধ ও আদর্শ রক্ষা করতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ ছিলেন।'

২৭ জানুয়ারী জুলফিকার আলী ভূট্টো ঢাকায় এলেন। শাসনতন্ত্র প্রনয়নের ব্যাপারে প্রতিনিধিত্বশীল দুই দলের দুই নেতার সমঝোতার ওপর নির্ভর করছিল ইয়াহিয়ার ক্ষমতা হস্তান্তর প্রক্রিয়া। ৩ দিন ধরে আন্তরিক পরিবেশে তাদের আলাপ আলোচনা হল। শেষ অবধি শেখ মুজিব ভুট্টোকে দ্ব্যার্থহীন ভাষায় জানিয়ে দিলেন যে তিনি ৬ দফায় পরিকল্পনা থেকে এক ইঞ্চিও সরে দাঁড়াবেন না।

ভুট্টোও দ্ব্যার্থহীনভাবে বললেন যে তিনি এবং তার দল ৬ দফা পরিকল্পনার গোপন দূরভি সন্ধি বিচ্ছিন্নতার পরিকল্পনায় সম্মত হতে পারেন না। তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের মিডিয়া ভুট্টোর বক্তব্য থেকে দুরভিসন্ধির গন্ধ আবিস্কার করলেও ৬ দফার অন্তর্নিহিত লক্ষ্যের কথা কোথাও আলোচিত হল না। সর্বাধিক স্বায়ত্ব শাসন দেওয়ার জন্য যখন প্রেসিডেন্ট এবং জেনারেলরা প্রস্তুত অর্থনৈতিক বৈষম্য দূরীকরণের সব ব্যবস্থা যখন পাকাপোক্ত এমনকি বৈষম্য জনিত অতীতের ক্ষতিসমূহ পূরণের অঙ্গীকার বাস্তবায়নের আয়োজন যখন চূড়ান্ত, এমন কি যখন সমগ্র পাকিস্তানের ভাগ্য বিধাতা বাঙালীরা। তখন মুজিব তার স্বভাব সূলভ পুরানো মেজাজ আকড়ে ধরে থাকলেন তার একগুয়েমী ও আপোষহীনতা সমগ্র জাতিকে সংঘাতের দিকে টেনে নিয়ে চলল।

মুজিবের আপোষহীনতা ও অনমনীয়তার কারণে জেনারেলরা ভুট্টোর দিকে ঝুকে পড়ল এর ফলে ভুটো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। জাতীয় পরিষদ বৈঠকের তারিখ ঘোষণার পর ভুট্টোর প্রতিক্রিয়ার মধ্যদিয়ে সেই শক্তির বহিঃপ্রকাশ প্রকট হয়ে ওঠে। তিনি হুঙ্কার দিয়ে বলে ছিলেন– 'যতক্ষণ পর্যন্ত মুজিব ও তার মধ্যে শানতন্ত্রের ব্যাপারে বোঝা পড়া না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত বৈঠক বসতে দেয়া হবে না। এমনকি এ প্রেক্ষিতে সমগ্র পশ্চিম পাকিস্তানে গণআন্দোলন ও বিপ্লব ছড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয় তার পক্ষে থেকে।

ফেব্রুয়ারীতে উপমহাদেশে একটি ঘটনা ঘটল, ঘটনা ছোট। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ। ঘটনাটি ছিল একটি ঝড়ের পূর্ব সংকেত। এই ঘটনাটি জানিয়ে দিল ভারত

www.pathagar.com

পাকিস্তানকে টুকরো করার ব্যাপারে কতদূর অগ্রসর হবে। ঘটনাটি ছিল দিল্লীর প্ররোচনায় একটি ভারতীয় বিমান ছিনতাই নাটক। এর উদ্দেশ্য ছিল পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করার জন্য বিমান ছিনতাই কে গ্রহণযোগ্য অযুহাত হিসাবে দাঁড় করানো। পাকিস্তান সরকারের বিচার বিভাগীয় তদন্তের মাধ্যমে এর রহস্য উন্মোচিত হয়। ভারত অধিকৃত কাশ্মীরের কতিপয় ভারতীয় অনুচর কাশ্মীরের স্বাধীনতার দাবীতে একটি বিমান ছিনতাই করে পাকিস্তানে নিয়ে যায়। এই ছিনতাই নাটকের সূত্র ধরে দিল্লী পাকিস্তানী বিমানের জন্য ভারতীয় আকাশ সীমা নিষিদ্ধ করে দেয়, এর ফলে পাকিস্তানকে সিংহল হয়ে তিন হাজার মাইল আকাশ সীমা অতিক্রম করে দেশের উভয় অংশের মধ্যে যোগাযোগ রক্ষা করতে হয়। ছিনতাই সংঘটিত হওয়ার সাথে সাথে মুজিব বিবৃতি দেন এটা ক্ষমতা হস্তান্তর স্থগিত করার জন্য পাকিস্তান সরকারের ষড়যন্ত্র।' মুজিব পরোক্ষভাবে ভারতীয় পদক্ষেপকে স্বাগত জানালেন। অন্যদিকে আরএক লঘুচেতা নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো ভারতীয় অনুচর ছিনতাইকারীদের জাতীয় বীর হিসাবে অভিহিত করলেন। এর অর্থ দাঁড়াল তিনি ভারতীয় পদক্ষেপে এক ধরনের বৈধতার প্রলেপ দিলেন। পর্যবেক্ষক মহল বুঝে নিলেন দুই প্রান্তের দুই নেতা মেধাশূন্য দেওলিয়া শুধু নয় ভারতীয় চক্রান্তের ক্রীড়নক।

ভুট্টোর অব্যাহত হুমকির প্রেক্ষিতে পশ্চিম পাকিস্তানের পিপলস পার্টি বহির্ভূত অন্যান্য সদস্যরা আসন্ন বৈঠকে যোগদানে অস্বীকার করলো। এতে ভুট্টোর অবস্থান আরো শক্ত হয়ে উঠল। চূড়ান্ত অবস্থায় বৈঠক স্থগিত ছাড়া ইয়াহিয়ার জন্য কোন বিকল্প পথ আর খোলা রইল না। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠার সম্ভাবনার কারণে তাদের সন্তুষ্ট করার মত তিনি একটি বক্তব্যের খসড়া তৈরী করলেন। কিন্তু বিবৃতিটি প্রকাশ করা হল না। জেনারেল পীর জাদার চক্রান্তে। ৩ মার্চ অনুষ্ঠিতব্য বৈঠক স্থগিত রাখার ঘোষণা প্রচার করা হল অতি সাধানারণ ভাবে। ৩ মার্চের নির্ধারিত বৈঠক মূলতবী ঘোষণার সাথে সাথে ঢাকা শহর অগ্নিগর্ভ হয়ে উঠল। প্রতিটি এলাকা থেকে জনগণ পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে শ্লোগান দিতে দিতে পল্টন এলাকায় সমবেত হতে শুরু করল। প্রত্যেকটি মানুষের হাতে লাঠি লোহার রড। ভাঙচুর দোকান পাট লুট হতে শুরু করল। শেখ মুজিবের অসিংস অসহযোগ আন্দোলন শুরু হল লুটপাটের মধ্য দিয়ে অবাঙালীদের দোকান পাট ঘরবাড়ী লোপাট হওয়া শুরু হল। সরকারকে সেনাবাহিনী নামাতে হল। লুটেরাদের উদ্দেশ্যে গুলি চালাতে হল। কিন্তু লুট-পাট এবং আন্দোলন বন্ধ হল না বরং আরো প্রবল হয়ে উঠল।

www.pathagar.com

পূর্বপাকিস্তানে কেন্দ্রীয় শাসনের অচলাবস্থা

মার্চের শুরু থেকে পূর্ব পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় শাসন বিকল হয়ে পড়ল। পূরো প্রশাসন মুজিবের নিয়ন্ত্রণে এসে গেল। রেডিও টিভি থেকে শুরু করে সব কিছু তখন মুজিবের নিয়ন্ত্রণে। মুজিব সরকারী আধা সরকারী অফিসসমূহ বন্ধ ঘোষণা করলেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান শাসনের জন্য ত্রিশটির অধিক নির্দেশ জারি করলেন। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে টেলিফোন ও টেলেক্স ও বেতার যোগাযোগ বন্ধ ঘোষণা করলেন। আর পাকিস্তানী পতাকা নয় বাংলাদেশী পতাকা উড্ডীন হল ঘরবাড়ী এবং অফিসে।

পাকিস্তানের অস্থিত্ব রক্ষার শেষ প্রয়াস নিয়ে ইয়াহিয়া ঢাকায় এলেন ১৫ মার্চ। মুজিব উস্কানীমূলক বিবৃতি দিলেন। বিবৃতিতে বলা হল–'জনগণের বীরোচিত সংগ্রাম এগিয়ে চলছে... বাংলাদেশের জনগণ, বেসামরিক সরকারী কর্মচারী, অফিস ও কারখানার কর্মচারী, কৃষক ও ছাত্রসমাজ এটা নিশ্চতিভাবেই প্রদর্শন করেছে যে তারা আত্মাসমর্পণের চেয়ে বরং মৃত্যুকে বরণ করবে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার উৎসাহ উদ্দীপনা নির্বাপিত করা যাবে না। সুতরাং সংগ্রাম নতুন উদ্দীপনাসহকারে চলবে। যতক্ষণ না আমাদের মুক্তির লক্ষ্য আদায় হয়।'

একাত্তরের মহানায়ক শেখ মজিব তখন ছিলেন ভারতীয় অর্থানুকুল্যে সংঘটিত উগ্রাবাদী জঙ্গী ভারত পন্থী দ্বারা পরিবেষ্টিত। এদের প্রত্যক্ষ ভাবে নিয়ন্ত্রণ করত RAD রিসার্চ এন্ড এনালিটিকাল ডিভিশন। এই গোয়েন্দা সংস্থার পরামর্শে শেখ মুজিব কর্নেল ওসমানীকে বিদ্রোহী শক্তি সমূহের দায়িত্ব দেন। কিছু সেনা কর্ম-কর্তা ওসমানীর সাথে যুক্ত হন। তিন সপ্তাহের অব্যাহত আন্দোলন পাকিস্তান সরকারকে চ্যালেঞ্জ করার ব্যাপারে মুজিবকে প্রেরণা যুগিয়ে ছিল ওদিকে ইষ্ট বেঙ্গল রেজিমেন্ট ইষ্ট পাকিস্তান রাইফেলস এর বাংলাভাষী অফিসার ও জোয়ানরা পুলিশ ও আনসাররা মুজিবকে সমর্থন দেয়ার ব্যাপারে ছিল ঐক্যবদ্ধ।

অন্যদিকে পাকিস্তানের জেনারেলরা পরিস্থিতির ওপর সার্বক্ষণিক নজর রাখছিলেন। মুজিব বিচ্ছিন্নতার পথ পরিহার না করলে কি ধরনের ব্যবস্থা নেয়া হবে সে ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নেয়া হচ্ছিল আর্মী হেড কোয়ার্টারে।

২০ মার্চ পর্যন্ত আলোচনার অগ্রগতি হতে থাকে। ফারল্যান্ড মুজিবকে সতর্ক করে দেয়। মুজিব কিছুটা নমনীয় হলে ঢাকাস্থ ভারতীয় কনস্যুলেট সক্রিয় হয়ে ওঠে। দুতাবাস সূত্রে মুজিবকে সাহায্য সহাযোগিতার আশ্বাস দেয়া হল। ওদিকে রুশ

www.pathagar.com

সাহায্য ও সমর্থন ও মুজিবকে শক্ত অবস্থান নিতে তাগিদ দেয়। মুজিবের ওপর চাপ বৃদ্ধি করে ভারতপন্থী উগ্রবাদী তরুণরা।

দুটো শক্তির ঐশ্বর্যে লালিত হয়ে শেখ মুজিব হতাশ হয়ে পড়েল তখন, যখন তিনি জানতে পারেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তার পেছনে নেই। মুজিব ইয়াহিয়ার সাথে সমঝোতার দিকে অগ্রসর হয়েও পিছিয়ে আসেন তার অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ভারত এবং তার আন্দোলনের শক্তি আপোষহীন তরুণদের চাপের মুখে। তার সীমাহীন গর্জনের আড়ালে তাকে ঘিরে ধরে এক অসীম অসহায়ত্ব। ইয়াহিয়া খানের সংগে এক বৈঠকে তিনি বলেই ফেলেছিলেন– 'আমি যদি আপনার কথামত কাজ করি তাহলে ছাত্র নেতারা আমাকে গুলি করবে। আর যদি আমি ছাত্র নেতাদের কথামত চলি তাহলে আপনি আমাকে গুলি করবেন। বলুন তো আমি কি করি।' শেখ মুজিব তার নেতৃত্বের অসহায় ও করুণ অবস্থাই ফুটিয়ে তুলেছিলেন তার উপরোক্ত মন্তব্যের মধ্য দিয়ে (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃ-১২)

১৬ মার্চ থেকে শেখ মুজিবও দায়িত্বশীল আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সাথে ইয়াহিয়ার আলোচনা শুরু হয়। ২০ মার্চ আলোচনা হয় ২ ঘন্টা ১০ মিনিট। আলোচনা শেষে সাংবাদিকদের মুজিব বলেন আলোচনার অগ্রগতি হয়েছে। এতে দেশের মানুষ অনেকটা আস্বস্ত হয়।

২১ মার্চ হাওয়া উল্টো দিকে প্রবাহিত হল। মুজিব ও তাজুদ্দিন ইয়াহিয়ার সাথে এক অনির্ধারিত বৈঠকে মিলিত হন। মুজিবের উপস্থিতিতে তাজুদ্দিন ইয়হিয়াকে জানিয়ে দেন– আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সভার ব্যাপারে সম্মত হতে পারে না। আওয়ামী লীগ চায় পূর্ব ও পশ্চিম পাস্তিানের পৃথকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করা হোক। আওয়ামী লীগের বক্তব্য পরিষ্কার, পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলা। ইয়হিয়া নিরাশ হলেন। তিনি অখন্ড পাকিস্তানের সেনা প্রধান হিসাবে পাকিস্তান ভেঙ্গে ফেলার দায়িত্ব নিতে পারেননি। অবশেষে তিনি জানিয়ে দিলেন দেশ ভাঙার কোন হুমকি চ্যালেঞ্জ বিহীন থাকতে পারে না।

বলতে গেলে মার্চের তৃতীয় সপ্তাহের শেষ পকিস্তানের সামরিক সরকারের সাথে আওয়ামী লীগের বোঝাপড়া ও সমঝোতার ব্যাপারে যাবতীয় সংলাপের অবসান হয়। চতুর্থ সপ্তাহের শুরুতে দীর্ঘ সংলাপের উপসংহার রচিত হচ্ছিল নেপথ্যে। যেমন প্রস্তুতি চলছিল ক্যান্টনমেন্টে অনুরূপ প্রস্তুতি অব্যাহত ছিল আওয়ামী মঞ্চে। সার্বিক বিচারে জাতি ছিল সম্মোহিত। আওয়ামী লীগ ছাড়া আর সব রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীরা ছিল নীরব। তারা এক অনিবার্য ধ্বংসাত্বক পরিণতি অবলোকনের জন্য ছিল অপেক্ষমান।

www.pathagar.com

২৩ মার্চ পাকিস্তান দিবসে আওয়ামী লীগ বলতে গেলে চূড়ান্ত বিদ্রোহের পতাকা উড়িয়েছিল। রেডিও টিভি পত্রপত্রিকা ও অন্যান্য মিডিয়াসমূহের প্রচারিত হল বিদ্রোহের জয়োল্লাস। ধানমন্ডিতে কর্নেল ওসমানীর নেতৃত্বে সশস্ত্র মার্চপাস্ট করিয়ে আওয়ামী লীগ অনিবার্য যুদ্ধের ঘোষণা জানিয়ে দিল। উচ্ছৃংখল জনতার বর্বর হামলা শুরু হল অবাঙালি জনবসতির উপর। এমনকি বিচ্ছিন্ন হামলার শিকার হল সেনাবাহিনীর সদস্যরাও। অসহযোগ আন্দোলনের ফলে সেনাবাহিনী ক্যান্টনমেন্ট চত্বরে বন্দী হয়ে পড়ল। এমনকি তাদের খাদ্য পানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ করার উদ্যোগ নেয়া হল। এত কিছুর পরেও প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া শেখ মুজিবের শুভবুদ্ধিসঞ্জাত নির্মল সিদ্ধান্তের প্রতীক্ষায় রইলেন তৃষ্ণার্ত চাতকের মত। ২৪ মার্চ পশ্চিম পাকিস্তানের গণপ্রতিনিধিরা পাকিস্তানকে রক্ষার জন্য শেখ মুজিবকে অনুরোধ করলেন। কিন্তু ইতিবাচক সাড়া পেলেন না। পাকিস্তানের সংহতির পক্ষে চেষ্টা তদবির যখন ব্যর্থ হল, বোঝাপড়ার মত সব পথ যখন রুদ্ধ হল যখন আর কোন বিকল্প অবশিষ্ট রইলো না, তখন অনাকাঙ্খিত সশস্ত্র পথের অর্গল খুলে গেল স্বাভাবিক নিয়মে।

ক্যান্টনমেন্টে আবদ্ধ সেনাবাহিনীর পক্ষে বাইরের ঘটনাপ্রবাহ সঠিক ভাবে আঁচ করা সম্ভব ছিল না। তাদের প্রতি সহানুভূতিশীলদের সাথেও যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। এর ফলে সেনা অভিযানের ব্যাপারে তারা তাদের শক্তি প্রয়োগের সীমা নির্ধারণ করতে পারছিল না।

২৫ মার্চ গভীর রাতে শেখ মুজিবকে তার ধানমন্ডীর বাস ভবন থেকে সেনাবাহিনী তাদের হেফাজতে তুলে নেয়। সেই সাথে ঢাকার কৌশলগত অবস্থান গুলোতে সামরিক অভিযান পরিচালিত হয়। পাক বাহিনীর সামরিক অভিযান সম্পর্কে নির্ভরযোগ্য কোন বিবরণ আজো প্রকাশি হয়নি। যা কিছু প্রকাশ হয়েছে সে সব ছিল ভারতীয় সাংবাদিকদের বানোয়াট বিবরণ। এদের সূত্র ধরে বৃটিশ সাংবাদিকরা সংবাদ প্রেরণ করেছে। ভারতীয় সাংবাদিকদের কাল্পনিক বানোয়াট বিবরণগুলোই বিশ্বময় আবর্তিত হয়েছে কাল্পনিক ভিত্তিহীন বানোয়াট বিবরণ গুজবের মত ছড়ায়ে বিশ্ব জনমতকে প্রভাবিত করার জন্য। তবে এটা সত্য যে পাক বাহিনী প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হয়েছিল। ঢাকা চট্টগ্রাম রাজশাহী সর্বত্র প্রতিরোধ ব্যুহ ভেদ করে পাক সেনাদের অগ্রসর হতে হয়েছিল। জি ডব্লিউ লিখেছেন– 'পাকিস্তান সেনাবাহিনী যখন মিলিটারী

www.pathagar.com

অপারেশন শুরু করে তখন তারা যে তীব্র প্রতিরোধের সম্মুখীন তা হতে এটা সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে ইস্টবেঙ্গল রেজিমেন্ট ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলেস এবং পূর্ব পাকিস্তান পুলিশ ফোর্সের সাহায্যে আওয়ামী লীগ কর্তৃকও একটি প্রতিরোধ পকিল্পনা সংগঠিত হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে পূর্ব পাকিস্তানের বা বর্তমান বাংলাদেশের অধিকাংশ অঞ্চল সমগ্র এপ্রিল মাসব্যাপী এবং কিছু এলাকা মে মাসের প্রথম দিক পর্যন্ত বিদ্রোহী বা মুক্তিবাহিনীর নিয়ন্ত্রণে ছিল। ফলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে বিরোধী বাহিনীর কাছ থেকে বিভিন্ন এলাকা দখল ও মুক্ত করেছিল। স্পষ্টতই এরূপ প্রতিরোধ স্বতস্ফুর্ত কিংবা অসংগঠিত হতে পারে না।'

www.pathagar.com

ষষ্ঠদশ অধ্যায়

গনেশ উল্টে দেমা লুটেপুটে খাই

দক্ষ নটদের মত সুনিপূন অভিনয়ের মাধ্যমে রাজনীতির দৌড়ে শেখ মুজিব ও তার দল প্রকৃত দেশ-প্রেমিকদের পিছু হটিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিলেন, বললে ভুল হবে। দেশ-প্রেমিক দল নেতা কর্মী ও জনগণকে রাজনীতির ময়দান থেকে বিতাড়তি করেছিলেন। এরপর শূন্য ময়দানে মার্চের শুরু থেকে লুটপাট এবং সন্ত্রাসের মহড়া চলতে থাকে। অনেক টালবাহানা, অনেক আবেগ আর উত্তাপ ছড়িয়ে শেখ মুজিব গনেশ উল্টে দিলেন। পরিকল্পিতভাবে ঝড় ডেকে এনেছিলেন শেখ মুজিব। বাংলার মানুষকে রক্তাক্ত মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে আত্মসমর্পন করেছিলেন। তার অনুগামীরা যারা চেয়েছিল গনেশ উল্টে দেমা। তারা শুরু করেছিল লুট। ভয়াবহ লুণ্টনের নেশা আওয়ামী নেতা কর্মীদের গ্রাস করেছিল। লূণ্ঠন আর ভোগ বিলাসের দৃষ্টান্ত একজন মুক্তি যোদ্ধা পরবর্তীতে রাষ্ট্রদূত লেঃ কর্নেল শরীফুল হক ডালিম তার গ্রন্থে (যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি) লিখেছেন– 'তারা কোলকাতায় বেশ আরাম আয়েশেই সময় কাটাচ্ছিলেন। কিন্তু ক্রমান্বয়ে তাদের অসৎ উপায়ে লুটপাট করার কথা প্রকাশ পেয়ে যাচ্ছিল, এতে তাদের সম্মানেরই শুধু হানি হচ্ছিল তার নয়, তাদের অনেকেরই প্রতি বিক্ষুদ্ধ হয়ে পড়েছিলেন মুক্তিযোদ্ধারা। তারা যেখানে অনাহারে অস্ত্রহীন বস্ত্রহীন অবস্থায় দেশকে স্বাধীন করার জন্য জীবন বাজি রেখে রণাঙ্গনে লড়ছেন তখন এ সমস্ত অসৎ রাজনীতিবিদ ও লুটেরার দল লুটপাটের বেশুমার টাকায় বিলাসী জীবন যাপন করে বাঙালিদের বদনাম করছিলেন অতি নির্লজ্জভাবে। কোটি কোটি টাকা তৎকালিন পূর্ব পাকিস্তান থেকে লুটে আনা হয়েছিল। শুধুমাত্র বগুড়ার স্টেট ব্যাংক থেকে লুট করা হয়েছিল ৫৬ কোটি টাকার উপর। এ সমস্ত লুটপাটের সাথে জড়িত ছিল রাজনৈতিক নেতা এবং আমলাদের একটি অংশ।

লুটপাট সমিতির সদস্যরা (আওয়ামী লীগাররা) তখন কোলকাতার অভিজাত পাড়াগুলোতে এবং বিশেষ করে পার্ক ষ্ট্রীটের হোটেল বার এবং রেস্তোঁরাগুলোতে তাদের বেহিসাবী খরচার জন্য জয় বাংলার শেঠ বলে পরিচিত। যেখানে তারা যান মুক্তহস্তে বেশুমার খরচ করেন। থাকেন বিলাসবহুল ফ্লাট কিংবা হোটেলে।

www.pathagar.com

সন্ধ্যার পর হোটেল গ্রান্ড, প্রিন্সেস, ম্যাগস, ট্রিংকাস, ব্লু ফকস, মলিন রুৎ, হিন্দুস্থান ইন্টার ন্যাশনাল প্রভৃতি বার রেষ্টুরেন্টগুলো জয় বাংলার শেঠদের ভিড়ে জমে উঠে। দামী পানীয় খাবারের সাথে সাথে পাশ্চাত্য সংগীতের আমেজে রঙিন হয়ে উঠে তাদের আয়েশী জীবন। বয় বাবুর্চিরাও তাদের আগমনে ভীষন খুশী হয়। এমনই একজন নেতা তার দলবল নিয়ে প্রত্যেক দিন হোটেল গ্রান্ডের বারে মদ্যপান করতেন। তিনি বগুড়া ব্যাংক লুটের টাকার একটা বিরাট অংশ কবজা করেছেন কোনভাবে। তার কাছে রয়েছে প্রায় ৪ কোটি টাকা। একদিন মধ্যরাতে তিনি হোটেল বারে গিয়ে মদ পরিবেশন করার জন্য বারম্যানদের হুকুম দেন। বারম্যান্যরা কাচু মাচু জবাব দেয়, সময় শেষ হয়ে যাওযায় বার বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। জবাব শুনে ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেন বাঙালি শেঠ। টলমল অবস্থায় চিৎকার করে বলতে থাকেন তিনি হোটেলটাই পুরো কিনে নিতে চান। বেসামল কিন্তু শাসাল খদ্দের, তাই বারম্যানরা চুপ করে সবকিছু হজম করে যাচ্ছিল। শেঠ আবোল তাবোল বকে পরে একজন বারম্যানকে হুকুম দেন 'কাল বার খোলার সময় থেকে বন্ধ করার আগে পর্যন্ত তিনি ও তার সংগীদের ছাড়া অন্য কাউকে মদ পরিবেশন করা যাবে না। তারাই শুধু থাকবে বারে। তার হুকুম শুনে বারম্যানরা ম্যানেজারকে ডেকে পাঠায়। ম্যানেজার এলে শেঠ তাকে প্রশ্ন করেন রোজ আপনার বারে সেল কত টাকা? ম্যানেজার একটা অংক তাকে জানায়। শেঠ তখন তাকে তার সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে বলেন পুরোদিনের সেলের টাকাই তিনি পরিশোধ করবেন পুরো টাকার মদ খেয়ে ওরা শেষ করতে না পারলে বাকি মদ যেন তার বাথরুমের টাবে ভরে দেয়ার ব্যবস্থা করা হয়। তিনি তাতে গোসল করবেন।'

আর একদিন আর এক জন জয় বাংলার শেঠ তার পুত্রের প্রথমারের মত জুতা পরার দিনটি উদযাপন করার জন্য ব্লু ফকস রেষ্টুরেন্টের ১০০ জনের একটি শানদার পার্টি দেন। এ ছাড়া অনেক শেঠরা দিল্লী ও বোম্বেতে গিয়ে বাড়ী ঘর কিনতে থাকেন। অনেকে আবার ফিল্ম ইন্ডাষ্ট্রিতে বিনিয়োগ করতে আগ্রহী হয়ে উঠেন। তাদের এ সমস্ত কীর্তি কলাপের উপর শহীদ জহির রায়হান একটি প্রামাণ্য চিত্র তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তার এ অভিপ্রায়ে অনেকেই ভীষণ অসন্তুষ্ট ছিলেন তার উপর অনেকেই তার ঔদ্ধত্যে ক্ষেপে গিয়েছিলেন। তার রহস্যজনক মৃত্যুর পেছনে এটাও একটা করণ হতে পারে। কোন এক নায়িকার জন্মদিনে তখনকার দিনে তার এক গুণমুগ্ধ তাকে ৯ লক্ষ টাকা দামের হীরের নেকলেস উপহার দিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

দারগা রোডের বিশু বাবুর বাড়ীতে থাকতেন মন্ত্রী পরিষদের পরিবারবর্গ। প্রবাসী সরকারের টাকায় প্রায় সবটাই কালো কালো ট্রাঙ্কে ভরে রাখা হয়েছিল বিশুবাবুর বাড়ীতে এবং ৩নং সোহরাওয়ার্দী এভিন্যুর তিনতলা ছাদের দুটো কামরায়। সেখানে থাকতেন অর্থ সচিব জনাব শামসুজ্জামান তার পরিবার ও রাফিয়া আকতার ডলি। এ টাকার কোন হিসাব ছিল না।

কোলকাতার বড় বাজারের মারোয়ারিদের সাহায্যে এগুলো এক্সচেঞ্জ করা হত। এ কাজের দালালী করেও অনেকেই কোটিপতি হয়ে উঠেন রাতারাতি। কিছুসংখ্যাক মুক্তিযোদ্ধা লোভ সম্বরণ করতে না পেরে অসৎ হয়ে উঠেন।

কোন এক সেক্টর কমান্ডার এক পাকিস্তানী সিএসপি অফিসারের অন্তসত্ত্বা স্ত্রীকে বেয়নটের আঘাতে মেরে তার গা থেকে সোনার অলঙ্কার খুলে নিয়েছিলেন এমন ঘটনাও ঘটেছে।

যুব শিবির, শরণার্থী শিবিরগুলো নিয়ে কেলেঙ্কারি হয়েছে অনেক। তাদের জন্য সারা বিশ্ব থেকে রিলিফ সামগ্রী, যানবাহন ভারতীয় সরকারের প্রযত্নে এসেছিল। কিন্তু তার কতটুকু বা দেয়া হয়েছিল শরণার্থীদের প্রয়োজন মেটাতে। এসব রিলিফ সামগ্রী বিতরণের দায়িত্ব ছিল যৌথভাবে ভারত ও প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের । বগুড়ার স্টেট ব্যাঙ্ক ছাড়াও মোটা অংকের টাকা নিয়ে আসা হয়েছিল পার্বত্য চট্টগ্রাম ভৈরব ও পাবনার ট্রেজারী থেকে, সে টাকারও কোন সুষ্ঠু হিসাব পাওয়া যায়নি।' (যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি, পৃঃ ২২০-২২৩)

দিল্লীর সক্রিয় অবস্থান

১৯৭১ সালে প্রকাশিত পকিস্তান সরকারের শ্বেত পত্রের সূত্র থেকে জানা যায়– 'মার্চে উদ্ভূত সংকটের আগেই পূর্ব পাকিস্তান সীমান্তে শিকারী জঙ্গী বিমান ও অতিরিক্ত পরিবহন বিমান মোতায়েন করা হল পূর্ব পাকিস্তানের পশ্চিম ও উত্তর সীমা সংলগ্ন ঘাঁটিগুলোতে প্রস্তুতি আরো জোরদার করা হল। বঙ্গোপসাগরে পাকিস্তানী জাহাজগুলোর চলাচল পর্যবেক্ষণ করার জন্য কোলকাতার কাছে ব্যারাক পুরে কয়েকটি পর্যবেক্ষণ বিমান মোতায়েন করা হল। মার্চ মাসের শেষ দিকে হিন্দুস্থানী সেনাবাহিনীর সদস্যরা ইপিআর এবং সেনাবাহিনীর ছদ্মবরণে পূর্ব পাকিস্তানে প্রবেশ করে। হিন্দুস্থানের বিরুদ্ধে পাকিস্তান অভিযোগ করে যে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বি এস এফ-এর ৭৬, ৮১, ৮৩, ১০১, ১০৩ ও ১০৪ নং ব্যাটেলিয়ান ছাড়া ও আরো দুটো ব্যাটেলিয়ানকে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসের শেষে পূর্বে পাকিস্তানের কাজে লাগান হয়েছিল

www.pathagar.com

পূর্ব পাকিস্তানের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের বিরুদ্ধে ইসলামাবাদ সামরিক পদক্ষেপ নেয়ার সাথে সাথে রাজনীতিকরা চঞ্চল হয়ে উঠল- এবং সেখানকার হিন্দু জনগণ সরব হয়ে উঠল যেন তাদের কাঙ্খিত শুভ দিন আসন্ন। ২৬ মার্চ সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী লোক সভায় বললেন– 'আমরা এ আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্বের ব্যাপারে গভীরভাবে সজাগ। যারা জানতে চেয়েছিল সময়মত পদক্ষেপ নেয়া হবে কিনা, আমি সেই সমস্ত সম্মানিত সদস্যবর্গকে আশ্বস্ত করতে চাই যে, তা করাই হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। এর জন্য সময় পার হয়ে গেলে সিদ্ধান্ত নিয়ে কোন লাভ নেই।' রাজ্যসভায় একই দিনে তিনি বলেন– 'বহু কারণে ব্যাপারটায় আমরা আগ্রহী। প্রথম যেমনটা একজন সদস্য বলেছেন শ্রী মুজিবর রহমান সেসব মূল্যবোধের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন, যেগুলো আমরা নিজেরাও সযত্নে লালন করি।'

১৯৭১ সালের ৩০ মার্চ হিন্দুস্থানী পার্লামেন্টের উভয় পরিষদে গৃহীত প্রস্তাবের পূর্ব বাংলার জনগণেল প্রতি গভীর ভালবাসা ও সহানুভূতি প্রকাশ করা হয় এবং তাদের আশ্বাস দেয়া হয় যে হিন্দুস্তানী জনগণ তাদের সংগ্রামে সর্বান্তকরণে সহানুভূতি জানাবে এবং সমর্থন যোগাবে। এই প্রস্তাবটি ৪ এপ্রিল সর্ব সম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। এ প্রস্তাব সম্পর্কে বক্তৃতা প্রসঙ্গে অল ইনডিয়া কংগ্রেস কমিটির পশ্চিম বাংলা ইউনিটের সেক্রেটারী মিঃ কেকে শুক্লা বললেন– 'শেখ মুজিবর রহমান যে যুদ্ধ করছেন সেটা হিন্দুস্থানেরই যুদ্ধ।'

বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে ভারতের প্রাদেশিক পরিষদ গুলোতে সরকারীভাবে প্রস্তাব গৃহীত হয়। পশ্চিম বঙ্গে ডিপুটি মূক্ষ্যমন্ত্রী বললেন– 'যদিও কেন্দ্রীয় সরকার বাংলাদেশের প্রতি সমর্থন জানায়নি। কিন্তু পশ্চিম বাংলায় আমরা বাংলাদেশের প্রতি এখন থেকে স্বীকৃতি জানাচ্ছি।'

৩১ মার্চ ইনডিয়ান কাউন্সিল ফর ওয়ালর্ড এ্যাফেয়ার্স কর্তৃক আয়োজিত এক সিম্পোজিয়ামে ভারতের প্রতিরক্ষা ইনষ্টিটিউটের ডাইরেক্টর কে সুব্রামানিয়াম বললেন– 'ভারতকে এ সত্যতা উপলব্ধি করতে হবে যে পাকিস্তানের ভাঙ্গণ আমাদের স্বার্থের অনুকুলে। এমন সুযোগ আর আসবে না। ..... বাংলাদেশের সংকট পাকিস্তানকে ধ্বংস করার ব্যাপারে ভারতের জন্য এ শতাব্দীর সুযোগ এনে দিয়েছে।' বিহার প্রদেশের মূখ্য মন্ত্রী কর্পূরী ঠাকুর সাহায্য তহবিলে ২৫ লাখ টাকা দান করে বললেন– 'বাংলাদেশে অস্ত্র সস্ত্র সরবরাহের ব্যাপারে আমরা অটল।'

www.pathagar.com

২ এপ্রিল (৭১) হিন্দুস্থানী পত্রিকা ফ্রি প্রেস জার্নালে লেখা হল– 'আমাদের হিন্দুস্থানের কার্যকলাপকে সচেতন ভাবে এবং বুদ্ধিমত্তার সাথে পাকিস্তানকে দুর্বল করার লক্ষ্যের দিকে পরিচালিত করতে হবে।

১৫ জুন দৈনিক মাদার ল্যান্ডে প্রকাশিত নিবন্ধে ভারতের একজন ভাষ্যকার সুব্রানিয়াম স্বামী লিখলেন– 'পাকিস্তানের আঞ্চলিক অখণ্ডতার দিকে লক্ষ্য রাখা আমাদের কাজ নয়। সেটা পাকিস্তানের মাথা ব্যাথা। আমাদের শুধু দুটো প্রশ্ন বিবেচনা করতে হবে– পাকিস্তান খণ্ড-বিখণ্ড হওয়া কি আমাদের দীর্ঘ মেয়াদী স্বার্থের অনুকুলে? আর যদি তা সত্যি আমাদের স্বার্থের অনুকুল হয় তাহলে এ ব্যাপারে আমাদের কি কিছু করার রয়েছে।

পাকিস্তানকে খণ্ড-বিখণ্ড করা কেবল আমাদের বাইরের নিরাপত্তার জন্য অনুকূল নয়, তা আমাদের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার অনুকূল। আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে হিন্দুস্থানকে একটি মহা শক্তি রূপে গড়ে ওঠা উচিত এবং এই ভূমিকা পালনের জন্য আমাদেরকে জাতীয় পর্যায়ে আমাদের নাগরিকদের সুসংবদ্ধ করতে হবে আর এজন্য অপরিহার্য পূর্ব শর্ত হচ্ছে পাকিস্তানকে ছিন্ন ভিন্ন করা।' ভারতের তাৎক্ষণিক ক্রিয়া প্রতিক্রিয়া লক্ষ করলে এটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের অন্তরালে ছিল দিল্লীর সক্রিয় ভূমিকা। হিন্দু নেতৃবৃন্দ বিশেষ করে এম কে গান্ধী মনে করতেন পূর্ব পাকিস্তান নিজস্ব যন্ত্রণায় ভারতে ফিরে আসবে। নেহেরু মাউন্ট ব্যাটেনের ধারণা ছিল পূর্ব-পাকিস্তান ভায়াবল নয়, যে কারণে ২৫ বছরের মধ্যে সে ভারতের সাথে একাকার হতে চাইবে। যে ভূখণ্ড ভায়াবল ছিল না সেটাকে ভায়াবল করেছিল পাকিস্তান পঞ্চম বাহিনী সৃষ্ট যন্ত্রণাকর পরিস্থিতির মধ্যে। দিল্লী উন্নয়ন মুখী পূর্ব পাকিস্তানকে দীর্ঘ মেয়াদী পরিকল্পনা নিয়ে ধাপে ধাপে ক্রমশ ২৫ বছর নয় ২৪ বছরের মধ্যে কলান্স করে দিল রক্তাক্ত পরিস্থিতির মুখোমুখী দাঁড় করিয়ে।

দায়ী কে?

একাত্তরের মর্মান্তিক সংকটের জন্য দায়ী কে? ইয়হিয়া না শেখ মুজিব। ইয়াহিয়া নয় শেখ মুজিবই একাত্তরের উত্তাল মার্চে সমঝোতা প্রয়াস ভণ্ডুল হওয়ার জন্য দায়ী। সীমাহীন জনপ্রিয়তা নিয়ে শেখ মুজিব পরিণতির কথা না ভেবে হটকারী সিদ্ধান্ত জাতির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন এক অদৃশ্য সুতোর টানে। কোন পঞ্চম বাহিনী চক্রের পক্ষে শত্রু পক্ষের পেতে রাখা ফাঁদে পা রাখা ছাড়া ভিন্ন কোন পথ খোলা থাকে না। একাত্তরের আন্তর্জাতিক চক্রের ষড়যন্ত্রমূলক

www.pathagar.com

প্রচারনায় বিভ্রান্ত ও সম্মোহিত জাতি তখন না বুঝলেও পরবর্তী তত্ব উপাত্ত থেকে অনুধাবন করেছে যে শেখ মুজিব স্বয়ং বিপর্যয় ডেকে এনে ছিলেন। শেখ মুজিবের একজন লেফ্টেনাণ্ট আব্দুর রাজ্জাকের স্বাধীনতার ১৫ বছর পর দেয়া একটি সাক্ষাৎকারই প্রমাণ করে যে তিনি স্বয়ং একাত্তরের সংকট জাতির কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছিলেন।

১৯৮৭ সালে সাপ্তাহিক মেঘনায় দেয়া সাক্ষাৎকারটি ছিল এমন– '...এরপর শুরু হল ডায়ালগ। ডাইলগে বঙ্গবন্ধু আপোসের সিদ্ধান্ত নিলেন। ইয়াহিয়া এমন একটি অফার দেন, যা একটি কনফেডাশেনের মধ্যে এসে গেল। অফারটা ছিল বঙ্গবন্ধু প্রাইম মিনিস্টার, জুলফিকার আলী ভুট্টো ডেপুটি প্রাইম মিনিস্টার এবং ফরেন মিনিস্টারের চার্জ পাবেন। এ ছাড়াও বঙ্গবন্ধু যে ৬ দফা দিয়েছিলেন তার মধ্যে একমাত্র ডাবল কারেন্সী বাদ দিয়ে বাকি আর পাঁচটা দাবিও ইয়াহিয়া খান মেনে নিলেন।... ২৩ মার্চ এ প্রস্তাবকে চূড়ান্ত রূপ দেবার কথা।... তবুও সেদিন বললাম বঙ্গবন্ধু আর যাইহোক ভুট্টোর সাথে সরকার গঠন করা যাবে না। এই যেই বলেছি, অমনি তিনি ভীষণ জোরে চিৎকার করে উঠলেন। বললেন চুপ কর। আমার চেয়ে বেশী বোঝ? ভুট্টোর সাথে সরকার গঠন করব কিনা আমাকে ভাবতে দাও।... পরে বললেন আমি ওদের সাথে খেলতে চাই। আমাকে খেলতে দাও। তোমরা একদিনেই সব খেতে চাও।... কিছুক্ষণ পর বঙ্গবুন্ধ আমাকে উপরে যেতে বললেন। কাছে গিয়ে বসলে বললেন আমি যা বলব পৃথিবীর কারো কাছে বলবে না নট ইভেন টু ইউর কমরেডস।' আমি ঘাড় নাড়লাম। তারপর বললেন, তোরা ঠিক বলেছিস। কাল সারারাত ধরে আমি চিন্তা করলাম, নো রিক্স নো গেইন। তোরা পারবি না প্রাথমিক অবস্থা চালাতে। খবরদার তোরা কাউকে বলবি না, ইয়াহিয়া খানকে কি বলব ঠিক করে ফেলেছি। আমি বললাম প্রাথমিকভাবে আমরা চালাতে পারব্ তারপর যদি আপনি ভারতের সাহায্য করার ব্যবস্থা করে যেতে পারেন আরো ভাল হয়।... বঙ্গবন্ধু নিচে নেমে নজরুল ইসলাম সাহেবকে ডাকলেন। তাজুদ্দিন মুশতাক সাহেবকেও। তারপর তাদের লাইব্রেরী রুমে নিয়ে গেলেন। ওরা মুখ অন্ধকার করে ঘর থেকে বের হয়ে এলেন। বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আমি বের হলাম গাড়ীতে। তারপর তাকে প্রেসিডেন্ট হাউসে পৌঁছে দিলাম। আমি চলে এলাম। ২৩ তারিখে আমি বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে গেলাম। সেখানে আগের দিনে দেয়া কথা বঙ্গবন্ধু প্রত্যাহার করলেন। বললেন পূর্বপাকিস্তান এ্যাসেম্বলীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর কর।"

www.pathagar.com

সাক্ষাৎকারে বলা হয়েছে, (মুজিব) বললেন আমি তাদের সাথে খেলতে চাই। শেখ ওদের সাথে খেলেননি খেলেছিলো সাড়ে সাত কোটি পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের ভাগ্য নিয়ে।

বিপর্যয় এড়ানো যেত

নিরোদ সি চৌধুরী আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী যদিও তিনি কিশোর গঙ্গের সন্তান। একাত্তরে তিনি ছিলেন বৃটিশ নাগরিক ও লণ্ডনেই বসবাস করতেন। সেই নিরোদ সি চৌধুরী ভারতের হিন্দুস্থান টান্ডার্ড পত্রিকার (১ ০মে ১৯৭১) এক নিবন্ধে লিখেছিলেন– '...আমি আবার ও বলতে চাই যে এই বিপর্যয় অবশ্যই এড়ান যেত। আমি কোলকাতা থেকে একটা চিঠি পেয়েছি। তাতে বলা হয়েছে যে শেখ মুজিবর রহমান তার দাবীর কিছু ছাড় দিলেও পাকিস্ত ান সরকার কঠোর ভাবে বদলা নিতেই কেবল তারা একটা অজুহাত খুঁজে বেড়াচ্ছিল মাত্র। আর এটাই হচ্ছে প্রত্যেকটি বাঙ্গালীর নিজের অপরাধ বা ত্রুটি ঢাকা দেবার চিরাচরিত বাহানা। তাই যদি হবে তাহলে ইয়াহিয়া খান ১৫ তারিখে ঢাকা আসতে যাবেন কেন? সেই সময়কার অবস্থাতো এমনি দাঁড়িয়ে ছিল যে, একটা প্রদেশ কেন্দ্রীয় শাসন থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চলেছে বলেই মনে হচ্ছিল। মার্কিনে গৃহযুদ্ধ সুরু হবার সময়ের যে অবস্থা সেটাও এতটা খারাপ ছিল না। মার্চ মাসের ছয় তারিখ থেকে শেখতো সরকারের বাঙ্গালী কর্মচারীদের সহযোগিতায় পূর্ব বাংলা সরকারের সমস্ত কর্তৃত্ব দখল করে নিয়ে ছিলেন– বাস্ত বে বিচ্ছিন্ন তাতো ঘটেই গিয়েছিল, তাই ৬ই মার্চ এর পর যে কোন সময় তো কেন্দ্রীয় সরকার সামরিক অভিযান চালাতে পারত অতি সহজে। ২৩ শে মার্চ ন্যাপের সাধারণ সম্পাদক মশিয়র রহমান (জাদুমিঞা) এক জনসভায় ঘোষণা দিলেন যে পূর্ব বাংলা ইতিমধ্যেই স্বাধীন হয়ে গেছে এবং বাঙ্গালীরা যে কোন মূল্যে সে স্বাধীনতা রক্ষা করবে। তিনি আরো বললেন–'জনসাধারণ সামরিক কর্তৃপক্ষ এবং আওয়ামী লীগ উভয়ের কাছ থেকে হুকুম পেয়েছে– আর তারা আর্মির হুকুম উপেক্ষা করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।' সুতারাং সামরিক অভিযান শুরু করার জন্য শেখ আর ইয়াহিয়া খানের মধ্যেকার আলোচনা ভেঙ্গে যাওয়ার জন্য বসে থাকার কোন প্রয়োজন ছিল না। আমার এই মন্তব্যের কি জবাব দেওয়া হবে তা আমার জানা আছে– বলা হবে যে আওয়ামী লীগকে ভুল পথে চালিত করার জন্য ইয়াহিয়া খান সমঝোতা করার ভান করে চলেছিল। কিন্তু তাই যদি

www.pathagar.com

হয় তাহলে শেখ মজিব ইয়াহিয়া খানের দেওয়া যে কোন একটি প্রস্তাব মেনে নিলেন না কেন?

১। শর্তসাপেক্ষে চার দফা মেনে নিয়ে সংসদে যাওয়া।

২। বিনা শর্তে সংসদে যাওয়া।

৩। কেন্দ্রে বেসামরিক শাসন পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করার পক্ষে সাময়িক ভাবে সামরিক সরকারকে মেনে নেওয়া।

উপরের এই শর্তগুলো যে কোন একটা মেনে নিলে কি মুখোমুখি সংঘর্ষের পথে যে পরিণত হচ্ছে তা চেয়ে ফল খারাপ হত কি?

এখন আরও একটা বিষয় উল্লেখ করতে চাই অতীত এবং ভবিষ্যৎ উভয়ের জন্য এটা প্রযোজ্য– বাঙ্গালী হিন্দুরা কোন কিছু করতে চাইলে তারা তখনই তা করতে চায় ধৈর্য্য ধরতে পারে না।– আর এটাই তাদের চরিত্রের বৈশিষ্ট্য। এর জন্য তারা চরম ভাবে উত্তেজিত হয় আর না হয় চরম ভাবে মুসড়ে পড়ে। দুর্ভাগ্যের বিষয় নূতন বাঙ্গালী মুসলমান বুদ্ধিজীবিরাও এই রোগে আক্রান্ত, যদিও তারা ভিন্ন ধাতুর তৈরী অর্থাৎ তারা অবশ্যই দৃঢ়চেতা হওয়ারই কথা। অন্য কথায় বলা যায় যে, বাঙালী মুসলমানরা রাজনৈতিক সচেতনতা অর্জন করতে গিয়ে হিন্দু চরিত্রের বৈশিষ্ট্য অর্জন করে বসেছে। কিন্তু বাঙ্গালী হিন্দুর রাজনৈতিক আন্দোলনের অভিজ্ঞতা না থাকায় বাঙ্গালী মুসলিমরা কোথায় থামতে হবে তা জানতো না। যদি প্রতিবাদের কথাই ধরা যায় তাহলে স্বীকার করতে হবে যে, পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুদের ভারত সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ পূর্ব বঙ্গের মুসলিমদের পাকিস্তান সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগের চেয়ে কোন অংশেই কম নয়। তবু পশ্চিম বঙ্গের হিন্দুরা তাদের নির্বাচিত দু'দুটো সরকার কেন্দ্র কর্তৃক বাতিল হতে দেখলেও চুপচাপ। তারা এর জন্য কোন বিদ্রোহ ঘোষণা করেনি। কিন্তু হালে গজিরে উঠা মুসলিম বুদ্ধিজীবীদের অজ্ঞতা ও অনভিজ্ঞতাই তাঁদের চূড়ান্ত বিপর্য্যয়ের কারণ হয়ে দাড়াল।

www.pathagar.com

সপ্তদশ অধ্যায়

প্ররোচিত যুদ্ধাবস্থা ও কূটনৈতিক উদ্যোগ

মার্চ মাসের প্রথম সপ্তাহে অসহযোগ আন্দোলন শুরু হয়। শুরু থেকেই ক্যান্টনম্যান্ট এলাকা ছাড়া সর্বত্র আওয়ামী লীগের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। সিভিল প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণ ছিল না। পূর্ব-পাকিস্তানের বেসামরিক প্রশাসন চলছিল মুজিবের নির্দেশে। যদিও আওযামী লীগ তাদের আন্দোলনকে বলতো অহিংস, প্রকৃত পক্ষে তাদের আন্দোলন ছিল ভয়ঙ্কর ভাইআলানসপূর্ণ অবাঙালীদের উপর মনস্তান্তিক আক্রমণ থেকে শুরু করে হত্যা লুণ্ঠন চলেছিল নির্বিচারে। ২৬ মার্চ সামরিক অভিযান শুরু হওয়ার পর মাত্র ২৪ ঘন্টার মধ্যে ঢাকার উপর সামরিক বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হয়। অতঃপর সেনাবাহিনী আওয়ামী লীগের প্রতিরোধ ভেঙে অগ্রসর হতে থাকে। মে মাসের শেষ নাগাদ সেনাবাহিনীর নিয়ন্ত্রণ সমগ্র দেশে প্রতিষ্ঠিত হয়। আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ জনগণকে মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে ভারতে পলায়ন করে। সাথে নিয়ে যায়– ট্রেজারী ও ব্যাঙ্ক লুণ্ঠন করা বিপূল পরিমান অর্থ। পরবর্তীতে প্রাণ ভয়ে পলায়ন করে সাধারণ মানুষের কিছু অংশ দিল্লী সৃষ্ট পূর্ব পাকিস্তানের সংকটের সম্ভাব্যউদ্বাস্তুদের জন্য পূর্ব থেকে নির্মাণ করা ভারতের উদ্বাস্ত শিবিরগুলো পূর্ব পাকিস্তান থেকে পলাতকরা স্থান নেয়। এদের সংখ্যা প্রকৃতপক্ষে ছিল ২০ লাখ যদিও হিন্দুস্তানের দাবী অনুসারে পূর্বপাকিস্তানের উদ্বাস্তুর সংখ্যা ছিল ১ কোটি সেনাবাহিনীর অগ্রযাত্রা সমমর্মিতা সমবেদনা এবং মহানুভূতিতে পূর্ণ ছিল না। না থাকার পেছনেও যথেষ্ট কারণ ছিল। অগ্রসরমান সেনাবাহিনী দেখেছে আওয়ামী লীগের পাশবিক নির্মমতা এবং সসস্ত্র প্রতিরোধ। তারা পথেঘাটে পড়ে থাকতে দেখেছে আওয়ামী লীগের নিপিড়নে নিষ্পেষিত অবাঙালী ও বাঙ্গালী সৈনিকদের লাশ। এর ফলে তারা সমমর্মী হওয়ার বদলে নির্মম হয়ে ওঠে সাধারণ মানুষ এক ধরনের প্রতিরোধ স্পৃহা তাদের মধ্যে ক্রিয়াশীল হয়ে ওঠে। ফল যা হওয়ার তাই হয়েছে। হিন্দুস্থানের পেতে রাখা ফাঁদে পা দিয়েছে এবং তারা যেখানে প্রতিরোধ হয়েছে সেখানে প্রতিরোধ ভেঙ্গে দিয়ে অগ্রসর হয়েছে।

www.pathagar.com

তৎকালীন যুদ্ধাবস্থা সম্পর্কে নিরোদ সি চৌধুরী লিখেছেন–'ভারতীয় এবং বৃটিশ সাংবাদিকরা যে প্রতিরোধ কাহিনী সৃষ্টি করে চলেছে তার চেয়ে চরম বোকামী আর হতে পারে না। সামরিক অভিযানে বর্ষা জনিত বাধাকে ঘিরে যেসব কল্পকাহিনী প্রচার করেছেন তারা, তার নজির খুঁজে পাওয়া মুস্কিল। যারা এসব কথা প্রচার করছে পূর্ববংগের বর্ষাকাল সম্বন্ধে তাদের কোন ধ্যান ধারনাই নেই। তারা জানতনা যে যখন চাকাওয়ালা যানবাহনের এতটা প্রচলন ছিল না। তখন পূর্ব বাংলায় বর্ষাকালেই হচ্ছে যাতায়াতের সবচেয়ে সুবিধাজনক সময়। আর সেজন্যই সব বিবাহিত মেয়েরা বর্ষাকালেই বাপের বাড়ী বেড়াতে যেত এবং পূজার আগে ঘরে ফিরে আসত। রেল কিম্বা স্টিমার যোগাযোগ ব্যবস্থা বর্ষায় ব্যহত হয় না। তাছাড়া বর্ষা যদি কোন অসুবিধা সৃষ্টি করেই থাকে তাহলে উভয়ের জন্যই করেছে। তাছাড়া বিমান হামলা বর্ষার জন্য খুব কমই বাধা পেতে পারে।

এসব সামরিক আঁচ আন্দাজের মূল লক্ষ্য হল পাকসেনারা যে ভূমিকা নিতে চাইছে না তাদেরকে সেই ভূমিকায় নামাবার জন্য উৎসাহ যোগান। এবার আমরা বৃটিশ প্রেস, ভারত সরকার, ভারতীয় নাগরিক এবং বিশেষ করে পশ্চিম বঙ্গের লোকদের দিকে একটু নজর ফেরাই। প্রথমেই বলতে হয় আমি এত দায়িত্বহীন সাংবাদিকতার কথা কল্পনাও করতে পারি না। আলোচনা ভেঙ্গে যাবার আগে থেকেই বৃটিশ সাংবাদিকরা যেভাবে বিচ্ছিন্নতার সম্ভাবনা বা অবশ্যম্ভাবী বলে জোরে সোরে প্রচার করতে শুরু করলো তাতে নিশ্চয়ই পূর্ব বঙ্গের নেতারা উৎসাহিত বোধ করছেন আর অন্যদিকে পাকিস্তান সরকার এবং সামরিক বাহিনী ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছেন। এর পর দুইজন প্রত্যক্ষ দর্শী ছাড়া অন্য সকলেই ভারতীয় আজগুবি গুজবের উপর ভিত্তি করে রিপোর্ট পাঠাতে থাকলো। কাল্পনিক শক্তিশালী প্রতিরোধের বিষয় এমন কি তারা এও প্রচার করলেন যে, পাকসেনাদের চারদিক থেকে ঘিরে ফেলা হয়েছে এবং এমন অবস্থায় তারা বাঙ্গালীদের কাছে আত্মসর্ম্পন করতে যাচ্ছে যে কোন মুহুর্তে। মাঝে মাঝে তুমুল যুদ্ধের কথাও তারা তাদের রিপোর্টে প্রচার করেছে। গত কয়েক দিন যাবৎ যশোরে পাঞ্জাবীদের হত্যার এক বিভৎস কাহিনী তারা বেশ জোরে সোরে প্রচার করল এবং বলল যে পূর্ব পাকিস্তান রাইফেলস্ স্থানীয় জনসাধারণের সহযোগিতায় ঐ শহরের কিছু অংশ দখল করে নিয়েছে। তাদের দায়িত্বহীনতা চরম সীমায় পৌঁছল এই কাল্পনিক রিপোটিং-এর মাধ্যমে কারণ তারা একবারও ভেবে দেখলনা যে পাকিস্তান সরকারের উপর এই রিপোটের কি প্রতিক্রিয়া হতে

www.pathagar.com

পারে। এ সম্বন্ধে আমার সবচেয়ে সংশয় ছিল। যারা এইসব ভুয়া খবরগুলো পাঠাচ্ছিল তারা হয় সংশ্লিষ্ট পক্ষের কেউ, না হয় তারা পেশাগত ভাবে গুজব সৃষ্টিকারী।

ইংল্যাণ্ডে বসে যে সামান্য খবরা-খবর পাচ্ছি তাতে মনে হচ্ছে বাঙ্গালী হিন্দুরা পূর্ব বঙ্গের ঘটনা প্রবাহে তাদের চরিত্রের দুটো জঘন্য দুর্বলতাকে বেশ উৎসাহ নিয়ে লালন করে চলেছে– প্রথমতঃ তাদের লড়াই অন্যের সাফল্যের সাথে লড়ে যাচ্ছে দেখে পৈশাচিক আনন্দবোধ আর দ্বিতীয়তঃ তাদের হীনমন্যতা আর আত্ম প্রতারণার অনুভূতি। পূর্ব বঙ্গে গণপ্রতিরোধের সাফল্যের বানোয়াট খবরা খবর প্রচার করে সহযোগী বাঙ্গালী হিসেবে আমাদের বোঝা উচিত ছিল যে এতে পূর্ব বঙ্গের অসহায় মানুষগুলোকে আরো দুর্ভোগ ও দুর্দশার দিকেই ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। মানসিক তৃপ্তি আর পৈশাচিক উল্লাস মানবতা বিবর্জিত মনোবৃত্তিরই বহিঃপ্রকাশ। পূর্ব বঙ্গের সাফল্যজনক গণ প্রতিরোধের কল্প কাহিনী শিক্ষিত মানুষের বিবেক তার বুদ্ধিমত্তার করুণতম ব্যর্থতাই প্রকাশ করে। (দি হিন্দু স্ট্যানডার্ড, কোলিকাতা, ১৩ এপ্রিল ১৯৭১)

ছোট ছোট আক্রমন প্রতিরোধ ও ঘাত-সংঘাতের মধ্য দিয়ে বর্ষা মওসুম পেরিয়ে গেল। কিন্তু ভারতের প্রত্যাশা পূরণ হল না। ভারত আশা করেছিল বর্ষা মওসুমে মুক্তি যুদ্ধ চূড়ান্ত রূপ নিবে। দিল্লী মনে করেছিল ভারতীয় সমরাস্ত্র সজ্জিত মুক্তি যোদ্ধাদের প্রবল আক্রমনের মুখে পাকিস্তানী সেনাবাহিনী আত্মসমর্পনের বাধ্য হবে কেননা পূর্ব পাকিস্তানের আবহাওয়াজনিত পরিস্থিতি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য অনুকুল এবং পশ্চিম পাকিস্তানীদের জন্য ছিল সম্পূর্ণ প্রতিকূল এ কারণে পাকবাহিনীর পতন অবশ্যম্ভাবী মনে করাটা দিল্লীর জন্য অমূলক ছিল না। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা দাঁড়াল তাদের প্রত্যাশার বিপরীত। পাক বাহিনীর অবস্থান আরো দৃঢ় এবং মজবুত বলে পরিগণিত হল। এতে ইন্দিরা সরকার দারণভাবে বিচলিত হয়ে পড়ল। তারা অনুভব করল দুর্নীতি অসদাচরণ ও ভোগ বিলাসে লিপ্ত আওয়ামী লীগের প্রতি প্রবাসী বাঙালীদের আনুগত্য দ্রুত হ্রাস পাচ্ছে। এমন আশঙ্কাও প্রকট হয়ে উঠল যে যুদ্ধ দীর্ঘ স্থায়ী হলে আওয়ামী লীগ তাদের একক নেতৃত্ব ধরে রাখতে সক্ষম হবে না। তখন মুক্তি যোদ্ধাদের মধ্যে দুটো সুসংগঠিত শক্তি বিদ্যমান ছিল দুটোর একটি হল চরমপন্থী রাজনৈতিক আদর্শে উদ্বুদ্ধ বিপ্লবীরা অন্যটি হল বিদ্রোহী সেনা বাহিনী, ইপি আর মুজাহিদ পুলিশ ও আনসাররা। এদের কারোই ভারত সরকারের উপর দায়-বদ্ধতা ছিল না। একারণে যুদ্ধ দীর্ঘস্থায়ী হলে সময়ের আবর্তনে এক সময় মুক্তি যুদ্ধের নেতৃত্ব

www.pathagar.com

এই দুটো শক্তির দখলে এসে যাবে। ভারত সরকারের দুরভিসন্ধি আওয়ামী লীগের সাথে গোপন আঁতাত এবং দিল্লী বিচ্ছিন্নতাবাদী ষড়যন্ত্র সম্মোহিত মুক্তি যোদ্ধা জনগণ এবং সংশ্লিষ্ট সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে। এর ফলে চলমান পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রকট হয়ে উঠবে।

সবচেয়ে বড় কথা পূর্ব পাকিস্তানে বিচ্ছিন্নতাবাদী আবহ সৃষ্টি করার ফলে এবং ভারতীয়দের এ ব্যাপারে সম্পৃক্ত করার কারণে যে গোলমেলে যুদ্ধ পরিস্থিতির প্রাবল্যে ভারতের বিভিন্ন জাতি সত্তার স্বাধীনতা সংগ্রাম তাৎক্ষনিকভাবে ঝিমিয়ে পড়ে। ভারত আশঙ্কা করল মুক্তি যুদ্ধ দীর্ঘ মেয়াদী হলে ঝিমিয়ে পড়া ভারতের বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলন নতুন করে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠবে। তখন মুক্তি যুদ্ধ পুর্ব পাকিস্তানের মাটিতে নয় সমগ্র উত্তর পুর্ব ভারত কাশ্মীর ও পূর্ব পাঞ্জাবে ছড়িয়ে পড়বে দিল্লী দেখল তার সামনে রয়েছে দুটো পথ খোলা, হয় পূর্ব পাকিস্তানের সমস্যার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ হতে হবে নয়তো মুক্তি যুদ্ধের পক্সি যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে। সার্বিক পরিস্থিতি বিচার বিশ্লেষণ করে দিল্লী জুলাই মাস নাগাদ যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে।

যুদ্ধের সিদ্ধান্ত নিলেও আর এক আশঙ্কা থেকে ভারত চোখ ফিরিয়ে রাখতে পারেনি। চীন সফরের পর হেনরি কিসিঙ্গার ওয়াশিংটনে ভারতের রাষ্ট্রদূতকে ইংগিত দিয়েছিলেন যে পূর্ব পাকিস্তান আক্রান্ত হলে চীন হস্তক্ষেপ করবে। প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়ার মধ্যস্থতায় দুই বৈরী শক্তি চীন ও মার্কিন সম্পর্কের বরফ গলাতে শুরু করে। এর ফলে চলমান পরিস্থিতিতে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভূমিকা অখণ্ড পাকিস্তানের পক্ষে থাকার সম্ভাবনাও অধিক বলে মনে করল দিল্লী। চীন মার্কিন ঘনিষ্ট সম্পর্কের কারণে দিল্লীর পাকিস্তান ভাঙ্গার স্বপ্ন অনেকটা ম্লান হয়ে পড়ে। এ সত্বেও দিল্লীর নেতৃত্ব ২৩ বছর ধরে যে স্বপ্ন দেখে আসছিল। যে ষড়যন্ত্র যে পরিকল্পনা সম্ভাবনাময় করে তুলতে সুচনা পর্ব থেকে পাকিস্তানকে বিব্রত করে এসেছে, আজ সেই জাত শত্রু পাকিস্তানের ধ্বংস পরিকল্পনার চূড়ান্ত মুর্হূর্তে দিল্লী তার পরিকল্পনা বাস্তবায়ন থেকে পিছু হটে আসবে এমনতো হতে পারে না। একারণে দিল্লী দেশে বিদেশে অন্বেষন শুরু করল তার মিত্র এবং তার লক্ষ্য অর্জনের শক্তিশালী সঙ্গী।

ওদিকে চীন এবং আমেরিকা সংযমও সমঝোতার পথে অগ্রসর হওয়ার জন্য প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়াকে পরামর্শ অব্যাহত রাখছিল। কিন্তু এদুটোই ছিল ইয়াহিয়ার নাগালের বাইরে। কারণ ভারত মুক্তি যুদ্ধের তৎপরতা বৃদ্ধি করে দেয়ায়

www.pathagar.com

সেনাবাহিনীর উপর হামলা ও অন্তর্ঘাত বৃদ্ধি পেল। এমন বৃদ্ধি পেল যে সেনাবাহিনী সংযম অবলম্বন করার অর্থ হল মৃত্যুকে আলিঙ্গন করা। এমতাবস্থায় সৈনিকদের উপর চাপিয়ে দেয়া ধৈর্য ও সংযম প্রদর্শনের আদেশ উপদেশ কার্যকারীতা হারিয়ে ফেলল।

মার্কিন যুক্ত রাষ্ট্রে দক্ষিণ এশিয়ায় যুদ্ধ এড়ানোর জন্য পাকিস্তানের গৃহ যুদ্ধ আপোস রফার জন্য এবং ভারতকে সংযমী হওয়ার জন্য কুটনৈতিক উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া ও রাজনৈতিক অচলাবস্থা দুর করার জন্য অস্থির হয়ে উঠে। এ কারণে জুলাই আগস্ট নাগাদ অন্তরীণ মুজিব নতূন এক সমঝোতা প্রক্রিয়ার কেন্দ্র বিন্দুতে পরিণত হন। সমঝোতার লক্ষ্যে মুজিবের সাথে আলাপ আলোচনা শুরু হল। এই সাথে মার্কিনী কর্মকর্তাদের সহযোগিতায় প্রবাসী বাংলাদেশ সরকারের সাথে সংলাপ শুরু হল। ওদিকে দেখা গেল সামরিক ট্রাইবুনালে মুজিবের বিচার শুরু হতে। একে ব্রোহীকে মুজিবের পক্ষের আইনজ্ঞ হিসাবে কাজ করার অনুমতি দেয়া হল। প্রকৃতপক্ষে এটা বর্হিবিশ্বের চোখে ধুলো দেয়ার জন্য একটা সাজান নাটক ছাড়া কিছু ছিলনা। এটা ছিল সমঝোতা প্রয়াসের একটা অংশ অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলোতে জি ডব্লিউ চৌধুরী একথা লিখেছেন। সমঝোতা প্রয়াস নিয়ে কোলকাতার থিয়েটার রোডের প্রধান মন্ত্রীর সচিবালয় এবং পরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মধ্যে বিরোধিতার কথা প্রকাশ হয়ে পড়ে। প্রধান মন্ত্রী তাজুদ্দিন এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী খাদকার মোশতাক আহমদের মধ্যে ব্যবধান রচিত হয়। গুজব ছড়িয়ে পড়ে খন্দকার মোশতাক আহমদ নাকি গোপনে সি আই এর মাধ্যমে আমেরিকার সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে চলেছেন। অস্থায়ী সরকারের অলক্ষ্যে তিনি আমেরিকার মধ্যস্থতায় তিনি নাকি পাকিস্তান সরকার ও শেখ মুজিবের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে গ্রহণযোগ্য সমঝোতার উদ্যোগ নিয়েছে এতে আওয়ামী লীগের মধ্যপন্থী অংশেরও সমর্থন রয়েছে বলে গুজব ছড়িয়ে পড়ে। ইতিমধ্যে জেনারেল ইয়াহিয়ার সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করায় গুজবটা সত্য বলে প্রতীয়মান হল অনেকের কাছে। মুক্তিযোদ্ধা মেজর শরিফুল হক ডালিম তার গ্রন্থ যা দেখেছি যা বুঝেছি যা করেছি (লিখেছেন) 'ইয়াহিয়ার এ ঘোষণাকে কেন্দ্র করে মুজিবনগর সরকারের রাজনৈতিক নেতাদের মাঝে ভীষণ আলোড়ন সৃষ্টি হল নেতাদের অনেকেই তখন পর্যন্ত মুক্তিযুদ্ধ করে কোন দিনই দেশ স্বাধীন করা যাবে কিনা এ বিষয়ে নেতাদের অনেকেই সন্দেহ পোষণ করতেন।

www.pathagar.com

দিল্লী এসবের সবকিছু যথাসময়ে অনুধাবন করে দিল্লী মোশতাক আহমদকে সরিয়ে আব্দুল সামাদ আজাদকে পররাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্ব অর্পণ করে এই সাথে পররাষ্ট্র সচিব মাহাবুব আলম চাষীকে তার দায়িত্ব থেকে সরিয়ে দেয়া হয়। .... চক্রান্তের খবর পেয়ে প্রধানমন্ত্রী তাজুদ্দিন ভারত সরকারের নির্দেশে এ পদক্ষেপ নিতে বাধ্য হয়েছিলেন।'

এরপর ভারত সরকার পূর্ব পাকিস্তানকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য আরো বেশী তৎপর হয়ে উঠে। সমঝোতার এই মার্কিন উদ্যোগ বেশী দুর এগুতে পারেনি প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া এ ব্যাপারে সর্বোচ্চ ছাড় দিবে প্রস্তুত থাকা সত্ত্বেও এ প্রসঙ্গে জি ডব্লিউ চৌধুরী লিখেছেন– তার পর ইয়াহিয়া আমাকে বললেন যে তিনি তার সর্বশেষ সফলতার জন্য নিক্সনের উপর খুব বেশী নির্ভর করেছেন। তিনি ইরানের শাহের সাহায্যেরও উল্লেখ করেন। যখন আমি জিজ্ঞাসা করলাম সম্ভাবনা কতটুকু তখন তার জবাব ছিল দুই ব্যক্তি বিরাট বাধার সৃষ্টি করেছে। সেই প্রতারক মহিলা (মিসেস গান্ধী) এবং সেই অসংযত উচ্চাভিলাষী ব্যক্তি (ভুট্টো)। তিনি স্বীকার করলেন যে তার প্রথম ভুল ছিল ১৯৭০ সালের নির্বাচনের পূর্বে মুজিবের কথায় এবং প্রতিশ্রুতিতে তার শর্তহীন বিশ্বাস এবং যখন তিনি ভুট্টোর দিকে ফিরলেন সে ক্ষেত্রেও তিনি নিরাশ হলেন। আমি তাকে মুজিবের চেয়ে ভুট্টোর প্রতি কম তিক্ত দেখলাম না। তিনি বললেন যে অখণ্ড পাকিস্তান ধ্বংস সাধনে এবং নিছক ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে ভুট্টো মুজিবের চেয়ে কম দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ছিলেন না। (অখণ্ড পাকিস্তানের শেষ দিনগুলি পৃঃ ১৮৫)

ইয়াহিয়ার সর্বশেষ উদ্যোগ

পাকিস্তানের অখণ্ডতা রক্ষার ব্যাপারে আওয়ামী লীগ এবং শেখ মুজিবের সাথে প্রেসিডেন্ট সর্বোচ্চ ছাড় দিয়ে সমঝোতা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু পঞ্চম বাহিনীকে সঠিক পথে ফেরান সম্ভব হয়নি। ভারতের কাছে দায়বদ্ধ আওয়ামী লীগ তার দায় পরিশোধে ব্যস্ত হয়ে ওঠে। এ কারণে,প্রেসিডেন্ট ইহাহিয়া ভারতের সাথে একটা বোঝাপড়া করে পূর্ব পাকিস্তান সংকটের রাজনৈতিক সমাধানের উদ্যোগ নিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তান ভারতীয় রাষ্ট্রদূত শ্রী জয় প্রকাশ অটলের মাধ্যমে ভারতের প্রধানমন্ত্রী মিসেস ইন্দিরা গান্ধীর নিকট ৫ দফা শান্তি পরিকল্পনা পেশ করেন এর মধ্যে ছিল শেখ মুজিবের মুক্তি, বাঙালীর অখণ্ড

www.pathagar.com

পাকিস্তানের সাথে থাকতে চায় কিনা সেটা গণভোটের মাধ্যমে নির্ধারণ, অনতিবিলম্বে অন্তর্বর্তী সরকার হিসাবে সর্বদলীয় সরকার গঠন এবং জাতি সংঘের তদারকিতে ভারত থেকে শরণার্থীদের প্রত্যাবর্তনের আয়োজন। কিন্তু ইন্দিরা গান্ধী ইয়াহিয়ার এই গণতান্ত্রিক প্রস্তাব নাকচ করে দিয়েছিলেন নির্মমভাবে। ইন্দিরা ইয়াহিয়াকে স্পষ্ট জানিয়ে দেন ১৯৭০ সালে গণভোট হয়েছে। নতুন করে গণভোট দরকার নাই। নিঃসন্দেহে এটা ছিল ইন্দিরা গান্ধীর জালিয়াতি। শেখ মুজিবের নির্বাচনী অঙ্গীকার ছিল স্বায়িত্বশাসনের স্বাধীনতার জন্য নয়। ৭০ সালের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল অখণ্ড পাকিস্তানের ভিত্তিতে।

রুশ ভারত সখ্যতার পটভূমি

সেন্টো সিয়াটোতে পাকিস্তানের যোগ দেয়ার কারণে পঞ্চাশ দশকের পূরোটাই সোভিয়েট ইউনিয়ন পাকিস্তান বৈরী রাষ্ট্র হিসাবে বিবেচনা করে এসেছে। ৬০ দশকের শুরু থেকে প্রেসিডেন্ট আইয়ূব পরাষ্ট্র বিষয়ে নিরপেক্ষতা অবলম্বনের কারণে ক্রেমলিন পাকিস্তানের ব্যাপারে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী পোষন করতে থাকে এবং এক পর্যায়ে তার পাকিস্তান বিদ্বেষ কেটে যায়। রাশিয়া পাকিস্তানকে সম্মানিত দক্ষিণ প্রতিবেশী বলে অভিহিত করে।

ইরানের সাথে আমেরিকার মাখামাখি এবং ইরানকে মার্কিন সমরাস্ত্রের ভাণ্ডারে পরিণত করার কারণে রাশিয়া সর্তক হয়ে উঠে। ওদিকে চীনের সাথে রাশিয়ার বিরোধ এবং আমেরিকার সাথে চীনের বৈরী সম্পর্কের বরফ গলতে থাকায় দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ার ব্যাপারে ক্রেমলিন আগ্রহী হয়ে ওঠে। আফগানিস্তান পর্যন্ত রুশ প্রভাব বলয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় পাকিস্তানকে প্রভাবিত করে বেলুচিস্তানের গোয়াদর বন্দর পর্যন্ত পৌছান সম্ভব হলে ভারত মহাসাগরে বিলোচিস্তান আধিপত্য বিস্তার করা রাশিয়ার জন্য সহজ হয়ে পড়বে।

একারণে ১৯৬৯-৭০ সালের দিকে আঞ্চলিক গোষ্টীবদ্ধ করণ পরিকল্পনা এবং এশীয় সম্মিলিত প্রতিরক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়ন মরিয়া হয়ে ওঠে। এ পরিকল্পনার মূলে ছিল চীনকে বেষ্টন করে রুশ প্রতিরক্ষা ব্যুহ রচনা করা এবং এই অঞ্চলে আমেরিকার উপস্থিতি চ্যালেঞ্জ করা চীন এবং আমেরিকার সাথে পাকিস্তানের সম্পর্ক নিবিড় থাকার কারনে পাকিস্তান এই পরিকল্পনার সাথে একমত হতে পারেনি। অন্যদিকে ১৯৬৭ সালে ভারতীয় পরাষ্ট্র মন্ত্রী দীনেশ সিং রাশিয়ার সফর করেন এবং ক্রেমলিমের প্রস্তাবটিকে অভিনন্দন

www.pathagar.com

জানিয়ে ভারতের পক্ষ থেকে ইতিবাচক সাড়া দেন। এই সূত্র ধরে ভারতের পররাষ্ট্র নীতি সম্পূর্ণ ক্রেমলিনমুখী হয়ে ওঠে। এদিকে পাকিস্তানের অখন্ডতা রক্ষায় মার্কিন উদ্যোগ আঁচ করে ভারত তার পাকিস্তান খণ্ডিত করার মহা পরিকল্পনায় পাশ্চাত্যের সহযোগিতার ব্যাপারে সম্পূর্ণ নিরাশ হয়ে পড়ে। এ কারণে চীন আমেরিকা বিরোধী পরাশক্তি শক্তি রাশিয়ার পক্ষপূটে আশ্রয় নেয় ভারত।

ভারত মহা সাগরে আধিপত্য বিস্তারে রাশিয়ার প্রত্যাশা পূরণে পাকিস্তান ব্যর্থ হওয়ায় ক্রেমলিন পাকিস্তানের প্রতি বৈরী হয়ে ওঠে এবং পাকিস্তানকে উপযুক্ত শিক্ষা দেয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এক পর্যায়ে দূই বৈরি শক্তি ক্রেমলিন ও ভারতের অভিলাশ এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। যথা সময়ে দিল্লী ও ক্রেমলিনের মধ্যে সহযোগিতা চুক্তি স্বাক্ষর হয় যা ছদ্মবেশী সামরিক চুক্তি বলে অভিহিত। এই চুক্তি ভারতকে দুঃসাহসিক করে তুলে। এরপর পূর্ব পাকিস্তানকে মানচিত্র থেকে মূছে ফেলার জন্য যুদ্ধের ঝুকি নিতে বিলম্ব করেনি ভারত।

www.pathagar.com

অষ্টদশ অধ্যায়

স্বাধীনতার দৃশপট

পলাশীর যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতি ও পূর্বপাকিস্তানের পতনোত্তর পরিস্থিতির মধ্য পার্থক্য মোটেও ছিল না। পলাশীর যুদ্ধে যারা সক্রিয় ছিল যারা ইংরেজদের দুর্ভিসন্ধি আঁচ করে পরিস্থিতির মুকাবিলা করতে চেয়েছিল তাদেরকে নিক্ষিপ্ত হতে হয়েছিল মীরজাফরের কারাগারে।

বৃটিশদের নির্দেশ মত অথবা আত্মগোপন করতে হয়েছিল নির্যাতনমূলক উৎকট পরিস্থিতি থেকে আত্মরক্ষার জন্য। সেদিন শুধু তরুণ নবাবকে নির্মমভাবে নিহত হতে হয়নি স্বাধীনতা ও সংহতির পক্ষে থাকা অসংখ্য দেশপ্রেমিকদের আলিঙ্গন করতে হয়েছিল অমানবিক মৃত্যু। সিরাজের লাশ মাড়িয়ে নবাবের কোষাগার লুণ্ঠিত হল– যা ছিল বাংলার জনগণের সম্পদ। সেদিন ছিল পলাশী নাটকের শেষ পরিণতির মূল প্রযোজক বর্ণবাদী হিন্দু চক্র, শিখণ্ডি মীরজাফর ও তার সহগামীদের ঘরে ঘরে উৎকট আনন্দের উচ্ছলতা। হয়তোবা জনগণ ও উল্লসিত হয়েছিল নিছক ক্ষমতার পালাবদল মনে করে। অনুরূপ একই চিত্র আমরা প্রত্যক্ষ করেছি পূর্বপাকিস্তান পতনের পর এই বাংলার প্রতিটি জনপদে।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝিতে পূর্বপাকিস্তানে পাকিস্তানী বাহিনীর পতন পর্যায় থেকে এই অঞ্চলে যেমন সর্বব্যাপী লূণ্ঠন শুরু হল। অন্যদিকে তেমনি চলল হত্যাযজ্ঞ আওয়ামী পরিভাষায় দালাল নিধন। এদেশী হিন্দু শুধু নয়– হিন্দুস্থানের প্রতিটি ঘরে সেদিন চলছিল দেয়ালীর মহোৎসব। একদিকে ছিল অবারিত উল্লাস অন্যদিকে কারবালার মাতম। চলছিল হত্যাযজ্ঞ, সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের উপর নির্মম নিপীড়ন দালাল অপবাদের বোঝা চাপিয়ে। আওয়ামী পান্ডাদের ধর্ষণের দায় চাপিয়ে দেয়া হল সবটুকু পাক বাহিনীর উপর এবং ধর্ষিতাদের বেআব্রু করার জন্য বীবাঙ্গনার তিলক পড়িয়ে কলঙ্কিত করা হল এদেশের তরুনীদের দেশের মাটি আকড়ে থেকে ৯০ শতাংশ জনগণকে রক্ষা করার যারা আপ্রাণ চেষ্টা করেছে, তাদেরকে লাঞ্ছিত করা হল এবং লুট করা হল তাদের সম্পদ। এদের অধিকাংশ হত্যাযজ্ঞের শিকার হল অথবা নিক্ষিপ্ত হল কারাগারে। কারাগার পূর্ণ করা হল দেশপ্রেমিকদের দিয়ে আর কারাগারে থাকা ক্রিমিনালরা

www.pathagar.com

আওয়ামী লীগের কল্যাণে মুক্ত আলোয় এসে আওয়ামী দুষ্কর্মের সহযোগীতে পরিণত হয়েছিল একাত্তরের রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে এদের সাথে আওয়ামী লীগের নাড়ীর যোগ অবশ্যই ছিল এবং আজ অবধি বিদ্যমান রয়েছে। কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা যারা দেশপ্রেমিক দেশের কল্যাণকামী রাজনীতিক ও সমাজকর্মী কোন অপরাধে নিপিড়নের শিকার হল। এরা স্বাধীনতা বিরোধী শক্তি একথায় হয়তো বলা হবে। কিন্তু স্বাধীনতার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের সুস্পষ্ট বক্তব্য ছিল কি ছিল না। এ ব্যাপারে আওয়ামী লীগ শুরু থেকে শেষ অবধি যে একটা গোলক ধাঁধার মধ্যে অবস্থান করছিল সে ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। আমি এ ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করতে চাই। প্রথমত দেখা যাক আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা কি ছিল? যে ওয়াদার ওপর আস্থা রেখে জনগণ ভোট দিয়েছিল।

নির্বাচনী ওয়াদা ছিল
পাকিস্তানের সংহতির সপক্ষে

শেখ মুজিবর রহমান : "৬ দফা বাস্তবায়িত করা হবে।" কিন্তু এর মাধ্যমে ইসলাম অথবা পাকিস্তানের জাতীয় সংহতি ক্ষতিগ্রস্ত হবে না। (নারায়ণগঞ্জ ঃ ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

এই নির্বাচন প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের সপক্ষে গণভোট। (ঢাকা ঃ ২৪ সেপ্টেম্বর; ১৯৭০)

৬ দফার অর্থ প্রাদেশিক স্বায়ত্ব শাসনের মাধ্যমে পূর্ব বাংলার অধিকারকে নিশ্চিত করা। (সিলেট ২৪ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

তাজুদ্দিন ঃ ৬ দফা বাস্তাবয়নের মধ্যে জাতীয় ঐক্য ও সংহতির সম্পর্ক খুব বেশী। (নারায়ণগঞ্জ : ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

এ এইচ এম কামরুজ্জামান ঃ জেনারেল সেক্রেটারী নিখিল পাক আওয়ামী লীগ ঃ পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। (রাজশাহী, ২১ জুন : ১৯৭০)

পাকিস্তানে ভেঙ্গে দেওয়ার কোন পরিকল্পনা নেই। (লাহোর, ২১ সেপ্টেম্বর ১৯৭০)

খন্দকার মোস্তাক আহমেদ, ভাইস প্রেসিডেন্ট পূর্বপাকিস্তান আওয়ামী লীগ ঃ শক্তিশালী পাকিস্তানের জন্য দাঁড়িয়েছি পূর্ণ স্বায়ত্ব শাসন পাকিস্তানের বুনিয়াদকে শক্তিশালী করবে। (ফেনী ২০ মার্চ ঃ ১৯৭০)

www.pathagar.com

স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রস্তুত করা হয়নি

৭০ দশকের শেষ দিকে আওয়ামী লীগ লাহোর প্রস্তাবের উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। কিন্তু এর মধ্যে স্বাধীনতার প্রচ্ছন্ন ধারণা রয়েছে এমনটি মনে করার যুক্তিসংগত কারণ নেই। তাছাড়া প্রচ্ছন্ন ধারণা দিয়ে স্বাধীনতার মত বিশাল কর্ম সম্পাদনে সমগ্র জাতিকে একই মঞ্চে টেনে আনা যায় না।

লাহোর প্রস্তাবের একাধিক রাষ্ট্রের কথা বলা হয়েছে এটা ঠিক। সেখানে পশ্চিম বঙ্গ আসাম নিয়ে একটি জোন বলা হয়েছে। এই অখণ্ড বাংলা একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হবে এতে কায়দে আযমের অসম্মতি ছিল না। হিন্দু নেতৃবৃন্দ ও বৃটিশদের ষড়যন্ত্রে বাংলাকে খণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হল তখনই মুসলিম নেতৃবৃন্দ পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তানের সাথে সংযুক্ত করার সিদ্ধান্ত নেয়। ১৯৪৬ সালে গণভোটের মাধ্যমে পাকিস্তানের দাবী স্বীকৃত হলে একই বছরে দিল্লীতে মুসলিম গণপ্রতিনিধি ও মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দের সমন্বিত সম্মেলনে হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী উত্থাপিত এক প্রস্তাবে লাহোর প্রস্তাবকে সংশোধন করে এক পাকিস্তানের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় এবং করা হয় পূর্ব বাংলার নিরাপত্তার কথা বিবেচনায় এনে। তা না হলে জুনাগড় হায়দ্রাবাদ জুনাগর অথবা কাশ্মীরের ভাগ্য বরণ করতে হত এ অঞ্চলকে। গণভোটের মাধ্যমে অর্জিত গণপ্রতিনিধিদের দ্বারা স্বীকৃত অখণ্ড পাকিস্তান যেটার স্বপক্ষে আওয়ামী লীগের প্রতিষ্ঠাতা ও শেখ মুজিবের রাজনৈতিক গুরু হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত কাজ করে গেছেন সে সংহতির পক্ষে শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা ছিল। যে সংহতির জন্য শেখ মুজিব স্বাধীনতা সংগ্রামকে এরিয়ে যাওয়ার ঝুকি নিয়েছিলেন সেটা সমুন্নত করার প্রয়াস অপরাধ নয়। স্বাধীনতার প্রশ্নে আওয়ামী লীগের মধ্যে ছিল অস্বচ্ছতা। এ প্রসঙ্গে আবুল বাসার বলেছেন–

'৭১ সালে যখন আমরা স্বাধীনতার জন্য জনগণকে প্রস্তুতি গ্রহণের কথা বলি, তখন ২৩ মার্চ আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পাকিস্তান দিবস পালন করা হয় এবং আমাদেরকে তারা বিচ্ছিন্নবাদী বলে অভিহিত করে।' মেজর জলিল স্পষ্টতই বলেছেন– 'আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ দেশকে স্বাধীন করার কোন চিন্তা ভাবনাই করেননি, শেষ পর্যন্ত আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ক্ষমতা দখলের চিন্তাভাবনা করেছিলেন।'

এ প্রসঙ্গে তৎকালীন আওয়ামী লীগের এমপি জনাব এম এ মোহাইমেন ২৬ মার্চের পরে আগড়তলায় এক দারুণ বিব্রতকর পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছিলেন

www.pathagar.com

স্বাধীনতার প্রশ্নে। তিনি এইভাবে বিষয়টি বর্ণনা করেছেন– 'শ্রমিক কৃষক আন্দোলন সম্পর্কে গভীর জ্ঞানের অধিকারী প্রমোদ গুপ্তের জেরার মুখে আমি আর কোন উত্তর দিতে পারছিলাম না। তিনি বার বার প্রশ্ন করলেন আওয়ামী লীগের ৬ দফা আন্দোলনের মূখ্য উদ্দেশ্য কি কার স্বার্থে আন্দোলন গড়ে তোলা হয়েছে।' কি বৈজ্ঞানিক ভিত্তির ওপর এটা পরিচালিত হয়েছে। ৬ দফার মানে যখন প্রায় পূর্ণ স্বাধীনতা যা পাকিস্তান সরকার মানতেই পারে না। তেমন অবস্থায় আন্দোলন চালাতে গিয়ে নিরস্ত্র জনসাধারণকে রক্ষার কি ব্যবস্থা আমরা পূর্বহ্নে করেছি এবং না করে থাকলে এ সমস্ত প্রশ্নে তিনি আমাকে ব্যতিব্যস্ত করে তুললেন।

... তাই কোন দৃষ্টিকোণ থেকে আন্দোলন পরিচালিত হয়েছিল। কি নীতির অনুসরণ করে আমরা বর্তমান অবস্থায় পৌঁছলাম সেই নীতির সারবত্তা ব্যাখ্যা করে আমি অনেক চেষ্টা করেও প্রমোদ দাস গুপ্তকে আমাদের গৃহীত নীতির যৌক্তিকতা বোঝাতে পারলাম না। এ ছাড়া পুরো ব্যাপার আমার নিজের কাছেও কুয়াশাচ্ছন্ন ছিল। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ পৃঃ ৬৭)

এই কুয়াশা ও ধুয়াশার অস্বচ্ছতাকে যারা আঁকড়ে ধরতে পারেননি বিবেকের তাড়নায় ও ইতিহাসের ইংগিতে যারা নিজস্ব পথ ধরে এগিয়ে ছিলেন তাদেরকে আওয়ামী লীগ দাঁড় করাল আসামীর কাঠগড়ায়। এ প্রসঙ্গে আবুল মনসুর আহমদ লিখেছেন– 'মন্ত্রীরা প্রচলিত আইনে দালালদের শাস্তি দিতে না পারিয়া নিত্য নতুন আইন প্রণয়ন করিতেছেন। ছাত্র তরুণরা এটাকে যথেষ্ট বিপ্লবী না মনে করিয়া দাবি করিতেছেন আদালত-টাদালত আবার কি, ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে ধরা না ধরা দালালদের কাতার বন্দী করিয়া নিপাত কর।'

'সম্ভাব্য দালালদের খোঁজে সরকার ও ছাত্র তরুণরা যে সময় ও অর্থ ব্যয় করিতেছেন, খাদ্য ও দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণ শান্তি শৃঙ্খলার জন্য ঐ পরিমাণ সময় অর্থ ও শক্তি ব্যয় করিলে ঐসব সমস্যার কিনারা করা যাইত।'

আবুল মনসুর আহমদ আর একটু এগিয়ে বললেন– 'আর জাতীয় ও সর্বদলীয় সরকার করিতে হইলে যারা স্বাধীনতা বিরোধি ছিলেন তাদেরও নিতে হইবে। স্বাধীনতা লাভের আগে পর্যন্ত স্বাধীনতার বিরোধিতা দেশদ্রোহিতা নয়, রাজনৈতিক মত বিভিন্নতা মাত্র। ভারত স্বাধীন হইবার আগে পর্যন্ত অনেক ব্যক্তি ও পার্টি স্বাধীনতার বিরোধীতা ও ইংরেজ সরকারের সমর্থন করিয়াছিলেন। ভারত স্বাধীন ও পাকিস্তান হাসিল হইবার পর ঐ কারণে কেউ দণ্ডিত হয় নাই। বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার আগের দিন পর্যন্ত বাংলার স্বাধীনতা ও পাকিস্তানের অখণ্ডতা

www.pathagar.com

ছিল রাজনৈতিক মতপার্থক্যের প্রশ্ন, এখন সেটা হইয়াছে আনুগত্যের প্রশ্ন। মত বিভিন্নতা দন্ডনীয় নয় আনুগত্যের অভাবই দন্ডনীয়।' (বেশী দামে কেনা কম দামে বেচা/পৃঃ২২-২৩)

জনাব আব্দুল মোহাইমেনের ভাষায়– 'সবচাইতে দুঃখের ও ক্ষতির কারণ হল তখন, যখন শেখ মুজিব বাংলাদেশ হওয়ার পরই ঘোষণা করলেন ১৯৪৮ সাল থেকে তিনি পাকিস্তানের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার পর পরই কে কত পাকিস্তান বিরোধী ছিল প্রমাণ করার জন্য যেন একটা মারাত্মক প্রতিযোগীতা শুরু হয়েছিল। পাকিস্তান বিদ্বেষের পরিণাম তখন যেন স্বদেশপ্রেমের গভীরতার মাপকাঠি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছিল। শেখ মুজিবের সে দিনের উক্তি যে কত অসত্য ও ভিত্তিহীন ছিল ১৯৫৪ এবং ৫৫ সালে শিল্পমন্ত্রী থাকাকালিন তার ১৪ আগস্ট প্রদত্ত বক্তৃতাগুলির পুরানো রেকর্ড দেখলেই পরিষ্কার হয়ে যাবে। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ/পৃঃ ৪০)

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত থেকে আওয়ামী লীগের আত্মঘাতী পদক্ষেপ অরাজনৈতিক বক্তব্য ও হটকারী সিদ্ধান্ত সমগ্র জাতির মধ্যে একটা ভেদরেখা টেনে দিয়েছে। সম্প্রসারণবাদী দিল্লীর প্ররোচনায় স্বাধীনতার পক্ষ বিপক্ষ শক্তি হিসাবে জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে। একদিকে যেমন জাতি পূনর্গঠনে জনগণের বিরাট অংশকে দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে নিষ্ক্রিয় রাখা হল অন্যদিকে অনুরূপ তরুণ সমাজকে পূনর্গঠনের ভাবনা থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হল। পাকিস্তান বিরোধী প্রচারণার বিষ বাষ্প ছড়িয়ে পাকিস্তান পন্থী হিসাবে চিহ্নিত করে সত্যিকার দেশপ্রেমিকদের মাঠ থেকে দুরে সরিয়ে রাখা হল সুকৌশলে। এসব করা হল সম্প্রসারণবাদী দিল্লীর প্ররোচনায়।

স্বাধীনতার পর নির্বিচার লুণ্ঠন

একদিকে যখন দেশ প্রেমিকদের ধাওয়া করছে আওয়ামী লীগ অন্যদিকে তখন চলছে লুণ্ঠন। মিত্রবাহিনী ভারতীয় বেনিয়া চক্র দেশী-বিদেশী লুটেরা এককভাবে অথবা যৌথ উদ্যোগে লুণ্ঠন শুরু করল। বাংলার মানুষ আবার দেখল ২১৪ বছর পর লুণ্ঠনের ভায়াবহতা। এ লূণ্ঠণ ১৭৫৭ সালে মুর্শিবাদ লুণ্ঠনকে ছাড়িয়ে গেল। লর্ড ক্লাইভ যেমন উমি চাঁদ জগৎশেঠ এবং মীরজাফরের সামনে বাংলার সম্পদ লুট করছিল। অনুরূপ লুট শুরু হল আওয়ামী লীগের স্বাধীন সরকারের সম্মুখে। কারো মুখে কোন কথা নেই। বরং ইন্দিরা গান্ধীর পদমূলে সবকিছু সমর্পণ করার জন্য তারা মানসিকভাবে তৈরী হয়েছিল। প্রতিবাদী হয়ে উঠল সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

একজন মেজর নবম সেক্টরের প্রধান মেজর জলিল ১৯৭২ সালে ফেব্রুয়ারী মাসে তাকে গ্রেফতার করা হল। ১১ মার্চ ১৯৭২ বৃহত্তর বরিশালের মানুষ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে। সেনাবাহিনীর তরফ থেকে মেজর জলিলের মুক্তির আবেদন জানান হয়। কিন্তু পুতুল সরকার ছিল প্রতিক্রিয়াহীন। ভারতের চাপের মুখে মেজর জলিলকে সামরিক আইনে বিচারের হুমকি দেয়া হয়। জনগণ ও সম্মিলিত মুক্তিযোদ্ধাদের চাপের মুখে পুতুল সরকার অবশেষ মেজর জলিলকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। সেই মেজর জলিল ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক বাংলার সম্পদ লুণ্ঠনের বিবরণ দিয়েছেন তার এক পুস্তিকায়। তিনি লিখেছেন–

'দেশপ্রেমিক মুক্তিযোদ্ধারা ডিসেম্বরের পরে মিত্রবাহিনী হিসাবে পরিচিত ভারতীয় সেনাবাহিনীকে নব্য স্বাধীন বাংলাদেশের বিভিন্ন সম্পদ ও মালামাল লুণ্ঠন করতে দেখেছে। সে লুণ্ঠন ছিল পরিকল্পিত লুণ্ঠন, সৈন্যদের উল্লাসের বহিঃপ্রকাশস্বরূপ নয়। সে লুণ্ঠণের চেহারা ছিল বীভৎস বেপরোয়া, সে লুণ্ঠন ছিল একটি সচেতন প্রক্রিয়ারই ধারাবাহিক তৎপরতা।

খুলনা শহরের লুটপাটের যে তান্ডব নৃত্য চলেছে তা তখন কে না দেখেছে। ভারতীয় সেনাবাহিনী কর্তৃক সেই লুটপাটের খবর চারিদিক থেকে আসছিল। পাকিস্তানী বাহিনী কর্তৃক পরিত্যক্ত গোলাবারুদসহ আরো মূল্যবান জিনসিপত্র ট্রাক বোঝাই করে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল।

যশোর সেনানিবাসের প্রত্যেকটি অফিস এবং কোয়ার্টার তন্ন তন্ন করে লুট করছে। বাথরুমের মিরর এবং অন্যান্য ফিটিংসগুলো পর্যন্ত সেই লুটতরাজ থেকে রেহাই পায়নি। রেহাই পায়নি নিরীহ পথযাত্রীরা। কথিত মিত্রবাহিনীর এ ধরনের আচরণ জনগণকে ভীত সন্ত্রস্ত করে তুলেছিল। (অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা/পৃঃ ৩৭

ভারত অথবা আওয়ামী লীগ এই লুণ্ঠণের কথা কখনো স্বীকার করেনি। তবে ১৯৭৪ সালের ১২ মে দৈনিক অমৃতবাজার পত্রিকায় ছোট একটি সংবাদ বেরিয়েছিল এতে বলা হয়েছিল– ভারত সরকার আড়াইশ' রেলওয়ে ওয়াগণ ভর্তি অস্ত্রশস্ত্র বাংলাদেশ সরকার স্থানান্তরিত করিয়াছে। দেরীতে হলেও অমৃত বাজার লুট অথবা লোপাটের কথা স্বীকার করেছে। বাংলাদেশ সরকারের অনুরোধক্রমে কথাটি যোগ দিয়ে বৈধতার আইনগত ভিত্তি দাঁড় করিয়েছে। যাইহোক বাংলাদেশ সরকার অর্থাৎ তৎকালীন আওয়ামী লীগ সরকার তার দায় পরিশোধ করেছে আনুগত্যের উপঢৌকন হিসাবে পাকিস্তানের পরিত্যাক্ত অস্ত্র সম্ভার হিন্দুস্থানের হাতে তুলে দিয়ে। দিল্লী তার সামরিক প্রয়োজনে এসব নিয়ে

www.pathagar.com

গেছে তাও নয়। বাংলাদেশকে শুধুমাত্র সামরিক দিক দিয়ে পঙ্গু অথবা দুর্বল করে রাখার জন্য এসব করা তার প্রয়োজন ছিল। অলি আহাদ লিখেছেন– 'স্বর্ণের ভরি ১৭১ টাকা মানে স্থানান্তরিত অস্ত্রশস্ত্রের মূল্য যদি ৪৫০ কোটি টাকা হয় তাহলে স্বর্ণের ভরি এক হাজার টাকা মানে উক্ত অস্ত্রের মূল্য দাঁড়ায় ২৭০০ কোটি টাকা। (জাতীয় রাজনীতি ১৯৪৫-৭৫, পৃঃ ৪৩১)

১৬ই ডিসেম্বর পাক বাহিনীর আত্মসমর্পণের মাত্র দু'সপ্তাহের ব্যাবধানে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে প্রথম নববর্ষ এল। নব বর্ষের প্রথম প্রভাতে মনে হল গঙ্গার পানি উজানে বইছে। বাংলার জনগণের স্বার্থ বিবেচনায় না এনে দিল্লীর মোহরাঙ্কিত মসনদে বসে তাজুদ্দিন দিল্লীকে খুশী করার জন্য বাংলাদেশের মুদ্রামান হ্রাস করলেন শতকরা ৬৬ ভাগ। একই সাথে ভারতে পাট বিক্রির ওপর নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করলেন। আওয়ামী লীগের যোগ সাজসে পাট থেকে শুরু করে সোনা কাশা পিতলসহ যাবতীয় মূল্যবান সম্পদ বিদেশে পাচার হয়ে গেল।

ইতিমধ্যে শেখ মুজিব পাকিস্তান থেকে ফিরে এসেই ক্ষমতার হাল ধরলেন। তিনি তখন নিরঙ্কুষ ক্ষমতার মহান অধিপতি হয়তোবা ভারতের চাপের মুখে এমন কিছু পদক্ষেপ নিলেন যাতে পাচার প্রক্রিয়ায় নতুন মাত্রা যোগ হল। এ সম্পর্কে তৎকালীন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মোহাইমেন লিখেছেন– '১৯৭২ সালের ২৭ মার্চ দিল্লীকে খুশী করার জন্য শেখ মুজিব ভারতের সাথে অবাধ বাণিজ্য চুক্তি সম্পাদন করে। ওপেন বর্ডার ট্রেড আরম্ভ হল এবং অল্প দিনেই এটা বাংলাদেশের অর্থনীতির পক্ষে মারাত্মক ক্ষতির কারণ হয়ে দেখা গেল। সীমান্ত শুল্ক ঘাঁটিতে এক পয়সাও জমা থাকলো না। এদিকে লক্ষ লক্ষ মন ধান চাল ও পাট পাচার হয়ে ভারতে চলে গেল। বাধা বিপত্তির ফলে পূর্বে যে প্রকার মাল সীমান্ত অতিক্রম করতো এখন তার দশ বিশ গুণ মাল ভারতে চলে গেল।' (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ-এম এ মোহাইমেন, পৃঃ ২৩)

এ ব্যাপারে আর একজন প্রবীণ নেতা ও আওয়ামী বুদ্ধিজীবী আবুল মনসুর আহম্মদের কঠোর মন্তব্য হল ঃ শেখ মুজিবের এই অদূরদর্শী পদক্ষেপ সম্পর্কে আবুল মনুসর আহমদ লিখেছেন– 'এই সীমান্ত বাণিজ্যের বিধানটা যেন বাংলাদেশের পক্ষ হতে চোখ বন্ধ করিয়া সব করা হইয়াছে। বহু ক্রটির মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ক্রটি ১০ মাইল এলাকাতে সীমান্ত আখ্যা দেওয়া। এই চুক্তি যে বিপুল আয়তনের চোরাচালান বিপুল শক্তিশালী প্রতিষ্ঠানে সংঘবদ্ধ হইবার সুযোগ দিয়াছে তার কবজা হইতে বাংলাদেশ আজো মুক্ত হইতে পারে নাই। (আমার দেখা রাজনীতির ৫০ বছর। পৃঃ ৫৯৮)

www.pathagar.com

এদেশ থেকে ব্যাপক হারে বিরামহীনভাবে সম্পদ পাচার হল। বিনিময়ে এদেশ পেল কিছু কাগজের টুকরো অর্থাৎ জাল নোট জাল নোটে ছেয়ে গেল দেশ। মুদ্রা পাচারের ভয়াবহতা এত তীব্র হয়েছিল যে সমকালীন অর্থমন্ত্রী জনাব তাজুদ্দিন স্বীকার করলেন যে মুদ্রা পাচারের ফলে জাতীয় অর্থনীতি ভেঙে পড়েছে। এটা হয়েছিল কিভাবে। বাংলাদেশ সরকার তার বন্ধু দেশ ভারতের কাছে ৪২১৬ মিলিয়ন নোট ছাপানোর অর্ডার দেয়। অল্প দিনের মধ্যে সবাই জানতে পারল ১৫০০ কোটি টাকার জাল নোট বাংলাদেশে চালু রয়েছে। (অমৃত বাজার পত্রিকা ১৩ এপ্রিল ১৯৭৩)। অমৃতবাজার পত্রিকা বলেছে রিজার্ভ ব্যাংক বাংলাদেশের কর্মকর্তারা ভয় করছেন যে ১২০০ মিলিয়ন ভারতে ছাপা নোট বাংলাদেশে চালু রয়েছে। আর এটা হয়েছে জালিয়াতির কারণে ভাবতে অবাক লাগে ৪২১৬ মিলিয়নের জায়গা ১২০০ মিলিয়ন জাল নোট বাংলাদেশের বাজারে ঘুরে বেড়াচ্ছে। উল্লেখযোগ্য যে ভারতের নাসিক ছাপনাখানায় যা ছাপার অর্ডার দেয়া হয়েছিল তার তিনগুণ নোট ছাপান হয়েছিল।

দৈনিক ইত্তেফাকের তৎকালিন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক আখতার-উল আলম লিখলেন– 'টাকা বদলের নামে বাংলার অর্থনীতিকে ফোকলা করে ফেলা হয়েছিল। বর্ডার বণিজ্যের নামে বাংলাদেশকে পরিণত করা হয়েছিল ভারতের বস্তাপচা মালামালের বাজারে ও পাটের রাজা বাংলাদেশ হয়ে পড়েছিল পাটহীন। পক্ষান্তরে পাটহীন আগরতলায় স্থাপিত হয়েছিল গোটা পাঁচেক পাটকল। কোলকাতার পাটকলগুলি কয়েক শিফট চালিয়েও কুলাতে পারছিল না।'

দৈনিক ইত্তেফাকে (৫ই মে ৭৩) লেখা হল– 'গত কয়েক বছরে ৪ হাজার কোটি টাকার বিদেশী সাহায্যের জাহাজ চোরা পাহাড়ে ধাক্কা খাইয়া ডুবিয়া গিয়াছে। অন্যুন ৬ হাজার কোটি টাকার সম্পদ পাচার হইয়া গিয়াছে। চট্টগ্রামগামী ত্রাণ সামগ্রীর জাহাজ অদৃশ্য ইঙ্গিতে কোলকাতার বন্দরে ভিড়তো এবং সেখানেই মাল খালাস হত। পানির দামে বিক্রয়লব্ধ অর্থ জমা হত নেতাদের একাউন্টে।'

শিল্প সেক্টর ধ্বংস করা হল

ভারতের প্রয়োজনে শিল্প সেক্টরকে ধ্বংস করা হল। পরিকল্পিত উপায়ে। ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতন পরবর্তী ইতিহাস এবং স্বাধীনতার উত্তর বাংলাদেশের ইতিহাসের প্রকৃতির মধ্যে পার্থক্য মোটেও চোখে পড়ে না। বৃটিশ বেনিয়ারা এদেশের শিল্প ছলে বলে কৌশলে ধ্বংস করেছিল বৃটিশ পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্য। তখন কিন্তু রাষ্ট্র ক্ষমতায় বৃটিশরা ছিল না ছিল মীরজাফর। স্বাধীনতা

www.pathagar.com

উত্তর বাংলাদেশের শিল্প ও অর্থনীতি অব্যাহত ধ্বংসের জন্য ভারতীয়দের থাকার প্রয়োজন হয়নি। শিখণ্ডি ও আশ্রিত সরকারের মাধ্যমে এদেশের সম্পদ লুট করা হয়েছে। এদেশের সন্তানদের দিয়ে এদেশের প্রশাসন দিয়ে শিল্প কারখানাগুলো অচল ও অকেজো করে দেয়া হয়েছে। এসব কিভাবে করা হয়েছে সে সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করব।

পূর্বপাকিস্তান শতাব্দীকাল ধরে ছিল কোলকাতার পশ্চাৎভূমি কাঁচামাল সরবরাহকারী। এখানে শিল্প গড়ে তোলার উদ্যোগ নেয়া হয়নি কখনো। ফলে দেশ বিভাগের সময় পূর্ব-বাংলায় শিল্প স্থাপনা ছিল শূন্যের কোঠায়। অতি দরিদ্র জনগোষ্ঠী অধ্যুসিত পূর্ব বাংলায় ছিল অদক্ষ জনগোষ্ঠী, শিল্প উদ্যোক্তার সংকট এবং পুজির ঘাটতি। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের অবস্থা অনুরূপ ছিল না। সেখানে বৃটিশ আমলেই অনেক শিল্প স্থাপনা গড়ে উঠেছিল। ফলে সেখানে ছিল দক্ষ শ্রমিক শিল্প উদ্যোক্তা এবং উদ্ধৃত পূজি যা শিল্প নির্মাণের জন্য অতি জরুরী।

দেশ বিভাগের পর পাকিস্তান আমলে উন্নয়নের সব রকম সুযোগ সুবিধা অবারিত হলে পশ্চিম পাকিস্তানী অথবা ভারত থেকে আগত অবাঙ্গালী মুসলমানরা যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনা গড়ে তুলেছিল অনুরূপ পূর্ব পাকিস্তানে শিল্প স্থাপনা গড়ে তুলল। নারায়ণগঞ্জে পৃথিবীর বৃহত্তম পাটকল গড়ে তুলেছিল অবাঙালী মুসলমান। এই সাথে শত শত শিল্প কারখানা পূর্ব পাকিস্তানে নির্মাণ করেছিল তারা। পাকিস্তানের নীতি কৌশলের সাথে সামঞ্জস্য রেখে আভ্যন্তরীণ চাহিদা নির্ভর শিল্প স্থাপন দেশে উভয় অংশে গড়ে উঠে। এ কারণে পাকিস্তানের উভয় অংশের শিল্প স্থাপনা ছিল পারস্পরিক পরিপূরক। যেমন পূর্ব পাকিস্তানে ৭০-৮০টি বড় পাট কল স্থাপিত হলেও পশ্চিম পাকিস্তানে একটি পাটকলও নির্মাণ করা হয়নি। পূর্ব পাকিস্তানের চা শিল্প গড়ে উঠলেও পশ্চিম পাকিস্তানের চা শিল্প গড়ে তোলার চেষ্টা নেয়া হয়নি। এ কারণে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের শিল্প স্থাপনা ও অর্থনীতি ছিল পারস্পরিক পরিপূরক। অখণ্ড পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিচ্ছিন্ন হলে স্বাভাবিকভাবে উভয় অংশ সংকটে পড়ে। স্বাধীনতা-উত্তর বাংলাদেশের অর্থনেতিক পরিস্থিতির উপর আলোকপাত করতে গিয়ে ওয়াশিংটন পোস্ট লিখেছিল– 'স্বাধীন হবার ফলে বাংলাদেশ শুধু গুরুত্বপূর্ণ আভ্যন্তরীণ বাজারই হারায়নি রপ্তানি বাণিজ্য পরিচালনার উপযোগী একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থা এবং প্রধান প্রধান আমদানি পণ্যের আভ্যন্তরীণ উৎসও হাতছাড়া করেছে।'

www.pathagar.com

এর ফলে যা হবার তাই হল। এ অঞ্চলে আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সবটুকু ভারত নির্ভর হয়ে পড়ল এবং বাংলাদেশের অর্থনীতির সব সেক্টর ভারতের শোষণের নাগালের মধ্যে এসে গেল। পাট এ অঞ্চলের অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড হওয়ার কারণে পাট শিল্পকে ধ্বংস করার উদ্যোগ গ্রহণ করা হল সর্বপ্রথম। ভারত বাংলাদেশে তাদের এজেন্টদের মাধ্যমে পাট শিল্প স্থাপনা ধ্বংসে মারাত্মক কর্ম-কাণ্ড চালাতে সক্ষম হয়েছিল স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে। প্রথমে তারা পাঠ বিশেষজ্ঞদের অথবা এ সংক্রান্ত অভিজ্ঞ কর্ম-কর্তাদের প্রতিষ্ঠান ছাড়তে বাধ্য করে। যেমন জিএম করীম ছিলেন আদমজীর জেনারেল ম্যানেজার। তাকে প্রতিষ্ঠান ছাড়তে শুধু বাধ্যই করা হয়নি। ঢাকা ভার্সিটি হলে আটকে রেখে হত্যার উদ্যোগ নেয়া হয়। অথচ এই করীম সাহেবকে জীবনের নিরাপত্তা দিয়ে অতিরিক্ত সম্মানী ও মর্যাদা দিয়ে ভারত তার দেশে বিশেষজ্ঞ হিসাবে নিয়োগ দেয়। এর ফল হল কি? আদমজীর মত বিশাল স্থাপনা রক্ত ক্ষরণ হতে হতে নিঃশেষ হয়ে গেল। পাট শিল্পের উৎপাদন গতি হারাল। এই সাথে হারাল পাট শিল্পের বিশ্ব বাজার। বাংলাদেশ সর্ববৃহৎ পাট উৎপাদনকারী দেশ হয়েও পাটের বিশ্ব বাজার নিয়ন্ত্রণ ভারতের হাতের মুঠোয় এসে পড়ল। আওয়ামী লীগের সাথে গোপন সমোঝতার মাধ্যমে ভারত বাংলাদেশের পাট বিদেশে রপ্তানীর সুযোগ পেল। পাট শিল্প অচল অথবা নিষ্ক্রিয় করে দেওয়ায় পাট উৎপাদনকারী চাষীরা এদেশের উৎপাদিত পাট সীমান্তে ওপারে পৌছে দিয়ে এল। পাটের রাজা হয়ে গেল ভারত। পাট শিল্পকে ধ্বংস করার জন্য ৭১টি পাটের গুদামে আগুন লাগান হয়েছিল পরিকল্পিতভাবে। এই অপকর্মের সাথে জড়িত ছিল আওয়ামী নেতারা। শুধুমাত্র ভারতে পাট পাচার করার উদ্দেশ্যে এসব করা হয়েছিল আওয়ামী আমলের মাত্র কয়েক বছরে ভারতে পাট পাচার হয়েছিল ৫০ লক্ষ বেল। সোনালী আঁশপাট থেকে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের পথ বন্ধ হয়ে গেল। রাষ্ট্রায়াত্ব পাটকলগুলো লোকসান গুণতে গুণতে রুগ্ন শিল্পে পরিণত হল। পাটের রাষ্ট্রায়াত্ত্ব সেক্টরে দেনার পরিমাণ দাড়াল ২শত কোটি টাকা।

সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও উপযুক্ত ব্যবস্থাপনার অভাবে দেশের ৮০ শতাংশ চা বাগানের উৎপাদন বন্ধ হয়ে গেল। বেকার হয়ে পড়ল লক্ষ লক্ষ শ্রমিক। চা থেকে বৈদেশিক মুদ্রা উপার্জনের পথ রুদ্ধ হল।

তাঁত শিল্পকে ধ্বংস করা হল পরিকল্পিতভাবে ভারতের বাজার সমুন্নত রাখার জন্য। ক্ষমতাসীনদের এবং এই সেক্টরে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের অর্থের জোগান

www.pathagar.com

দিতে লক্ষ লক্ষ কারিগর বেকার হয়ে পড়ল। চার লাখ হস্তচালিত তাঁতের মধ্যে কোনমতে টিকে রইল দেড় লাখ।

চিনি শিল্প লুটেরাদের আখড়ায় পরিণত হল চিনিতে স্বনির্ভর দেশকে আমদানী করতে হল ৩২ কোটি টাকার চিনি। এইভাবে চামড়া শিল্পকে ও সংকটাপন্ন করে তোলা হল। এইভাবে সার, নিউজ প্রিন্ট, টেক্সটাইল লবণ জ্বালানী সব সেক্টর আওয়ামী দুর্নীতিবাজদের কবলে পড়ে কৃত্রিম সংকটের আবর্তে ঘুরপাক খেতে খেতে জনজীবনকে বিপন্ন করে তুলল। আট আনা কেজি লবণ খেতে হল ৬০ টাকা কেজি দরে। লবণের কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে ভারতীয় লবণে সয়লাব করে দেয়া হল।

বাংলার সম্পদ লোপাট করার জন্য চোরাচালানের দুয়ার উন্মুক্ত করেই ক্ষান্ত হলনা সোনার বাংলার সোনার সন্তানরা। পাকিস্তান ধ্বংস প্রক্রিয়ার মূল উদ্যোক্ত ভারতের দায় পরিশোধ করার জন্য আওয়ামী লীগ শিল্প বাণিজ্য এবং অর্থনীতির সব সেক্টরকে স্থবির করে দিল। এক অদৃশ্য ইংগিতে সোনার বাংলার সোনার সন্তানরা তাদের সোনালী স্বপ্ন বিকিয়ে দিল পানির দরে মেজর রফিকুল ইসলামের ভাষায়– 'স্বাধীনতার পর কি হল, এক সংঘবদ্ধ প্রচেষ্টা চলল বাংলার অর্থনীতিকে ধ্বংস করার। উৎপাদন কমে গেল, বেড়ে গেল শ্রমিক অসন্তোষ। অন্তর্ঘাতমূলক কার্যকলাপ বেড়ে গেল। বেড়ে গেল গুপ্ত হত্যা। শিল্প কারখানা ধ্বংস হল। কোন অদৃশ্য অশুভ শক্তি যেন বাংলার মানুষকে নিয়ে রক্তের হলিখেলায় নেচে উঠল। ইতিহাসের জঘন্যতম অপরাধে লিপ্ত হল অনেকে। সেই সব সৌখিন দেশপ্রেমিক সবাই মিলে ছারখার করেছিল বাংলার মানুষের স্বপ্নসাধ। চোরাকারবারের লাইন ওরা আগেই ঠিক করে রেখেছিল। পুরোদেশ ছেয়ে গেল অবৈধ ব্যবসায়। প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হল জাদরেল সরকারী কর্মচারী ব্যবসায়ী আর কিছু রাজনৈতিক কর্মী। শক্তিশালী মহলের সমর্থন না হলে এ বিরাট আকারে অবৈধ ব্যবসা সম্ভব নয়। তাহলে কি এ কথা বলা যায় না যে কোন প্রকার প্রভাবশালী মহলের প্রচেষ্টায় ধ্বংস হয়েছে এদেশের অর্থনীতি।'

দেশটা পরিণত হল পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। সর্বত্র শুরু হল হরিলুট। তৎকালিন আওয়ামী লীগের নীতিজ্ঞানসম্পন্ন নেতা এবং বুদ্ধিজীবি জনাব আব্দুল মোহাইমেন এ প্রসঙ্গে লিখেছেন– 'দুদিনেই আরম্ভ হল লুট। অধিকাংশ ক্ষেত্রে এডমিনিস্ট্রেটর পারচেজ অফিসার ম্যানেজারগণ প্রতিষ্ঠানের শ্রমিক নেতাদের যোগসাজশে প্রায় প্রত্যেকটি শিল্প প্রতিষ্ঠানে লুট করতে আরম্ভ করল। ফলে দফায় দফায় জিনিসের দাম বাড়তে লাগল। এক একটি পাটকল ও বস্ত্রকলে

www.pathagar.com

দ্বিগুণ আড়াই গুণ শ্রমিক নিয়োজিত হল। শ্রমিক ভাতার ব্যাপারেও কারচুপির অন্ত রইল না। বহুস্থানে অস্তিত্বহীন শ্রমিকের নামে লক্ষ লক্ষ টাকা মাহিনা নেওয়া হতে লাগল। পাটকলগুলিতে অপচয় হতে লাগল। সার্বিক অব্যবস্থার ফলে পাটের দর অসম্ভব কমে গেল।

বিশ্ববাজারে আমরা পাটের বাজার হারাতে লাগলাম। সেই স্থান দখল করল ভারত, বস্ত্রশিল্পের ব্যাপারে একই ব্যাপার ঘটেছে। তুলা কেনা ও সুতা বিক্রির মাধ্যমে কোটি কোটি টাকা লুট হল। জাতীয়করণকৃত বস্ত্র কলের এক একজন ম্যানেজারের মাসিক আয় ৫০ হাজারে এসে দাঁড়াল। অধিকাংশ সুতা কালো বাজারের মারফত সরকারী মূল্যের উপর বেল প্রতি দেড় থেকে ২ হাজার টাকা অধিক মূল্যে তাঁতীদের হাতে পৌঁছাতে লাগল। বাড়ল তাঁতীদের দুর্গতি। জাতীয়করণ করতে গিয়ে জাতীয় অর্থনীতিকে লন্ড ভন্ড করে দেয়া হল।' (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ পৃঃ ১৪)

শেখ মুজিবের সংগ্রামের মূলে যেমন দেশপ্রেম ছিল না অনুরূপ এদেশের মানুষের কুঁড়ির কাঙাল হওয়ার মূলে কোন আকস্মিকতা ছিল না। 'আওয়ামী লীগ জেনে বুঝে সচেতনভাবে জাতিকে স্বর্গের প্রলোভন দেখিয়ে টেনে এনেছিল অনিবার্য ধ্বংসের দিকে। লুণ্ঠনের সব ব্যবস্থা নীল নক্সা তাদের আগে থেকে তৈরী ছিল। তা না হলে স্বাধীনতা যুদ্ধের পর এর সাথে জড়িতদের দেশ প্রেম উধাও হয়ে যায়, কি করে। তারা আত্মঘাতী ধ্বংসের জন্য উন্মাতাল হয়ে যায়। পাকিস্তান আমলের সমৃদ্ধ প্রাণ চঞ্চল কারখানাগুলোতে আওয়ামী লীগ যেভাবে ধ্বংস ডেকে এনেছিল তার বর্ণনা দিয়েছেন আওয়ামী লীগ নেতা এম এ মোহাইমেন তিনি লিখেছেন– ১৯৭২ সনে অবাঙালীদের পরিত্যক্ত শিল্প কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠনাগুলিকে সরকারী নিয়ন্ত্রণে এনে কোন প্রকার ইনভেন্ট্রী তৈরি না করেই যাকে তাকে পরিচালক বানিয়ে সেগুলি চালাতে দেয়া হল। ইনভেন্ট্রী তৈরী না করে চালাতে দেয়ার দরুন কারখানা চালু করার সময় তৈরি মালের স্টক কত ছিল তা জানবার উপায় রইল না। ফলে আরম্ভ হল লুট। তখন এক একটি কারখানা ও ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে কোটি কোটি টাকার তৈরি মাল ছিল একাত্তরের স্বাধীনতা সংগ্রাম দেশব্যাপী যুদ্ধ চলার দরুন উৎপন্ন দ্রব্যাদি বিক্রি সম্ভব না হওয়ার দরুন বহু কারখানাতে প্রচুর উৎপাদিত মাল জমা হয়েছিল। ৭২ সালের প্রথম থেকেই এসব মাল লুট হতে আরম্ভ হল। লুট প্রথমে আরম্ভ করল ১৬ ডিভিশনের নামে ভুয়া মুক্তিযোদ্ধারা। তারপর আরম্ভ করল পরিচালনায় যারা নিয়োজিত হয়েছিল তারা এবং তাদের সাঙ্গ পাঙ্গরা। এত সম্পদ বাঙালী যুবকরা

www.pathagar.com

কখনো এক সাথে দেখেনি। ফলে কিছু দিনের মধ্যেই লুটের একটি সর্বগ্রাসী বন্যায় তলিয়ে গেল দেশ। সে বন্যায় কোথায় ভেসে গেল বাঙালী যুবকদের দেশপ্রেম, মুল্যবোধ, স্বাধীনতা এবং চেতনা। তারপর আরম্ভ হল লুণ্ঠিত অর্থ নিয়ে কাড়াকাড়ি। (বাংলাদেশের রাজনীতিতে আওয়ামী লীগ/পৃঃ ৩২)

শ্রমিক শ্রেণীকে প্রভাবিত করার জন্য মুজিববাদের অবতারণা

শেখ মুজিব ও আওয়ামী লীগের উত্থানের মূলে রয়েছে শ্রমিক শ্রেণীর সক্রিয় ভূমিকা। কিন্তু যেভাবে শেখ মুজিব সমগ্র জাতিকে প্রতারিত করেছিলেন অনুরূপ একই পন্থায় প্রতারিত করেছেন শ্রমিক শ্রেণীকে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অন্যতম রাষ্ট্রীয় মূলনীতি হিসাবে তিনি সমাজতন্ত্রকে সামনে আনলেও তার নিজের এবং তার দল আওয়ামী লীগের চরিত্র ছিল পূঁজিবাদী। মূলনীতি হিসাবে সমাজতন্ত্রকে বেছে নেয়ার মূল উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত করা যেমন করে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের শ্রমিক শ্রেণীকে প্রতারিত করেছিলেন ঠিক অনুরূপ পন্থায় অগ্রসর হলেন শেখ মুজিব। ক্ষমতাসীন হয়েই শেখ মুজিব সমাজতন্ত্রকে রাষ্ট্রের অন্যতম স্তম্ভ হিসাবে ঘোষণা করলেন। সত্যিকার সমাজন্ত্রীরা প্রতারক মুজিবকে বিশ্বাস করেনি। কিন্তু ঘোলা পানিতে মাছ শিকারের প্রত্যাশায় কমিউনিষ্ট পার্টি বলল মুজিব সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারবে। কিন্তু আওয়ামী লীগ সমাজতন্ত্রের পাশাপাশি মুজিববাদ প্রতিষ্ঠার শ্লোগান তুলল। কিন্তু সমাজতন্ত্র কি এ জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠলে বিশেষজ্ঞ হিসাবে তোফায়েল এগিয়ে এলেন বললেন– 'আব্রাহাম লিঙ্কন গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা দিয়েছেন কিন্তু সমাজতন্ত্র দিতে পারেননি কিন্তু মুজিববাদে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র পাশাপাশি অবস্থান করছে। সুতরাং মুজিববাদই বিশ্বের তৃতীয় মতবাদ। সমগ্র জাতিকে তারা মনে করল অন্ধ অর্বাচীন বলে। হিন্দুস্থান প্ররোচিত তথাকথিত জাতীয়তাবাদের অন্ধ আবেগে উন্মাতাল জাতির এটা ছিল প্রাপ্য। ৭২ সালের ৬ জুন শেখ মুজিব সমাজন্ত্রের নতুন সংস্করণ দাঁড় করিয়ে বক্তব্য রাখলেন সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। বললেন– সমাজতন্ত্র কায়েম করা হবে স্থানীয় অবস্থা ভিত্তিক। এটা ছিল সুবিধাবাদী চরিত্রের উদ্ভট বিশ্লেষণ। এর মধ্যে নিহিত ছিল শুভঙ্করের ফাকি। ফল হল বাংলাদেশে সমাজতন্ত্রের যাত্রা শুরু হল খেয়াল খুশী মেজাজ মর্জির আকা-বাঁকা পিচ্ছিল পথ ধরে। ১৯৭২ সালে ১ ফেব্রুয়ারী মুজিববাদকে গ্রহণযোগ্য করে

www.pathagar.com

তোলার জন্য আওয়ামী লীগের শ্রমমন্ত্রী বললেন– শ্রম শিল্প প্রতিষ্ঠানের ৩০ শতাংশ শ্রমিকদের ৩০ শতাংশ মালিকদের ৪০ শতাংশ থাকবে সরকারের। এটা ছিল তাৎক্ষণিকভাবে মুজিববাদকে জনপ্রিয় করে তোলার মুখরোচক ঘোষণা। সাড়ে তিন বছর একক ও নির্বিরোধ ক্ষমতাসীন থাকা অবস্থায় কোন দিনও ঘোষিত দৃষ্টিভঙ্গী কার্যকর করার কোন পদক্ষেপ নেয়নি। ১৯৭২ সাল থেকে ৭৫ পর্যন্ত দুর্নীতির প্লাবন এনে সমৃদ্ধ শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলোকে দেওলিয়া ও ফোকলা করে দেয়া হল। শ্রমিক শ্রেণীর ন্যূনতম অবলম্বন যখন ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে এসে উপনীত হল তখন বাঁচার তাগিদে গণতান্ত্রিক অধিকার ধর্মঘট এবং প্রতিবাদে সোচ্চার হল। আওয়ামী সরকার এর প্রতিক্রিয়ায় ৭২ সালের ২৮ মে ধর্মঘট নিষিদ্ধ ঘোষণা করল। বাওয়ানীর শ্রমিকরা আন্দোলন মূখর হয়ে উঠলে সরকার কঠোর হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করল। রাষ্ট্রপতির নোটে বলা হয় এ ধরনের তৎপরতা কঠোর হস্তে দমন করা হবে। আওয়ামী লীগের এধরনের গণ বিরোধী পদক্ষেপের জবাবে আওয়ামী লীগেরই অঙ্গ সংগঠন শ্রমিক লীগের সাধারণ সম্পাদক বললেন মিলটির পরিচালনা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনৈক এমসিএ মিল ম্যানেজার এবং প্রশাসনিক কর্মকর্তারা চোরা পথে গোপনে লাখ লাখ টাকার সুতা যন্ত্রপাতি ও কাপড় আত্মসাত করে মিল শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষের সৃষ্টি হয়েছে। এই অভিযোগের ব্যাপারে কখনো কোন তদন্ত অনুষ্ঠিত হয়নি। তৎকালীন পত্র পত্রিকার পাতায় পাতায় দুর্নীতির অসংখ্য ঠাসা খবর এখনো বিদ্যমান রয়েছে।

এমন কি কোন এক অদৃশ্য সুতার টানে কোন অন্তর্ঘাত নাশকতামূলক কর্মকাণ্ডের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ নেবার সাহস করেনি আওয়ামী লীগ যেমন ৭১টি পাটের গুদামে অগ্নি কাণ্ডের কোন প্রতিকার হয়নি। যেমন অন্তর্ঘাতমূলক কর্মকাণ্ডে সারখারখানার কন্ট্রোল রুম বিধ্বস্ত হয়ে ৫০ কোটি টাকা ক্ষতি হলে তদন্ত কমিটি একে নাশকতা বলে উল্লেখ করেন। এই নাশকতার বিরুদ্ধে কোন পদক্ষেপ নেওয়ার ব্যাপারে আওয়ামী সরকারের কোন আগ্রহ দেখা যায়নি। ১৯৭২ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর শ্রমনীতি ঘোষণা করা হল। বলা হল শিল্পগুলো শ্রমিক সমবায়ের কাছে বিক্রি করা হবে। ১৯৭৪ সালে এক নির্ভরযাগ্য তথ্যে প্রকাশ হল মিলগুলোতে ২৫ হাজার শ্রমিক অতিরিক্ত রয়েছে। এই অতিরিক্ত শ্রমিক ছিল অদক্ষ দলীয় কর্মী যারা ঠ্যাঙারে বাহিনী হিসাবে কাজ করেছে। শ্রমিক আন্দোলন নস্যাৎ করার জন্য এরা সন্ত্রাস করেছে। ৭২ সালের আগস্টে আদমজীতে সংঘর্ষ বাড়ারকুন্ডে শতাধিক শ্রমিক খুন, ৭৩ এর এপ্রিল টঙ্গীতে এ সবের এরাই উদগাতা।

www.pathagar.com

স্বজন প্রীতির প্লাবন

১৯৫৬-৫৭ সালে শেখ মুজিব শিল্পমন্ত্রীর দায়িত্ব পেয়ে ক্ষমতার প্রভাব ঘাটিয়ে তিনি তার প্রিয়জন ও পার্টির লোকদের অবৈধ পন্থায় অনেক পারমিট ব্যাংক লোন ইনডেন্টিং লাইসেন্স এবং শিল্পকারখানা গড়ে তোলার অনুমোদন দেন। তখনই শেখ মুজিব ও ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দের পৃষ্ঠপোষকতার কারণে ব্লাকমার্কেটিং মওজুতদারী এবং আইন বহির্ভূত পন্থায় অর্থোপার্জনের নেশা আওযামী নেতা কর্মীদের পেয়ে বসেছিল। এদের কারণে সে সময়ও দুর্ভিক্ষ কড়া নেড়েছিল। অনিয়ম ও অর্থনৈতিক বিশৃংখলা নিয়ন্ত্রণের জন্য সেনাবাহিনীকে মাঠে নামতে হয়েছিল।

তখনকার পূর্বপাকিস্তানে আওয়ামী মূখ্য মন্ত্রী প্রশাসনকে দল নিরপেক্ষ রাখতে চেয়েও মুজিবের কারণে ব্যর্থ হন। মুজিবের প্রশ্রয়ে আওয়ামী লীগের মধ্যে থাকা অপশক্তি দলের সম্মুখ সারিতে এসে পড়ে। নিঃস্বার্থ ও সত্যিকার দেশপ্রেমিকরা ক্রমশ পিছু হটতে থাকে তখন থেকে শুরু হয় আওয়ামী লীগের অস্ত্রের পথ ধরে এগিয়ে চলা এবং অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা হিসাবে শেখ মুজিবের উত্থান হতে থাকে। অবশেষে বাহাত্তরে এককভাবে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে মুজিবও তার দলের সকলের পুরানো অভ্যাসের অনুশীলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়। মুজিব নিয়ম নীতির তোয়াক্কা না করে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে দলীয় কর্মীদের হাতে তুলে দেয় দলীয় কর্মীদের ঢালাও চাকুরিতে নিয়োগ জাতীয়করণকৃত শিল্প প্রতিষ্ঠানের দায়িত্ব অর্পণ করে জাতীয় অর্থনীতিকে ধূলিসাত করে দেয়া হয়। আওয়ামী নেতা-কর্মীদের প্রায় সকলে মধ্য স্বত্ব ভোগীতে পরিণত হয়। পরিণতিতে দেশটা বিশৃংখল শূন্য ভান্ডে পরিণত হয়। পাকিস্তানী নাগরিকদের ৬০ হাজার বাড়ি ও অন্যান্য পরিত্যক্ত সম্পদ আওয়ামী লীগ নেতাকর্মীদের মধ্যে বিতরণ করা হয়। লাইসেন্স পারমিট বিলি বন্টন করা হয় এমন অসংখ্য দলীয় কর্মীদের মধ্যে যাদের ব্যবসার সাথে কোন ধরণের সম্পর্কই ছিল না। ৭৩ সালে ১১ই মে বাণ্যিজমন্ত্রী কামরুজ্জামান জানান ২৫ হাজার আমদানীকারকদের মধ্যে ১৫ হাজার ভুয়া।

অনুগত স্বজনদের প্রতিষ্ঠিত করার ব্যাপারে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের মধ্যে তীব্র প্রতিযোগিতা শুরু হলে শেখ মুজিব অতীষ্ট হয়ে নির্দেশ জারি করলেন চাকুরিতে নিয়োগ বদলি ও পদোন্নতির জন্য কেউ সুপারিশ করবেন না। এ নির্দেশ কোন কার্যকারী ভূমিকা না রেখে স্বজন প্রীতির দুয়ারে ধাক্কা খেয়ে ফিরে এলো। যেমন

www.pathagar.com

১১ মার্চ সিগারেটের পারমিট সংক্রান্ত খবরে বলা হল বাংলাদেশের টোবাকো কোম্পানীর ২৫ জন ডিষ্ট্রিবিউটার নিয়োগের জন্য কর্তৃপক্ষ ৩ হাজার সুপারিশ পত্র পেয়েছিলেন।

আওয়ামী লীগের ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম বৈরিতা

স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত থেকে শুরু হল আওয়ামী লীগের ইসলাম বিদ্বেষ ও মুসলিম বৈরিতা জাতীয় জীবনের সামগ্রিক অবস্থান থেকে ইসলামকে নির্বাসিত করার সুপরিকল্পিত পদক্ষেপ গ্রহণ করা হল, ঢাকা বিশ্ব বিদ্যালয়ের মনোগ্রাম থেকে কুরআনের আয়াত তুলে দেয়া হল। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল থেকে মুসলিম শব্দটি তুলে দেয়া হল। কাজী নজরুল ইসলাম কলেজ থেকে ইসলাম শব্দটি উৎখাত করা হল। জাহাঙ্গীর নগর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলর অধ্যাপক আলী আহসান মুঘলদের সাম্রাজ্যবাদী আখ্যায়িত করে বললেন যে তারা শত শত বছর ধরে বাংলাকে লুট করেছিল। তার মতে পাকিস্তানীরাও এই কাজ করেছে। ভাইস চ্যান্সেলার হওয়ার পর তিনি অনুরোধ করলেন বিশ্ব বিদ্যালয়ের ইসলাম শব্দটি কেটে দিতে। অনুরোধ কার্যকরী করা হল।

ঢাকা উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের মনোগ্রামে লেখা ছিল ইকরা বিসমে রাববেকাললাজি, সেটাকে বাদ দেয়া হল। ঢাকার ইসলামিয়া কলেজের নামকরণ করা হয় বঙ্গাবাসী কলেজ। কিন্তু রাজশাহীর ভোলানাথ হিন্দু একেডেমী হিন্দু একেডেমী রয়ে গেল। হিন্দু দেবী রাধার প্রতীক শাপলা ফুলকে জাতীয় ফুলে পরিণত করা হয়। বঙ্গ ভঙ্গ রদের প্রেক্ষিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের আমার সোনার বাংলা গানটিকে 'জাতীয় সংগীতে পরিণত' করা হল।

যে দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর বাংলাদেশের অস্তিত্ব নির্ভরশীল অথচ এই দ্বিজাতি তত্ত্বের মৃত্যু ঘোষণা করল আওয়ামী লীগ। দ্বি-জাতি তত্ত্বের মৃত্যুর অর্থ কি দাঁড়াল? অখণ্ড ভারতের মধ্যে লীন হয়ে যাওয়া। এই সহজ কথাটা কি আওয়ামী লীগের বিজ্ঞ রাজনীতিকরা বোঝেন না? বোঝেন ঠিকই। কিন্তু কোন এক অদৃশ্য সুতোর টানে বিবেক-বুদ্ধি দীল দেমাগ বিশৃংখল হয়ে পড়ে। আওয়ামী লীগের তর্জন গর্জনের আড়ালে লুকিয়ে রয়েছে এক ধরণের অসহায়ত্ব চিন্তাশীলরা এটা অনুভব করেন।

www.pathagar.com

রাজাকার আলবদরের নামে ইসলাম প্রিয় মানুষদের উপর সীমাহীন নিপীড়ন শুরু হল। বাংলার মানুষ দেখল নিপীড়িত হতে। তাদের, যারা সমাজের সম্মানিত ব্যক্তি এবং যারা ইসলামের প্রতিনিধিত্বকারী। স্বাধীনতার প্রাথমিক পর্যায়ে অধিকাংশ মসজিদ জনমানবহীন হয়ে পড়ল। মুসুল্লিরা মসজিদে যাওয়া বন্ধ করল। মসজিদে আযান দেয়া বন্ধ হয়ে গেল। এমনকি সালাম বিনিময়ের সাহসটুকুও মানুষের মধ্যে আর রইল না। অনেক মাদ্রাসা বন্ধ হয়ে গেল। সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠীর ইমান আকীদা ও তাহজিব তমুদ্দুনকে পরিকল্পিক ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার প্রচেষ্টা চলল সরকারী বেসরকারী পর্যায়ে। বাংলাভাষা ও সাহিত্য থেকে ইসলামী শব্দ প্রতিশব্দ ও পরিভাষাকে উপড়ে ফেলার চেষ্টা চলল। ইতিহাসকে বিকৃতভাবে উপস্থাপন শুরু হল। রাষ্ট্রীয় মূলনীতিকে ধর্ম নিরপেক্ষতা আনা হল। আর ধর্ম নিরপেক্ষতার মূল টার্গেট হয়ে দাঁড়াল ইসলাম। সর্বস্তরে সর্ব পর্যায়ে ইসলাম বিরোধীতা চলল সমানে।

কমিউনিস্টরা ইসলাম বিরোধী পদক্ষেপসমূহ কার্যকরী করার ব্যাপারে সহযোগী শক্তি হিসাবে সক্রিয় ছিল। লঘুচেতা মেধা বিবর্জিত আওয়ামী নেতৃত্বের পেছনে বুদ্ধিবৃত্তিক সহযোগিতা দিতে শুরু করল কমিউনিষ্টরা। তাদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতায় প্রতিভাবান ও সম্ভাববনাময় তরুণদের কমিউনিস্ট রাষ্ট্রসমূহ সফর এবং শিক্ষা গ্রহণের সুযোগ করে দেয়া হয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল আগামী প্রজন্মকে পথ ভ্রষ্ট করে তোলা। মুজিব ও আওয়ামী লীগের এ ধরনের কর্ম-কাণ্ড তাদের চূড়ান্ত বিপর্যয় ত্বরান্বিত করছে বলে অনেকের ধারণা। এন্থনি ম্যাসকারেণ হাসের ভাষায়– 'মুজিবের পতনের প্রধান কারণ ১৯৭২ সালে রচিত বাংলাদেশের শাসনতন্ত্রে ইসলামকে রাষ্ট্রীয় ধর্মের মর্যাদা থেকে সরিয়ে দেয়া। ইসলামের মর্যাদার এই অবমাননা অনিশ্চয়তা সূচক প্রমাণিত হয়েছে।

এক হাজার মসজিদের শহর বলে ঢাকা বরাবরই গর্ব করেছে এবং বাঙালীরা ঐতিহ্যগতভাবেই পশ্চিম পাকিস্তানীদের চেয়ে বেশী ধর্মানুরাগী। অপরদিকে বাঙালী মুসলমানরা উপমহাদেশে আলাদা মুসলিম রাষ্ট্রের পরিকল্পনা অবিচলিতভাবে সমর্থন করেছিল বলেই ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের সৃষ্টি হয়েছিল। এই পটভূমিতে মুজিবের অনুসৃত ধর্মনিরপেক্ষতার নীতি বাংলাদেশের জনগণের বৃহত্তর অংশকে আহত করেছিল।'

www.pathagar.com

বাক স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ
সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ

গণতন্ত্র ও বাকস্বাধীনতার পক্ষে আওয়ামী লীগ সোচ্চার ছিল শুরু থেকেই। ষাটের দশকে আইয়ুব খানের প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যান্স এর বিরুদ্ধে ছিল আওয়ামী লীগ। মত প্রকাশের স্বাধীনতা নিয়ন্ত্রণ মুক্ত ও অবাধ করার ব্যাপারে ছিল আওয়ামী লীগের নির্বাচনী ওয়াদা। কিন্তু আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হয়ে তার নৌকা চালিয়ে ছিল উল্টো দিকে। ক্ষমতাসীন হয়ে আওয়ামী লীগ নতুন করে যে প্রেস এন্ড পাবলিকেশন অর্ডিন্যন্স জারি করেছিল সেটা আইয়ুবের অর্ডিন্যন্সের চাইতে জঘন্যতম ছিল। এর মূলে ছিল আওয়ামী লীগের মানসিক ভীতি। এই মানসিক ভীতিটা ছিল তাদের ব্যর্থতা। রাজনীতির অন্ধগলি চোরাপথ এবং ষড়যন্ত্রের সড়ক ধরে অকল্পনীয় মিথ্যাচার এবং অতি আশাবাদের ফিরিস্তি দিয়ে আওয়ামী লীগের উত্থান। অতঃপর সামান্য সময়ের ব্যাবধানে অকল্পনীয় ব্যর্থতার মধ্য দিয়ে জনগণের মোহভঙ্গ হয় এবং বারুদে পরিণত হয় সমগ্র দেশ। আওয়ামী লীগ আঁচ করেছিল এ বারুদে বিস্ফোরণ ঘটাতে পারে একটি স্ফুলিঙ্গ। আর অসংখ্য স্ফুলিঙ্গ সৃষ্টি করে থাকে সংবাদপত্র ও বাক স্বাধীনতা। এ কারণেই আওয়ামী লীগ কালাকানুনের বৃত্ত রচনা করে সংবাদ পত্রের কণ্ঠরোধ করতে চেয়েছে।

আওয়ামী লীগ সব সময় সংবাদপত্রের স্বাধীনতার কথা বলতেন কিন্তু বাস্তবে তাদের আচরণ ছিল স্ববিরোধী একদিকে যখন আওয়ামী নেতৃবৃন্দ সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারে সোচ্চার কণ্ঠ সেই সময় ২২ মে সাতক্ষীরায় একজন সাংবাদিকের গ্রেপ্তারের কথা জানা গেল। তার অপরাধ, তিনি একজন আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যের সাথে বচসা করেছিলেন। ৭২ সালে ২১ জুন 'হক কথার' সম্পাদককে গ্রেপ্তার করা হয়। ৭ই সেপ্টেম্বর চট্টগ্রামে দেশ বাংলা অফিস জ্বালিয়ে দেয়া হয়। সাংবাদিক ইউনিয়ন এর জোর প্রতিবাদ জানায়। অক্টোবর (৭২) এক সরকারী নির্দেশে বলা হয় সরকারী আধাসরকারী স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠান বেতার টিভি রাষ্ট্রায়ত্ব প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের মতামত প্রকাশের পূর্বে সরকারী অনুমোদন নিতে হবে। পূর্বানুমতি ছাড়া তারা তাদের লেখা কোথাও ছাপাতে পারবে না।

৭২ সালের ২২ ডিসেম্বর তথ্যমন্ত্রী মিজানুর রহমান চৌধুরী সংবাদপত্র সেবীদের আশ্বস্ত করে বলেন– 'সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্রের স্বাধীনতাতেও সরকার

www.pathagar.com

বিন্দুমাত্র হস্তক্ষেপ করবে না। সরকার এসব সংবাদপত্রের আর্থিক দিকই দেখবে শুধু।' অথচ এ কথা বলার ৯ দিনের মাথায় ঘটল এর বিপরীত ঘটনা।

৭৩ সালের ১ জানুয়ারী প্রেসক্লাবের সড়কে আওয়ামী লীগ সরকার দু'জন ছাত্রকে গুলি করে হত্যা করার প্রেক্ষিতে দৈনিক বাংলা একটি টেলিগ্রাম বের করে। এই অপরাধে দৈনিক বাংলার সম্পাদকমন্ডলীর সভাপতি হাসান হাফিজুর রহমান এবং সম্পাদক তোয়াব খান চাকরিচ্যুত হন। ৪ জানুয়ারী দৈনিক বাংলার শ্রমিক কর্মচারীরা শেখ মুজিবের কাছে চাকুরিচ্যুত দু'জন সাংবাদিককে চাকুরিতে পুনর্বহালের দাবি জানালে শেখ মুজিব পত্রিকাটি হাতে নিয়ে বলেন– 'আমার কাগজে এসব কি লিখেছ? তোমাদের নীতি থাকে প্রেসক্লাবে ফলিও, নিজের ড্রইংরুমে ফলিও, আমার কাগজে এসব চলবে না।' সবাই জানল সরকার নিয়ন্ত্রিত সংবাদপত্র শেখ মুজিবের ব্যক্তিগত সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছে। শেষ অবধি চাকুরিচ্যুত দুই সাংবাদিককে চাকুরিতে বহাল করা হয়নি।

১৩ মে দৈনিক স্বদেশ বন্ধ করে দেয়া হয়। দৈনিক পয়গামের শ্রমিক কর্মচারীরা ঐ এক প্রতিষ্ঠান থেকে দৈনিক স্বদেশ প্রকাশ করতেন।

১৮ জুন প্রেস এন্ড পাবলিকেশন্স অর্ডিন্যান্স বলে সরকার নবযুগ সম্পাদককে গ্রেপ্তার করেন। এর আগে হক কথা, মুখপত্র, স্কোপসম্যান, লালপতাকা, গণশক্তি প্রভৃতি পত্রিকা বন্ধ করে দেয়া হয়।

১২ আগস্ট চট্টগ্রামের দেশবাংলা পত্রিকাটিকে সরকারী নির্দেশে জোর করে বন্ধ করে দেয়া হয় এবং এর সম্পাদককে রাষ্ট্রপতির ৫০ নম্বর আদেশ বলে গ্রেপ্তার করা হয়। ১৪ আগষ্ট আওয়ামী লীগের তথ্যমন্ত্রী বুক উচিয়ে বলেন– 'সংবাদপত্রের স্বাধীনতা আওয়ামী সরকারের ঈমানের অঙ্গ।' কি দুঃসহ নির্লজ্জতা। ২৩ নভেম্বর সাপ্তাহিক ওয়েভ পত্রিকাকে আদালতের ইনজাংশন উপেক্ষা করে উচ্ছেদ করা হয়।

২৭ আগস্ট ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়নের সভাপতি ইউনিয়নের পক্ষ থেকে বলেন সত্য প্রকাশে বাধার সৃষ্টি করা হচ্ছে। চোরাচালানীদের জন্য রাষ্ট্রপতির ৫০ নং ধারা বলে সাংবাদিকদের গ্রেপ্তার করা চলবে না। এর জবাবে ২৮ আগস্ট আওয়ামী লীগ সরকার প্রিন্টিং প্রেসেস প্রন্ড পাবলিকেশন্স (রেজিস্ট্রেশন এন্ড ডেক্লারেশন) ৭৩ নামে নতুন আর একটি গণবিরোধী কালাকানুন জারি করেন। ১৯ সেপ্টেম্বর অর্ডিন্যান্সটি সংসদে পাস করিয়ে নেয়া হয়। একই সংসদ অধিবেশনে স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল বলেন– 'কাউকে নৈতিকতা ও

www.pathagar.com

সৌজন্যতার পরিপন্থী আলোচনা বা সংবাদ পরিবেশন করতে দেয়া হবে না।' হলিডে সম্পাদক এনায়েতুল্লা খানকে নিয়েও মালেক উকিল খিস্তি খেওর করেন। ২৩ সেপ্টেম্বর আওয়ামী লীগের এসব অশালীন উক্তির প্রতিবাদ করে ডিইউজে।

প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে আওয়ামী নেতৃবৃন্দের সকলেই সমস্বরে বলতে থাকেন ভারতের বিরুদ্ধে কাউকে কথা বলতে দেয়া হবে না। ভারতবিরোধী লেখা প্রকাশের জন্য বিভিন্ন পত্রিকার উপর নিপীড়ন শুরু হয়। সুস্পষ্ট বক্তব্য প্রকাশের জন্য গনকণ্ঠের উপর বার বার হামলা হতে থাকে।

১৬ জানুযায়ী (৭৪) ঢাকা সাংবাদিক ইউনিয়নের এক বিবৃতিতে বলা হয়– বিভিন্ন মহলের নিকট হতে সাংবাদিকদের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, ঘোষিত ও অঘোষিত নানা রকম হুমকির সম্মুখীন হতে হচ্ছে। দেশে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা নেই বলেই এই পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছে।

১৯৭৩ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে সংসদে বিশেষ ক্ষমতা আইন পাস করে আওয়ামী লীগ বিরোধীদল ও ভিন্ন মতপোষণকারী সাংবাদিক ও বুদ্ধিজীবী দলনের ব্যবস্থা চূড়ান্ত করে। ১০ ফেব্রুয়ারী ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন এক বিবৃতি 'প্রকাশ করে বলে বিশেষ ক্ষমতা আইন পাশ করে আওয়ামী লীগ সাংবাদিক ও সংবাদপত্রের স্বাধীনতার উপর নয়া বিধি নিষেধ আরোপের ব্যবস্থা করেছেন।'

এই আইনে সংবাদ প্রকাশে বাধা আরোপসহ যে কোন সংবাদ প্রকাশের জন্য এমনকি এই আইন রচনার পূর্বে প্রকাশিত কোন সংবাদের জন্যও ছাপাখানা মুদ্রাকর প্রকাশক রিপোর্টোর এবং সম্পাদকের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যাবে। এই আইনের শর্তানুযায়ী সরকার দৃশ্য অদৃশ্য সত্য বা মিথ্যা যে কোন সংবাদ আইন শৃংখলাবিরোধী মনে করলে ব্যবস্থা নিতে পারবেন।

৭৪ সালের ১৭ মার্চ জাসদের জনসভাকে কেন্দ্র করে দৈনিক গণকণ্ঠ বন্ধ করে দেয়া হয়। গণকণ্ঠ সম্পাদক আল-মাহমুদসহ বহু সাংবাদিক কর্মচারীদের গ্রেপ্তার করা হয়। ২৯ জুন ঢাকার রাস্তায় সাংবাদিকদের ঠেঙান হয়। ১ জুলাই মওলানা ভাসানীর জনসভাকে কেন্দ্র করে গণকণ্ঠ অফিসে আর এক দফা হামলা চালান হয়। পুলিশ অফিসে এসে গণকণ্ঠের ফর্মা ভেঙে দেয়। মওলানা ভাসানীর প্রাচ্যবার্তা ও চট্টগ্রামের ইস্টার্ন একজামিনার বন্ধ করে দেয়া হয়।

১৯৭৩ সালের আগস্ট মাসে বাংলাদেশ ফেডারেল সাংবাদিক ইউনিয়ন বিশেষ ক্ষমতা আইন বাতিলের জন্য আন্দোলন শুরু করে। ২৮ আগস্ট অর্ডিন্যান্সটি

www.pathagar.com

বাতিল ঘোষিত হয়। কিন্তু এরই মধ্যে একটি সংবাদকে কেন্দ্র করে চট্টগ্রামের দৈনিক দেশবাংলাকে বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ছাড়াও নিউজপ্রিন্ট ও বিজ্ঞাপন নিয়ন্ত্রণ করে সংবাদপত্র দলন অব্যাহত রাখা হয়।

২৮ জুলাই নিউজপ্রিন্ট নিয়ন্ত্রণ আদেশ জারি করে। এর ফলে স্বাভাবিকভাবে সরকারের আশির্বাদবিহীন সংবাদপত্রগুলো মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুঁকতে থাকে। জনৈক বিদেশী সাংবাদিক একটি প্রখ্যাত ম্যাগাজিনে রক্ষীবাহিনী সম্পর্কে সমালোচনা করার পর স্পষ্ট হয়ে উঠল যে রক্ষী বাহিনী বাংলাদেশে সরকারের কাছে প্রিয় আলোচ্য বিষয় নয়। নিরব হুকুম জারি হল, উক্ত সাংবাদিককে পুনরায় বাংলাদেশে ঢুকতে দেয়া হবে না।

তৎকালীন সংবাদপত্র ও বাকস্বাধীনতার নাজুক পরিস্থিতি বর্ণনা করে পত্রিকাটিতে বলা হয়– 'ঢাকায় অবস্থানরত একজন ভারতীয় সাংবাদিক যেমন বলছেন ঢাকার বিখ্যাত প্রেসক্লাবে যারা সবরকম বিষয়ে কথা বলতেন এখন তারা শুধু আবহাওয়া কানাডা এসব বিষয়ে কথা বলেন। আভ্যন্তরীন মতবিরোধ দমন করা ছাড়াও সরকার কঠোর ভাবে সাংবাদিকতা নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা করেছেন। যা বিদেশে বাংলাদেশের ভাবমূর্তির পক্ষে মোটেও শুভ নয়। হংকং নিউজ ম্যাগাজিনে মুজিবের বিরুদ্ধে লেখার জন্য জনৈক সাংবাদিককে বাংলাদেশের নিউজ এজেন্সী থেকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

যারা বিদেশী সংবাদপত্রের খবরাদি প্রকাশ করবে তাদের অনুরূপ প্রতিশোধের সম্মুখীন হতে হবে। যেমন হয়েছেন বাংলাদেশে সিভিল লিবার্টির একজন প্রধান আইনজীবী। তিনি সোনার বাংলা সম্পর্কে যে মন্তব্য করেছিলেন তা মুখরোচক ছিল না। হদিস পাওয়ার পর তাকে কারারুদ্ধ করা হয়েছে।

সংবাদ সম্পর্কীয় বাধানিষেধের ফলে বাঙালীরা আহতবোধ করছেন। এ ধরনের ব্যবস্থা অবলম্বনের সার্থকতা থাকত যদি বাংলাদেশের ভয়াবহ সমস্যার উপশম হত।'

অবশেষে ৭৫ এর ৩ জানুয়ারী জারি করা হল বিশেষ ক্ষমতা বিধি। ২৪ জানুয়ারী (৭৫) ঘোষণা করা হল একদলীয় শাসন। একই বছরের ১৬ জুন জারি করা হল সংবাদপত্র ডিক্লারেশন বাতিল অধ্যাদেশ। এই একটি অস্ত্র প্রয়োগ করে গণতন্ত্রের অপরিহার্য উপাদান সংবাদপত্রের স্বাধীনতা শুধু অপহরণই করা হলো না, ৪টি সংবাদপত্র ছাড়া বাকি সব পত্রিকার ডিক্লারেশন বাতিল ঘোষণা করা হল। প্রায় ৪ শতাধিক পত্র পত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষণা করে আওয়ামী লীগ প্রমাণ

www.pathagar.com

করল যে সে আসলে গণবিরোধী। স্বাধীনতার নামে গণতন্ত্রের নামে গণস্বার্থের দোহাই পেরে সত্যিকার স্বাধীনতাপিয়াসী জনগণের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে আদিম স্বৈরাচার।

মন্বন্তরের ছোবল

১৭৫৭ সালে সিরাজের পতনের পর শোষণ লূণ্ঠনের মধ্যদিয়ে সমগ্র বাংলা দুর্ভিক্ষাবস্তায় পৌঁছতে সময় লেগেছিল ১৩ বছর। যা বাঙলার ইতিহাসে ছিয়াত্তরের মন্বন্তর হিসাবে পরিচিত এই মন্বন্তরে প্রাণ হারিয়েছিল সমগ্র জনসংখ্যার এক তৃতীয়াংশ। কিন্তু পূর্ব বাংলার সর্বশেষ মন্বন্তর সংঘটিত হয়েছিল আওয়ামী শাসনের ৩ বছরের মাথায়। এ থেকে আন্দাজ করা যায় কি ধরনের শোষন লুট ও দুঃশাসন চলেছিল শেখ মুজিবের শাসনামলে। ১৯৫৭ সালে আওয়ামী শাসনামলেও দুর্ভিক্ষাবস্থার সূচনা হয়েছিল। কিন্তু পশ্চিম পাকিস্তানের উদ্বৃত্ত খাদ্যশস্য দিয়ে সেটার মুকাবিলা করা সম্ভব হয়। সেই সময়ও চোরাকারবারি মওজুতদার ও মুনাফা খোররা জাতীয় স্বার্থবিরোধী তৎপরতায় লিপ্ত হয়েছিল। আওয়ামী আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে। সেই কট্টর অভিজ্ঞতা সত্বেও আওয়ামী প্রতারণার ফাঁদে পা দিয়ে যে ভুল করেছিল বাংলার জনগণ তারই প্রায়শ্চিত্য করতে হয়েছে জাতিকে চুয়াত্তরের মন্বন্তরে।

পূর্বপাকিস্তানের পতনের পর একাত্তরোত্তর বাংলাদেশে বীভৎস লুণ্ঠন ও নারকীয় সন্ত্রাস চলেছিল এদেশের মানুষ দ্বারা জনগণের মধ্যে এক নবতর সম্ভাবনাময় স্বাধীনতার আবেশ সৃষ্টি করে। সেই আবেশ নিমিত্ত হয়ে সামগ্রিকভাবে বিবর্যস্ত হয়ে পড়ে সমগ্র জাতি।

বাহাত্তরের প্রতিটি জনপদে পরিলক্ষিত হয়েছে দ্বিমুখী চিত্র একদিকে ছিল ভারতের প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষ ছোবল অন্যদিকে চলছিল ভাগ্য বিড়ম্বিত সংখ্যাগুরু জনগণের বেঁচে থাকার লড়াই। মুদ্রা স্ফীতির চাপ বল্গাহীন শোষণ ও লুণ্ঠনের সাথে পালা দিয়ে পিছিয়ে পড়ছিল খেটে খাওয়া মেহনতি মানুষগুলো। ৭৪ এর আকালে লক্ষ লক্ষ কঙ্কালসার মানুষ ক্ষুৎপিপাসার যন্ত্রণা নিয়ে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে মহাকালের গর্ভে হারিয়ে গেল। পঞ্চাশের মন্বন্তর ম্লান হয়ে গেছে চুয়াত্তরের কাছে। চুয়াত্তরের আগস্টে বন্যা শুরু হল। এই সাথে শুরু হল মন্বন্তরের মর্মান্তিক কাহিনী। একদিকে চলছিল দুর্ভিক্ষ পিড়ীত মানুষের হাহাকার করুণ ক্রন্ধন অন্যদিকে তাদেরই মুখের গ্রাস নিয়ে আওয়ামী লুটেরাদের নির্বিকার লুণ্ঠন। লুট-পাট চলে বন্যা ও দুর্ভিক্ষ পীড়িত মানুষদের ডাল, চাল খাদ্য সামগ্রী রিলিফ এবং কম্বল নিয়ে।

www.pathagar.com

ডেইলী মেল পত্রিকায় জন পিলজার লিখেছিলেন– 'এই দুর্ভিক্ষের আর একটি ভয়ঙ্কর পরিসংখ্যান হল এই বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ((WHO) এর হিসাব মতে ৫০ লাখ মহিলা আজ নগ্ন দেহ। পরিধেয় বস্ত্র বিক্রি করে তারা চাল কিনে খেয়েছে।'

সরকারী শাসনযন্ত্রের অতি সাবধানতার মধ্যেও ২২ সেপ্টেম্বর বায়তুল মোকাররমের দুই শতাধিক উলঙ্গ, অর্ধ উলঙ্গ নারী পুরুষ অন্ন-বস্ত্রের জন্য মিছিল বের করেছিল। আর এ সময়ে মহাসমারোহে ৫৫ তম জন্মবার্ষিকীতে ৫৫ পাউণ্ড ওজনের কেক কাটেন শেখ মুজিব নিজেই। ২৩ সেপ্টেম্বর সারাদেশে ৪৩০০ লঙ্গরখানা খোলার ঘোষণা করা হয়। এ প্রসঙ্গে ১৩ নভেম্বর প্রকাশিত নিউইয়র্ক টাইমসের এক নিবন্ধে লেখা হল– 'সরকারী পরিকল্পনা বানচাল হয়ে গেছে। কেননা দুর্ভিক্ষপীড়িত লোকের সংখ্যা সরকার অনুমিত সংখ্যার ৩ গুণ বেশী হয়ে দাঁড়িয়েছে। আগস্ট মাসে যখন সরকার লঙ্গরখানা খোলার পরিকল্পনা করেন তখন ধরে নেয়া হয়েছিল যে দেশে আনুমানিক ২০ লাখ লোককে খাওয়ানোর জন্য ৪ হাজার লঙ্গরখানা যথেষ্ট হবে।'

ডেইলি টেলিগ্রাফের পিটারগিল গ্রামবাংলার খেটে খাওয়া মানুষগুলোর অসহায় অবস্থা বর্ণনা করে লিখেন– 'গ্রামবাংলার ছিন্নমুল মানুষেরা আজ ঢাকার পেশাদার ভিখারিতে পরিণত হয়েছে। পিতা শিশুদের নিয়ে রাস্তার চত্বরে নির্জীবের মত বসে আছে আর ফুপিয়ে কাঁদছে।'

দৈনিক ইত্তেফাকের একটি ছবিতে গ্রাম বাংলার দুর্ভিক্ষাবস্থার চিত্র প্রকট হয়ে প্রকাশ হয়েছে। ছবিটি ছিল কোন এক বাসন্তীর মাছ ধরা জাল দিয়ে লজ্জা নিবারণের প্রয়াস।

দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা আরো প্রকট করে তুলেছিল একটি মর্মান্তিক সংবাদ। সংবাদটিতে বলা হয় গায়বান্ধা প্লাটফার্মে একজন অসুস্থ মানুষ বমি করলে সেই বমি একজন ক্ষুধার্ত মানুষ ভক্ষণ করে ক্ষুধার জ্বালা নিবারণ করে।

আওয়ামী বিরোধীরা তো গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় তাদের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে থাকে। অবশেষে আওয়ামী ঘারানার জাতীয়তাবাদী বুদ্ধিজীবীরা ও প্রতিবাদ মুখর হয়ে ওঠে। ৮ আগস্ট আবুল ফজলসহ চট্টগ্রামের ৮৪ জন শিক্ষকের বিবৃতি প্রকাশ হয়। এতে বলা হয়– 'জাতির জীবনে দুর্যোগ মোকাবিলার প্রতি এত অনাসক্তি, এত অবজ্ঞা, এত অদ্ভুত রকম ঔদাসীন্য কখনো দেখা গেছে বলে বিশ্বাস হয় না। নিজের প্রতি আস্থাহীন জাতি যে কি পরিমাণ জড় পদার্থে পরিণত হতে পারে, বর্তমান বাংলাদেশ তার জ্বলন্ত উদাহরণ। স্বাধীনতা

www.pathagar.com

সংগ্রামের সেই একাত্মতা ত্যাগের সহজ শক্তির সেই প্রচন্ডতা পরবর্তীকালের সিদ্ধান্তহীনতায়, ভুল সিদ্ধান্তে, প্রশাসনিক নিষ্ক্রিয়তায় আর গুটি কয়েক লোকের লাগামহীন দুর্নীতির সয়লাবে সব ধুয়ে গেছে। দেশের নেতৃত্বের প্রতি এই জাতীয় দুর্দিনে আমাদের আকুল প্রার্থনা জাতি হিসাবে আমাদের শক্তিতে আস্থাবান হওয়ার পরিবেশ ফিরিয়ে দিন।'

সে সময় শুধুমাত্র খাদ্যশস্যের আকাল ছিল তাই নয়। নিত্য প্রয়োজনীয় সবকিছু দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছিল। যেমন আটানা কেজির লবণ ৬০ টাকা হয়েছিল কাঁচা মরিচের কেজি হয়েছিল ৭০ টাকা। দুর্ভিক্ষের এই সুযোগে লবণ বিক্রি করে ভারতীয় ব্যবসায়ীরা বিশাল অংকের টাকা বাংলাদেশ থেকে হাতিয়ে নিল।

আওয়ামী লীগের দুর্নীতি দুর্গতদের খাদ্য ও রিলিফ সামগ্রী নিয়ে লুটপাটের খণ্ডিত চিত্র বিদেশী পত্রিকা শিকাগো ডেইলি নিউজে (২৩ জুন ৭৫) প্রকাশ করে এতে লেখা হয়েছিল– 'বিদেশী সাহায্য সামগ্রীর অধিকাংশ বাজারে প্রকাশ্যে বিক্রি হয়। কম্বল, জ্যামপার, টিনের খাদ্য, গুঁড়া দুধ সবকিছুই ঢাকার দোকানপাটে পাওয়া যায়। একটি দূতাবাসের হিসাব (দূতাবাসটি পশ্চিম দেশীয় নয়)। অনুযায়ী বিদেশী সাহায্যের ১৫ শতাংশেরও কম জনসাধরণের হাতে পৌঁছায়। শেখ মুজিবের ভাগ্নে শেখ মনিকে গত দুর্ভিক্ষের কথা জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি জোর দিয়ে বলেন, দোষ আমাদের সরকারের নয়। দোষ সেসব সরকারের যারা প্রতিশ্রুতি দিয়েও সময়মত খাদ্যশস্য পৌঁছে দেননি। শেখ মনি অবশ্যই উপাদেয় খাবার খায়। স্বাধীনতার পর একজন ক্ষমতাসম্পন্ন যুব রাজনৈতিক নেতা বলেছেন তিনি দুটি সংবাদপত্রের সম্পাদক, দুটি গাড়ি ও দুটি দখল করা বাড়ির মালিক। মামা মুজিব ক্ষমতায় আসার পর শেখ মনি, যাকে বিদ্রূপকারীরা জাতীয় ভাগ্নে বলে অভিহিত করেন হঠাৎ করে অজস্র টাকার মালিক বনে গেছেন।'

অবশেষে মুজিবের গলাবাজির সম্মোহনী শক্তি যখন অকার্যকর ও নিস্তেজ হয়ে পড়ল। জনগণ যখন মনে করতে শুরু করল মুজিবের বক্তৃতা মানেই দ্রব্যমূল্যের আর একধাপ বৃদ্ধি। তখন তিনি জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য চাতুরীর আশ্রয় নিলেন। প্রথমেই তার আঘাতের লক্ষ্যবস্তু নির্ধারণ করলেন তাজুদ্দিনকে তাকে মন্ত্রীত্ব ও কেন্দ্রীয় কমিটি থেকে অপসারণ করলেন। মুজিবের ধারণা ছিল তাকে বাদ দিলেই জনগণের আস্থা ফিরে আসবে। কিন্তু লঘু চেতা মুজিবের জনপ্রিয়তার ধ্বস নামা মোটেও কমেনি।

www.pathagar.com

৩০ অক্টোবর লবণ মওজুতের জন্য আওয়ামী এমপি ডাঃ শামসুদ্দিনকে গ্রেপ্তার করা হলে এতে মুজিবের প্রতি জনগণের ধারণার বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হয়নি। জনগণ এটাকে দেখেছে আই ওয়াস হিসাবে। বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজ আবার নড়ে উঠল।

১৯৭৪ সালে ১ নভেম্বর দুর্ভিক্ষ প্রতিরোধের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলার লক্ষ্যে বুদ্ধিজীবী ও সুশীল সমাজের এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয় বায়তুল মোকাররমে। এই সমাবেশে মন্বন্তর পরিস্থিতি ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত ১৭টি প্রস্তাব গৃহীত হয়। প্রস্তাবে বলা হয় এই মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতা ১৯৪৩ সালের মন্বন্তরের ব্যাপকতা ও ভয়াবহতাকে অতিক্রম করছে এবং মন্বন্তর বন্যা অথবা প্রাকৃতিক দুর্যোগের ফলে সৃষ্টি হয়নি। বরং এটা ছিল শাসক শ্রেণী ও তাদের সহযোগীদের গণবিরোধী নীতি ও কর্মকাণ্ডের প্রত্যক্ষ পরিণতি। সমাবেশের প্রস্তাবে এই মন্বন্তরকে প্রায় দুর্ভিক্ষাবস্থা বলে বর্ণনা না করে একে মন্বন্তর বলে ঘোষণা করার দাবি জানান হয়। প্রস্তাবে বৈদেশিক সাহায্যের এক শ্বেতপত্র ও চোরাচালানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের দাবি জানান হয়।

এই দুর্ভিক্ষের ভয়াবহতা শুধু মাত্র জাতীয় অর্থনীতিকে বিপর্যস্ত করেছিল তা না সামাজিক অবকাঠামো ধসিয়ে দিয়েছিল বুভুক্ষার যন্ত্রণা নিবারণের জন্য কুল বধু অথবা নিষ্পাপ তরুণীদের অকাতরে দেহ বিক্রি করে খাদ্যোপকরণ সংগ্রহ করতে হয়েছে। বুভূক্ষ জননীরা সন্তানের জন্য খাদ্য সংগ্রহ করতে না পেরে গলাটিপে হত্যা করে নিজ সন্তানকে। সমকালীন ফিনান্সিয়াল টাইম (৬ জানুয়ারী ১৯৭৫) পত্রিকাতে বলা হয়– শুধুমাত্র নেত্রী স্থানীয় ব্যক্তিদের দুর্নীতির মাধ্যমে যে আওয়ামী লীগ দেশকে ধ্বংস করছে তা নয়। ভয়াবহ খাদ্য পরিস্থিতি ও গ্রামবাংলার দুর্ভিক্ষ গ্রামের সামাজিক কাঠামোর উপরে মারাত্মক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছে। অনেক জেলায় বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলীয় জেলাগুলোতে কৃষকরা তাদের জমি-জিরাত বিক্রি করে খাদ্য কিনতে বাধ্য হচ্ছে। হিসাব করে দেখা গেছে যে উত্তরাঞ্চলে এক লাখ বিঘা জমি হস্তান্তরের দলিল সম্পাদিত হয়েছে। এসব জমি প্রধানত আওয়ামী লীগের স্থানীয় চাঁইরা সস্তায় কিনে নিয়েছে।'

এত আলোচনার পর ও ৭৪ এর মন্বন্তরের পূর্ণাঙ্গ প্রকাশ হয়নি। এখানে যা কিছু বলা হয়েছে এটা মন্বন্তরের খণ্ডিত অসম্পূর্ণ চিত্র। বিষয়টি আলোচনার জন্য গ্রন্থ নয় মহা গ্রন্থের প্রয়োজন হবে। এখানে সেই অবকাশ নেই। তবে বিষয়টির উপর একটি ধারণা আগামী বংশধরদের মনে রেখাপাতের এই আলোচনা যথেষ্ট হবে বলে আমি মনে করি।

www.pathagar.com

এইভাবে শেখ মুজিব ও তার দল অনেক প্রত্যাশার স্বপ্নময় পৃথিবী থেকে গোরস্থানের কিনারে এনে দাঁড় করাল জাতিকে। ১০ লক্ষ মানুষ আওয়ামী দুর্নীতির খেসারত দিল। এক টুকরো রুটির বিনিময়ে দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের যৌন লালসা মেটাতে হল এ দেশের অসংখ্য কুলবধু এবং নিষ্পাপ তরুণীদের সর্বস্ব হারিয়ে পথে নামতে হয়েছে কত অসংখ্য পরিবারকে। গ্রামবাংলার মেহনতি মানুষের হাতে উঠলো ভিক্ষার ঝুলি। সম্ভাবনাময় অসংখ্য শিশুকে আলিঙ্গন করলো হিমশীতল অকাল মৃত্যু। সর্বনাশা মন্বন্তর ও মহা আকালে ক্ষুধার্থ মানুষের আর্তনাদে যখন আল্লাহর আরশ কেঁপে উঠেছিল, বেওয়ারিশ লাশে যখন গোরস্থান উপচে পড়েছিল। সেই দুঃসহ দুরবস্থার সময় শেখ মুজিব মহাসমারোহে তার সন্তান শেখ কামালের বিয়ে দিয়েছিলেন শেখ মুজিব রাজকীয় বিয়ের অনুষ্ঠানে বধু বরণ করেছিলেন হীরকের মুকুট দিয়ে মহামন্বন্তরে বিপর্যস্ত জাতির সাথে কি বেদনাদায়ক মস্করা ছিল এটা অথচ একই আর এক দৃশ্য দেখেছি আমরা ষাটের দশকে। তখন পূর্ব পাস্তিানের গভর্ণর ছিলেন শহীদ আব্দুল মোনয়েম খান। খাদ্য সংকট মেটানোর জন্য তখন বিপুল পরিমাণ ভুট্টা আমদানি করা হয়েছিল। গভর্নর বিকল্প খাদ্য হিসেবে ভুট্টাকে খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করার জন্য সে সময় তিনি জগণের প্রতি আহ্বান জানাতেন। শুধু বক্তব্য দিয়েই ক্ষান্ত না হয়ে নিজেও ভুট্টাকে খাদ্য তালিকার অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন। গভর্নর মোনয়েম খান তার তৃতীয় কন্যার বিয়েতে অতিথি আপ্যায়ন করেছিলেন ভুট্টার রুটি দিয়ে। কিন্তু এর উল্টো চিত্র দেখেছি মন্বন্তরে দুঃসময়ে বাংলার দরদী 'বঙ্গবন্ধ' শেখ মুজিবকে হীরকের মুকুট দিয়ে বধুবরণ করতে। জাতির সাথে মুজিবের এই নির্লজ্জ তামাশা কোন দিনেই ভুলবে না এদেশের মানুষ।

মুজিবের নির্বাচন প্রহসন

'ফার ইষ্টার্ণ ইকোনমিক রিভিউ'এর ডেভিড হার্ট লিখেছেন– ১৯৭২ সালের জানুয়ারীতে পাকিস্তানী জেল থেকে ফিরে এসে শেখ মুজিব তার প্রথম গুরুত্বপূর্ণ ভাষণে দেশবাসীর কাছে ৩ বছর সময় চেয়েছিলেন যে সময় তিনি তাদের কিছুই দিতে পারবেন না। হয়তো তাদের অনাহারে অর্ধাহারে থাকতে হবে। এক লক্ষ লোক যারা নেতার বক্তৃতা শোনার জন্য সমবেত হয়েছিল তারা জয়বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধ্বনিতে তাকে অভিনন্দন জানিয়েছিল।'

www.pathagar.com

কিন্তু শুভানুভূতির উল্লাস বছর না যেতে উবে গেল। তারা জানতে চাইল ক্ষুধা অনাহার জরা পুষ্টিহীনতা এবং রক্ষী বাহিনীর নামে পরিচিত বাছাই করা প্যারামিলিটারী দলের নির্মম দৌরাত্বের জন্য স্বাধীনতা সংগ্রামে "৩০ লাখ" লোক প্রাণ দিয়েছিল কিনা।'

বাংলার প্রতিটি মানুষের মনে যখন এ জিজ্ঞাসা প্রবল হয়ে উঠল তখন মুজিব হয়তো ভেবে থাকতে পারেন যে তিনি নির্বাহী ক্ষমতা হাতে পেলে বাংলার তাবৎ সমস্যার সমাধান করা তার পক্ষে সম্ভব হবে। অথবা আরো বেশী ক্ষমতার মোহ পেয়ে বসেছিল তাকে। প্রধান মন্ত্রী তাজুদ্দিনকে সরিয়ে তিনি প্রধান মন্ত্রী হলেন। এতে অবস্থার পরিবর্তন হল না। ক্রম হ্রাসমান আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা আরো দ্রুতগতিতে নিম্নগামী হতে শুরু করল।

ক্ষমতার প্রতি মুজিবের মোহ এবং আকর্ষণ ছিল তার রাজনীতির শুরু থেকে। পাকিস্তান থেকে প্রত্যাবর্তনের পর তিনি বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট হলেন। প্রেসিডেন্ট হয়ে দেখলেন তিনি ঠুটো জগন্নাথ। সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্টের ক্ষমতার সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এতে তার নিজেকে ছোট মনে হল। তিনি আরো আরো অধিক ক্ষমতার অধিকারী হতে চাইলেন। যে কারণে তাজুদ্দিনকে প্রধান মন্ত্রীত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে হল। সংসদীয় গণতন্ত্রে তিনি প্রেসিডেন্ট হলেও প্রকৃতপক্ষে তার ক্ষমতা ছিল অসীম। ১৯৭১ সালে যেমন তার অঙ্গুলি হেলনে সমগ্রজাতি উঠা বসা করতো, তখনো সেই অবস্থা বর্তমান ছিল। প্রধান মন্ত্রী হওয়ার পরও তিনি আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তা ধরে রাখতে ব্যর্থ হলেন। জনপ্রিয়তার দ্রুত অবক্ষয় তাকে ভাবিয়ে তুলল। তখনও শেখ মুজিবের ইমেজে ভাটা পড়েনি। তিনি বিজ্ঞ রাজনীতিকের মত নির্বাচন দিলেন। নির্বাচন দিলেন এই কারণে যে তার ইমেজ বর্তমান থাকতে যেন আওয়ামী লীগের ক্ষমতা ৫ বছর বেড়ে যায়। ৭২ সালের ৭ মার্চ নির্বাচন ঘোষিত হল। নির্বাচনের মুখে ন্যাপ নেত্রী মতিয়া চৌধুরী ৩ মার্চ ঢাকার এক জনসভায় অভিযোগ তুলে বললেন– 'গত এক বছরে অবাধ লুটতরাজ দুর্নীতি স্বজন প্রীতি আর রিলিফ চুরির রেকর্ড ভঙ্গ করে আওয়ামী লীগ এবার বঙ্গবন্ধুকে পুঁজি করে জনতার কাছে ভোট চাইতে এসেছে। একদিকে মুখে গণতন্ত্রের কথা বলা হয়েছে অন্যদিকে 'আজো আছে জোর লড়াই বঙ্গ বন্ধু অস্ত্র চাই' বলে শ্লোগান দিয়ে আওয়ামী লীগ ভয়-ভীতি প্রদর্শন করছে।'

নির্বাচনে ৩০০টি আসনের ২৯১ টিতে আওয়ামী লীগকে বিজয়ী ঘোষণা করা হল। ন্যাপ নেতা মোজাফফর আহমদের অভিযোগ হল কমপক্ষে ৫০টি আসনে

www.pathagar.com

ন্যাপ ও অন্যান্য বিরোধী দল প্রার্থীকে পরাজিত করা হচ্ছে কারচুপির মাধ্যমে জোর করে।

মেজর জলিলের অভিযোগ ছিল মারাত্মক। তিনি বলেন–' নির্বাচনের দিন গণ ভবনেই কন্ট্রোল রুম স্থাপিত করা হয়েছিল এবং স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী ফলাফল নিয়ন্ত্রণ করেছেন বিরোধী দলের প্রার্থীরা যখন ভোট গণনায় এগিয়ে যাচ্ছিলেন তখন প্রধান মন্ত্রীর নির্দেশেই অকস্বাৎ বেতার টেলিভিশনে এই সকল কেন্দ্রের ফলাফল বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সন্দেহজনক দীর্ঘ সময় পর নিজেদের পছন্দমত হিসাব অনুযায়ী ভোটের সংখ্যা প্রকাশ করে আওয়ামী লীগ প্রার্থীদের বিজয় ঘোষণা করা হয়। ভাসানী ন্যাপের ডক্টর আলীম আল রাজী ও অনুরূপ সরকারের নির্বাচনী কার চুপির কথা জোরে সোরে উচ্চারণ করেছেন। শেখ মুজিবের ইমেজে অবক্ষয় তখনো তেমন হয়নি এ কারণে আওয়ামী লীগের বিজয় তখনও নিশ্চিত ছিল। এসত্বেও শেখ মুজিব কেন নির্বাচনে কারচুপির আশ্রয় নিয়েছিলেন এটা অনেকের কাছে বিস্ময়কর মনে হলেও কারচুপি করা হয়েছিল এটা নিশ্চিত।'

নির্বাচনে কারচুরি করার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল এটা প্রমাণ করার জন্য যে তখনো আওয়ামী লীগের জনপ্রিয়তায় ধ্বস নামেনি। মূলত উদ্দেশ্য ছিল দেশের মানুষকে বোকা বানিয়ে বিশ্ব বিবেককে প্রতারিত করা। এ ছাড়াও ক্ষমতায় থেকে অথবা না থেকে নির্বাচনে কারচুপি করা আওয়ামী লীগের চিরাচরিত অভ্যাস। রাজদণ্ড হাতে নিয়ে এতটুকু না করা আওয়ামী লীগের প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি বিরুদ্ধ। ৩০০টি আসনের মধ্যে ২৯১টি আসন দখল করে ও আওয়ামী লীগের ইমেজ ফিরে এলো না। বরং আরো ধ্বস নামা শুরু হল। এমনকি শেখ মুজিবের ইমেজ এবং তার প্রতি মানুষের ভালবাসা শ্রদ্ধার অবক্ষয় শুরু হল তখন থেকেই।

কোলকাতার ফ্রন্টিয়ার পত্রিকায় লেখা হল– 'এটা এখন পরিষ্কার হয়ে গেছে যে সরকারের একচ্ছত্র সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকলেই দেশের অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সংকটের মোকাবিলা করা যায় না। অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশের দুঃখ-কষ্ট নব্যশাসকের সৃষ্ট শ্রেণীগত অসঙ্গতির ফল। কিন্তু বাংলাদেশের শাসক ও নব্যশাসকেরা অধিকতর অযোগ্য দুর্নীতিপরায়ণ ও লোভী। এরা রাতারাতি বড় হতে চায়। ধুরন্ধর ব্যক্তি উচ্চাশার টোপ ফেলেছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশ অগ্রগতির দিকে এগিয়ে যাবে এবং সরল মানুষরা তা বিশ্বাস করেছিল। কিন্তু

www.pathagar.com

ভারতীয় হস্তেক্ষেপের ফলে যারা বাংলাদেশের ক্ষমতায় আসীন হল তাদের মত স্বার্থপর নেতৃত্ব কোন দেশে সত্যিকার জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের পর আর দেখা যায়নি। দেশটি যে অর্থনৈতিক ধ্বংসের দিকে এগিয়ে যাবে তা অবশ্যম্ভাবী ছিল। বন্ধু রাষ্ট্রগুলির সাহায্য সহযোগিতা বাংলাদেশের কোন কাজে আসেনি। আরামদায়ক বন্দীদশা থেকে শেখ মুজিব প্রত্যাবর্তনের পর দেশের অবস্থা মন্দ থেকে মন্দতর হয়েছে। হাজার হাজার লোক বন্যা দুর্ভিক্ষ ও বিকৃত গৃহযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছে। জাঁকজমকের বিভ্রান্তিতে মুজিব যা করেছেন তাতে তার নিজের এবং তাদের দলের লোক ছাড়া কারো উপকার হবে না। হতে পারে গ্রামবাঙলার কিছু সরলপ্রাণ লোক তাকে জাতির পিতা হিসাবে দেখে আর মনে করে যে একজন ভাল লোক ডিক্টেটরদের হাতে পড়ে গেছে। মুজিব সরল লোকদের এই আবেগের উপর নির্ভর করেছেন।'

বাকশাল গঠন ও গণতন্ত্রের অপমৃত্যু

একাত্তরে মুজিবের প্রতি ভালবাসার যে ভাবাবেগ সৃষ্টি হয়েছিল সেই আবেগ পুনরুদ্ধারের প্রয়াস শেখ মুজিব অব্যাহত রাখা সত্ত্বেও সেটা আর ফিরে এলো না। শেখ মুজিব তার ব্যর্থতাকে ঢেকে রাখার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন। তার ব্যর্থ নেতৃত্বের ভাবমুর্তিকে ঘসে মেজে জনগণের গ্রহণযোগ্য সীমার মধ্যে রাখতে ব্যর্থ হলেন। আওয়ামী নেতৃত্বের বিধিবদ্ধ নিয়ম হল নিজেদের ব্যর্থতাকে অন্যদের ঘাড়ে চাপিয়ে দেয়া। পাকিস্তান আমলে পাঞ্জাবীও পশ্চিমাদের উপর দোষারোপ করা হয়েছিল। অতঃপর একাত্তরে নিজেদের অপকর্মও চাপিয়ে দিতে সক্ষম হয়েছিল পাক সেনাদের উপর। তারপর সব অপকর্মের দায়িত্ব চাপান হল পাকিস্তানের সংহতিতে বিশ্বাসী দল, নেতা ও কর্মীদের ওপর। একাত্তরের পরবর্তীপর্যায়ে রাজনৈতিক দৃশ্যপটে যখন তাদের কেউ অবশিষ্ট রইল না, তখনও তার প্রয়োজন হলো কারো না কারো ওপর দোষারোপ করা। অবশেষে তারা সহকর্মীদের দোষারোপের লক্ষ্য বস্তুতে পরিণত করল। চুয়াত্তরের অক্টোবরে শেখ মুজিব তার সব ব্যর্থতা অর্থনৈতিক রাজনৈতিক এবং সামাজিক সব বিপর্যয়ের দায় তাজুদ্দিনের কাঁধে চাপিয়ে তাকে দুরাত্মা রূপে চিহ্নিত করলেন। খুব জোরে সোরে প্রচারনা শুরু হল তাজুদ্দিনের বিরুদ্ধে। পর্যবেক্ষক মহল অবাক বিস্ময়ের অপেক্ষা করতে থাকলেন শেখ মুজিবের নতুন কোন পদক্ষেপের দিকে। সেই নতুন নাটক মঞ্চস্থ হতে মোটেও বিলম্ব হলো না।

www.pathagar.com

২৮ ডিসেম্বর রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ উল্লাহ জরুরী অবস্থা ঘোষণা করলেন মুজিবের নির্দেশে। ডেভিড হার্ট লিখেছেন– 'সরকার কী কার্যক্রম গ্রহণ করতে যাচ্ছেন তা জরুরী ঘোষণায় স্পষ্ট করে বলা হয়নি। তবে জরুরী আইনে ন্যাস্ত স্পেশাল ক্ষমতার বলে শেখ মুজিব ও তার দল যাকে বিপজ্জনক মনে করবেন তাকে জেলে পুরতে পারবেন। আর এভাবে বাংলাদেশে আজও যতটুকু সরকার বিরোধিতা টিকে আছে তা সমুলে ধ্বংস করে দেয়া হবে।

এই বিশেষ ক্ষমতা আইনের দ্বারা প্রতিপক্ষ বিরোধী দলের ওপর শরু হল গ্রেপ্তারী অভিযান। প্রতিপক্ষের কিছু কিছু নির্মূল করে রাজ-সিংহাসন নিষ্কন্টক করতে চাইলেন। সিরাজ সিকদারকে গ্রেপ্তার ও হত্যা করা হল। হত্যার পর আঙুল উচিয়ে ক্রুর হাসি হেসে মুজিব সদম্ভে প্রকাশ করলেন আজ কোথায় সিরাজ সিকদার। অস্থায়ী ক্ষমতার দাপটের কি নিষ্ঠুর আনন্দ। কোথায় সিরাজ সিকদার বলার মধ্যে দিয়ে তার প্রতিপক্ষদের জানিয়ে দিলেন মুজিবের বিরোধীতা করার নির্মম পরিণতি। হিতৈশী এক নায়কের লেবাস পড়ে গণতন্ত্রী মুজিব শহরের গৃহকর্তাদের দেয়ালে অঙ্কিত রাজনৈতিক শ্লোগানগুলো মুছে ফেলার নির্দেশ দিলেন। সকাল ১০টায় সেক্রেটারিয়েটের গেট বন্ধ করার নির্দেশ দেয়া হল। রক্ষী বাহিনীকে ব্যবহার করা হল ঠ্যাঙানোর জন্য। মোসাহেবদের কণ্ঠে ধ্বনিত হল এক নেতা এক দেশ বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ। এই শ্লোগান সম্বলিত প্লাকার্ড ফেষ্টুনে ভেসে গেল দেশ। মুজিবের মুখে অন্তহীন তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। তার ক্ষমতার ক্ষুধা আরো আরো তীব্র হয়ে উঠল। তার তোষামাদকারী পারিষদবর্গ তাকে ক্ষমতা আরো বেশী কুক্ষিগত করার জন্য প্ররোচিত করল। এই কারণে যেন মুজিবকে সামনে রেখে জনগণ এবং জাতীয় সম্পদকে আরো লুট করা সম্ভব হয়। মুজিব ক্ষমতা কুক্ষিতগত করার ব্যাপারে অনেক দূর এগিয়ে গেলেন। রাশিয়ার আদলে একনায়কতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চাইলেন। চাইলেন একারণে যে তিনি ক্ষমতার শীর্ষ বিন্দুতে অবস্থান করে জনগণকে অকটোপাশের মত বেধে রাখতে পারবেন। এ উদ্দেশ্যে ১৯৭৫ সালের ১৮ জানুয়ারী এক দলীয় সরকার গঠনের প্রস্তাব সংসদীয় দলের সভায় উত্থাপন করা হল। অধিকাংশ সদস্য বিপক্ষে মত প্রকাশ করলেন।

সংসদে বিলটি উত্থাপিত হলে। নুরে আলম সিদ্দিকী বাকশাল গঠনের বিরোধীতা করে ৫৫ মিনিট বক্তৃতা রাখলেন। সংসদ সদস্যরা করতালি দিয়ে তাদের সমর্থন ব্যক্ত করেন। এই বক্তব্যের পর কাউকে বক্তব্য রাখার সুযোগ দেয়া হয়নি। ২০ জানুয়ারী পরের অধিবেশনের শুরুতে মজিব তার পরিকল্পনা ঘোষণা করলেন

www.pathagar.com

শামসুল হক দাঁড়ালেন কিন্তু ফ্লোর পেলেন না। মুজিব বললেন তোমরা আমাকে চাও কি চাও না একথা শুনতে চাই। মুজিবের বিরোধীতা করার দুঃসাহস তখন কারো ছিল না। এসত্ত্বেও এ বিলের বিরোধীতা করে তিনজন সংসদ সদস্য ওয়াক আউট করেন। আতাউর রহমান খান আগেই বেরিয়ে যান। প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন চীফ হুইপ শাহ মোয়াজ্জম। বিলটি কণ্ঠ ভোটে পাশ হয়ে যায়।

২৫ জানুয়ারী দুপুরে এক সংক্ষিপ্ত অধিবেশনে জারীকৃত চতুর্থ সংশোধনীতে বলা হয়– আইন প্রণয়নের অব্যাবহিত পর যিনি রাষ্ট্রপতি পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন তিনি রাষ্ট্রপতি পদে থাকবেন না। রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হবে। শেখ মুজিবর রহমান বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি হবেন এবং রাষ্ট্রপতি কার্যভার গ্রহণ করবেন এবং উক্ত আইন প্রবর্তন হলে তিনি রাষ্ট্রপতি পদে বহাল থাকবেন যেন তিনি এই আইন দ্বারা সংশোধিত সংবিধানের অধীনে নির্বাচিত হয়েছেন।' কি দারুন জালিয়াতি শেখ মুজিব এবং আওয়ামী লীগের।

২৪ ফেব্রুয়ারী শেখ মুজিবর রহমান এক আদেশ বলে দেশে একটি মাত্র রাজনৈতিক দল বাংলাদেশ কৃষক শ্রমিক আওয়ামী লীগ বা বাকশাল গঠন করেন এবং নিজেকে চেয়ারম্যান ঘোষণা করেন।

ঘোষণার ৩নং আদেশে বলা হয় রাষ্ট্রপতি অন্য কোন আদেশ না দেয়া পর্যন্ত জাতীয় সংসদের আওয়ামী লীগ দলীয় সদস্য মন্ত্রী প্রতিমন্ত্রী উপমন্ত্রী সকলেই বাকশালের সদস্য বলে গণ্য হবেন।

২৬ ফেব্রুয়ারী মুজাফফার ন্যাপ এই সিদ্ধান্তকে অভিনন্দন জানায়। ২৫ এপ্রিল আতাউর রহমান খান বাকশালে যোগদান করেন। ৪টি দৈনিক ছাড়া, ৪শ পত্রপত্রিকা নিষিদ্ধ ঘোষিত হল এ সত্ত্বেও ৯টি দৈনিক ৯জন সম্পাদক বাকশালে যোগদানের জন্য আবেদন পেশ করে তাদের দৈন্যতা ও হীনমন্যতার স্বাক্ষর রাখলেন।

৬ জুন বাকশালের সাংগঠনিক কাঠামো ঘোষণা করা হল। দলের মহা সম্পাদক তিন জন সম্পাদক এবং ১১৭ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির নাম ঘোষণা করা হল।

শেখ মুজিব দেশের সব অশুভ শক্তিকে নিজের পক্ষপূটে ধারণ করে বাকশালের কঠিন শৃংখলে বেধে ফেলেন সমগ্র জাতিকে। বাংলাদেশ পরিণত হল গণতন্ত্রের বধ্য ভূমিতে। সুখ আর ঐশর্য্যের স্বপ্নিল প্রত্যাশা নিয়ে বাংলার মানুষ বন্দী হয়ে পড়ল নিজের জন্মভূমিতে ডেইলি টেলিগ্রাফের (২৭ জানুয়ারী ১৯৭৫) পিটার গিল লিখলেন– 'বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ মুজিবর রহমান তার দেশে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে ফেলে দিয়েছেন। গত শনিবার

www.pathagar.com

ঢাকার পার্লামেন্টের এক ঘণ্টা অস্থায়ী অধিবেশনে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে শেখ মুজিবকে প্রেসিডেন্ট ঘোষণা করেছে এবং এক দলীয় শাসন প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে ক্ষমতার্পণ করেছে।

অনেকটা নিঃশব্দে গণতন্ত্রের কবর দেয়া হয়েছে' বিরোধী দল দাবি করেছিল, এ ধরনের ব্যাপক শাসনতান্ত্রিক পরিবর্তনের ব্যাপারে আলোচনার জন্য তিন দিন সময় দেয়া উচিত। জবাবে সরকার এক প্রস্তাব পাস করলেন যে এ ব্যাপারে কোন বিতর্ক চলবে না।

১৯৭১ সালে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে ৯ মাস যুদ্ধের পর বিধ্বস্ত কিন্তু গর্বিত স্বাধীন বাংলাদেশের অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিব এমপিদের বললেন যে পার্লামেন্টারী গণতন্ত্র ছিল ঔপনিবেশিক শাসনের অবদান তিনি দেশের স্বাধীন আদালতকে ঔপনিবেশিক ও দ্রুতবিচার ব্যাহতকারী বলে অভিযুক্ত করেন।

প্রেসিডেন্ট এখন খেয়াল খুশিমত বিচারকগণকে বরখাস্ত করতে পারবেন। নাগরিক অধিকার বিন্দুমাত্র যদি প্রয়োগ করা হয় তা প্রয়োগ করবে নতুন পার্লামেন্ট কর্তৃক নিযুক্ত স্পেশাল আদালত।

এক্সিকিউটিভ অর্ডারের মাধ্যমে একটি জাতীয় পার্টি প্রতিষ্ঠার জন্য নতুন শাসনতন্ত্র মুজিবকে ক্ষমতা দিয়েছে। এটাই হবে দেশের একমাত্র বৈধ পার্টি। যদি কোন্ এমপি যোগদান করতে নারাজ হন অথবা এর বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহলে তার সদস্যপদ নাকচ হয়ে যাবে। এহেন পদক্ষেপের বিরুদ্ধে ঢাকায় সমালোচনা বোধগম্য কারণেই চাপা রয়েছে। কিন্তু ৩১৫ সদস্যবিশিষ্ট পার্লামেন্টের ৮ জন বিরোধী দলীয় সদস্যের ৫ জনই প্রতিবাদে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন। আওয়ামী লীগের ১১ জন সদস্য ভোট দিতে আসেননি। তার মধ্যে ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে বাংলাদেশের সেনাবাহিনীর নায়ক জেনারেল এম এ জি ওসমানী। শোনা যায় তিনি আওয়ামী লীগ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন।

শেখ মুজিবের নিযুক্তি ১৯৮০ সাল পর্যন্ত বাড়িয়ে দিয়েছে। তবে পার্লামেন্ট বছরে মাত্র দু'বার স্বল্প মেয়াদে বসবে।

ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রধামন্ত্রী ও কাউন্সিল অব মিনিস্টার এর মাধ্যমে সরকার পরিচালিত হবে। সৈয়দ নজরুল ইসলাম ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং মনসুর আলী প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হয়েছেন।

নতুন প্রেসিডেন্টের যে আদৌ প্রশাসনিক ক্ষমতা নেই গত তিন বছরে যথেষ্ট প্রমাণিত হয়েছে। তার স্টাইল হচ্ছে ডিক্টেটর স্টাইল।'

www.pathagar.com

রক্ষী বাহিনীর সন্ত্রাস

শেখ মুজিবকে যারা পুতুলের রাজা সাজিয়ে ছিল তারা আশঙ্কা করলো জনগণের সম্মোহন অথবা স্বপ্নের ঘোর এক সময় কেটে যাবে তখন বাংলাদেশকে নিয়ে দিল্লীর যে সুদূর প্রসারী ভাবনা ছিল সেই ভাবনাগুলোর ধ্বংস অনিবার্য হয়ে উঠবে। একারণে পুতুলের রাজা শেখ মুজিবের নিরাপত্তার জন্য তার অন্ধ স্তাবকদের নিয়ে একটি শক্তিশালী এলিট ফোর্স গড়ে তোলার উদ্যোগ নিল দিল্লী।

এনায়েতুল্লাহ খান লিখেছেন ঃ একটি বিশেষ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিত এই এলিট ফোর্স সৃষ্টির ইতিহাস আরো বিচিত্র। মুজিব বাহিনীর নেতৃবৃন্দের পরিকল্পনা অনুযায়ী শেখ মুজিবর রহমানের স্বহস্তে লিখিত পত্রের ওপর ভিত্তি করে এবং তারি উত্তরাধিকারীদের নেতৃত্বে এই রাজনৈতিক বাহিনী গঠন করা হয়। এখানে উল্লেখ্য যে দেরাদুনে প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত এই বিশেষ প্রতিবিপ্লবী সংগঠন জেনারেল ওসমানী পরিচালিত মুক্তিবাহিনী এমন কি তাজুদ্দিনের নিয়ন্ত্রণে ছিল না। জনৈক ভারতীয় সেনাবাহিনীর জেনারেল ওবান-এর প্রত্যক্ষ পরিচালনায় এর সাংগঠনিক কাঠামো এবং ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে একথায় নিঃসন্দেহে প্রমাণ করে যে, জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের সংগে এই বাহিনীর মৌলিক বিরোধ ছিল।'

'বিপর্যয়কর অর্থনীতির অতি বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনগণের আবেগ যখন থিতিয়ে আসে। যখন গণ অসন্তোষ ধূমায়িত হয়ে উঠে তখন মুজিব কেন্দ্রীক পৌত্তলিক রাজনীতি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়ার জন্য সেই কায়েমী স্বার্থবাদী অশুভ চক্র মুজিববাদী ধূয়া তুলে জনগণের আবেগকে নতুন করে উদ্দীপ্ত করার উদ্যোগ নেয়। অন্যদিকে মোহভঙ্গ আশাহত জনগণের রুদ্ররোষ থেকে নিজেদের এবং পুতুলের রাজা শেখ মুজিবকে সুরক্ষার জন্য গড়ে তোলা হয় নতুন নতুন বাহিনী।'

সেনাবাহিনী গড়ে তোলার আগ্রহ শেখ মুজিবের কখনো ছিল না তাছাড়া এ ব্যাপারে দিল্লীর নিষেধাজ্ঞা ছিল। কিন্তু স্বাধীনতা যুদ্ধে সেনাবাহিনীর সর্বাধিক অবদান থাকার কারণে এবং তাৎক্ষণিক বিদ্রোহ ও অন্যান্য উটকো বিড়ম্বনা এড়িয়ে যাওয়ার জন্য সেনা বাহিনীর গঠন প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হয়েছিল। মুজিবের লক্ষ্য ছিল সেনাবাহিনীকে ঠুটো জগন্নাথ করে রেখে পর্যায় ক্রমে একে অপ্রয়োজনীয় করে তোলা। এ কারণে দিল্লীর পরামর্শে সেনাবাহিনীর একটি সমান্তরাল বাহিনী গড়ে তোলা হল দেরাদুনে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত দলীয় কর্মীদের নিয়ে। এক বিদেশী সাংবাদিক লিখেছেন– 'ভারতীয় জনৈক সমর নায়কের প্রত্যক্ষ

www.pathagar.com

তত্ত্বাবধানে সৃষ্টি হয়েছিল কুখ্যাত নাৎসী বাহিনীর অনুকরণে রক্ষীবাহিনী। আসলে রুশ ভারত চক্রের হাতেই এই রক্ষী বাহিনীর মূল পরিচালনার দায়িত্ব ছিল। কিন্তু বাইরে বলা হয় শেখ মুজিবের প্রত্যক্ষ নেতৃত্বে এই রক্ষীবাহিনী পরিচালিত।

সর্বোপরি স্বাধীনতার পর থেকেই মুজিব সেনাবাহিনীকে আঘাতের পর আঘাত করে আসছিলেন। শুরু থেকেই ভারতে ট্রেনিংপ্রাপ্ত মুক্তি বাহিনীর অংশবিশেষ নিয়ে গঠিত রক্ষীবাহিনী বাংলাদেশ সামরিক বাহিনীর প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে দাঁড়াল। রক্ষীবাহিনী একই সঙ্গে প্রেসিডেন্টের প্রহরী, গোয়েন্দা পুলিশ ও বিকল্প সেনাবাহিনী ছিল। আয়ারল্যান্ডের ব্লাক এন্ড টেন্স ও জার্মানীর ব্রাউন শার্টের সঙ্গে এর তুলনা করা যায়।

১৯৭৩ সাল পর্যন্ত রক্ষীবাহিনীতে ভারতীয় উপদেষ্টা ছিল। এরপরেও রক্ষীবাহনীর অফিসাররা ট্রেনিং-এর জন্য ভারতের দেরাদুনে যেত। রক্ষী বাহিনীর সংখ্যা ২০ হাজার দাঁড়িয়েছিল। লক্ষ্য ছিল আরো বেশী।

রক্ষী বাহিনীর সংখ্যার জন্য নয়, যে ভাবে সরকার তাদের প্রতি অনুগ্রহ দেখাত তাতেই সেনাবাহিনী ক্ষুব্ধ হয়েছিল। প্রচুর টাকা খরচ করা হত রক্ষীবাহিনীর ব্যারাক তৈরী করার জন্য। আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের বেশীর ভাগই পেত রক্ষীবাহিনী। আর সেনাবাহিনীকে থাকতে হত সেকেলে অস্ত্রপাতি নিয়ে।'

১৯৭৩ সালের ২৭ জুলাই প্রেসিডেন্টকে দেয়া হয় নতুন ক্ষমতা। এই ক্ষমতায় জাতীয় রক্ষী বাহিনীর ডেপুটি লিডার এবং তার উপরোস্থ সকল অফিসারকে গ্রেপ্তারী পরোয়ানা ছাড়া অপরাধ করেছে সন্দেহে যে কোন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তারের অধিকার দেয়া হয়। এর ফলে রক্ষী বাহিনীর দাপট সীমাহীন হয়ে ওঠে রক্ষী বাহিনী কর্তৃক গন নিপিড়নের মাত্রা উত্তরোত্তর বেড়ে চলে। এ সম্পর্কে কোলকাতার ফ্রান্টিয়ার পত্রিকা (ভলিউম বি নং-২) লিখেছিল- 'বাংলাদেশের রাজনীতি এতটা একদলীয় হয়ে গেছে যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলি আত্মগোপন করতে বাধ্য হয়েছে। তাদের বিরুদ্ধে প্রেসিডেন্টের অভিযানের অস্ত্র হচ্ছে তার গুপ্ত পুলিশ ও আধা সামরিক মিলিশিয়া রক্ষীবাহিনী। গ্রাম বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে এরা ত্রাসের রাজত্ব চালাচ্ছে।

ময়মনসিংহ জেলার একটি থানাতেই (নান্দাইল) শত শত তরুণ চাষী ও ছাত্রকে হত্যা করা হয়েছে। এই এলাকার গরীব চাষীদের মধ্যে সিরাজ সিকদারের বিশেষ প্রভাব ছিল এবং গত তিন বছরের শেষে ও তারা কার্যত এ অঞ্চল নিয়ন্ত্রণ করছে।

www.pathagar.com

প্রতক্ষ্যদর্শীর হিসাব মতে গত জানুয়ারীতে এক ময়মনসিংহ জেলাতে অন্তত এক হাজার পাঁচশ' কিশোরকে হত্যা করা হয়। এরা অনেকেই সিরাজ সিকদারের সর্বহারা পাটির সদস্য ছিল। অন্যদের মার্কসবাদী ও লেলিনবাদী দলের প্রতি সহানুভূতিশীল বলে সন্দেহ করা হয়েছিল। এমন কি অনেক বাঙালী যুবক যারা রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত ছিল না তারাও সন্ত্রাস অভিযানে প্রাণ হারিয়েছে রক্ষীবাহিনী কি করে সিরাজ সিকদার নামাঙ্কিত পোষ্টার পেরেক দিয়ে এটে লাশ সদর রাস্তায় ফেলে দিয়েছে তার বর্ণনা তাদের আত্মীয় স্বজনদের মুখে শোনা যায়। নিষ্ঠুরতার অভাব নেই। যারা সৌভাগ্যবশত রক্ষী বাহিনীর ক্যাম্প থেকে ছাড়া পেয়েছে তাদের মুখে মধ্য যুগীয় অত্যাচার পদ্ধতি অনুসৃত হতে শোনা যায়। অত্যাচারের সাধারণ হাতিয়ার লৌহদন্ড সূচ, গরম পানি ও অন্যান্য গার্হস্থ সামগ্রী। কিন্তু বিরোধী রাজনৈতিক দল সম্পর্কে তথ্য উদঘাটনে এগুলো যথেষ্ট কার্যকরী। তাছাড়া এসব হাতিয়ার প্রয়োগের ফলে শরীরের যে ক্ষতি সাধিত হয় তার জের চলে সারা জীবন।'

স্বাধীনতা উত্তর বাংলাদেশে আইন শৃংখলার অবনতি হয়েছিল চরম। সরকারী হিসাব অনুযায়ী ১৯৭২ সালের জানুয়ারী থেকে ৭৩ সালের জুন পর্যন্ত গুপ্তহত্যা হয়েছে ২০৩৫টি, অপহরণ হয়েছে ৩৩৭টি, ধর্ষণ হয়েছে ১৯০টি, ডাকাতি হয়েছে ৪৯০৭টি এবং আততায়ীর হাতে খুন হয়েছে ৪৯২৫ ব্যক্তি। ১৯৭৩ সালের নির্বাচনেও শেখ মুজিব সৃষ্ট অপশক্তি অসূরশক্তি ও অবৈধ অস্ত্র নির্বিচার ব্যবহার হয়েছিল।

এছাড়াও আওয়ামী শাসনামলের সাড়ে তিন বছরে রক্ষীবাহিনী স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী ও লালবাহিনী নীলবাহিনী ও অন্যান্য আওয়ামী গুন্ডাদের হাতে ২৭ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছিল। রাজনৈতিক হত্যা হয়েছিল ১৯ হাজার। রক্ষীবাহিনীর নির্যাতনে পঙ্গু হয়েছিল ২৬শ'। গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের শিকার হয়েছিল ২ লক্ষ লোক। হাইজ্যাক ও ছিনতাই হয়েছিল ২২ হাজারটি। চুরি ডাকাতি রাহাজানি ও ছিনতাই হয়েছিল ৬০ হাজারটি। অস্ত্র লুট হয়েছিল ১৫ হাজার। ধর্ষণের ঘটনা ঘটেছিল ১৫ হাজার। অবৈধ দখল হয়েছিল শিল্পকারখানা ঘরবাড়িসহ ১৩ হাজার। জমি দখলের পরিমাণ ছির ৫০ হাজার একর। এই ছিল আওয়ামী দুঃশাসনের কালো অধ্যায়। হত্যা লুট ধর্ষণ ছিনতাই অবৈধ দখল এবং গ্রেপ্তার ও নির্যাতনের প্রক্রিয়া অব্যাহত ছিল ৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট পর্যন্ত।

www.pathagar.com

উনবিংশ অধ্যায়

দুঃশাসনের যবনিকাপাত

শেখ মুজিব পূর্ব পাকিস্তানের মানুষকে সোনার বাংলা স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন। সেই স্বপ্নের ঘোর কেটেছিল বাংলাদেশের সূচনা পর্বে। হ্যামিলনের বাশির সুরে যেমন সম্মোহন ছিল অনুরূপ সম্মোহন ছিল মুজিবের ভাষণে। মুজিব আঞ্চলিকতার আবেশ ছড়িয়ে শোষণ বঞ্চনার কল্প কাহিনী দিয়ে সহজ সরল বাংলার মানুষকে যখন ক্ষুধা দারিদ্র আর সন্ত্রাসের দ্বার প্রান্তে টেনে আনলেন তখনই তাদের সম্মোহন কেটে যায়। কাটলেও নিরূপায় ছিল সকলে। পিছু হটবার সব পথ রুদ্ধ থাকার কারণ শয়তানকে আলিঙ্গন করে জপ করতে হয়েছিল এক নেতা একদেশ বঙ্গ বন্ধু বাংলা দেশ। শেখ মুজিব বাংলার লুণ্ঠিত শোষিত ক্ষুধার্ত মানুষকে দেবতার মত বলেছিলেন তিন বছর কিছুই দিবার পারুমনা'। কোন বাদ প্রতিবাদ না করে তিন বছর অপেক্ষা করেছিল মানুষ। মুজিব তিন বছর বাংলার মানুষকে দিয়েছিলেন সন্ত্রাস বিশৃংখলা মৃত্যু ও ক্ষুধা। ১০ লক্ষ ক্ষুধিত মানুষ আলিঙ্গন করেছিল মৃত্যুকে। তবুও বাংলার জনগণ তলা বিহীন ঝুড়িকে আঁকড়ে ধরে উত্তম সম্ভাবনার স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু তিন বছর পরে শেখ মুজিব তার সাড়ে সাত কোটি অনুরাগী ভক্তকে কি দিলেন? মুজিব তার জনগণকে সেটাই দিলেন যা একজন আত্মসর্বস্ব নির্মম একনায়ক তার জনগণকে দিয়ে থাকে।

১৯৭৫-এর ২৫ জানুয়ারী পার্লামেন্টারী গণতন্ত্রের শেষ চিহ্নটুকু লাথি মেরে গুড়িয়ে দিলেন। সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মাত্র ১৩ মিনিটের মধ্যে শাসনতন্ত্র বদলে দিলেন। বাকশাল গঠন করলেন। রাজনৈতিক দল নিষিদ্ধ করলেন। সামরিক বেসামরিক সকলকে বাকশালে যোগদানে বাধ্য করলেন। বাকশালে যোগদান ছাড়া নির্বাচিত এমপিদের সদস্য পদ বাতিল করলেন। সুপ্রিম কোর্টের মৌলিক মানবাধিকার প্রয়োগের ক্ষমতা খর্ব করলেন। স্বাধীন চেতা রাজনৈতিক নেতা ও কর্মীদের শায়েস্তা করার জন্য ৬০টি জেলায় গভর্ণর নিয়োগ করলেন বরকন্দাজী করার জন্য। মুজিব দেবতার প্রশংসা করার জন্য বাঁচিয়ে রাখা হল মাত্র চারটি পত্রিকা। ভারতীয় মেজর জেনারেল সুজান সিং উবান পরিচালিত রক্ষী বাহিনীকে শক্তিশালী করা হল জনগণকে ঠেকানোর জন্য। সেনাবাহিনীকে ঠুটো জগন্নাথে পরিণত করা হল। অর্থনৈতিক রাজনৈতিক সামাজিক ভাবে

www.pathagar.com

বিধ্বস্ত জাতিকে গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করে শেখ মুজিব মস্কো ও দিল্লীর পরিকল্পনা বাস্তবায়নের জন্য স্বাধীন বাংলার মহান অধিপতির মেকি লেবাস পড়ে ক্ষমতার রাজ প্রাসাদে প্রবেশ করলেন কিন্তু বেরিয়ে আসার পথ খুলে রাখলেন না।

ফারুক তার বন্ধু রশিদকে নিয়ে অভ্যুত্থানের যে পরিকল্পনা করেন তাতে সম্ভাব্য অভ্যুত্থানের সময় নির্ধারণ করা হয়েছিল সেপ্টেম্বরের কোন এক সময়ে। কিন্তু অভ্যুত্থান সংঘটিত হল ১ মাস আগে। কিন্তু কেন? এই কেনর উত্তর খুঁজতে হলে ১৫ আগস্টের পূর্বাপর পরিস্থিতির দিকে চোখ ফেরাতে হবে। আমরা সমকালীন সংবাদের দিকে চোখ রাখলে দেখতে পাব বাঙলাদেশ সীমান্তে দুটো ভারতীয় হেলিকপ্টর বিদ্ধস্ত হওয়ার এবং এতে কয়েকজন ভারতীয় জেনারেল নিহত হওয়ার খবর কেন কি উদ্দেশ্যে জেনারেলরা বাংলাদেশে আসতে চেয়েছিলেন?

ইন্দিরা গান্ধী ২৫ বছর চুক্তির শৃংখলে বাংলাদেশকে আবদ্ধ করেও স্বস্থি পাচ্ছিলেন না। গান্ধী থেকে শুরু করে নেহেরু প্যাটেল সবারই প্রত্যাশা ছিল পাকিস্তান একদা হিন্দুস্থানের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবে। বিশেষ করে পূর্ব পাকিস্তান অর্থনৈতিক দিক দিয়ে ভায়াবল না হওয়ার কারণে সেখানকার জনগণ ভারতে অন্তর্ভুক্তির জন্য দাবী তুলবে। প্রায় দুটো যুগ অতিবাহিত হলেও তেমন পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়নি কখনো। ভায়াবল নয় এমন ভূখণ্ডকে পাকিস্তান ভায়াবল করে তুলেছিল। এ সত্বেও ভারত পূর্ব পাকিস্তানে পঞ্চম বাহিনীকে কাজে লাগিয়ে পাকিস্তান থেকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে। ধারাবাহিক শোষণ লুণ্ঠনের মধ্যে দিয়ে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ বাংলাদেশকে অকার্যকর রাষ্ট্রে পরিণত করে। স্বাভাবিকভাবে বাংলাদেশ দিল্লীর প্রত্যাশার কাছাকাছি এসে পৌছে। একারণে ১৫ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহা সমারোহে আয়োজিত মুজিবের অভিষেক অনুষ্ঠানের প্রাক্কালে জেনারেলদের পাঠিয়েছিলেন। একটি নতুন পরিকল্পনায় শেখ মুজিবের সম্মতি আদায়ের জন্য। এ পরিকল্পনা অনুসারে বাংলাদেশ ভারতের মান চিত্রের অন্তর্ভুক্ত হবে এবং বাংলাদেশ হবে ভারতের অন্তর্ভুক্ত একটি প্রদেশ। মুজিব হবেন ভারতের ভাইস প্রেসিডেন্ট।

কিন্তু মহান আল্লাহ ভারতের দীর্ঘ দিনের চূড়ান্ত পরিকল্পনা গুড়িয়ে দিলেন মুজিবের মর্মান্তিক পরিণতি রচনা করে। কর্নেল ফারুক কতিপয় জানবাজ তরুণদের নিয়ে রুখে দাঁড়ালেন। ভারতের পুরোপরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ১৩৩৮ দিন পর পাল্টে গেল ইতিহাসের গতি।

www.pathagar.com

বাংলার সাদ্দাদ শেখ মুজিব নিহত হলেন। তিন জন ভারতীয় জেনারেল লাশ হয়ে ফিরে গেলেন তাদের দেশে। হিন্দুস্থানের সম্ভাব্য গোলামী থেকে নাজাত পেল বাংলাদেশ। ১৫ আগস্ট অভ্যুত্থানের দিন এক নিবিড় প্রশান্তি এবং আল্লাহর রহমত ও বরকতে আচ্ছন্ন হয়েছিল দেশ। মহুর্তেই আইন শৃংখলা পরিস্থিতি বাজারের অগ্নি মূল্য সবকিছু স্বাভাবিক হয়ে গেল। তিন বছর আট মাস ধরে জ্বলন্ত জাহান্নামের আগুনের লেলিহান শিখা নিভে গেল নিমেশে। সেদিন অগ্নি গহ্বরের তীরে দাঁড়িয়ে থাকা জাতি সত্যিকার আযাদীর নিঃশ্বাস ফেলেছিল। স্বীকৃত মুজিবের পতনকে ফেরাউনের পতন বলে তখনকার সংসদের স্পীকার আব্দুল মালেক উকিল মন্তব্য করেন লণ্ডনে।

'ইন্দিরা রচিত নাটকের শেষ দৃশ্যের মহড়া শুরু হল দুর্ভিক্ষপীড়িত মানুষের লাশের উপর দিয়ে। শুরু হল বাকশাল গঠনের প্রক্রিয়া। এক নেতা এক দেশ গঠনের প্রস্তুতি চলল সমগ্র জাতিকে ভারতীয় শৃংখলে আবদ্ধ করার জন্য। সেদিন ভারতের বরকন্দাজ ও ঠাঙারে বাহিনীর সম্মুখে সমগ্র জাতি জিম্মি হয়ে পড়েছিল। তখন কোন নেতা ছিল না যে সংকট উত্তরণের জন্য শক্ত হাতে হাল ধরতে পারে; কোন দল ছিল না, যে দল মানুষের সংকটে তাদের পাশে দাঁড়িয়ে জনগণকে সঠিক দিক নির্দেশনা দিবে। সমস্ত নেতা, সমস্ত বুদ্ধিজীবী নতজানু হয়ে আনুগত্য প্রদর্শনের জন্য লাইন ধরে হাজির হয়েছিল মুজিবের দরবারে। আর যাদের মধ্যে ইমানের কিছু মাত্র অবশিষ্ট ছিল তারা আত্মগোপন করেছিল শাদ্দাদী জুলুম নিপীড়ন থেকে আত্মরক্ষার জন্য জাতি তখন দিশাহারা, নির্বাক কণ্ঠ আবরুদ্ধ। সর্বত্র দুঃশাসনের বিভীষিকা। বোবা কান্না ও অশ্রু বিসর্জনের মধ্য দিয়ে শেষ পরিণতির অপেক্ষায় অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে ছিল দেশের মানুষ। দিল্লীর দোসর ও দালালদের ঘরে ঘরে চলছিল উল্লাস। অদৃশ্যে অবস্থান করে সবকিছুর নিয়ন্ত্রা মহান আল্লাহ কোটি মানুষের নীরব কান্না সেদিন শুনেছিলেন দিল্লীর প্রযোজনায় নাটকের শেষ দৃশ্য আর মঞ্চস্থ হল না। পনেরই আগস্ট শেষ রাতে বিদ্যুতের চমক দেখল সমগ্র পৃথিবী। শাদ্দাদের স্বপ্ন ভেঙে খান খান হল। একটা বেদনাদায়ক কলঙ্কিত ইতিহাসের পরি সমাপ্তি হল। নদীর গতি প্রবাহিত হল উল্টো দিকে। শ্বাসরুদ্ধ জনগণ কেবলি নিঃশ্বাস নিতে শুরু করেছে কিন্তু তখনো মুক্ত মানুষগুলোর কণ্ঠ রোধের ষড়যন্ত্রগুলো থেমে থাকেনি। ১৩৩৮ বিনিদ্র রজনীর ধকলে ক্লান্ত পরিশ্রান্ত জাতি গা ঝাড়া দেয়ার আগেই প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের ষড়যন্ত্র শুরু হল বঙ্গ ভবন থেকে সেনা ছাওনি পর্যন্ত।

www.pathagar.com

মসনদের মোহ ছিলনা কর্নেল ফারুকের। একটি সফল বিপ্লবের কৃতিত্ব নেয়ার জন্য আত্মপ্রচারের ক্ষীণতম প্রয়াসও তার মধ্যে ছিল না। একজন মোমিন হিসাবে মহান আল্লাহরই সন্তুষ্টির লক্ষ্যে তিনি বিপ্লবের ঝুঁকি নিয়েছিলেন। তিনি চেয়েছিলেন স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের অতন্দ্র প্রহরী হিসাবে জাতির নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে। কিন্তু চক্রান্ত ও ষড়যন্ত্রের দেশে সেটা সম্ভব হল না। সময়ের অভিযানে তাকে সরে যেতে হল দৃশ্যপটের বাইরে।

আগস্ট বিপ্লবের পটভূমি

শেখ মুজিবের বিশ্বাস ঘাতকতা সচেতন বিবেকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। সকলেই বুঝে ফেলেছিল যে শেখ মুজিব সমগ্র জাতিকে স্বর্গীয় সুখের স্বপ্ন দেখিয়ে জাহান্নামের দ্বার প্রান্তে টেনে এনেছে দিল্লীকে সন্তুষ্ট করার জন্য। ৯০ শতাংশ মানুষ নিরূপায় হয়ে নিয়তির উপর নির্ভর করে সন্ত্রাস বিভিষীকা ক্ষুধা ও দারিদ্রতাকে আলিঙ্গন করে বোবার মত নীরবে অশ্রু বিসর্জন করছিল। বাকী ১০ শতাংশ মানুষ আওয়ামী নৃশংসতাকে সহজ ভাবে গ্রহন করে মুজিববাদী পাশবিকতার সাথে একাকার হয়েছিল সুবিধাবাদী স্বার্থপরের মত। তবে শেখ মুজিবকে উৎখাতের ভাবনাও ছিল অনেকের মধ্যে।

সে সময় শেখ মুজিবকে উৎখাতের অন্তত ৫টি সম্ভাব্য চক্রান্তের তদন্ত শুরু করেছিল তৎকালীন গোয়েন্দা বিভাগ। বাকশালী অক্টোপাশ থেকে দেশকে বাঁচানোর জন্য সচেতন কিছু কিছু সচেতন গ্রুপ নেপথ্যে তৎপর হয়ে উঠেছিল, যেমন মাওবাদী সর্বহারা পার্টি ও অন্যান্য বাম গ্রুপ, জাসদ এমন কি আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরে কিছু রাজনীতি সচেতন ব্যক্তি। এদের অনেকেই মার্কিন দুতাবাসের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করেছিলেন। কিন্তু দূতাবাসের অনীহা অনেককে নিরাশ করেছিল। সবচেয়ে বড় কথা ক্যান্টনম্যান্টে শৃংখলার মধ্যে আবদ্ধ থাকা কতিপয় মেজরের অভ্যুত্থান প্রয়াস কারো রাডারে ধরা পড়েনি।

একাত্তরের বাংলাদেশে শেখ মুজিবের দুঃশাসন এবং সমকালীন ধারাবাহিক শোষণ লূণ্ঠন জুলুম ও অত্যাচারের প্রেক্ষাপটে একজন মুক্তিযোদ্ধা কর্নেল ফারুকের মধ্যে তার নিপিড়ীত নিষ্পেষিত ও ভাগ্যহত জাতির জন্য এমন এক দারুণ ভাবান্তর হয়েছিল যে পরিণতির কথা চিন্তা না করে তিনি একা হলেও শেখ মুজিবকে উৎখাতের সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছিলেন, তার ভাষায় 'তখনকার বিরাজমান পরিস্থিতি এবং অবলুপ্ত সকল পন্থার প্রেক্ষিতে আমার এবং সকলের

www.pathagar.com

সামনে এক কথায় সমগ্র জাতির সামনে শুধুমাত্র একটি পথই খোলা ছিল, আর তা হচ্ছে– শেখ মুজিব যিনি আমাদের জনগণকে এবং জনগণের সকল কোরবাণী আর আশা আকাঙ্ক্ষা এবং স্বপ্নকে ভয়ঙ্করভাবে প্রতারণা করেছিলেন সেই কথিত দেবতাকে ধ্বংস করা, অথবা ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করা।'

এন্থনি ম্যাসকারেনহাস এ সম্পর্কে লিখেছেন– 'ইতিমধ্যে সেনাবাহিনীর অফিসারগণ নানা রকমের নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হচ্ছেন। দেখা গেলো, তাঁরা বহু কষ্টে যে শত শত চোরাচালানী, খুনী এবং ডাকাতদের আটক করছেন, ঢাকা থেকে একটি টেলিফোন এলেই তারা ছাড়া পেয়ে যাচ্ছে। এ ছিল এক অদ্ভুত পরিস্থিতি। ফারুক আমাকে এ প্রসঙ্গে বলেছিলেন, যখনই আমরা কোন দুষ্কৃতিকারীকে আটক করি, তখনই দেখা যায় হয় আওয়ামী লীগের নয়তো আওয়ামী লীগের কোন ক্ষমতাসীন সমর্থকের লোক সে। ফলে উপরওয়ালাদের ইচ্ছে অনুযায়ী এদের ছেড়ে দিতে হতো। বিনিময়ে ঝামেলা পোহাতে হতো আমাদের।'

'এটা ছিল এক ধরনের প্রহসন'– ফারুক বলেছিলেন।' ঠিক এই সময়ে সেনাবাহিনীকে বলা হলো নক্সালদের উৎখাত করার জন্যে। এই নির্দেশের পেছনে যার হাত ছিল তিনি শেখ মুজিব। মুজিব আসলে চেয়েছিলেন নক্সালদের নামে সিরাজ সিকদার এবং কর্ণেল জিয়াউদ্দিন প্রমুখদের খতম করতে। ফারুক এ জাতীয় নির্দেশ পালনে উৎসাহী হলেন না

ফারুক বলেছিলেন– 'আমি মার্ক্সিস্টদের ব্যাপারে উৎসাহী ছিলাম না। আদর্শগতভাবে তারা হয়তো ভুল পথে ছিল– কিন্তু তারা দেশের খুব বেশি ক্ষতি করেনি।'

একবার টঙ্গীতে মেজর নাসির তিন ব্যক্তিকে আটক করেন। এরা তিনটি খুনের সঙ্গে জড়িত ছিল। নববিবাহিত এক দম্পতি তাদের গাড়িতে টঙ্গী যাওয়ার পথে মোজ্জাম্মেল নামে দুর্ধর্ষ আওয়ামী লীগার ও তার সহকর্মীরা তাদের উপর হামলা চালায়। গাড়ির ড্রাইবার এবং আরোহীকে মেরে তারা মেয়েটিকে ধর্ষণ করে। তিনদিন পর রক্তাক্ত অবস্থায় মেয়েটির মৃতদেহ পাওয়া যায়।

মেজরের হাতে ধৃত এই ঘটনার সঙ্গে জড়িত মোজাম্মেল মেজর নাসিরকে তিন লক্ষ টাকা বিনিময়ে মুক্তি দেওয়ার অনুরোধ জানায়। কিন্তু নাসের তাদের কোর্টে চালান করেন। কিছু দিন পর তিনটি নৃশংস খুনের আসামী মোজাম্মেলকে জনসম্মুখে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

www.pathagar.com

এই ঘটনাটি সেনাবাহিনীতে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করে। ফারুক পরে জানান যে, আমরা তখন নিশ্চিত যে দেশ ধ্বংসের দিকে এগুচ্ছে এবং সে সময় আমি এতো উত্তেজিত হয়ে পড়ি যে তক্ষুণি সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলি শেখ মুজিবকে না মারা পর্যন্ত আমার শান্তি নেই। আমি তখন ক্যাপ্টেন শরিফুল হক (ডালিম)-কে বলেছিলাম, 'শারফুল চলো, মুজিবকে খতম করে দেই।' তিনি বলেছিলেন, 'ওই ঘটনার পর প্রমোশন, ক্যারিয়ার এসব ব্যাপারে আমার আর কোন মোহ ছিল না। শেখ মুজিবের প্রতি আমার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলো। আমার তখন একটাই চিন্তা– কিভাবে এই সরকারকে উৎখাত করা যায়।'

এ্যান্থনি ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন– '১৯৭৫ সালের ফ্রেয়ারীর মধ্যেই ফারুকের চূড়ান্ত পরিকল্পনা স্থির হল এবং একটি ক্যুর জন্য তিনি তৈরী হলেন। তখন মেজর রশিদ দেশের বাইরে ছিলেন।'

রশীদ যখন দেশে এলেন তখন ফারুক তাকে বললেন– 'তোমাকে আমার প্রয়োজন। তুমি জাননা ঢাকায় কি ঘটেছে?' দুই বন্ধু তখন শেখ মুজিবকে সরিয়ে দেয়ার দুঃসাহসিক পরিকল্পনার মধ্যে ডুবে গেলেন।

অভ্যুত্থান পরবর্তী রাজনৈতিক পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য শেখ মুজিবের বিকল্প রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব অনুসন্ধানে ব্যস্ত হয়ে পড়েন ফারুক রশিদ।

ফারুক অবশেষে অভ্যুত্থানের প্রাক্কালে জেনালের জিয়ার সাথে যোযোগ করলে জিয়া পরিষ্কার নেতিবাচক জবাব দিয়েছিলেন। ফারুক আশা করেছিলেন দেশের কোটি কোটি নিরন্ন নিষ্পেষিত হতদরিদ্র নৈরাশ্যে ভেঙে পড়া মানুষের অধিকার পুনরুদ্ধারের জন্য এবং স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্ব সুরক্ষার জন্য দেশের গর্বিত সৈনিকেরা সাগ্রহে এগিয়ে আসবে। কিন্তু বাস্তবে ফারুকের এ প্রত্যাশা ম্লান হতে শুরু করল। ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন– 'মেজর হাফিজ কর্ণেল আমিন এবং আহমদ চৌধুরীর মত আরো অনেকে শেষ পর্যন্ত রণে ভঙ্গ দিলেন। কার্যত কেউ এগিয়ে এলেন না।'

ফারুক বলেন– 'দেশের দুরাবস্থার দিকে তাকিয়ে আমি মরিয়া হয়ে উঠলাম। নিজের জীবন নিজেদের ভবিষ্যতের ভাবনা আমার মন থেকে একেবারে মুছে গেল। নিজের প্রতি কোন মায়া অবশিষ্ট রইলো না। শেষ পর্যন্ত একা হলেও মুজিবকে উৎখাতের কাজ আমাকেই করতে হবে। সবাই সরে গেলেও পরিকল্পনা বাস্তবায়নের আকাঙ্ক্ষা আমার কমলো না, বরং আরো দৃঢ় আরো মজবুত হল। কিন্তু তাৎক্ষণিক কৌশল হিসাবে নিরবতা অবলম্বন করলাম। সামাজিক অনুষ্ঠানে

www.pathagar.com

আর পাঁচ জনের মত যাতায়াত শুরু করলাম যাদের সাথে আমার এ সংক্রান্ত আলাপ হয়েছিল তাদেরকে প্রসঙ্গটি ভুলে যেতে বললাম।

এসবের কোন একটি অভ্যুত্থান অকার্যকর এবং বিফল হওয়ার জন্য যথেষ্ট ছিল। কিন্তু ফারুক ছিলেন নির্বিকার। সীমিত শক্তি নিয়ে পাহাড়ের সাথে টক্কর দেবার দুঃসাহসিক অভিযানের নীলনক্সা যথাসম্ভব নিখুঁত করে তোলার চেষ্টা করলেন। এ প্রসঙ্গে ম্যাসকারেনহাস লিখেছেন– 'ফারুকের ডায়েরীতে উল্লেখ ছিল যে ১৪ আগস্ট রাতে বেঙ্গল ল্যানসার এবং সেকেণ্ড ফিল্ড আর্টিলারীর পরবর্তী ট্রেনিং অনুষ্ঠিত হবে। দিনটি শুক্রবার। শুক্রবার দিনটি ফারুকের জন্য অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ তার জন্ম শুক্রবারে। তার জীবনে অনেক উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটেছে এই দিনে। তিনি বিয়েও করেছেন শুক্রবারে, ধর্মীয় কারণেও শুক্রবার তাৎপর্যপূর্ণ। তিনি মনে করেন শুক্রবার এবারও তার জন্য শুভ হবে কারণ ইসলাম ও দেশের স্বার্থে তিনি কাজ করে চলেছেন।'

পঁচাত্তরের ১৫ আগস্ট শুক্রবার ভোর চারটা ৪০ মিনিট। সমগ্র ঢাকা নগরী গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন। ফারুকের বাহিনী বাংলার ভাগ্য হত মানুষের মুক্তির লক্ষ্যে আত্মনিবেদনের জন্য প্রস্তুত। মাত্র ২৮টি ট্যাঙ্ক ১২টি ট্রাক ৩টি জিপ ১০৫টি মি মি হাউইটজার ৪শ' সৈন্য। ফারুক ঢাকার ম্যাপ বিছিয়ে অধিনায়কদের দায়িত্ব ও কর্তব্য নির্ধারণ করে দিলেন। ঘণ্টার কাঁটা ৫ অতিক্রম করল। রাত্রির গাঢ় অন্ধকার ক্রমশ ফিকে হতে শুরু করেছে। সুবে সাদিক সমাগত। মসজিদের মিনার থেকে আযানের ধ্বনি সমস্বরে প্রতিধ্বনি হয়ে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র ঢাকায়। যেন আযানই ছিল কুদরতের নির্দেশ। ট্যাঙ্কগুলো নড়ে উঠল এগিয়ে চলল অকুতভয় সৈনিকরা।

অভিযানের মূল নায়ক ফারুকের নির্দেশ মত যে যার দায়িত্ব সম্পন্ন করার জন্য নির্ধারিত টার্গেটে পৌঁছে গেল সূর্যোদয়ের আগে। অপারেশন সফল হল। শেখ কামাল জামাল প্রতিরোধ করার কারনে মুজিব সপরিবারে নিহত হলেন। সপরিবারে নিহত হলেন সেরনিয়াবত এবং ফজলুল হক মনি। ৫ টার পর অভিযান শেষ হল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে মুজিবের নিহত হওয়ার সংবাদ ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র দেশে। তেরশত আটত্রিশ রজনীর নিকশ অন্ধকারের বুক চিড়ে নতুন একটি সুর্য্যে উদয় হয় সে সূর্য্য মুক্তির ১৫ই আগস্টের প্রভাত সমীরণ নিয়ে এল বসন্তের আমেজ। মুজিব হত্যার সংবাদ সমগ্র দেশে আনন্দের হিল্লোল বয়ে গেল দুর্নীতি ও দুষ্কর্মের সবচেয়ে উঁচু পাহাড়টা ধসে পড়ায় আওয়ামী সন্ত্রাসীদের চিন্তা শক্তি রোহিত হল। কিছু বুঝে উঠার আগেই তারা গণ আক্রোষ থেকে বাঁচার জন্য আত্মগোপন করল। রক্ষী বাহিনী হারিয়ে ফেলল

www.pathagar.com

মনোবল। অভিযানের প্রথম পর্যায়ে তাদের নিউট্রাল করা সম্ভব হল। উচ্চ পর্যায়ে কিছু কর্মকর্তা ছাড়া সামগ্রিকভাবে সমগ্র সেনাবাহিনী উল্লাসিত হল। কোন প্রতিরোধ হলো না কোথাও। মুজিবের জন্য একটি প্রাণীও অশ্রু বিসর্জন করেনি সেদিন। দুপুরে মুজিবের শুন্য স্থান পূরণ করলেন খন্দকার মোস্তাক। সেনা প্রধান বিমাব বাহিনী ও নৌবাহিনী প্রধানরা মোস্তাকের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করলেন। ১৩৩৮ রজনী পর নদীর স্রোত উল্টো দিকে প্রবাহিত হল। বাংলার অবলুপ্ত ও লুণ্ঠিত স্বাধীনতার পুনরুত্থান হল সেদিনই। দেশের স্থবির রাজনীতি স্পন্দিত হল। বিধ্বস্ত জাতি সত্ত্বার আত্মবিশ্বাস ও দেশপ্রেম পুনর্জ্জীবিত হল।

বাকশাল সরকারের ১৮ জন মন্ত্রীর ১০ জন এবং প্রতিমন্ত্রীর ৯ জনের ৮জনই বিপ্লবোত্তর মোশতাক সরকারে যোগ দিয়ে আগস্ট বিপ্লবের সফল অভ্যুত্থানের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করেন অভ্যুত্থানের প্রথম দিনেই পাকিস্তান বাংলাদেশকে সমর্থন দেয়। স্বাধীনতার পর ইসলাম ও ইসলামের সত্যিকার অনুসারীদের প্রতি অব্যাহত নির্যাতনের কারণে সউদী আরব স্বাধীন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি না দিলেও ১৫ আগস্ট বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পরের দিন বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেয়। চীন ও আগস্ট বিপ্লবের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করল বাংলাদেশকে সমর্থন দিয়ে। ভারত ২৫ বছরের চুক্তির সুবাদে বাংলাদেশে সেনা অভিযানের বৈধতা থাকা সত্ত্বেও ভারত সে পথে পা বাড়াল না। এর নৈপথ্য কারণ ছিল, সে সময় পিকিং বেতার এবং ভয়েস অব আমেরিকা আগস্টের অভ্যুত্থানকে বাংলাদেশের আভ্যন্তরীণ ব্যাপার বলে ব্যাপক প্রচারণা চালায়। এই সাথে এই হুশিয়ারী উচ্চারণ করে বাংলাদেশের চলমান পরিস্থিতিতে কোন বিদেশী হস্তক্ষেপ বরদাস্ত করবে না এবং আঞ্চলিক স্থিতিশীলতা বজায় রাখার জন্য তারা প্রয়োজনীয় সব রকম পদক্ষেপ নিতে বিলম্ব করবে না। একদিকে চীন ভারতের সম্ভাব্য হামলা প্রতিহত করার জন্য চীন তার সীমান্তে সৈন্য সমাবেশ করে অন্যদিকে পাকিস্তান ও তার সেনাবাহিনীকে সতর্কাবস্থার নির্দেশ দেয়। এসব কারণে দিল্লীকে তার সহযোগী শেখ মুজিবের পতনকে মেনে নিতে হয় কোন রকম প্রতিক্রিয়া না ব্যক্ত করে অভ্যুত্থানের ১২ দিনের মাথায় জাপান ইরান ও সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ ৩৬টি রাষ্ট্র মোশতাক সরকারকে স্বীকৃতি দেয়।

১৯৭৫ সালের ২২ আগস্ট খন্দকার মোশতাক রাষ্ট্রপতির ৯নং আদেশ বাতিল করে এক অধ্যাদেশ জারি করে। দুর্নীতিবাজ রেডক্রস চেয়ারম্যান গাজী গোলাম মোস্তফাকে তার দায়িত্ব থেকে অপসারণ করে বিচারপতি বি এ সিদ্দিকীকে তার পদে নিযুক্ত করা হয়। একই দিনে দৈনিক ইত্তেফাককে তার মালিকদের নিকট

www.pathagar.com

হস্তান্তর করা হয়। সমস্ত পত্র পত্রিকা থেকে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। ২৪ আগস্ট জেনালের ওসমানীকে রাষ্ট্রপতির নয়া সামরিক উপদেষ্টা নিয়োগ করা হয় একই দিনে ভাসানী ন্যাপের মশিউর রহমান এবং জাতীয় লীগের অলি আহাদকে মুক্তি দেয়া হল। মেজর জেনালের খলিলুর রহমানকে জয়েন্ট চীফ অব ডিফেন্স এবং মেজর জেনারেল সফিউল্লাহর স্থলে জেনালের জিয়াউর রহমানকে আর্মী চীফ অব স্টাফ হিসাবে নিয়োগ দেয়া হয়। বিমান বাহিনীর চীফ অব স্টাফ হিসাবে নিযুক্ত হন এয়্যার ভাইস মার্সাল এম জি তোয়াব।

বাংলাদেশকে ৬১ জেলায় ভাগ করে প্রত্যেক জেলায় যে গভর্ণর নিয়োগ দিতে চেয়েছিলেন তার ৬১টি বরকন্দাজকে, বিপ্লবী সরকার সেটাকে বাতিল করে দেয়। বিপ্লবী সরকার আগের মত ১৯টি জেলা পূর্ণ প্রতিষ্ঠা করে জেলা প্রশাসকের হাতে সংশ্লিষ্ট জেলার দায়িত্বভার অর্পণ করা হয়। দুর্নীতি ও ক্ষমতার অপব্যবহারের অভিযোগে সাবেক উপরাষ্ট্রপতিসহ মুজিব সরকারের ৬ জন মন্ত্রী ১০ জন সংসদ সদস্য ৪ জন আমলা এবং ১২জন ব্যবসায়ীকে গ্রেপ্তার করা হয়। সামরিক বাহিনীর ৩৬ জন দুর্নীতিপরায়ণ অফিসারের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়। মুজিব আমলে আটক দলীয় নেতা ও কর্মীদের মুক্তিদানের জন্য রাজনৈতিক দল সমূহকে তালিকা পেশ করার আহ্বান জানান হয়।

১৫ আগস্টের বিপ্লবী তৎপরতার অধিনায়ক কর্নেল ফারুকের টেস্টামেন্ট

শয়তানের প্রতারণা ও ছলনা থেকে মহান আল্লাহর আশ্রয় ভিক্ষা চেয়ে আমার সকল প্রচেষ্টা, কর্মকাণ্ড ও প্রয়াসে মহান আল্লাহর নিকট সঠিক দিক-নির্দেশনা দানের বিনীত আবেদন রেখে এবং মানবিক দুর্বলতা ও জ্ঞানের অভাবপ্রসূত আমার সকল অনিচ্ছাকৃত আর অপরাপর ভ্রান্তি ও মিথ্যা অহংকারের জন্য মহান আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে সকল সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক পরম করুণাময় ও সর্বশ্রেষ্ঠ ক্ষমাশীল দয়ালু আল্লাহর নামে শুরু করছি ঃ

কেন ১৫ আগস্ট ১৯৭৫?

শেখ মুজিব এবং তার সহকর্মীবৃন্দ আমাদের মুক্তি ও আত্মমর্যাদার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। আমরা অর্থাৎ বাংলাদেশের জনগণ ঐক্যবদ্ধ হয়ে মরণপণ যুদ্ধ করেছিলাম। মুক্তি অর্জন আর আত্মসম্মানবোধ প্রতিষ্ঠা করার জন্য। ইয়াহিয়া খানের পরিবর্তে শেখ মুজিব কিংবা ইন্দিরা গান্ধী অথবা অন্য কোন ক্ষুদে

www.pathagar.com

নবাবকে শাসন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করিয়ে সমাজের বিরাজমান অভিশাপ বয়ে বেড়ানো কিংবা আরো গভীরতর সংকটে নিপতিত হওয়ার জন্য তো আমরা মুক্তি-সংগ্রাম করিনি।

কিন্তু শেখ মুজিবের ক্ষমতায় আরোহণের ফলে জাতি হিসাবে কি পেয়েছিলাম আমরা। আল্লাহর পরিবর্তে জবরদস্তিমূলকভাবে মুজিবকে বানানো হলো দেবতা আর আমাদের অস্তিত্বের স্পন্দন ইসলামের স্থলে আমরা পেলাম মুজিববাদ। কাঙ্ক্ষিত মুক্তি এলো না। গোলামের অবস্থান থেকে আমরা হয়ে পড়লাম নতুন এক শ্রেণীর ক্রীতদাস। আত্মমর্যাদাবোধ আমাদের অর্জন করতে দেয়া হলো না। তার পরিবর্তে করুণা আর উপহাসের পাত্র হয়ে বিশ্বসমাজে আমাদের পরিচিতি হলো 'তলাবিহীন ঝুড়ি' হিসাবে। সমগ্র জাতিকে যে ভয়াবহ আর জঘন্য প্রতারণার জালে আবদ্ধ করা হলো, তার সমুচিত জবাব কি ছিল? সেই বিশ্বাস-ঘাতকতার প্রেক্ষিতে স্বাধীনতা পিয়াসী চির সংগ্রামী জনগণের সামনে আত্মমর্যাদা আর সম্মান পুনরুদ্ধারের জন্য আর কোন পথ কি খোলা ছিল? স্বাধীনতা, মুক্তি, আর নতুন একটি জাতির আত্মমর্যাদাবোধের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা আর বেঈমানী যারা করেছে, তাদের কি পাপের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে না?

মুজিব ভক্তরা যেভাবে প্রচার করতো শেখ মুজিব যদি তেমন কোন দেবতাই হতো তাহলে তার মৃত্যু হয় কিভাবে? অথবা মানবগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত কেউ তাকে কিভাবে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিতে পারে? আর শেখ মুজিব যদি দেবতা না হয়ে রক্ত মাংসের মানুষ হয়, তাহলে তো তাকে মানবতা আর আল্লাহর বিরুদ্ধে কৃত অপরাধের বিচারের সম্মুখীন হওয়ার জন্য আল্লাহর নিকট প্রেরণ করা হয়েছে মাত্র। কোন মানুষেরই তো এমন কোন ক্ষমতা নেই যার উপর নির্ভর করে অন্য কোন ব্যক্তি অথবা কোন গোষ্ঠী নিজের জীবন কিংবা মৃত্যুর উপরে কোন এখতিয়ার, ক্ষমতা আর নিয়ন্ত্রণ আছে বলে দাবী করতে পারে।

আর পাঁচ জনের মত সাধারন মানুষ হিসাবে অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করতে আমার কোন দ্বিধা নেই যে, অন্য কোন ব্যক্তির জীবন অথবা মৃত্যুর উপরে আমার কোন নিয়ন্ত্রণ নেই। তবে অন্যান্য আর সব মানুষের মত আমার সত্তা আর আমার আত্মসম্মানবোধ সংরক্ষণের অধিকার আমারও আছে। স্বাধীনতা আর আত্মমর্যাদাবোধ ব্যতিরেকে মানব জীবন নিরর্থক এবং তা যদি না থাকে তাহলে মানুষ হিসেবে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টির সেরা হিসেবে বেঁচে থাকাটাই অসম্ভবের পর্যায়ে উপনীত হয়।

তখনকার বিরাজমান ভয়াবহ পরিস্থিতি আর অবলুপ্ত সকল পন্থার প্রেক্ষিতে আমার এবং যারা আমাকে ১৫ আগস্ট '৭৫-এর প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন করেছিল

www.pathagar.com

আর যারা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দোয়া করেছিল, তাদের সকলের সামনে এক কথায় সমগ্র জাতির সামনে শুধুমাত্র একটি পথই খোলা ছিল; আর তা হচ্ছে শেখ মুজিব যিনি আমাদের জনগণকে এবং জনগণের সকল কুরবানী আর আশা-আকাঙ্ক্ষা-স্বপ্নকে ভয়ংকরভাবে প্রতাণা করেছিলেন, সেই কথিত দেবতাকে ধ্বংস করা কিংবা কমপক্ষে ধ্বংস সাধনের চেষ্টা করা।

পনের বছর পর আজকে ব্যাপারটি কারো কারো কাছে খুব সহজ মনে হতে পারে। কিন্তু নরকের অতল থেকে উৎসারিত শোচনীয়ভাবে অন্ধকারাচ্ছন্ন মুজিববাদের সেই বিভীষিকাময় দিনগুলোতে এমন পরিবর্তনের কথা চিন্তা করতেও সাধারণ মানুষতো দূরের কথা, অতি সাহসী বিপ্লবীরাও আতংকগ্রস্ত হয়ে পড়তেন। আমদের জন্য বিষয়টি ছিল ভীতিকর এবং ব্যর্থতার আশংকায় ভরপুর- আমাদের বলগাহীন কল্পনাতে কিংবা স্বপ্নেও আমরা ভাবিনি আমরা সফল হতে পারবো। আমরা ধরে নিয়েছিলাম আমরা মড়ব এবং সে মৃত্যু হবে আত্মমর্যাদাবোধ সম্পন্ন মুক্তি ও স্বাধীন মানুষের গৌরবময় শাহাদাত। মুজিবী দুঃশাসনের পশুত্বের জীবন মেনে নিয়ে ক্রীতদাসের মত বেঁচে থাকার চেয়ে আমরা আমাদের নিজেদের ভবিষ্যতের জন্য কোন পরিকল্পনাই করিনি। কারণ, আমরা জানতাম না অথবা চিন্তাও করিনি যে, মৃত্যুর অনিবার্য পরিণতিকে অতিক্রম করে আমরা জীবিত থাকব এবং আমাদের ভবিষ্যৎ বলে কিছু থাকবে। আমাদের সাহায্য করার জন্য, আমাদের পথ দেখানোর জন্য, আমাদের মনে সাহস সঞ্চয়ের জন্য আমরা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করেছিলাম যদিও আমরা তখন নিশ্চিত ছিলাম না সর্বশক্তিমান স্রষ্টা আমাদের এই ক্ষুদ্র জাগতিক জীবনের দৈনন্দিন কর্মধারাকে প্রত্যক্ষভাবে নিয়ন্ত্রণ করেন কিনা, কারণ জাতির সেই অসহায় দিনে আমরা আল্লাহ ব্যতিরেকে আর কারো দিকে সাহায্যের প্রত্যাশায় হাত পাতার কথা ভাবতেই পারিনি।

আমরা বিশ্বাস করি, হতাশার অতল তিমিরে নিক্ষিপ্ত জাতির আশাহীন একটি হেতু আর প্রচেষ্টা (cause)-কে সফল করার প্রয়াসে একমাত্র আল্লাহই পারেন সাহায্য করতে। সীমাহীন নৈরাজ্যজনক যেহেতু আর উদ্দেশ্যে (cause) আমরা ঝুঁকি নিয়েছিলাম আমাদের তখনকার বিবেচনায় আমাদের সর্বোত্তম যে ফলাফল আমরা আশা করেছিলাম তা ছিল মুক্তির প্রয়াসে আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন মানুষের গৌরবময় মৃত্যু।

পনের বছর পূর্বের জাতির গৌরব ও শৌর্যমণ্ডিত সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত যা ঘটেছে তার জন্য কোন পূর্ব পরিকল্পনা ছিল না। কিন্তু দুঃশাসনের পরাকাষ্ঠা

www.pathagar.com

অপদেবতা মুজিবের পতন ঘটেছে। তার তৈরী পূজা পদ্ধতি অর্থাৎ মুজিববাদ আজ বেঁচে আছে শুধুমাত্র মুষ্টিমেয় কয়েকজন মুজিবভৃত্য আর মুজিববাদের কারণে তখনকার দিনে উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত মুজিবী-পুরোহিতদের মনে। জাতির সাথে বেঈমানী করে বৈষয়িক ক্ষেত্রে উপকৃত, ভোগ দখলকারী কায়েমী স্বার্থবাদী সেসব হাতেগোনা বেনিফিসিয়ারী ব্যক্তিবর্গ এখন মুজিব কন্যার উপর দেবত্ব আরোপ করে নুতন এক দেবীরূপে প্রতিষ্ঠিত করে আরেকবার জাতিকে প্রতারণার জালে আবদ্ধ করে লুণ্ঠন করার সুযোগ করে নিতে চায়।

ভবিষ্যত কোন্‌দিকে ?

পনের বছর পূর্বের সেই ঘটনাবহুল দিন থেকে আমার সমস্ত বিশ্বাস আর সকল প্রকার আনুগত্য নিঃশর্তভাবে মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য। আমার দেশের জনগণের মুক্তির লক্ষ্যে সংগ্রামের পথে আমার জীবনকে নিয়োজিত করেছি। নিঃস্বার্থ কুরবানীর এই পথে পনের বছর পূর্বে একজন মানুষ হিসেবে আমি আমার আত্মমর্যাদা পুরুরুদ্ধার করতে পেরেছি এবং যতদিন আমি জীবিত থাকি সেই মর্যাদাবোধ সংরক্ষণের প্রচেষ্টা আমার থাকবে। এই পৃথিবীতে আল্লাহ যতদিন আমাকে রাখবেন, আমি আমার দেশের মানুষের মুক্তি অর্জন আর আত্মসম্মানবোধ জাগ্রত করার সংগ্রামের মধ্য দিয়ে আল্লাহ এবং একমাত্র আল্লাহর এবাদত করে যাব। আমি জানি না আমি সফল হবো কিনা সফলতা কিংবা ব্যর্থতা নিয়ে কোন পরিকল্পনাও করতে চাই না। কারণ, আমি বিশ্বাস করি ফলাফল নির্ধারণ করবেন মহান আল্লাহ। আমার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, আমি আমার দায়িত্ব পালন করতে সাধ্যাতীত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে পারছি।

১৫ আগস্ট, ১৯৭৫ এমনই একটি গৌরবোজ্জ্বল দিন, যা আমার জন্য এবং বাংলাদেশের যন্ত্রনাবিদ্ধ নির্যাতিত মানুষের জন্য আল্লাহর প্রতি অগাধ বিশ্বাস স্থাপন আর সুখী-সুন্দর-শান্তিপূর্ণ-সমৃদ্ধ ভবিষ্যৎ গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অসামান্য আলোকবর্তিকা হিসাবে চিরভাস্বর হয়ে থাকবে। নির্লজ্জ শঠতা, প্রকাশ্য প্রবঞ্চনা আর সীমাহীন দুর্নীতির কুয়াশাচ্ছন্ন জীবনে এবং নিপীড়ন আর অবিচারের তমসাচ্ছন্ন ইতিহাসে একমাত্র এই দিনটিই হচ্ছে আশ্বাসের রূপালী রেখা। যারা মানুষকে দুর্যোগের মুখে ঠেলে দিয়ে নিজেদের দেবতা অথবা দেবীরূপে প্রতিভাত করতে চায়, তাদের জন্য এই দিনটি একটি সতর্ক সংকেত। তাদের জানা উচিত আল্লাহ সর্বশক্তিমান এবং নিপীড়ক আর মুনাফেক গোষ্ঠী সীমালংঘন করলে দ্বিতীয় কোন সতর্কবাণী ব্যতিরেকেই আল্লাহ তাদের ধ্বংস করে দেন। সর্বোপরি,

www.pathagar.com

এই দিনটি স্মরণ করিয়ে দেয় যে, আল্লাহর সাহায্য মুক্তি আর আত্মমর্যাদাবোধ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে সংগ্রামরত জাতির দ্বারপ্রান্তেই অপেক্ষা করছে।

আজকের দিনে বিরাজমান আশাহীন অস্থির পরিস্থিতি, অনিশ্চয়তার জালে আবদ্ধ যন্ত্রণাক্লিষ্ট মানুষের আহাজারি আর শঠতা, দুর্নীতি এবং সর্বোচ্চ আইন ও অবিচারের অভিশাপ আপাতঃদৃষ্টিতে সমাজকে পরিবেষ্টিত করতে চললেও মুজিবী দুঃশাসনের দিনগুলো ছিল আরো ভয়াবহ। সেই অভিশপ্ত দিন যাতে আর ফিরে না আসে এবং বিরাজমান জরাগ্রস্ত সমাজব্যবস্থা যাতে সর্বগ্রাসী ধ্বংসত্মক রূপ পরিগ্রহ করতে না পারে, তার জন্য সর্বপ্রথমে জাতির জীবন থেকে মুজিববাদ হোক, এরশাদবাদ হোক কিংবা আর অন্য কোন মতবাদ হোক– সবকিছু থেকে হৃদয়কে পরিচ্ছন্ন ও নিষ্পাপ করতে হবে। মুক্তি অর্জন আর আত্মসম্মানবোধ পুনঃজাগ্রত করার শক্তি ও সাহস অর্জনের নিমিত্তে একমাত্র আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করতে হবে।

আমার জীবন, আমার মৃত্যু, আমার মুনাজাত, আমার কর্ম, আমার প্রয়াস, আমার কুরবানী– সবকিছু মিলিয়ে আমার সত্তা এবং–

- আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন দেবতা, দেবত্বলোভী ব্যক্তি, নিপীড়নমূলক পদ্ধতি ও প্রতিষ্ঠান কিংবা ব্যবস্থাকে আমি মানি না এবং আল্লাহ ব্যতীত আর কারো নিকট কিংবা অন্যকিছুর নিকট আমি মাথা নত করি না।
- আমি সাক্ষ্য দেই যে, আল্লাহই একমাত্র সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আল্লাহ আমার প্রভু ও জীবনের নিয়ন্ত্রক, আমার আশ্রয়দাতা ও রক্ষাকারী, নিশ্চিত ও শর্তহীনভাবে আমার অস্তিত্বের রক্ষক এবং আমার রিজিকের মালিক।
- আমি সাক্ষ্য দেই যে, হযরত মোহাম্মদ (সা) (আল্লাহ তাঁকে এবং তাঁর সঙ্গীদের শান্তি ও সম্মান প্রদান করুন) হচ্ছেন শেষ নবী এবং আল্লাহর রাসূল।
- আমি সাক্ষ্য দেই যে, পবিত্র কুরআন হচ্ছে মানুষের জন্য আল্লাহর বাণী এবং সর্বোচ্চ আইন।

(দৈনিক মিল্লাত বিশেষ ক্রোড়পত্র ঃ ১৫ আগস্ট, ১৯৯১)

www.pathagar.com

বাংলাদেশ

স্বাধীনতার স্বল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৭০ সালের বহুল প্রচারিত পাকিস্তানী শোসন সংক্রান্ত ধারণা তার গভীরতা হারিয়ে ফেলে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর ব্যবধানের কারণে। ৭০ দশকে স্বাধীনতার মূল নায়ক শেখ মুজিব ও তার অনুগামীদের প্রচারণা গণ মনে যে উন্মাদনার সৃষ্টি করেছিল সেটা স্বাধীনতার প্রথম পর্যায়ে তার শক্তি হারিয়ে ফেলে। মুজিব ভবিষ্যতবাণী করেছিলেন যে স্বাধীনতার পর বাংলার জনগণ পাকিস্তানের অর্ধেক মূল্যে চাউল কিনতে পারবে। অথচ ১৯৭৪ সালে স্বাধীনতার তিন বছরের মধ্যে ১০ গুণ চড়া মূল্যে এখানকার মানুষকে চাউল কিনতে হয়েছে।' শেখ মুজিবের বাংলাদেশ পশ্চিম পাকিস্তানী শোষণ ছাড়াই সবচেয়ে গরীব, স্বাধীনতার কয়েক বছরের মধ্যে তলা বিহীন ঝুড়িতে পরিণত হয়েছে বাংলাদেশ। তাদেরই কল্যাণে টিআইবি এর বিপোর্ট অনুসারে বাংলাদেশ দুনিয়ার সবচেয়ে দুর্নীতি গ্রস্থ দেশ বলে চিহ্নিত হয়েছে।

১৯৭১ সালে এখানকার মাথা পিছু গড় আয় ছিল ৪৭ ডলার ১৯৯২ সালে মাথা পিছু গড় আয় ২০২ ডলারে উন্নীত হলেও পাকিস্তানের মাথা পিছু গড় আয়ের অনেক নীচে। ১৯৬৯-৭০-এর দিকে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে মাথা পিছু গড় আয়ের অনুপাত ছিল ২ : ১। এদেশে তথাকথিত পশ্চিম পাকিস্তানের শোষণ না থাকা সত্বেও এখানকার মানুষের ভাগ্যের কোন পরিবর্তন হয়নি মাথা পিছু গড় আয়ের অনুপাত আগের মতই রয়ে গেছে। এখনো পাকিস্তানে ৫ লক্ষ্য বাঙালী পশ্চিম পাকিস্তানে কর্মরত রয়েছে যাদের আয় বাংলাদেশের জাতীয় আয়ের সাথে যুক্ত হচ্ছে। সিমেন্ট কম্বল, সামরিক সরঞ্জাম এবং অন্যান্য অনেক কিছু আমদানী হচ্ছে যদিও এসব ভারত থেকে আমদানী করা সম্ভব। ভারতের সামরিক বিশ্লেষক সুব্রানিয়ামের প্রত্যাশা ছিল যে স্বাধীন বাংলাদেশ নির্ভেজাল ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি ও আদর্শের মধ্যে অবস্থান করবে। কিন্তু তার ধারণা সঠিক বলে প্রমাণিত হয়নি। বাংলাদেশ শেখ মুজিবের চাপিয়ে দেয়া ধর্ম নিরপেক্ষ নীতি থেকে সরে এসেছে–এখন বাংলাদেশের রাষ্ট্র ধর্ম ইসলাম। এখন ভারতকে সার্কের তিনটি মুসলিম রাষ্ট্রের মুখোমুখি হতে হবে। বর্তমানে শুধুমাত্র কায়েমী স্বার্থবাদী চক্র ছাড়া সাধারণ মানুষের মধ্যে পাকিস্তান বিদ্বেষ তেমন প্রকটভাবে নেই। পাক ভারত ক্রিকেট খেলা হলে বাংলাদেশের মানুষের সত্যিকার অনুভূতির প্রকাশ দেখা যায়।

www.pathagar.com

পাকিস্তান

একাত্তরের যুদ্ধে পাকিস্তানী সেনাবাহিনীর আত্মসমর্পণের মধ্য দিয়ে পাকিস্তানের মানচিত্র থেকে পূর্ব পাকিস্তান বিলীন হয়ে যায়, যার ফলে এর প্রতিক্রিয়া পশ্চিম পাকিস্তানে ভয়াবহ রূপ নেয়। এবং সার্বিক সেনা কমান্ড ভেঙে পড়ে তরুণ অফিসার জেনালেরদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেনাসদর দপ্তরে ইয়ংটাক হিসেবে পরিচিত তরুণ অফিসাররা প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ এবং তার নিকটতম সহযোগী জেনারেলদের বিচারের দাবী করেন।

নতুন প্রেসিডেন্ট জুলফিকার আলী ভুট্টো পরিস্থিতি সামাল দেয়ার জন্য টিভি ঘোষণার মাধ্যমে ১১ জন সিনিয়র জেনারেলকে তাদের দায়িত্ব থেকে অপসারণ করেন। নেভীর পুরো কমাণ্ড বরখাস্ত করা হয়। সেনা অফিসাররা অপমাণিত হতে থাকেন যে কারণে উর্দী পরিহিত অবস্থায় কেউ জন সমক্ষে যেতে সাহস করতো না। কিন্তু ক্রমশ পাকিস্তান ভেঙে যাওয়ার যন্ত্রণা তিথিয়ে আসে। সেনাবাহিনীর সাথে বেসামরিক জনগণের সম্পর্কে আগের মত সৌভ্রাতৃত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। খণ্ডিত পাকিস্তান শুধুমাত্র টিকেই রইল না ধ্বংসস্তূপের মধ্য থেকে তার গর্বিত শির তুলতে শুরু করল। লাহোর অনুষ্ঠিত ইসলামী শীর্ষ সম্মেলন পাকিস্তানকে অন্ধকার থেকে আলোর দিগন্তে টেনে তুলল।

ভারতের সামরিক বিশ্লেষক কে সুব্রানিয়াম ১৯৭২ সালে ভবিষ্যত বাণী করেছিলেন–'পাকিস্তান পরাজিত হয়েছে এবং বিশ্ব রাজনৈতিক মঞ্চ থেকে স্থায়ীভাবে বিদায় হয়ে গেছে। পাকিস্তান আর কখনই তেমন বিশাল বাহিনী গড়ে তুলতে সক্ষম হবে না ফলে পশ্চিম ফ্রন্ট ভারতের জন্য আর কখনো হুমকি হয়ে উঠবেনা।' কিন্তু সুব্রানিয়ামের এ ধারণার বিপরীত চিত্র দেখা গেল পাকিস্তানে। এখানে আগের তুলনায় অনেক বেশী সামরিক স্থাপনা গড়ে উঠল। অনেক বেশী আধুনিক সামরিক সরঞ্জাম সংগ্রহ করা হল। পাকিস্তান ভারতের জন্য হুমকি এ কথাটা কিছু দিনের জন্য অবাস্তব মনে হলেও পাকিস্তানের সামরিক শক্তি আবারো ভারতের জন্য হুমকি হয়ে উঠল।

১৯৭১ সালের যুদ্ধোত্তর পরিস্থিতিতে সুব্রানিয়াম বলেছিলেন পাকিস্তান ভারতের প্রবল প্রতিপক্ষ হিসাবে আর কখনো মাথা তুলতে সক্ষম হবে না এ কথাটা ভুল প্রমাণিত করেছে। পাকিস্তানের বিকাশমান সামরিক শক্তির ব্যাপারে দিল্লীর ক্রম বর্ধমান উদ্বেগ। পূর্ব পাকিস্তানকে হারানোর পর ও দেখাগেল ইসলামাবাদ তার আয়ের বিরাট অংশ সামরিক শক্তি পুনর্বিন্যাসে ব্যয় করছে অকাতরে।

www.pathagar.com

পারমানবিক সম্ভাবনার ক্ষেত্রে সুব্রানিয়ামের বিশ্বাস ছিল খণ্ডিত পাকিস্তান তার প্রতিবেশীদের জন্য কখনো পারমানিবক হুমকি হয়ে উঠবেনা। কিন্তু পরবর্তীতে ভারতের সামরিক বিশ্লেষক এমনকি সুব্রানিয়াম স্বয়ং পাকিস্তানকে ভারত পারমানবিক হুমকি বলে বিবেচনা করেন।

পাকিস্তান তার পূর্বাঞ্চল হারানোর পরও ১৯৭৯ সালের ১৯.৭ বিলিয়ন ডলার জিডিপি ১৯৯১-৯২ সাল নাগাদ ৪৮.০৯ বিলিয়ন ডলারে উন্নীত হয়েছে। এর রপ্তানী আয় (পাট ছাড়াই) ১,২৬২ মিলিয়ন থেকে উন্নীত হয়ে ১৯৯২ সালে ৬ বিলিয়নের ডলারে দাঁড়িয়েছে যা ভারতের রপ্তানী আয়ের এক তৃতীয়াংশ। পাকিস্তানের মাথা পিছু গড় আয় ১৯৭২ সালের ৯০ ডলার থেকে ১৯৯০ সালে ৪০৯ ডলারে উন্নীত হয়েছে। এই একই বছরে পাকিস্তানের বৈদেশিক মুদ্রার রিজার্ভ দাড়ায় ১ বিলিয়ন ডলার। সুব্রানিয়ামের ধারণা ছিল একাত্তরে পরাজিত পাকিস্তান ধর্ম নিরপেক্ষতার পথ ধরবে কিন্তু দেখা গেছে– তার ধারণার বিপরীতে অবস্থানে এসে দাঁড়িয়েছে।

ভারত

ভারতের ব্যাপারে সুব্রানিয়াম বিশ্বাস করতো যে সেখানে সাম্প্রদায়ীক সংকীর্ণতা দূরীভূত হবে। কিন্তু ঘটেছে এর উল্টোটা আধভানীর বিজেপি হিন্দুদের ধ্বংসের দেবী কালীকে সামনে এনেছে নবোদ্দমে ধ্বংস যজ্ঞের প্রস্তুতির জন্য। নির্ভেজাল হিন্দু রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে বিজেপি অঙ্গীকারই সাম্প্রদায়িক বিষবাস্প ছড়িয়েছে ভারতে।

সুদ্রানিয়াম পূর্ব পাকিস্তান সমস্যা সমাধানের সাময়িক হস্তক্ষেপ করার জন্য ইন্দিয়া গান্ধীকে ধন্যবাদ জানান এ কারণে যে পূর্ব পাকিস্তান ভারতের প্ররোচনা ও প্রত্যক্ষ সহযোগিতায় স্বাধীন বাংলাদেশের উত্থান হওয়ার কারণে নাগামিজো ও অহমিয়াদের স্বাধীনতা আন্দোলনের পশ্চাৎ ভূমি হিসেবে বাংলাদেশ ব্যবহৃত হবে না। কিন্তু বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার ২০ বছর পর সেই একই অভিযোগ পুনরাবৃত্তি হতে শুরু করেছে যেমনটি বলা হত মিজো নাগাদের আশ্রয় হল পাকিস্তান অনুরূপ আজকে বলা হচ্ছে বাংলাদেশ-ভারতের বিদ্রোহীদের আশ্রয় ও প্রশয় দিয়ে আসছে। ভারত থেকে বাংলাদেশে উদ্বাস্তুদের পুশ ব্যাক করে চলেছে। একাত্তরের পর ভারত প্রত্যাশা করেছিল যে তাদের জন্য পুর্বাঞ্চলীয় হুমকি স্থায়ী ভাবে তিরোহিত হয়ে যাবে। ১৯৬৯ সালে যেখানে পূর্ব–পাকিস্তনে

www.pathagar.com

১ ডিভিশন সৈন্য অবস্থান করত সেখানে বর্তমানে বাংলাদেশের রয়েছে ৫ ডিভিশন সৈন্য এবং বিমান বাহিনীর যে শক্তি বর্তমান রয়েছে তার মোকাবিলায় ভারতের বিমান বাহিনীর ১১ স্কোয়াড্রন প্রয়োজন হবে।

স্বাধীনতার প্রথম দিন থেকে বাংলাদেশের জনগণের মন মানসিকতা ভারত বিরোধী হয়ে উঠে। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ভারতের প্রতি এদেশের মানুষের যে দুর্বলতা ছিল স্বাধীনতার প্রথম দিনেই সেটা দুর হয়ে যায়, এর কারণ হল ত্রদেশের হিন্দু এবং ভারতীয় হিন্দুদের ধৃষ্টতাপূর্ণ উদ্ধত আচার-আচরণে এদেশের মানুষ ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে। এছাড়াও ভারতীয় সেনাবাহিনীর নির্বিচার লূণ্ঠন পরিত্যাক্ত অস্ত্র সস্ত্র ও সামরিক সাজ-সরঞ্জাম এমন কি শিল্প কারখানা যন্ত্রপাতি ভারতে স্থানান্তর করার কারণে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষ ক্রমশ ভারত বৈরী হয়ে উঠে। ১৯৭১ সালের ৬ ডিসেম্বর টাইম ম্যাগজিনের ভবিষ্যত বানী করা হয়েছিল যে স্বাধীনতার সহযোগী ভারতীয় সেনাবাহিনী অবশেষে দখলদার হিন্দু বাহিনীতে পরিণত হবে। এই ভবিষ্যৎ বাণী তখন সত্য বলে পরিগণিত হয়েছিল।

ভারতীয় বিশ্লেষকরা পূর্বাভাষ দিয়ে ছিলেন চীন এবং যুক্ত রাষ্ট্রের প্রভাব কমে যাবে তাদের এ ধারণাও মিথ্যে প্রমাণিত হয়েছে। ভারত আমেরিকার যৌথ নৌ মহড়া এবং টেকনোলজি স্থানান্তর ইত্যাতি এখনো অব্যাহত রয়েছে।

সুব্রায়িনামের মতে পূর্ব পাকিস্তানের পতনের মধ্যদিয়ে আঞ্চলিক অথবা জাতিগত আন্দোলন থিতিয়ে যাবে। কিন্তু সেটা হয়নি শিখরা স্বাধীন খলিস্তানের দাবীতে সোচ্চার শ্রী নগর উপত্যাকায় কাশ্মীর কাশ্মীরীদের জন্য স্বাধীনতার এই আওয়াজ প্রতিধনিত হচ্ছে। ইন্দিরা গান্ধী পূর্ব পাকিস্তানে আঞ্চলিকতার যে বীজ বপণ করেছিলেন সেটা পাকিস্তানকে তো টুকরো করেছে। সেই আঞ্চলিকতাবাদের নব দানব এখন ভারতের উপর ভর করেছে।

সুব্রানিয়ামের একটি বক্তব্য সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে সেটা হল ভারত জাতি এবং আন্তজাতিক ক্ষেত্রে এমন একটা ইমেজ গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছে যে বড় বড় পরাশক্তিদের নাকের ডগায় তাদের পছন্দ নয় এমন পরিকল্পনা বাস্তবায়নে ভরত সক্ষম।

পাকিস্তানকে টুকরো করতে গিয়ে ইন্দিরা গান্ধী ভারতের বিপুল অর্থ ব্যয় করেছেন। কিন্তু তার জনগণের কল্যাণে তার গরীবী হটাও প্রকল্প এক মিলি

www.pathagar.com

মিটার ও অগ্রসর করতে পারেননি। পাকিস্তান টুকরো হওয়ার ৩ যুগ পর ১৯৯১ সালে পূর্ব পাকিস্তানে ভারতের নির্লজ্জ ভূমিকার পূর্নমূল্যায়নের ব্যাপারে ভারতীয় নেতৃবৃন্দের উচিত ছিল আবেগ বিবর্জিত পদক্ষেপ নেয়া। একাত্তরে কে কতটুকু লাভবান হয়েছে এটা বিচার বিশ্লেষণ হওয়া জরুরী।

সবচেয়ে মজার ব্যাপার হল পাকিস্তানকে ভাঙবার জন্য যারা মূলত দায়ী তাদের একজনেরও মৃত্যু স্বাভাবিক হয়নি। শেখ মুজিব সবংশে নিপাত হয়েছে তাজুদ্দিন সোনার বাংলার সোনার সন্তানদের দ্বারা বেয়নট বিদ্ধ হয়ে নিহত হয়েছে। ভুট্টোর ভাগ্যে জুটেছে ফাঁসির দড়ি আর ইন্দ্রিরা গান্ধী দেহরক্ষীর ব্রাশফায়ারে তলপেট ঝাজড়া হয়ে মারা যায়। চট্রগামে জিয়াউর রহমান তার উপরোক্ত অবাঙালী আফিসারদের হত্যা করে যেভাবে স্বাধীনতা যুদ্ধের সূচনা করেছিলেন সেই চট্টগ্রামের মাটিতে তার অধস্তন অফিসারদের গুলিতে জিয়ার বুক ঝাঝরা হয়ে যায় এটাই হল ইতিহাসের অনিবার্য পরিণতি। আর এখানেই ইতিহাসের শেষ নয়।

রাজনীতিক ও বুদ্ধিজীবিদের প্রবণতা

১৯৯১ সালের নির্বাচনের সময় পাশ্চাত্যের বিভিন্ন দেশ থেকে বিপুল সংখ্যক পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিক বাংলাদেশের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আসেন। এটা কোন স্বাভাবিক ঘটনা ছিল না। নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের পরও এই ধারা বিদ্যমান ছিল। নির্বাচনের পরও ঐ বিশেষ একটি মহল গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবীতুলে বিদেশী শক্তির দ্বারস্থ হয়। এদেশের পঁচে যাওয়া বখে যাওয়া বুদ্ধিজীবীরা সরকারী ভূমিকার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ সভা করে স্মারক লিপি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস যুক্ত রাজ্যের হাইকমিশন এবং আরো কতিপয় আধিপত্য-বাদী রাষ্ট্রের দূতাবাসসমূহে ধর্ণা দিতে দেখা গেছে। এরা বিশেষ একটি লবির সাথে সংশ্লিষ্ট এবং বিশেষ রাজনীতির ধারক। এরা সব সময় ঔপনিবেশিক শক্তির দালাল হিসেবে এদেশের রাজনীতিতে প্রাধান্য বিস্তার করে রাখতে চায়।

১৯৯৪ সালের অক্টোবরে অস্ট্রোলিয়ার এক সাবেক পররাষ্ট্র মন্ত্রী নিনিয়েন স্টিফেন বৃটিশ কমন ওয়েস্থ সেক্রেটারী এমেকার প্রতিনিধি হিসাবে ঢাকায় এসে ১ মাস ৪ দিন ধরে আওয়ামী লীগ বিএনপি এবং আরো কোন কোন দলের নেতাদের, সেই সাথে এনজিও কর্তাদের নিয়ে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার

www.pathagar.com

সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। বিদেশীদের ডেকে আনার ব্যাপারে তখনকার বিরোধী দল অনেক দূর এগিয়ে যায়। জনগণের কাছে ধর্ণা না দিয়ে আধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের আশ্রয় কামনা করে। ১৯৯৬ সালে অনুরূপ নির্বাচনের মধ্যদিয়ে আওয়ামী লীগ ক্ষমতাসীন হলে বিএনপি বিরোধী দলের অবস্থানে থেকে বাংলাদেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার দাবী নিয়ে অধিপত্যবাদী শক্তিসমূহের দ্বারস্থ হয়।

বিগত ২৭ অক্টোবর রাত ১২টায় বিএনপি সরকারের ক্ষমতায় থাকার মেয়াদ ৫ বছর পূর্ণ হয়। কিন্তু আওয়ামী লীগ আন্দোলন শুরু করে এর দু'ঘণ্টা পূর্বে। আন্দোলনের রূপ ছিল চরম উত্তেজনাপূর্ণ সহিংস ও ভয়াবহ। আন্দোলনের প্রথম দিনেই অন্তত ৬০ জনের প্রাণ হানি ঘটেছে। সরকারী ও বেসরকারী সম্পত্তিও প্রচুর নষ্ট হয়েছে আওয়ামী লীগ অবরোধ আন্দোলন দিয়ে ঢাকা শহরকে সারাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখতে চেয়েছে। প্রতিরোধ আন্দোলন চলেছে প্রায় এক মাস।

২৮ অক্টোবর জোট সরকারের ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন আওয়ামী লীগের নেতা কর্মীরা চারদলীয় জোটের নেতা-কর্মীদের ওপর ঝাপিয়ে পড়ে। রাস্তায় লাঠি পেটা করে হত্যা করে। বেশ কয়েক জনকে হত্যা করে লাশের ওপর নৃত্য করতে থাকে। এ দৃশ্য টেলিভিশনের পর্দায় দেখেছে দুনিয়ার মানুষ। দুনিয়ার বিবেকবান মানুষই শুধু নয় আমিকার রাষ্ট্রদূত এ দৃশ্য দেখে চোখের পানি ফেলে ধিক্কার জানিয়ে ছিলেন আওয়ামী বর্বরতাকে। এখন বাংলাদেশের রাজনীতি অর্থনীতি সাংস্কৃতি সকল গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারে মার্কিন কর্তৃত্ব প্রকট। এইসাথে রয়েছে ইউরোপীয় ইউনিয়ন। দেশের সবরকম সংকটের মূলে রয়েছে সেইসব রাজনৈতিক দল যাদের সম্পৃক্ততা রয়েছে বিদেশী দূতাবাসসমূহের সাথে রয়েছে সেইসব বুদ্ধিজীবী কথায় কথায় যারা বিদেশী কূটনীতিকদের সাথে সলা পরামর্শে ব্যাকুল হয়ে থাকে। বিদেশী কূটনীতিকরাও এসব মেরুদণ্ডহীন দালালদের নিয়ে খেলা করতে আনন্দ পায়।

আওয়ামী লীগের ধারণা নির্বাচন কমিশন পুনর্গঠন, হাসান আজিজ জাকারিয়াকে সুকৌশলে এড়িয়ে যাওয়া সব শেষে প্রেসিডেন্ট ডঃ ইয়াজউদ্দিনের তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পদ থেকে বিদায়; সব কিছু রাজ পথের আন্দোলনের মধ্য দিয়ে সুরাহা করতে পেরেছে। আওয়ামী লীগের ধ্বংসাত্মক আন্দোলন জ্বালাও পোড়াও ও হত্যা বিদেশী কূটনীতিকদের মধ্যে কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করতে পেরেছে

www.pathagar.com

বলে মনে হয় না। তাদের এক তরফা চাপ ছিল প্রেসিডেন্টের উপর। প্রেসিডেন্ট চাপের মুখে বলিষ্ট সিদ্ধান্ত নিতে পারেনি।

দেশের অভ্যান্তরিণ ব্যাপারে বিদেশী রাষ্ট্রগুলোর একটি দলের পক্ষ হয়ে বিবৃতি প্রদান ছাড়াও ২২ জানুয়ারীর নির্বাচনে তাদের পর্যবেক্ষক প্রত্যাহার করে নেয়া হয়।

কোন দেশের রাজনীতিতে কূটনীতিকদের নির্লজ্জ হস্তক্ষেপ নেই

মিশন প্রধানদের বাসায় দলের নেতাদের চায়ের আমন্ত্রণ জানিয়ে শলা পরামর্শ উপদেশ অথবা নির্দেশ দান করা শুধুমাত্র বাংলাদেশই সম্ভব হয়েছে। পৃথিবীর অন্য কোথাও এমন নজীর আছে বলে মনে হয় না। প্রতিবেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারে এক যুগের ওপর মানবাধিকার লঙ্ঘন ও সেনা শাসন চলছে। নির্বাচনে বিজয়ী নেত্রী ওয়াংসান সুকীর কারাবরণ রয়েছে অব্যাহত, সেখানে কোন অবস্থায় কূটনৈতিক মিশনগুলো মিয়ানমার সরকারের ওপর চাপ প্রয়োগ করতে পারছে না। এমনকি থাইল্যাণ্ডের সেনা শাসন নিয়েও বিদেশী রাষ্ট্র ভারতের অঙ্গ রাজ্য পশ্চিম বাংলার মূখ্য মন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের কোন এক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করার কারণে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের প্রধানকে ক্ষমা চাইতে হয়েছে। মূখ্য মন্ত্রী বলেছেন–আপনাদের কর্মকাণ্ড কূনৈতিক পাড়ায় সীমাবদ্ধ। রাষ্ট্রের কোন কাজ তদারকি করার দায়িত্ব আপনাদের ওপর ও বর্তায় না এটা কূটনৈতিক শিষ্টাচার বর্হিভুত দূতাবাস প্রধান তার দেশের রাষ্ট্র প্রধানকে জানালে রাষ্ট্র প্রধান বিষয়টি নিয়ে মনমোহন সিং-এর সাথে কথা বলেন তাতে তাদের লাভ হয়নি কিছুই। মনমোহন সিং ও সোনিয়া গান্ধী উভয়েই জবাব দেন বুদ্ধদেব যা বলেছে সেটা রাষ্ট্রীয় ধৃরাষ্ট্র প্রধানের বলার কিছু থাকে না। কিন্তু আমাদের দেশের চিত্র সার্বভৌমত্বের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এরপর মিশন প্রধান ও সংশ্লিষ্ট ভিন্ন দেশ আমাদের অনৈক্যের সুযোগটা পুরোমাত্রায় নিচ্ছে। বিদেশী দূতাবাসগুলো কারণে অকারণে সংকটে অসংকটে যেভাবে আমাদের নেতৃবৃন্দ বিদেশী দূতাবাসগুলোতে ধর্ণা দেয় ক্ষমতা লাভের হীন স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য তাতে মনে হয় বাংলাদেশকে সুন্দর ও সাবলীল ভাবে চালিয়ে নেয়ার যোগ্যতা কোন দলের কোন নেতৃবৃন্দেরই নেই।

www.pathagar.com

ভারতের প্রত্যাশাও বাংলাদেশের পানি সংকট

যখন যুক্ত বাংলার বিভাজন অনিবার্য করে তুলল ভারত তখন পূর্ব পাকিস্তানের নিরাপত্তা ও অস্তিত্বের জন্য সমকালীন মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ ও মুসলিমগণ প্রতিনিধিরা ১৯৪৬ সালে দিল্লীতে এক যৌথ অধিবেসনে মিলিত হলে সোহরাওয়ার্দী এক পাকিস্তানের প্রস্তাব উত্থাপন করেন এবং সর্বসম্মতিক্রমে সেটা গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব অনুযায়ী খণ্ডিত বাংলার একটি অংশ পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের অন্তর্ভূক্ত হয়। পাকিস্তান তার সীমিত সামর্থ দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানকে ভায়াবল করে তুলে। নেহেরু গান্ধী মাউন্ট ব্যাটেন মনে করত পূর্ব পাকিস্তান ভায়াবল হবে না। হিন্দু নের্তৃবৃন্দ সৃষ্ট সব ধরনের সংকট মুকাবিলা করে যখন পূর্ব পাকিস্তান সত্যিকার অর্থে ভায়াবল হয়ে উঠল তখনই পূর্ব পাকিস্তানকে বিচিছন্ন করার জন্য মরিয়া হয়ে উঠে দিল্লী। এদেশের পঞ্চম বাহিনী অপশক্তি তাদের ভাষায়। ব্যবহার করে পাকিস্তান থেকে পূর্ব পাকিস্তান অর্থাৎ এ অঞ্চলকে এ দেশকে বিচ্ছিন্ন করে ক্ষ্যান্ত হল না ভারত তলা বিহীন ঝুড়িতে পরিণত করল। আজো সেই প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। ভারতীয় নেতৃবৃন্দ বাংলাদেশের অগ্রগতির অন্তরায় এ ব্যাপারে কিছুটা আলোকপাত হওয়া জরুরী।

বাংলাদেশের কাছে ভারতের অনেক প্রত্যাশা। ত্রিপূরা ও আসামের সাথে দ্রুত যোগাযোগের জন্য ভারত চায় একদিকে শিয়ালদহ জয়দেবপুর যাত্রীবাহী ট্রেন যোগাযোগ অন্য দিকে আখাওড়া রেলওয়ে লিঙ্ক। ভারত চায় বাংলাদেশী গ্যাস এজন্য বাংলাদেশ থেকে ভারত পর্যন্ত গ্যাস লাইন এবং বিদ্যুৎ লাইন। আরো চায় চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহার করতে। এছাড়াও আরো অনেক প্রত্যাশা রয়েছে ভারতের। কিন্তু বাংলাদেশ ভারত দ্বিপক্ষীয় সম্পর্ক সাবলীল করে তোলার ব্যাপারে ভারত স্বয়ং অসংখ্য বিঘ্ন সৃষ্টি করে রেখেছে। স্বাধীনতার প্রথম প্রভাত থেকে ভারত বাংলাদেশের সাথে অসম ঔপনিবেশিক আচরণ করার ফলে দুটো সার্বভৌম রাষ্ট্রের সম্পর্ক কখনই সাবলীল হয়ে উঠেনি। দ্বিপক্ষীয় সম্পর্কের ক্ষেত্রে এখনো অন্তরায় হয়ে রয়েছে বাণিজ্যিক ঘাটতি বাংলাদেশী পণ্যের শুল্ক মুক্ত প্রবেশাধিকারের প্রশ্ন, তিস্তার পানি বণ্টন, আন্তনদী সংযোগ প্রকল্প, ভারতের টিপাই মুখী বাঁধ সমাধানের কোন উদ্যোগ আজো নেয়া হয়নি। বাংলাদেশ ভারত বাণিজ্য অসম এবং ভারতের অনুকুলে। ভারত বাংলাদেশে যা রপ্তানী করে আমদানী করে অনেক কম। ভারতে বাংলাদেশের কিছু কিছু পণ্যের চাহিদা থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন ধরনের ট্যারিফ এবং প্যারা ট্যারিফের কারণে ভারতের আমদানী কারকরা সেসব পণ্য আমদানী করতে উৎসাহ বোধ করে না। এ কারণে

www.pathagar.com

বাংলাদেশ তার পণ্যের শুল্কমুক্ত প্রবেশের দাবী জানিয়ে সেটা আদায় করতে পারেনি আজ অবধি। এর ফলে বাণিজ্য ঘাটতি বেড়েই চলেছে। নব্বই এর শুরুতে বাংলাদেশে ভারতীয় রপ্তানী ছিল ১৪/১৫ কোটি ডলার এখন সেটা ২০০ কোটিতে দাঁড়িয়েছে। বাণিজ্য ঘাটতি পূরণের জন্য ভারতে বাংলাদেশী পণ্যের ব্যাপক রপ্তানী প্রয়োজন। কিন্তু সেটা হয়ে উঠছে না। ইতিমধ্যে অবাধ বাণিজ্যের কথা বলা হচ্ছে। যেটার পরিণতি মুজিব আমলের সীমান্ত বাণিজ্যের অনুরূপ ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। ওদিকে বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলছে ভারতের সাথে অবাধ বাণিজ্য বাংলাদেশ তেমন লাভ হবে না। বিশ্ব ব্যাঙ্কের বক্তব্য হল দুই দেশের মধ্যে অনানুষ্ঠানিক অবৈধ বাণিজ্য বন্ধ করা সম্ভব হলে বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য ভাল হবে। আনুষ্ঠানিক বাণিজ্যের তুলনায় অনানুষ্ঠানিক বাণিজ্যের পরিমাণ ৩ গুণ ফলে বাংলাদেশের অর্থনীতি ক্রমশ ফোকলা হয়ে যাচ্ছে।

ভারত আজ উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলোতে পণ্য সরবরাহের জন্য ট্রানসিপমেন্ট দাবী করছে অথচ বাংলাদেশে বাংলাবান্ধা ও নেপালের কাকর ভিটার মধ্যে যোগাযোগের ট্রানজিট সুবিধা পাচ্ছে না। তারা এখানে নিরাপত্তার প্রশ্ন তুলছে। বাংলাদেশ তার জন্ম থেকে ভারতের পানি আগ্রাসনের সম্মুখীন। তিস্তাসহ অভিন্ন নদীগুলোর ন্যায্য পানি বণ্টনের এবং দীর্ঘ মেয়াদি গঙ্গা পানি চুক্তির ওপর বাংলাদেশ গুরুত্বারোপ করলেও ভারতীয় নেতৃবৃন্দের সদিচ্ছার অভাবে পানি সংক্রান্ত সমস্যা জটিল থেকে আরো জটিল হচ্ছে। ২০০৫ সালের সেপ্টেম্বরে ঢাকার নদী কমিশনের বৈঠকে তিস্তার পানি বণ্টন নিয়ে সর্বশেষ আলোচনায় ভারত জানায় ৬টি নদী (ধরলা, ধুধকুমার, মনু খোয়াই গোমতী ও মুহুরী) এর সমীক্ষা শেষ করতে চায়। এর অর্থ আর কিছু নয় ভারতের সময় ক্ষেপনের কৌশল। সাবেক প্রধান মন্ত্রী বেগম জিয়া পানি সমস্যা নিয়ে আলোচনার জন্য ভারত সফরে গেলে গজল ডোবায় এক তরফা পানি প্রত্যাহর করে দিল্লী তার সদিচ্ছা জ্ঞাপন করেছিল। এতে তিস্তা ব্যারেজের পানি কমেছিল অস্বাভাবিক সেচ নির্ভর ১ লাখ ১২ হাজার হেক্টর জমি বিপর্জয়ের মুখে পড়েছিল। গঙ্গার পানি বণ্টনের চুক্তির প্রথম কিস্তিতে ভারত বাংলাদেশকে ২৯ হাজার কিউসেক পানি কম দিয়েছেন হাড্রিজ ব্রিজের ১৫টি গাড়ারের ৯টি পানি নয় বালির উপর দাঁড়িয়ে আছে। পানি সম্পদ মন্ত্রনালয় থেকে বলা হয়েছে চলতি বছর অর্থাৎ ২০০৭ এর জানুয়ারী থেকে বাংলাদেশ ভারতের মধ্যে পানি বণ্টন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সিডিউল অনুযায়ী ভারত বাংলাদেশকে ২৯ হাজার ৫৫০ কিউসেক পানি কম দিয়েছে। এবার ১ লাখ ৭ হাজার ৫১৬ কিউসেক পানির প্রবাহ নিশ্চিত করার

www.pathagar.com

কথা ছিল। কিন্তু পানি সরবরাহ করা হয় ৭৭ হাজার ৯৬৬ কিউসেক। পানি উন্নয়ন বোর্ডের হাইড্রোলজি বিভাগ সূত্রে জানা যায় গত ১০ বছর থেকে বাংলাদেশ পানির ন্যায্য হিস্যা থেকে বঞ্চিত। যৌথ নদী কমিশনের পক্ষ থেকে ভারতের কাছে তীব্র প্রতিবাদ জানানো হয়েছে। জিকে প্রজেক্ট এখন আর পানি নেই পদ্মার বুকে এখন চাষাবাদ হচ্ছে।

ভারতের আন্ত নদী সংযোগ প্রকল্প ও টিপাই মুখী বাঁধ বাংলাদেশের পানি সমস্যা আরো প্রকট করে তুলছে। টিপাই মুখে বাধ নির্মাণের কারণে সুরমা নদীর পানি প্রবাহ গত দশ বছরে ৮০ শতাংশ কমেছে। আর সুরমা নদীর ভাটিতে কম পক্ষে ৩ কিলোমিটার মরে গেছে। আন্ত নদী সংযোগ প্রকল্পের কাজ শুরু হলে বাংলাদেশ মুখী পানি প্রবাহ শূন্যের কোঠায় এসে পৌঁছাবে।

হুমকির মুখে বাংলাদেশের নিরাপত্তা

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর এদেশকে অকার্যকর করে তোলার ব্যাপারে দেশী-বিদেশী যড়যন্ত্র অব্যাহত রয়েছে। এদেশের অস্তিত্ব বিপন্ন না হওয়া পর্যন্ত ষড়যন্ত্র অব্যাহত থাকবে। বাংলাদেশের স্বতন্ত্র অস্থিত্ব ভারতের হিন্দু নেতৃবৃন্দের মাথা ব্যথা। অখণ্ড ভারতের অবয়বে বাংলাদেশকে বিলীন করার স্বপ্ন এখনো হিন্দু নেতৃবৃন্দকে তাড়িয়ে নিয়ে ফিরছে। দক্ষিণ এশিয়া থেকে বাক্ষণ্যবাদীরা বৌদ্ধদেরকে যেভাবে উৎখাত করেছে। অনুরূপে পন্থা অবলম্বন করা হয়েছে উপমহাদেশের মুসলমানদের ক্ষেত্রে। ব্রাক্ষণ্যবাদী সমাজ কাঠামোর মধ্যে বৌদ্ধবাদের জন্ম। বলতে গেলে বৌদ্ধবাদ ছিল ব্রাক্ষণ্যবাদের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিদ্রোহ। এটা ছিল তৎকালীন ঘুণে ধরা সমাজে প্রগতিশীল ব্যবস্থা উপ-মহাদেশের নির্যাতিত জনগোষ্ঠী বৌদ্ধবাদে আশ্রয় নিয়ে মুক্তির নিঃশ্বাস নিতে থাকে এমনকি উপমহাদেশের রাষ্ট্র কাঠামো ও দখল করে বৌদ্ধবাদীরা। চতুর ব্রাক্ষণ্যবাদী বৌদ্ধবাদ উৎখাতের ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয়। তারা প্রকাশ্য বিরোধীতাকে এরিয়ে বৌদ্ধবাদীদের মধ্যে ভাঙন সৃষ্টির উদ্যোগ নেয়।

প্রথমত তারা ব্রাক্ষণ্যবাদীদের মধ্যেকার অধৈর্য্যদের সন্ধান করে এবং তাদেরকে বিভিন্নভাবে প্রলুব্ধ করা হয়। এমনকি মসনদে আরোহণের ব্যাপারেও মহাবিষ্ঠ করা হয়। ধীরে ধীরে তাদেরকে ব্রাক্ষণ্য সাংস্কৃতির ধারকে পরিণত করা হয়। অবশেষে বৌদ্ধবাদীদের দ্বিধাবিভক্ত করা হয়। মহাযান ও হীনযান এই দুই ভাগে

www.pathagar.com

বৌদ্ধবাদীরা বিভক্ত হয়ে পড়ে। ব্রাহ্মণ্য সাংস্কৃতি ও হিন্দু সাংস্কৃতি যারা গলাধকরণ করেছিল তারা মহাযান হিসাবে পরিচিত। আর যারা নির্ভেজাল বৌদ্ধবাদ আকড়ে ব্রাহ্মণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে সক্রিয় ছিল তাদেরকে বলা হত হীনযান। মহাযানদের ব্রাহ্মণ্যবাদীরা প্রগতিশীল হিসাবে চিহ্নিত করে তাদের পৃষ্ঠপোষকতা দান করে এবং তাদেরকেই বৌদ্ধবাদ উৎখাতে পঞ্চম বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করে। যেমন করে মুসলিম শক্তিকে বিপর্যস্ত করার জন্য ব্রাহ্মণ্যবাদী চক্র শেখ মুজিবও আওয়ামী লীগকে পঞ্চম বাহিনী হিসাবে ব্যবহার করেছিল প্রকৃতপক্ষে এরা মহাযানের ভূমিকা নিয়েছিল। আর যারা তাদের আদর্শকে সমুন্নত করতে চেয়েছিল এবং নিঃস্বার্থভাবে দেশ ও জাতির জন্য সংগ্রাম করেছিল তাদেরকে দালাল হিসাবে চিহ্নিত করে হত্যা নির্যাতন করেছিল এবং দৃশ্যপটের বাইরে ঠেলে দিয়েছিল। আজো ব্রাহ্মণ্যবাদীরা বাংলাদেশের মানুষকে ছলেবলে কৌশলে এবং মিডিয়ার উপর প্রভাব বিস্তার করে জাতীয় ঐক্য বিনষ্ট করে চলেছে। জাতিকে বিভক্ত করে ফেলেছে দুটো শিবিরে। একটি পক্ষ্য প্রকাশ্য অথবা নেপথ্যে তাদের অনুগত ভৃত্যের ভূমিকায় রয়েছে। এরা চায় বাংলাদেশকে ভারতের হাতে তুলে দিতে। অর্থাৎ এইসব পঞ্চম বাহিনী মহাযানদের দিয়ে অখণ্ড ভারত প্রতিষ্ঠার অসমাপ্ত কর্মকে এগিয়ে নিয়ে যেতে।

বাংলাদেশের বিরোধী তৎপরতা

এ বছর অর্থাৎ ২০০৭ সালের ১০ জানুয়ারী নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের উদ্যোগে কোলকাতায় বাংলাদেশ উপ হাইকমিশনের সামনে বাংলাদেশ বিরোধী কিছু দাবী দাওয়া বাস্তবায়নের দাবিতে বিক্ষোভ কর্মসূচী পালন করে। ইংরেজী ও বাংলায় লেখা প্লেকার্ড ছিল তাদের হাতে। প্লাকার্ডগুলোতে লেখাছিল প্রেসিডেন্ট ডক্টর ইয়াজুদ্দিন আইএসআই এর চর। বাংলাদেশ ভেঙে সংখ্যালঘুদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চায়। Bangladesh centre of slamic terrorist, Destroy the terrorist Bangladesh. ইত্যাদি ধরনের শ্লোগান। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বলেন বাংলাদেশ থেকে ভারতে চলে যাওয়া উদ্বাস্তদের বাংলাদেশ সরকারকে ফেরত নিতে হবে। বাংলাদেশে বসবাসকারী ৩ কোটি সংখ্যালঘুদের জন্য আলাদা রাষ্ট্র গঠন করতে হবে। বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় বাদ পড়া সংখ্যালঘুদের অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। এই বিক্ষোভ মিছিলের সময় পশ্চিম বঙ্গ সরকার কোলকাতাস্থ বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনের নিরাপত্তার ব্যবস্থা নিলে ও

www.pathagar.com

কেন্দ্রীয় সরকার ও ভারতীয় গোয়েন্দা সংস্থা র'এর আশির্বাদ রয়েছে এদের কর্মকাণ্ডের প্রতি। হিন্দু সন্ত্রাসীদের একটি সংগঠন ভারত সেবাশ্রম সংঘ এদের অনেক কর্মকাণ্ডের বৈষয়িক সহযোগিতা দিয়ে থাকে।

বাংলাদেশ বিরোধী এ ধরনের তৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে অনেক সংগঠন। যেমন : (১) স্বাধীন বঙ্গভূমি (বঙ্গ সেনা), (২) বিএলও (বঙ্গভূমি থেকে ভেঙে আনা অংশ), (৩) বাংলাদেশের রিফিউজি সমিতি, (৪) ভারত বাংলাদেশ মৈত্রী সমিতি, (৫) ক্যাম্প, (৬) সোনার বাংলা ডেমোক্রিটিক পার্টি, (৭) স্বদেশীগণ জাগরণ মঞ্চ, (৮) বাংলাদেশ উদ্বাস্ত সংগ্রাম পরিষদ, (৯) অখণ্ড ভারত ঐক্য পরিষদ, (১০) বাংলাদেশ ভারত ভ্রাতৃত্ব মঞ্চ, (১১) বাংলাদেশ উদ্বাস্ত উন্নয়ন সংসদ, (১২) বাংলাদেশ সংখ্যালুঘু বাঁচাও কমিটি, (১৩), গণতন্ত্র অধিকার রক্ষা সমন্বয় কমিটি, (১৪) গ্লোবাল হিউম্যান রাইটস ডিফেন্স, (১৫), অল ইনডিয়া রিফিউজি ফ্রন্ট, (১৬) হিন্দু বাঙালীগণ পরিষদ, (১৭) বিবেকানন্দ সাহিত্য পরিষদ, (১৮) নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘ।

প্রত্যেক বছর ২৬ মার্চ স্বাধীনতা দিবস এবং ১৬ ডিসেম্বর বিজয় দিবস এলেই এসব বিচ্ছিন্নতাবাদী সংগঠন তৎপর হয়ে ওঠে।

নিলিখ বঙ্গ নাগরিক সংঘের বাংলাদেশ বিরোধী সমাবেশের ৫দিন পর ১৫ জানুয়ারী কোলকাতার বাংলাদেশ হাইকমিশনের সামনে পশ্চিম বঙ্গ রাম্য সিপিএস এর যুব সংগঠন ও ছাত্র সংগঠন বিক্ষোভ প্রদর্শন করেন যব সংগঠন নেতা আভাস রায় চৌধুরী, বাংলাদেশ জরুরী অবস্থা জারি হওয়ার জন্য উদ্বেগ প্রকাশ করেন। এতে নাকি সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি নষ্ট হবে। এ কর্মসূচীর পেছনে রয়েছে পশ্চিম বঙ্গের বাম ফ্রন্ট সরকার।

গত বছর (২০০৬) ১৬ ডিসেম্বর পশ্চিম বঙ্গের দক্ষিণ দিনাজপুরের হিলি থানার অদূরে ত্রিমোহনী বাজারে নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের এক সমাবেশে স্বাধীন ভঙ্গভূমি প্রতিষ্ঠার দাবী জানান হয়। এর আগে ১১ নভেম্বর চব্বিশ পরগণা জেলার মুকুন্দ পুরে বঙ্গ সেনাদের এক সমাবেশে নিখিল বঙ্গ নাগরিক সংঘের সাধারণ সম্পাদক সুভাষ চক্রবর্তী বাংলাদেশের ৪ দলীয় জোট এবং শেখ হাসিনার আওয়ামী লীগকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের কর্মসূচী বাস্তাবায়নের লক্ষ্যে চাপ প্রয়োগের জন্য ভারত সরকারের প্রতি আহ্বান জানান।

বাংলাদেশে সংখ্যা লঘুদের নিরাপত্তা ও তাদের সু-রক্ষার অযুহাতে বাংলাদেশের ৬৪টি জেলার মধ্যে ৩৭টি জেলাকে নিয়ে পৃথক রাষ্ট্র গঠনের আওয়াজ তুলেছে

www.pathagar.com

লিবারেশন টাইগার অব বেঙ্গল। তারা এই ৩৭টি জেলাকে মনে করে তাদের জন্য অভয়ারণ্য। এই জেলাগুলো হল ঃ পঞ্চগর, লালমনির হাট, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, দিনাজপুর রংপুর, গাইবান্ধা, জয়পুর হাট, নওগাঁ, নবাবগঞ্জ, রাজশাহী, নাটোর, সিরাজগঞ্জ, পাবনা কুষ্টিয়া, মেহেরপুর রাজবাড়ী, চুয়াডাঙ্গা, ঝিনাইদহ, মাগুরা ফরিদপুর মাদারীপুর শরিয়তপুর, যশোর, নড়াইল গোপালগঞ্জ, সাতক্ষীরা, খুলনা, বরিশাল, পিরোজপুর, বাগের হাট, বগুড়া, পটুয়াখারী, ভোলা ও ঝালকাঠি। লিবারেশন টাইগার অব বাংলাদেশ মনে করে বাংলাদেশের জনসংখ্যা ১৪ কোটির ওপর। এখানে বাস করে ৩ কোটি সংখ্যা লঘু। এদের নিরাপদ বসবাসের জন্য ৩৭টি জেলা সমন্বয়ে গঠিত স্বাধীন বঙ্গদেশ প্রতিষ্ঠার প্রয়োজন। এই লক্ষ্যে তারা বঙ্গদেশ মুক্তিপরিষদ গঠন করেছে। এদের সসস্ত্র শাখা হিসাবে কাজ করছে লিবারেশন টাইগার অব বেঙ্গল এরা হতে চাই শ্রী লঙ্কার এলটিটি অর্থাৎ লিবারেশন টাইগার অব তালিম ইলম। শ্রী লঙ্কা আজ যে সঙ্কটাপন্ন এমন সংকট আমাদের জন্য ও ডেকে আনতে চায় ব্রাহ্মণ্য বাদীরা। Bangladesh Mukti Parisad & Libaration tigers of Bengal What and Why. নামক একটি বুকলেট এবং সংগঠনের প্যাডে বাংলাদেশের প্রধান মন্ত্রীর বরাবর একটি চিঠি কোলকাতা বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ ঠিকানায় এবং বাংলাদেশের উপ হাইকমিশনে পাঠান হয়। সংগঠনের প্যাডে সদর দপ্তরের ঠিকানা পাইকপাড়া ব্রাহ্মণ বাড়িয়া উল্লেখ করা হয়। লিবারেশন টাইগারের কমান্ডার ইনচীফ এবং মুক্তি পরিষদের প্রধান হিসাবে স্বাক্ষর করেন জনৈক দুর্গা চরণ। এসব কাগজপত্র বিভিন্ন দেশ এবং সার্কভুক্ত দেশের রাষ্ট্র প্রধানদের কাছে পাঠান হয়। এমনকি জাতিসংঘ এবং কমলওয়েন্থ মহাসচিবদের নিকট প্রেরণ করা হয়। বুকলেট বঙ্গদেশে পুরো পরিকল্পনা তুলে ধরা হয়। বঙ্গদেশের রাজধানী কোথায় হবে পতাকা কেমন হবে জাতীয় সংগীত কেমন হবে সব কিছুর পরিষ্কার বর্ণনা রয়েছে।

ভঙ্গভূমি গঠনের ষড়যন্ত্র

২০০৩ সালের ২৩ জানুয়ারী বীর বঙ্গ/বঙ্গভূমি রাষ্ট্রের ঘোষণা দেয়া হয়। সুপ্রিম রেভূলিউসনারী কাউন্সিল এবং ১৭ সদস্যের একটি অন্তর্বর্তী প্রবাসী সরকার গঠন করা হয়। বাংলাদেশের দক্ষিন ও পূর্বের কিয়দাংশ নিয়ে এ রাষ্ট্র গঠনের পরিকল্পনা প্রকাশ করা হয়। এর সম্ভাব্য রাজধানী হবে পার্বত্য চট্টগ্রামের শক্তি গড়ে। তবে শক্তি গড়ের অবস্থান কোথায় সেটা সুনিদিষ্ট করে বলা হয়নি। এর

www.pathagar.com

জন্য সমস্ত সংগ্রামের কথা বলা হলেও জাতিসংঘের হস্তক্ষেপের ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়।

বিশ্ব হিন্দু পরিষদের সাধারণ সম্পাদক প্রবীণ তেড়াড়িয়া বলেন ভারতে প্রবাসী এবং বাংলাদেশে অবস্থিত হিন্দু জনগোষ্ঠীর সমন্বয়ে বাংলাদেশ বিভক্তির মাধ্যমে একটি পৃথক হিন্দু রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতি। বাংলাদেশকে খণ্ড বিখণ্ড করার পরিকল্পনা প্রকৃতপক্ষে ব্রাহ্মণ্যবাদীদের সকলের। একে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে চলছে 'র'। এখন এসব ষড়যন্ত্র গুরুত্ব হীন মনে হলেও আগামী একদা এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যোগ মহীরুহে পরিণত হবে না এমনটি বলা যাবে না। এ কারণে এসব বাংলাদেশের জন্য অশনি সংকেত।

সীমান্তে বিএসএফএর অপতৎপরতা

বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফএর পরিকল্পিত অপতৎপরতা আজকের নয়। দীর্ঘ দিন ধরে এ অপতৎপরতা চলে আসছে। যখন থেকে বাংলাদেশ ভারতের আশ্রিত অবস্থান থেকে সোজা ও স্বনির্ভর হয়ে দাঁড়ানোর চেষ্টা করছে তখন থেকে এই অপতৎপরতা চলে আসছে। বাংলাদেশের বিডিআর এসব অপতৎপরতার জবাবও দিচ্ছে প্রতিনিয়ত। বিনা উস্কানীতে নিরীহ বাংলাদেশীদেরগুলি করে হত্যা নিত্যকার ব্যাপার। গত বছর ২০০৬ সালের আগস্টে জকিগঞ্জ সীমান্তে এরা বড় ধরনের একটি হামলা চালায়। বিডিআর জোয়ানরা বীরত্বের সাথে প্রতিহত করলেও বিভিন্ন সীমান্তে বিএসএফ তাদের তৎপরতা আগের চেয়ে অনেকগুণ বাড়িয়ে দিয়েছে। সীমান্তে ভারতীয় গুপ্তচরদের আনাগোনা বেড়ে গেছে। এ ব্যাপারে বাংলাদেশের কূটনৈতিক উদ্যোগ জোরদার করা হলেও অবস্থার পরিবর্তন হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না।

গত ২৯ নভেম্বর (২০০৬) বার্ষিক সংবাদ সম্মেলনে বিএসএফ এর মহা পরিচালক ভারত বাংলাদেশ সীমান্তকে প্রবলেম এরিয়া উল্লেখ করে সীমান্তে বিএসএফ ব্যাটেলিয়ান ৫০ থেকে ৬৬ তে উন্নীত করার কথা বলছেন।

গত বছর ৩০ নভম্বের (২০০৬) ইন্ডিয়ান ওয়েব সাইট জানায় ভারতের দুই ক্যাম্পে দূরত্ব ১০ কিলোমিটার থেকে কমিয়ে ৩-৫ কিলোমিটার করা হয়েছে প্রতি ক্যাম্পে অন্তত ৫জন সদস্য থাকবে। সীমান্ত ফ্লাড লাইট দিয়ে আলোকিত করা হবে।

www.pathagar.com

'২০০৬ এ ভারত ইসরাইল চুক্তির পর ভারত সেনাবাহিনীর বিভিন্ন রেজিমেন্ট থেকে ৩১ হাজার সৈন্য নিয়ে ২৫টি স্পেশাল ফোর্স গঠন করেছে। ইসরাইলী প্রশিক্ষণে প্রশিক্ষিত এবং তাদের অস্ত্রে সজ্জিত এ বাহিনী ভারতীয় সেনা অফিসারের নেতৃত্বে বিশেষ রুলস অব এনগেজমেন্টের অধীনে বাংলাদেশ সীমান্তে গুলি বর্ষণ, হত্যা, সীমান্ত অতিক্রম, সীমান্ত পরিস্থিতি অস্থিতিশীল করা, পুশ ইন ও ভূমি দখল ইত্যাদি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছে।

ইসরাইলীরা যেমন মুসলমানদের সবচেয়ে বড় শত্রু হিসাবে মনে করে অনুরূপ হিন্দু জনগোষ্ঠীর প্রায় সকলেই মুসলমানদেরকে তাদের জাত শত্রু হিসাবে মনে করে। শত্রুর মিত্র এই ফরমূলা অনুযায়ী দুই মুসলিম বিরোধী শক্তি সংঘবদ্ধ হয়েছে মুসলমাদের বিনাশ করার জন্য। ফিলিস্তিনীদের উপর নিত্য নব নব পন্থায় নিপিড়ন চালানোর সুদীর্ঘকালের অভিজ্ঞতা উপমহাদেশের মুসলমানদের উপর প্রয়োগ করার জন্য ইসলাইলীদের কাছে প্রশিক্ষণ নিচ্ছে ভারতের বিশেষ বাহিনী। আগামী একদা এই বিশেষ বাহিনী হয়তোবা চাড়াও হতে পারে বাংলাদেশের উপর। বাংলাদেশ হতে পারে আর এক ফিলিস্তিন তখনকার জন্য এখনি প্রস্তুতি নিতে হবে বাংলাদেশের। কিন্তু সবচেয়ে বড় সমস্যা এখানকার মেরুদণ্ডহীন রাজনীতিক ও বুদ্ধিহীন বুদ্ধিজীবিরা যারা পঞ্চম বাহিনীর ভূমিকা নিতে এবং পানির দরে জাতীয় স্বার্থকে বিক্রি করতে মোটেও কুণ্ঠিত হবে না।

www.pathagar.com

উপসংহার

জাতির ক্রমবর্ধমান অধঃপতন নৈতিক অবক্ষয় ও স্বাধীনতা উত্তর প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির বিস্তর ব্যাবধান থেকে উৎসারিত গভীর হতাশা সমগ্র জাতিকে টেনে নিয়ে চলেছে সীমাহীন সংকটের দিকে। দেশের অতি সাধারণ মানুষ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের বুদ্ধিজীবী চিন্তাবিদ রাজনীতিবিদ শিক্ষক সমাজসেবী সকলকে গ্রাস করেছে একই হতাশায় আমাদের কারোই গন্তব্য জানা নেই দুর্গতি অতল গহ্বরের দিকে চোখ বন্ধ করে আমরা এগিয়ে চলছি। টাইটানিক ডুবছে, ডুবছে এর নাবিক আরোহী সকলে।

ঐতিহাসিক ইবনে খালদুন আল মুকাদ্দিমার দ্বিতীয় খণ্ডে লিখেছেন– জনগণের ওপর অর্থনৈতিক শোষণ ও নির্যাতন চালানো হলে তাদের সম্পদ উপার্জনের স্পৃহা নস্যাৎ হয়ে যায়। যখন স্পৃহা নষ্ট হয়ে যায় তখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড শ্রম ও সাধনা থেকে তারা হাত গুটিয়ে নেয়। আর জনপদ যখন অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে শ্রম বিমুখ হয়ে পড়ে তখন বাজারে মন্দা দেখা যায়। দেশের বাসিন্দা হয়ে ওঠে কর্ম বিমূখ এবং উজাড় হয়ে যায় নগর বন্দর আর জনপদ দৃষ্টান্ত হিসাবে বলা যায় ১৭৫৭ সালে সিরাজের পতনের পর যে সীমাহীন শোষণ ও জুলুম চলে এর প্রতিক্রিয়ায় মাত্র ১ যুগের ব্যবধানে বাংলার মন্বন্তরে দেড় কোটি অর্থাৎ সমগ্র জনগোষ্ঠীর এক তৃতীয়াংশ মৃত্যুর কোলে ঢলে পরে। এই মৃত্যু ও ধ্বংসের অন্ত রালে সক্রিয় ছিল ওপনিবেশিক শক্তি ও তাদের দালালদের সীমাহীন শোষণ ও দুর্নীতি। একাত্তরোত্তর বাংলার পরিস্থিতির দিকে তাকালে একই চিত্র আমরা দেখতে পাব। একাত্তরোত্তর ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী ও তাদের সহযোগীদের নির্বিচার লুণ্ঠন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে মাত্র ৩ বছরের মধ্যে মন্বন্ত্বরের মুখোমুখি হতে হয়েছিল এদেশের মানুষকে। ভিয়েতনাম আমাদের অনেক পরে স্বাধীনতা লাভ করে ও তাদের অগ্রগতির পালে হাওয়া লাগাতে সক্ষম হয়েছে, মহাথিরের গতিশীল নেতৃত্ব মালয়েশিয়াকে বিশ্বের উন্নত জাতিতে পরিণত করেছেন। শুধুমাত্র আমরা স্বাধীনতার মেকি চেতনা থেকে প্রেরণা লাভের চেষ্টা করছি আর দুর্নীতির বিষাক্ত উদ্ভুত অবয়বে ধারণ করে মৃত্যু যন্ত্রণায় ধুকছি।

আমরা ২শ' বছরের ঔপনিবেশিক শাসনের উত্তরাধিকারী হয়ে সাবেকী কাঠামোর ক্ষয়ে যাওয়া খোলসটা আকড়ে মুক্তি ও প্রগতির পথ অন্বেষণ করছি। কিন্তু মরীচিকার মত উন্নতি ও প্রগতির স্বপ্ন ক্রমশ দুরে সরে যাচ্ছে। যতদিন যাচ্ছে ততই অধঃপতিত হচ্ছি। সর্বগ্রাসা দুর্নীতি জাতির সর্বনাশ ত্বরান্বিত করে

www.pathagar.com

চলেছে। দুর্নীতিবাজ ঔপনিবেশিক দালাল ও তাদের সহযোগীরা জনগণের সম্পদ অব্যাহত শোষণ এবং রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় লুণ্ঠণের মধ্য দিয়ে এদেশের ৯০ শতাংশ মানুষকে দারিদ্র সীমার নীচে টেনে নিয়ে চলছে। সরকার পৃষ্ঠাপোকতা দান করে চলেছে সে সব লুটেরাদেরকে যারা সরকারকে ক্ষমতাসীন করেছে লুণ্ঠিত সম্পদের ক্ষুদ্রাংশ বিনিয়োগ করে। ক্ষমতাসীনরা যদিও জনগণের ভোটে নির্বাচিত তা সত্ত্বেও গণ স্বার্থের ব্যাপারে ভ্রুক্ষেপ হীন হয়ে দুর্নীতিবাজ লুটেরাদের স্বার্থ সংরক্ষণ করে চলেছে। লুটেরাদের স্বার্থ এবং ক্ষমতাসীন ও ক্ষমতা বহির্ভূত নেতৃবৃন্দের স্বার্থের অভিন্নতা রয়েছে।

ইবনে খালদুন লিখেছেন– 'জুলুম ব্যাপক অর্থবহ যারা কোন অধিকার ছাড়া সম্পদ আহরণ করে তারা জালিম। যারা সম্পদে অন্যায় হস্তক্ষেপ করে তারা জালিম এবং যারা মানুষের ন্যায্য অধিকার থেকে জনগণকে বঞ্চিত করে তারা ও জালিম। মালিকানা হরণ কারীরাও সাধারণত জালিম। এসবের খারাপ প্রতিক্রিয়া পড়ে রাষ্ট্রের উপর সামাজিক বিকৃতির আকারে। সর্বস্তরে জনগণের সম্পদ লোপাট ও সর্বাবস্থায় জনগনকে শোষণ করার অনিবার্য পরিণতি থেকে উদ্ভব হয়েছে ব্যক্তি সমষ্টি সমাজ ও রাষ্ট্রীয় বিকৃতি। আজ ব্যক্তি চেতনা ক্লেদাক্ত সংকীর্ণ এবং সার্বজনীন আবেদন ও ঔদার্য থেকে অনেক দুরে। সামাষ্টিক চেতনায় বিরাজ করছে তীব্র প্রতিযোগীতা পরস্পরের ঘাড়ে পা রেখে আকাশ ছোয়ার আকাঙ্ক্ষা সামাজিক বিপর্যয়ের সূচনা করছে প্রতিনিয়ত। রাষ্ট্রীয় চেতানায় রয়েছে প্রভূত্বের দাপট জনগণের সম্পদ লুণ্ঠণের দুর্নিবার– আকাঙ্ক্ষা; আর প্রভূত্বের আসন নিরাপদ করার জন্য লুটেরা মাস্তান দুষ্কৃতিকারীদের পৃষ্ঠপোষকতা দানের অলিখিত কার্যক্রম। যে কারণে আজ ৯০ শতাংশ শোষিত বঞ্চিত লুণ্ঠিত মানুষ হতাশা ও বঞ্চনা নিয়ে নিরুপায় হয়ে নির্বিকার চিত্তে দুর্গতির শেষ সীমার দিকে এগিয়ে চলছে।

২০০২ সালের ডিসেম্বর ট্রান্সপারেন্সী ইন্টারন্যাশনাল অব বাংলাদেশ অর্থাৎ টি আইবি এর রিপোর্টে বলা হয় বাংলাদেশে ৭টি দুর্নীতিগ্রস্থ খাত বছরে ঘুষ বাবদ জনগণের কাছ থেকে মোট ৭ হাজার ৮০ কোটি টাকা আদায় করে। এই ৭টি খাতের মধ্যে শীর্ষে রয়েছে পুলিশ বিভাগ এই বিভাগ দুর্নীতি বাবদ বছরে আদায় করে ২ হাজার ৬৬ কোটি টাকা, অন্য খাতগুলির মধ্যে নিম্ন আদালত ১ হাজার ১শ ৩৫ কোটি টাকা, সরকারী হাসপাতালগুলো তথা স্বাস্থ্য খাত ১ হাজার ২শত ৫০ কোটি টাকা, শিক্ষা খাত ৯শত ২০ কোটি টাকা, বিদ্যুৎ খাত ১৮২ কোটি টাকা, কর বিভাগ ১২ কোটি টাকা দূর্নীতি বাবদ আয় করে।' টি আই বি এর

www.pathagar.com

আঞ্চলিক চ্যাপ্টার গুলোর দুর্নীতি বিষয়ক জরিপে এ তথ্য তুলে ধরা হয়। জরিফে বাংলাদেশের ৭টি খাতের পরিসংখ্যা তুলে ধরা হয়। পুলিশ বিভাগ কর্তৃক ৮৩.৬ শতাংশ নিম্ন আদালত কর্তৃক ৭৫.৩২ শতাংশ, ভূমি প্রশাসন কর্তৃক ৭২.৭৮ শতাংশ, স্বাস্থ্য বিভাগ কর্তৃক ৫৫.৫০ শতাংশ কর বিভাগ কর্তৃক ১৯.২৫ শতাংশ জনগণ দুর্নীতি বা ঘুষের শিকার হয়। ২০০৪ সালে প্রকাশিত বিশ্ব ব্যাঙ্কের এক প্রতিবেদনে বলা হয় প্রতি বছর সরকারের কেনা কাটায় প্রায় ২৭০০ কোটি টাকার দুর্নীতি করা হয়। সরকার প্রতি বছর প্রায় ১৮ হাজার কোটি টাকা মূল্যের পণ্য ও সেবা কেনে। বিশ্ব ব্যাঙ্ক পরিচালিত জরিপে তথ্য পর্যালোচনা করে বলা হয় সরকারী খাতের ক্রয় ব্যবস্থায় যথেষ্ট লুকোচুরি রয়েছে। বাংলাদেশের অর্জন ও চ্যালেঞ্জ শিরোনামে প্রকাশিত এ প্রতিবেদনে ব্যাপক দুর্নীতি ও চাঁদাবাজিকে সরকারের দারিদ্র বিমোচন কর্মসূচীসহ সকল অর্জনের পথে বড় বাধা বলে চিহ্নিত করা হয়।

রাজস্ব আয়ের বৃহত্তম প্রতিষ্ঠান চট্টগ্রাম কাষ্টমস হাউসে প্রতিদিন ৩০-৩৫ কোটি টাকা রাজস্ব আদায় হয়ে থাকে এখানে অবৈধ লেনদেন হয়ে থাকে। আড়াই কোটি টাকা কতিপয় কাষ্টমস কর্মকর্তা এখানে রাজস্ব ফাঁকি দিয়ে বিপূল সম্পদের মালিক হয়ে গেছেন। বিগত আওয়ামী সরকারের ৪১ জন দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তার তালিকা প্রস্তুত হলেও তাদের বিরুদ্ধে আজো কোন ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। অথচ ঐসব দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তাদের ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা সম্পদের পরিমাণ আড়ায় হাজার কোটি টাকা।

দরিদ্র বিমোচনের নামে এনজিওদের সুদী কারবার দারিদ্রকে আরো প্রকট করে তুলেছে। প্রত্যেক বছর এনজিওরা ১০ হাজার কোটি টাকা ব্যয় করে থাকে দারিদ্র বিমোচ, দরিদ্র জনগণকে ৪০ শতাংশে সুদ উৎসর্গ করতে হয়। এনজিওদের উদ্দেশ্যে। স্বাভাবিকভাবে তাদের শক্তি সামর্থ ব্যয় করেও দারিদ্রের দুঃসহ সীমানা পার হতে পারেন না এদেশের দুঃস্থ জনগণ। এনজিওদের সুবাদে তারা দরিদ্র থেকে হত দরিদ্রে পরিণত হয়। এ ব্যাপারে এদেশের দায়িত্বশীল কর্মকর্তরা নির্বাক।

গত ১২ ফেব্রুয়ারী (২০০৭) ট্রান্সপারেন্সী ইন্টার ন্যাশনাল টিআইবির এক সংবাদ সম্মেলনে উপস্থাপিত টিআইবির এক গবেষণা প্রতিবেদন অষ্টম জাতীয় সংসদে কোরাম সংকটের কথা উল্লেখ করে বলা হয়–'সংসদ সদস্যদের অনুপস্থিতির জন্য সংসদ কার্যক্রমের ২২৭ ঘণ্টা সময় নষ্ট হয়েছে এর ফলে সংসদের ২০ কোটি ৫০ লাখ টাকা অপচয় হয়েছে। ২৭৩ কর্ম দিবসের মাত্র

www.pathagar.com

৯টি কর্মদিবসে নির্দিষ্ট সময়ে অধিবেশন শুরু হয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী মোট কার্যদিবসের মধ্যে ১৭৮ এবং প্রধান বিরোধী দলীয় নেত্রী মোট কর্ম দিবসের ২৪৮ অনুপস্থিত ছিলেন। প্রধান বিরোধী দল ২২৩ কর্মদিবস সংসদে অনুপস্থিত ছিল। প্রতিবেদনে আরো বলা হয় এ সংসদে ১৩ হাজার ১৫১ কোটি ৫৪ লাখ টাকার অডিট আপত্তির মধ্যে ১২ হাজার ৫৩৫ কোটি ৭৮ লাখ টাকা অনাদায়ী পড়ে আছে। ১৮৩ জন সংসদ সদস্যের টেলিফোন বকেয়া বিলের পরিমাণ ১ কোটি ২৬ লাখ টাকা।

টিআইবি এর প্রতিবেদনে জাতীয় নেতৃবৃন্দের কাণ্ডজ্ঞান বিবর্জিত দায়ীত্বহীনতা প্রকট হয়ে ধরা পড়েছে। জনগণের ভোটে নির্বাচিত সদস্যরা জনগণের ভাগ্য নির্মাণে যে অমনোযোগী ছিলেন এটাই প্রমাণ করেছে টিআইবি'এর গবেষণা প্রতিবেদন এ অমনোযোগিতার পেছনে রয়েছে ব্যক্তি স্বার্থ। রাজনীতি অর্থ তাদের কাছে এমন একটা উপকরণ যা দিয়ে অতি সহজে প্রভাব প্রতিপত্তি অর্থ সম্মান ও সম্পদ অর্জন করা সহজ। নির্বাচিত হয়ে একারণে তারা গণ স্বার্থের কথা বিবেচনা না করে সম্পদ আহরণে ব্যস্থ হয়ে পড়েছে। আর সম্পদ আহরণের অবৈধ পথ দুর্নীতির পথে অগ্রসর হয়েছে নির্দ্বিধায় অগ্রসর হয়েছে কোন রূপ বাছ বিচার না করে। এদের সংসদ অধিবেসনে অংশ গ্রহণের সময় কোথায়।

শীর্ষ রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের ভূ-খা নাঙ্গা দেশবাসীর প্রতি কি দারুন দরদ সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাদের লোভ লালসায় পরিপূর্ণ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে। খালেদা জিয়া সরকারের কাছ থেকে দান হিসাবে ক্যাপ্টনমেন্টে সাড়ে ১০ বিঘা জমির উপর সুবিশাল ভবন রাজি এবং গুলশানে আর একটি ভবন নিয়েছেন। শেখ হাসিনাও অনুরূপ সরকারী দান হিসাবে নিজের নামে গণভবন এবং বোনের জন্য একটি বিশাল ভবন জাতীয় সংসদে আইন পাশ করে নিয়ে নিয়েছিলেন। যদিও নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ ক্ষমতায় প্রত্যাবর্তন করতে না পারায় ভবন দুটি তাদের নিজেদের দখলে রাখতে সক্ষম হননি। হাসিনা তার প্রবাসী সন্তান জয়কে রাজনীতিতে টেনে এনে খালেদা জিয়া তার অযোগ্য অপদার্থ অর্ধশিক্ষিত লোভী সন্তান তারেক জিয়াকে বিএনপি এর সিনিয়ার যুগ্ম মহাসচিব হিসাবে নিয়োগ দিয়ে তাকে রাজনীতিক হিসাবে প্রতিষ্ঠা করার যে উদ্যোগ গ্রহণ করেছিলেন এটা আর কিছু নয় বংশানুক্রমিক ক্ষমতার রাজনীতি প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এর মধ্যে ও রয়েছে খালেদা হাসিনার হীন স্বার্থ। এরা দুজনেই প্রত্যক্ষ অথবা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতা দান করে রাজনীতিতে ছড়িয়ে দিয়েছে– ভোগবাদী

www.pathagar.com

নীতি। এর ফলে রাজনৈতিক দলসমূহের শীর্ষ নেতা থেকে পাতি নেতা পর্যন্ত সকলেই দুর্নীতির পাঁকে আকণ্ঠ নিমজ্জিত। এমন কোন সংসদ সদস্য নেই যাকে দুর্নীতি স্পর্শ করেনি। দুর্নীতি করার নিত্য নতুন পথ উন্মুক্ত করেছে সরকার। দুর্নীতির সুযোগ করে দেয়া হয়েছে গাড়ী আমদানীর লাইসেন্স দিয়ে অন্যায় আরো বহুবিধ সুযোগ-সুবিধা দিয়ে। সেসব এখন ধরা পরছে। সেনাবাহিনী ব্যাকট তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে এ সরকারই গণদেবতাদের চোখ খুলে দিয়েছে কয়েকশ' রাজনীতিকের তালিকা প্রদান করে।

এখন এক অথবা দু'কোটি টাকা মূল্যের একাধিক গাড়ীর মালিকের সন্ধান মিলেছে। সাবেক যোগাযোগ মন্ত্রীর ট্রাডিলাক গাড়ী, পার্বত্য চট্টগ্রাম উন্নয়ন বোর্ডের সাবেক চেয়ারম্যানের বিলাস বহুল বিএম ডব্লিউ, অনুরূপ গাড়ী সিলেটের এক সাবেক এমপি এবং প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক সচিবের ইনফ্যানিটি কি এক্স ৫০ তিনটি গাড়ি। ঢাকার সাবেক এক এমপির এবং জনৈক সাবেক প্রতিমন্ত্রীর বাড়ী থেকে পাঁচটি করে বিলাসবহুল গাড়ী জব্দ করা হয়েছে। দুর্নীতির বৈচিত্র আমরা প্রতিদিন খবরের কাগজ থেকে জানতে পারছি। বরিশাল বানড়ী পাড়ার সাবেক এমপি ও হুইপ শুধু তার ব্যবহারের জন্য ১০ বছর ধরে সড়ক ও জনপদের একটি ফেরী নিজ দখলে রেখেছিলেন।

বাংলাদেশ ব্যাঙ্কের এক পরিসংখ্যানে জানা গেছে যে দেশের ব্যাঙ্কিং খাতে খেলাপী ঋণের পরিমাণ ২০ হাজার কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এর মধ্যে রাষ্ট্রায়ত্ব খাতের ৪ বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের ১১ হাজার ৫ শ ৩ কোটি টাকা। অন্যদিকে ২০০৬ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কসহ দেশের সবগুলো ব্যাঙ্ক ১১ হাজার ৬০৭ কোটি টাকার খেলাপী ঋণ মওকুফ করেছে। এর মধ্যে ৪ রাষ্ট্রায়ত্ব বাণিজ্যিক ব্যাঙ্কের মওকুফ কৃত ঋণের পরিমাণ ৪ হাজার ৯০ কোটি ৫৪ লাখ টাকা।

সম্প্রতি দুর্নীনির দায়ে যাদের ব্যাঙ্ক একাউন্ট জব্দ করা হয়েছে তাদের প্রদর্শিত আয়ের চেয়ে অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ ৪০ গুণ বেশী। এ ৫৫ জনের অপ্রদর্শিত আয়ের পরিমাণ ১০০ কোটি টাকার ও বেশী।

গত ২৭ মার্চ জাতীয় প্যারেড ময়দানে মুক্তি যোদ্ধাদের সম্মানে আয়োজিত এক চা চক্রে সেনাবাহিনী প্রধান লেঃ জেনারেল মইন ইউ আহমদ বলেন দুর্নীতিবাজ রাজনীতিকরা দেশের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। তিনি বলেন বিগত সরকারের আমলে কেবল বিদ্যুৎ খাত থেকেই বিদেশে পাচার হয়েছে ২০ হাজার কোটি টাকা।

www.pathagar.com

গিয়াস উদ্দিন আল মামুন প্রধান মন্ত্রী খালেদা জিয়ার জেষ্ঠ পুত্র তারেক রহমানের বন্ধু হওয়ার সুবাদে কত অজস্র টাকা অবৈধ পন্থায় অর্জন করে তার সঠিক হিসাব এখনো মিলেনি। মামুন স্বীকার করেছে যে বিদেশী ব্যাঙ্কে তার ৩০০ কোটি টাকা রয়েছে যা সে অবৈধ পন্থায় উপার্জন করেছে এবং অবৈধভাবে পাচার করেছে। এর বাইরেও তার রয়েছে স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তি।

দুদুকের নির্দেশ মোতাবেক সম্পত্তির হিসাব দাখিল করা বিশিষ্ট ব্যক্তি ও তাদের ৬ পরিবারের কাছে ৮০০ কোটি টাকার সম্পত্তি রয়েছে। তাদের হিসাব বর্হিভূত আরো যে অনেক সম্পত্তি রয়েছে সেটা এখনো অনাবিস্কৃত। তবে এই ৬ পরিবারের কাছে ব্যাঙ্ক পাবে ৪ হাজার কোটি টাকা। এই ৬ জন হলেন বসুন্ধরা গ্রুপের চেয়ারম্যান শাহ আলম আওয়ামী নেতা আকতারুজ্জামান বাবু আওয়ামী নেতা আবুল হাসান আবদুল্লাহ, সাবেক আওয়ামী এমপি হাজী সেলিম, হাজী মকবুল হোসেন, যুবলীগের চেয়ারম্যান জাহাঙ্গীর কবির নানক। দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে যে শতাধিক লোকের নাম ও বিবরণ আমাদের সামনে এসেছে এটাকেও বলা যায় যৎকিঞ্চিত। জনগণের বিশাল সম্পদ এখন কয়েক শ' অথবা কায়েক হাজার লোকের কুক্ষিগত আর এরা সকলেই রাজনীতির সাথে সম্পৃক্ত। এই দুর্বৃত্ত্বরা জনগণকে মনে করে তাদের গোলাম। হাসিনার বিরুদ্ধে কয়েকটি দুর্নীতি মামলা ঝুলছে। এখন পর্যন্ত খালেদার নামে দুর্নীতির মামলা দায়ের না হলেও তার সন্তান অসংখ্য দুর্নীতির বোঝা কাঁধে নিয়ে কারাগারে। বিগত সময়গুলোতে রাজনীতির নামে হিংসা বিদ্বেষ ছড়িয়ে দ্বন্দ্ব সংঘাতের দিকে তাড়িয়ে নেয়া হয়েছিল জনগণকে এবং সব সময় চলছিল জনগণকে বিভক্ত রাখার প্রয়াস আর যখনই রাজনীতি বন্ধ করা হল তখন আর হিংসা বিদ্বেষ দ্বন্দ্ব সংঘাত হাওয়া হয়ে গেল। এর কারণ কি? এ কারণ হল জনগণের নামে কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা এখন ক্রিয়াশীল নয়। প্রতারণার আশ্রয় নিয়ে ধ্বংসাত্মক পরিস্থিতি সৃষ্টি করার সাহস তারা হারিয়ে ফেলেছে। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতির শিক্ষক ডক্টর মইনুল হোসেন ঠিকই বলেছেন– 'ব্যাঙ্কগুলো সারাদেশ থেকে আমানত কুড়িয়ে এনে ৫০০ লুটেরাদের হাতে ব্যাঙ্ক ঋণের মাধ্যমে তুলে দিচ্ছে এখন ৩০ হাজার কোটি টাকা ব্যাংক খ্যাতে। ১২ হাজার কোটি টাকা অবলোপন অথবা অন্যখাতে সরিয়ে নেয়া হয়েছে। ব্যাঙ্কগুলোও দুর্নীতিবাজদের সহযোগী এবং তাদেরকে অধিকতর দুর্নীতিতে নিমজ্জিত করেছে অর্থনীতিবিদ সমিতির এক ওয়ার্কসপে আইন উপদেষ্টা ব্যারিষ্টার মইনুল হোসেন যা বলেছেন সেটা মোটেও ফেলে দেয়ার নয়। তিনি

www.pathagar.com

বলেছেন দুর্নীতি ও অপচয় না হলে দেশের প্রবৃদ্ধির হার দুই অঙ্কে পৌঁছে যেত। তত্ত্বাবধায়ক সরকারের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান এখনো অব্যাহত রয়েছে। এ সংক্রান্ত ফিরিস্তি অনেক লম্বা হবে বলে মনে করা হচ্ছে। তবে চলমান এই দুর্নীতি বিরোধী অভিযান থেকে যে মজার তথ্য বেরিয়ে আসছে সেটাই এখানে তুলে ধরা দরকার।

বাংলাদেশোত্তর ৩৬ বছর অতিবাহিত হলেও পঞ্চম বাহিনীও দিল্লীর সেবাদাসরা সংঘবদ্ধ হয়ে সমস্বরে আওয়াজ তুলছে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি এবং বিপক্ষের শক্তি বলে। এটা করা হচ্ছে পরিকল্পিতভাবে জাতিকে বিভক্ত রাখার জন্য। তারা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি যাদেরকে বলছে তাদের উপস্থাপন করা হচ্ছে ধোয়া তুলসীর পাতা হিসেবে। যাদেরকে তারা বলছে স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তি তাদের উপস্থাপন করা হচ্ছে চরিত্রহীন লম্পট ও খল নায়ক হিসাবে। কিন্তু চলমান দুর্নীতি বিরোধী অভিযানে যাদের পাকড়াও করা হচ্ছে তারা সকলেই স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। স্বাধীনতার বিপক্ষ শক্তির একজনের নাম ও খবরের কাগজে দেখতে পাওয়া যায় না। শেখ মুজিব স্বাধীনতার মূল নায়ক এবং অনুসারীরা স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। জিয়াউর রহমান স্বাধীনতার ঘোষক অতএব এর অনুসারীরা ও স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি। আওয়ামী লীগ বিএনপির নেতা কর্মীরাই যে সীমাহীন দুর্নীতির পাকে নিমজ্জিত এটা প্রমাণিত সত্য। এবং দিবালোকের মত পরিস্কার।

উপনিবেশিক শাসন কাঠামো টিকে থাকার কারণ

সিরাজের পতনের মধ্য দিয়ে বৃটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের পত্তন হয়েছিল এই বাংলায়– তারা ১৯০ বছর শাসন করেছিল এদেশ। ঔপনিবেশবাদী বৃটিশদের ধারাবাহিক শোষণের মধ্যদিয়ে এদেশে ভয়াবহ দরিদ্র অবস্থার সৃষ্টি হয় স্থানীয় দালালদের সহযোগিতায়। শোষণকে পাকা পোক্ত করে তুলার জন্য তারা ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামো গড়ে তুলে। এই শোষণমূলক শাসন কাঠামো বিন্যাস্ত করার জন্য তিনটি কৃত্রিম স্তর গড়ে তোলে।

(১) সর্বোচ্চ স্তরে অবস্থান করে বৃটিশরা জনগণকে শোষণ করার জন্য।

(২) মধ্যবতী স্তর গঠিত হয়েছিল বৃটিশদের অনুগত দালালদের নিয়ে। এরাই হল জমিদার ও রাজকর্মচারী। শোষণ সুসংহত করার জন্য মধ্যবর্তী স্তরে দেয়া হয় মেকি আভিজাত্যের প্রলেপ। এরাই জনগণকে শোষণ পিড়ন করার জন্য বৃটিশদের হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে।

www.pathagar.com

(৩) সর্ব নিম্ন স্তরে রাখা হয় ৯৯ শতাংশ মানুষকে। যারা তাদের মেধা সৃজনশীলতা ও মেহনত দিয়ে সম্পদ সৃষ্টি করে। এরাই ঔপনিবেশবাদী চক্রের নির্মম শোষণের শিকারে পরিণত হয়।

ঔপনিবেশিক বৃটিশরা যখন দেশ ত্যাগ করে তখন তাদের হাতেই ক্ষমতা ছেড়ে যায়, যারা ছিলেন এদেশীদের মধ্যে অগ্রগামী। আর অগ্রগামীরা হল বৃটিশদের সৃষ্ট মধ্যবর্তী স্তরের অবস্থান কারীরা। স্বাভাবিক ভাবে এদের হাতে ক্ষমতা এসে পড়ে। শোষণমূলক ব্যবস্থা যা বৃটিশদের যুগে চলছিল তার অনেকটা পরিবর্তন হলেও আমুল পরিবর্তন হলো না। পাকিস্তান অর্জনের পর যে পরিবর্তনটা হওয়া উচিত ছিল সেটা হলো না। বৃটিশদের সৃষ্ট যে মধ্যবর্তী স্তর ছিল কায়দে আযমের মৃত্যুর পর সে স্তরের মধ্যে ক্ষমতা বিঘুর্নিত হতে থাকল। পাকিস্তান অর্জনের পর তৃতীয় স্তরে অবস্থানকারীর সন্তান যাদের ভবিষ্যত বির্ধারিত ছিল লাঙ্গলের পেছনের মানুষ হিসাবে, তারা শিক্ষা-দীক্ষা জ্ঞান গরিমায় অগ্রসর হল সাত চল্লিশের স্বাধীনতার সুবাদে। এই নব্য অগ্রবর্তীরা তাদের পিতা মাতা দাদা নানাদের কথা ভুলে গেল একটু আলো একটু স্বচ্ছলতা ও স্বস্তিবর স্পর্শ পেয়ে। তারা সেই বৃটিশ সৃষ্ট মধ্যবর্তী স্তরে উন্নীত হওয়ার জন্য পেছনের কথা ভুলে গিয়ে নতুন করে যড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় নব্য ঔপনিবেশিক দালাল হওয়ার জন্য। হলও তাই কায়দে আযমের প্রজ্ঞার উপর গভীর আস্থা রেখে তৃতীয় স্তরের শোষিত বঞ্চিতরা যে আন্দোলন করেছিল তারই চুড়ান্ত পরিণতি হল পাকিস্তান। সেই পাকিস্তানকে ভাঙল তাদেরই সন্তানরা যারা ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্র শোষণ বঞ্চনা থেকে বাঁচতে চেয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রে সিরাজের পতন হয়েছিল। ব্রাহ্মণ্যবাদী ষড়যন্ত্রে মধ্য দিয়ে উচ্চ বর্ণের হিন্দুরা মধ্যবর্তী স্তরে উন্নীত হয়। তাদেরই ষড়যন্ত্রের ভারতবর্ষ যারা শাসন করেছিল তাদের স্থান হল সর্বনিম্ন স্তরে। রাজদণ্ড ছেড়ে তাদের আসতে হল লাঙ্গলের পেছনে। তাদেরই প্ররোচনা সর্বনিম্ন স্তরের মানুষের সন্তানরা তাদের পূর্ব-পুরুষদের অর্জনকে ধ্বংস করে শূন্য অবস্থানে এসে দাঁড়াল। কি বিচিত্র।

কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে সময়ের স্বল্প ব্যবধানে সাধারণ মানুষকে উপলব্ধি করতে হল যে তাদের স্বাধীনতা সংগ্রামের কথিত নেতারা আসলে আরেকটি আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দিল্লীর দালাল ছাড়া আর কিছু নয়। স্বাধীনতার পর সাধারণ মানুষের জীবন যাত্রার কোন পরিবর্তন এলো না। শাসন কাঠামো আগের মত অপরিবর্তিত থাকলো এবং করা হল আরো বেশী নির্যাতনমুখী।

www.pathagar.com

১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট আঞ্চলিক সাম্রাজ্যবাদী শক্তি দিল্লীর এজেন্টরা ক্ষমতাচ্যুত হল। আগস্ট বিপ্লবের মধ্যদিয়ে দেশের নিপিড়ীত মানুষ স্বল্প সময়ের জন্য মুক্ত হলেও পরবর্তী শাসকরা তাদের পূর্ব সূরীদের পথ অনুসরণ করল ঔপনিবেশিক শাসন কাঠামোর পরিবর্তন করল না। কোন এক অদৃশ্য ইঙ্গিতে দিল্লীর এদেশীয় এজেন্টদের পুনর্বাসিত করা হল। আগস্ট বিপ্লবের বেনিফিসিয়াররাও আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রভুদের সন্তুষ্ট রেখে নিজেদের স্বার্থ রক্ষার জন্য এত ব্যস্ত হয়ে উঠলো যে জনগণের দুরাবস্থার দিকে তাকানোর কোন অবকাশই তাদের হলো না। স্বাভাবিকভাবে জনগণের ওপর সামাজিক সাংস্কৃতিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক শোষণ নির্মমভাবে অব্যাহত রইল। সীমাহীন দুর্নীতি ঘিরে ধরল। এদেশের রাজনীতিবিদ ও ঘুণে ধরা শাসন কাঠামোকে। বলতে গেলে সব রাজনীতিক হয়ে উঠল দুর্নীতিবাজ।

এই সব দুর্নীতিবাজ পরজীবি রাজনীতিকদের কাছে গণতন্ত্রের অর্থ হল জনগণকে অন্ধকার খাঁচায় বন্দী রেখে তাদের নিজেদের সুযোগ সুবিধা অব্যাহত রাখার ব্যবস্থা। তথাকথিত গণতন্ত্র হল এদের হাতিয়ার।

এদেশের স্বচ্ছল শিক্ষিত অভিজাত সুবিধা ভোগীরা এখনো কেন যেন বুঝতে সক্ষম হচ্ছেন না। 'বিরাজমান রাষ্ট্র কাঠামো নিজেই তার সৃষ্ট সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ এবং এই ব্যর্থতার পরিণতিতে গোটা জাতি একটি আর্থ সামাজিক নৈরাজ্য ও হতশার দিকে এগিয়ে চলছে। এটা চলতে থাকবে কিয়ামত পর্যন্ত। চলমান শুদ্ধি অভিযানও দুর্নীতি ও শোষণ প্রতিরোধ করতে সক্ষম হবে বলে আমি মনে করি না। এরজন্য প্রয়োজন হবে বর্তমান শাসন কাঠামো ও এর উপকাঠামো সমূহের মূলোৎপাটন করে একটি নতুন কাঠামোর গোড়া পত্তন করা। এসব জনগণের স্বাধীনতা ও আত্মমর্যাদা বোধের ওপর গড়ে উঠবে এবং শক্তি আহরণ করবে। এই সাথে দুর করতে হবে ঔপনিবেশিক আর্থ সামাজিক ও বুদ্ধি বৃত্তিক সাংস্কৃতি। বৃটিশ ওপনিবেশিকরা সচেতনভাবে আমাদের কাঁধে চাপিয়ে দিয়েছে যে দারিদ্র, যে দারিদ্র শতাব্দীর শতাব্দী আমরা লালন করছি সেটার অবসান ঘটাতে হবে। তা না হলে আত্ম মর্যাদাসম্পন্ন জাতি গড়ে উঠবে না। জাতীয় শক্তির উত্থান ঘটাতে হলে এবং জাতীয় নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হলে সমাজের প্রতিটি স্তরে ঘাপটি মেরে থাকা পঞ্চম বাহিনী চিহ্নিত করাও জরুরী।

এই বিশাল কর্ম খুব সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হবে এমনটি মনে করাও ঠিক হবে না। কেননা কায়েমী স্বার্থবাদীরা সু-সংবদ্ধ। এই সু-সংঘবদ্ধ শক্তির

www.pathagar.com

মুকাবিলায় কোন একক প্রয়াস সফল হবে বলে আমি মনে করি না এর জন্য প্রয়োজন জনগণের ঐক্য। রাসূল (সাঃ) যেভাবে জাহেলি যুগের দ্বন্দ্বমুখর বিচ্ছিন্ন জনগোষ্ঠীকে সু-সংঘটিত করেছিলেন যেভাবে নব প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছিলেন, যেভাবে আত্ম সর্বস্ব মানুষকে পরার্থপর করে তুলেছিলেন যেভাবে ধ্বংসের দার প্রান্ত থেকে টেনে এনে জাহেল আরবদের আত্মমর্যাদা সম্পন্ন পরাক্রম জাতিতে পরিণত করেছিলেন অনুরূপভাবে আমাদের ধ্বংসোন্মুখ জাতিকে ও আত্মমর্যাদা সম্পন্ন শক্তিশালী জাতিতে পরিণত করা সম্ভব। তবে এদেশের মানুষ মুজিবের ডাকে সাড়া দিয়ে ক্ষুধা দারিদ্র মন্বন্তর ও অপমৃত্যুর সাক্ষাৎ পেয়েছিল। প্রতারকদের ডাকে সাড়া দিয়ে এ দেশের জনগণ বিপন্ন হয়েছে বার বার। তা সত্ত্বেও আল্লামা ডক্টর ইকবালের মত আমার বলতে ইচ্ছে করে নিঃসন্দেহে আমরা কঠিন সময় অতিবাহন করে চলেছি। কিন্তু আপনারা নিশ্চিত জেনে রাখবেন যে, মুসলিম জনগণকে যদি বর্তমান পরিস্থিতির গুরুত্ব সঠিকভাবে বুঝিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয় তাহলে তারা আপনার ডাকে সাড়া দিতে পশ্চাৎপদ হবে না। (লাহোরে প্রদত্ত ভাষণ)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-১

ইন্দিরা-মুজিব চুক্তি

সংযুক্তি ঃ '২৩শে জুন' এর মীরজাফরীর ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা ঃ দুইটি অসম চুক্তি ঃ সেবাদাসত্বের অনন্য নজীর

১৯৭২ সালের ১৯শে মার্চ স্বাক্ষরিত হয় তথাকথিত ভারত-বাংলাদেশ পঁচিশসালা মৈত্রী চুক্তি। বাংলাদেশের মানুষের কাছে দাসত্ব কিংবা বশ্যতামূলক চুক্তি হিসাবেই পরিচিত। ১৭৫৭ সালের ৩ জুন ক্লাইভ ও মীরজাফরের সঙ্গে স্বাক্ষরিত চুক্তির মতই এটিও একটি অসম চুক্তি। ১৯৫৭-এর চুক্তি মোতাবেক ইংরেজরা যেমন মীরজাফরকে সিংহাসন রক্ষায় সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে নাই তেমনি ১৯৭২ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তির প্রতি ভারতীয়রা এক কানাকঁড়ি মূল্য ও প্রদর্শন করছে না। মুজিব-ইন্দিরা চুক্তির ১ নম্বর অনুচ্ছেদে একে অপরের ভৌগলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রদর্শনের কথা বলা থাকলেও পার্বত্য চট্টগ্রামের বিচ্ছিন্নতাবাদী চাকমা যুবক ও তথাকথিত বঙ্গভূমি দাবীওয়ালাদের ভারত আশ্রয়, প্রশ্রয় ও প্রশিক্ষণ দিয়ে চলেছে। ৫নম্বর অনুচ্ছেদে সম-অধিকারের ভিত্তিতে বাণিজ্যের কথা থাকলেও ভারত-বাংলাদেশ বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ দুই হাজার কোটি টাকা। ৬ নম্বর অনুচ্ছেদে বন্যা নিয়ন্ত্রণ ও নদী অববাহিকার উন্নয়নে যৌথ সমীক্ষার কথা বলা হলেও ফারাক্কায় এক তরফাভাবে গঙ্গার পানি প্রবাহ পরিবর্তনসহ-বিভিন্ন নদ-নদীর উৎসমুখে বাঁধ ও স্পার নির্মাণে ভারতীয় দূরভিসন্ধি বাংলাদেশের মানুষ এখন হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। চুক্তির ৮, ৯, ও ১০ অনুচ্ছেদে নিঃসন্দেহে বাংলাদেশের স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বের ক্ষেত্রে অবমাননাকর ও পীড়াদায়ক এবং ধারাগুলোর সামার্থ মীরজাফর স্বাক্ষরিত চুক্তির ২ নম্বর ধারার অনুরূপ।

মীরজাফরের স্বাক্ষরিত চুক্তির ৩ নম্বর ধারার মতই '৭১ সালে ভারতীয় বাহিনী বাংলাদেশে পাকিস্তানীদের ফেলে যাওয়া অস্ত্রশস্ত্র-গোলাবারুদ নিয়ে যায়। মীরজাফরের স্বাক্ষরিত চুক্তির ৮ নম্বর ধারার মতই শেখ মুজিব চুক্তি করেই বাংলাদেশের বেরুবাড়ী ইউনিয়ন ভারতকে দান করে কিন্তু প্রতিশ্রুতি মোতাবেক ভারত তিন বিঘা জমি বাংলাদেশকে দেয়নি।

www.pathagar.com

সবেচেয়ে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, মীরজাফর ও শেখ মুজিব স্বাক্ষরিত উভয় চুক্তিই ১২টি অনুচ্ছেদে বিভক্ত। পাঠকের সুবিধার্থে ক্লাইভ-মীরজাফর ও মুজিব-ইন্দিরা স্বাক্ষরিত চুক্তি দুইটি নিম্নে প্রকাশ করা হলো।

মুজিবের চুক্তি ঃ

১ নম্বর অনুচ্ছেদ–

উভয় দেশের জনগণ যে উদ্দেশ্য সম্মিলিত সংগ্রাম ও আত্মোৎসর্গ করেছে, সেই উদ্দেশ্যে ও লক্ষ্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় ঘোষণা করেছে যে, তাদের দুটি দেশ এবং দুই দেশের জনগণের মধ্যে স্থায়ী শান্তি বজায় থাকবে। প্রত্যেক পক্ষ অপর পক্ষের স্বাধীনতা, সার্বভৌমত্ব ও ভৌগলিক অখণ্ডতার প্রতি সম্মান প্রর্দশন করা এবং অপর পক্ষের অভ্যন্তরীণ ব্যাপারে হস্ত ক্ষেপ করা থেকে বিরত থাকবে।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় উপরে বর্ণিত নীতিমালা এবং সমতা ও পারস্পারিক কল্যাণকর নীতিমালার ভিত্তিতে তাদের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সুপ্রতিবেশীসুলভ ও সকল ক্ষেত্রের সহযোগিতা আরও জোরদান ও সুদৃঢ় করবে।

২ নম্বর অনুচ্ছেদ–

জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকল জনগণ ও রাষ্ট্রের সম-অধিকারের নীতিমালায় উজ্জীবিত ও পরিচালিত হয়ে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল প্রকার উপনিবেশবাদ, বর্ণবাদ এবং বৈষম্যকে নিন্দা করে এবং এ সবের সম্পূর্ণ ও চূড়ান্ত নির্মূলের লক্ষ্যে সংগ্রাম চালিয়ে যেতে তারা বদ্ধপরিকর।

উপরোক্ত লক্ষ্যসমূহ অর্জনের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অপরাপর রাষ্ট্রের সাথে সহযোগিতা করে যাবে এবং উপনিবেশবাদ ও বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে সংগ্রামরত বিশ্বের সকল অঞ্চলের জনগণের ন্যায়সঙ্গত আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতি এবং তাদের জাতীয় মুক্তি আন্দোলনের প্রতি সমর্থন দিয়ে যাবে।

৩ নম্বর অনুচ্ছেদ–

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় জোট নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণ সহাবস্থানের নীতির প্রতি তাদের দৃঢ় প্রত্যয়ের কথা পুনর্ব্যক্ত করছে এবং তারা এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, বিশ্বে উত্তেজনা হ্রাস, আন্তর্জাতিক শান্তি ও নিরাপত্তা বজায় রাখা এবং জাতীয় স্বার্বভৌমত্ব ও স্বাধীনতা সুদৃঢ় করার ক্ষেত্রেই উপরোক্ত নীতিই হচ্ছে গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

www.pathagar.com

৪ নম্বর অনুচ্ছেদ–

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় সকল পর্যায়ে বৈঠক ও মতবিনিময়ের মাধ্যমে উভয় রাষ্ট্রের স্বার্থের ক্ষেত্রে প্রভাব সৃষ্টিকারী প্রধান প্রধান আন্তর্জাতিক সমস্যাবলী নিয়ে একে অপরের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করবে।

৫ নম্বর অনুচ্ছেদ–

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অর্থনৈতিক, বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি ক্ষেত্রে পারস্পরিক সুযোগ-সুবিধা প্রদান ও সার্বিক সহযোগিতা জোরদার ও সম্প্রসারণ অব্যাহত রাখবে। এই দুটি দেশ সম-অধিকার, পারস্পারিক কল্যাণ ও সর্বাধিক সুবিধাপ্রাপ্ত জাতির নীতির ভিত্তিতে নিজের মধ্যে বাণিজ্য, পরিবহন ও যোগাযোগের ক্ষেত্রে পারস্পরিক সহেযোগিতা বৃদ্ধি করবে।'

৬ নম্বর অনুচ্ছেদ–

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় বন্যান নিয়ন্ত্রন, নদী অববাহিকার উন্নয়ন এবং পানি বিদ্যুৎ শক্তি ও সেচের উন্নয়ন ও বিকাশে যৌথ সমীক্ষা চালাতে এবং যৌথ পদক্ষেপ গ্রহণেও সম্মত হয়েছে।

৭ নম্বর অনুচ্ছেদ–

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় আর্ট, শিক্ষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি, ক্রীড়া ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে সম্পর্ক বৃদ্ধি করবে।

৮ নম্বর অনুচ্ছেদ–

দুদেশের মধ্যে বিরাজমান বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক অনুযায়ী চুক্তিস্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে পরিচালিত কোন সামরিক বন্ধনে যোগদান কিংবা অংশগ্রহণ করবে না।

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের আগ্রাসন থেকে বিরত থাকবে এবং অপরপক্ষ সমরিক দিক দিয়ে ক্ষতি কিংবা নিরাপত্তার প্রতি হুমকি সৃষ্টি হতে পারে এমন যে কোন ধরনের কার্য্যের জন্য নিজস্ব ভূখণ্ড ব্যবহার করার অনুমতি দিবে না।

৯ নম্বর অনুচ্ছেদ–

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়য়ের প্রত্যেকে অপরপক্ষের বিরুদ্ধে যে কোন ধরনের সামরিক সংঘর্ষে অংশগ্রহণকারী কোন তৃতীয় পক্ষকে যে কোন প্রকারের সহায়তা প্রদান থেকে নিবৃত্ত থাকবে। এই চুক্তি স্বাক্ষরকারী দুই পক্ষের মধ্যে কোন এক

www.pathagar.com

পক্ষ যদি কখনও আক্রান্ত হয় তবে অথবা আক্রমনের হুমকির সম্মুখীন হয়, তাহলে সেই হুমকি নির্মূলের উদ্দেশ্যে যথাযথ কার্যকর ব্যবস্থাদি গ্রহণের জন্য চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয় অবিলম্বে পারস্পারিক সলাপরামর্শে মিলিত হবে এবং এইভাবে তাদের দুই দেশের শান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করবে।

১০ নম্বর অনুচ্ছেদ–

চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের প্রত্যেকে ঘোষণা করছে যে, সে গোপনে কিংবা প্রকাশ্যে, এক বা একাধিক রাষ্ট্রের সাথে এমন কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হবে না- যা এই চুক্তির সাথে অসংগতিপূর্ণ।

১১ নম্বর অুনচ্ছেদ–

এই চুক্তি পঁচিশ বছর মেয়াদের জন্য স্বাক্ষরিত হলো এবং চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের পারস্পারিক সম্মতিক্রমে তা নবায়নযোগ্য।

স্বাক্ষরিত হওয়ার তারিখ থেকে এই চুক্তি অবিলম্বে কার্যকর হবে।

১২ নম্বর অনুচ্ছেদ–

এই চুক্তি কোন অনুচ্ছেদ বা অনুচ্ছেদসমূহের ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে চুক্তি স্বাক্ষরকারী পক্ষদ্বয়ের মধ্যে কোন মতানৈক্যের সৃষ্টি হলে তা পারস্পারিক শ্রুদ্ধা ও সমঝোতার চেতনায় শান্তিপূর্ণ উপায়ে দ্বিপক্ষীয় ভিত্তিতে নিষ্পত্তি করতে হবে।

উনিশশ' বাহাত্তর সালের উনিশে মার্চ তারিখে সম্পাদিত।

ইন্দিরা গান্ধী	শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী	প্রধানমন্ত্রী
ভারত প্রজাতন্ত্রের পক্ষে	গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ-এর পক্ষে

(দুর্জন রাজনীতিকদের কিছু চালচিত্র, পৃষ্ঠা-১১৩)

www.pathagar.com

মীরজাফরের চুক্তি

"আমি আল্লাহর নামে ও আল্লাহর রাসূলের নামে প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে, আমার জবীনকালে আমি এই চুক্তিপত্রের শর্তাবলী মানিয়া চলিব।

ধারা-১ : নবাব সিরাজউদৌলার সঙ্গে শান্তিচুক্তির যেইসব ধারা সম্মতি লাভ করিয়াছিল, আমি সেইসব ধারা মানিয়া চলিতে সম্মত হইলাম।

ধারা-২ : ইংরেজদের দুশমন আমারও দুশমন, তারা ভারতবাসী হোক অথবা ইউরোপীয়।

ধারা-৩ : জাতিসমূহের স্বর্গ বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় ফরাসীদের সকল সম্পত্তি এবং ফ্যাক্টরীগুলি ইংরেজদের দখলে থাকিবে এবং আমি কখনো তাহাদিগকে (ফরাসীদেরকে) এই তিনটি প্রদেশে আর কোন স্থাপনা প্রতিষ্ঠা করিতে দিব না।

ধারা-৪ : নবাব সিরাজ কর্তৃক কলিকাতা দখল ও লুণ্ঠনের ফলে ইংরেজ কোম্পানী যেইসব ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছে তাহার বিবেচনায় এবং তন্নিমিত্ত মোতায়েনকৃত সেনাবাহিনীর জন্য ব্যয় নির্বাহ বাবদ আমি তাহাদিগকে এক ক্রোড় তঙ্কা প্রদান করিবো।

ধারা-৫ : করিকাতার ইংরেজ অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠনের জন্য আমি তাহাদিগকে পঞ্চাশ লক্ষ তঙ্কা প্রদান করিতে সম্মত হইলাম।

ধারা–৬ : কলিকাতার জেন্টু (হিন্দু) মূর (মুসলমান) এবং অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদান করা হইবে বিশ লক্ষ তঙ্কা। (ইংরেজরা হিন্দুদেরকে 'জেন্ট' এবং মুসলমানদেরকে 'মূর' ও 'মেহোমেটান' বলে চিহ্নিত করত।)

ধারা-৭ : কলিকাতার আর্মেনীয় অধিবাসীদের মালামাল লুণ্ঠণের জন্য তাহাদিগকে প্রদান করা হইবে সাত লক্ষ তঙ্কা। ইংরেজ, জেন্টু, মূর এবং কলিকাতার অন্যান্য অধিবাসীকে প্রদেয় তঙ্কার বিতরণ–ভার ন্যস্ত রহিল এডমিরাল ওয়াটসন, কর্ণেল ক্লাইভ, রজার ড্রেক, ইউলিয়াম ওয়াটস, জেমস কিলপ্যাট্রিক এবং রিচার্ড বীচার মহোদয়গণের উপর। তাঁহারা নিজেদের বিবেচনায় যেমন প্রাপ্য তাহা প্রদান করিবেন।

www.pathagar.com

ধারা-৮ : কলিকাতার বর্ডার বেষ্টনকারী মারাঠা ডিচের মধ্যে পড়িয়াছে কতিপয় জমিদারের কিছু জমি; ওই জমি ছাড়াও আমি মারাঠা ডিচের বাইরে ৬০০ গজ জমি ইংরেজ কোম্পানীকে দান করিব।

ধারা-৯ : কল্পি পর্যন্ত কলিকাতার দক্ষিণস্থ সব জমি ইংরেজ কোম্পানীর জমিদারীর অধীনে থাকিবে এবং তাহাতে অবস্থিত যাবতীয় অফিসাদি কোম্পানীর আইনগত অধিকারের থাকিবে।

ধারা-১০ : আমি যখনই কোম্পানীর সাহায্য দাবি করিব, তখনই তাহাদের বাহিনীর যাবতীয় খরচ বহনে বাধ্য থাকিব।

ধারা-১১ : হুগলীর সন্নিকট গঙ্গা নদীর নিকটে আমি কোন নতুন দুর্গ নির্মাণ করিব না।

ধারা-১২ : তিনটি প্রদেশের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠিত হইবা মাত্র আমি উপরি উক্ত সকল তঙ্কা বিশ্বস্তভাবে পরিশোধ করিবে।

পরিশিষ্ট-৩

৭১'-এর স্মৃতি প্রসঙ্গে

অধ্যাপক আবু জাফরের লেখা থেকে–

"দেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ যখন শুরু হলো আমি কলকাতা চলে যাই।...

আমরা প্রথমে গেলাম কলকাতা বেতারে। দেবদুলাল বন্দোপ্যাধ্যায়ের সঙ্গে আমার অনেকদিন থেকে পত্র-যোগাযোগ ছিলো। তিনি আমাদের তিনজনকেই প্রভূত সমাদর করলেন এবং তাৎক্ষণিকভাবে উপেন তরফদারকে বলে আমাদের একটি সাক্ষাৎকার রেকর্ড করে নিলেন। সাক্ষাৎকারটি পরবর্তী সপ্তাহে উপর্যপরি দু'বার প্রচারিত হয়।

বেতার থেকে বিদায় নিয়ে আমরা গেলাম কবি বুদ্ধদেব বসুর নাকতলার বাসাতে। তাঁকে পূর্বে দেখিনি, কিন্তু তাঁর সঙ্গেও যেহেতু ঘনিষ্ঠ পত্র- যোগাযোগ ছিলো...

বুদ্ধদেব এবং প্রতিভা বসু, দু'জনের কাছে আমরা আশাতীত ভাবে সমাদৃত ও আপ্যায়িত হলাম। প্রতিভা এবং বুদ্ধদেব উভয়েই তাঁদের শৈশব-কৈশোর ও

www.pathagar.com

যৌবনের একটি বড় অংশ অতিবাহিত করেছেন ঢাকায়। অতএব ঢাকা ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তাদের আগ্রহ ও কৌতূহল খুব স্বাভাবিক কারণেই সীমাহীন। আর এরকম দু'জন উন্মুখ ও উৎসাহী শ্রোতা পেয়ে আমারা দু'জন সহযাত্রী অবিরল ভাবে স্বাধীনতা-যুদ্ধের বর্ণনা দিয়ে চলেছেন। কিন্তু হঠাৎই একটু ছন্দপতন ঘটলো। কথার ফাঁকে বুদ্ধদেব বললেন, 'কী-এমন হলো যে, তোমরা হঠাৎ পাকিস্তান থেকে আলাদা হতে চাইছো! তোমাদের কতো দিকে কতো উন্নতি হচ্ছিলো, ভালোই তো ছিলে। আমরাও তো দিল্লীর অনেক অন্যায়-অবিচারের শিকার, তাই বলে কি আলাদা হয়ে যাবো? এখন হয়তো আর ফেরার পথ নেই, কিন্তু আমার বিশ্বাস তোমরা সবাই ভুল করেছো। আমি তোমাদের লড়াইকে শ্রদ্ধা করি কিন্তু সমর্থন করি না।'

আমরা তিনজনেই হতবাক, মানুষটি বলে কী!

কথা আর এগোলো না। আমরা খুবই মনঃক্ষুণ্ন হয়ে ফিরে এলাম আমাদের প্রিয় কবির 'কবিতা ভবন' থেকে। বেলাল ভাই অর্থাৎ ভারত বিচিত্রার প্রাক্তন সম্পদক কবি বেলাল চৌধুরী এবং কবি আল মাহমুদ দু'জনেই বুদ্ধদেব ও বুদ্ধদেব-পরিবারের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র ছিলেন। আমার ধারণা, তাঁরা উভয়েই বুদ্ধদেব বসুর এই প্রতিক্রিয়ার কথা জানেন।...

স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরের একটি ঘটনা। আমাকে ও আমার আত্মীয় আবুল কাসেমকে দেবদুলাল তাঁর বালিগঞ্জের বাসায় একদিন খুব আদর করে সকালের নাশতা খাওয়ালেন। আমরা পরিতৃপ্ত উদরে যখণ চা খেতে শুরু করেছি, দেবদুলাল অনেকটা উষ্মার সঙ্গে বললেন, 'কিছু মনে করো না, তোমরা আসলেই স্বাধীনতার যোগ্য নও।'

আমরা দু'জনেই স্তম্ভিত। স্বাধীনতা পেতে না পেতেই এতোবড় অপবাদ! তিনি বললেন, 'দেখ, এতো বড় একটা যুদ্ধের তান্ডব বয়ে গেলো, এতো প্রাণহানি, এতো ক্ষয়ক্ষতি; তোমাদের এখন কতো কাজ, কতো দায়িত্ব। অথচ কয়েকদিন আগে তোমাদের কিছু নেতা এসেছিলো কলকাতা থেকে নামকরা কিছু গায়ক ও নর্তকী ভাড়া করে দিতে হবে। তারা সপ্তাহব্যাপী বড় রকমের ফাংশন করবে ঢাকায়। একটা যুদ্ধবিধ্বস্ত দেশে এইরকম অকথ্য অমর্জনীয় দায়িত্বহীনতা কল্পনাও করা যায় না। দুঃখ হয়, অনুতপ্ত হই, তোমাদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আমারও কিছু অবদান ছিলো।' (আমার দেশ : আমার স্বাধীনতা, পাক্ষিক পালাবদল)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৪

গণ জিজ্ঞাসা

শেখ মুজিব তার মনিব রুশ-ভারত অক্ষ শক্তির মদদে পুষ্ট হয়ে এই জাতির স্কন্ধে যে নির্মম স্বৈরতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেয, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় তার অবসান ঘটানো ছিল অসম্ভব এবং অকল্পনীয়। বাংলার অমিত তেজী, চিরজাগ্রত ও মুক্তিপাগল মানুষ যখন একদিকে রুদ্ধ আক্রোশে ফুঁসছিল এবং অন্যদিকে এই শাসরুদ্ধকার অবস্থার হাত থেকে মুক্তির আকুতি নিয়ে আল্লাহর দরবারে আহাজারি করছিল, ঠিক তখনি ইতিহাসে মহান বিপ্লব সংঘটিত হয়। সূচিত হয় ইতিহাসের নবতর অধ্যায়। কিন্তু তারপর, তারপরও গণ মানুষের অন্তরে বয়ে গেল অনন্ত জিজ্ঞাস। সে জিজ্ঞাসার জবাব হয়তো কেউ পেয়েছেন অথবা পাননি। কিন্তু মুক্তিযোদ্ধা মেজর জলিলের জিজ্ঞাসা, একটি গণ জিজ্ঞাসা এ জিজ্ঞাসার জবাব দেবে কে?

"স্বাধীনতার ১৭ বছর পরেও আমার মত একজন সাধারণ লড়াকু মুক্তিযোদ্ধার মনে এ প্রশ্নগুলো নিভৃতে উঁকি-ঝুঁকি মারে এ কারণেই যে, ২৫ মার্চ সেই ভয়াল রাতের হিংস্র ছোবলের সাথে সাথেই পূর্ব পাকিস্তানের অধিবাসী এবং পুর্ব পাকিস্তানে নির্বাচিত আওয়ামী লীগের সংসদ সদস্যবর্গ কি করে পাকিস্তানের শত্রু হিসাবে পরিচিত ভারতের মাটিতে আশ্রয় গ্রহণের জন্য ছুটে যেতে পারল? তাহলে কি স্বাধীনতা বিরোধী বলে পরিচিত ইসলামপন্থী দলগুলোর শঙ্কা এবং অনুমান সত্য ছিল? তাদের শঙ্কা এবং অনুমান যদি সত্যই হয়ে থাকে তাহলে দেশেপ্রেমিক কারা? আমরা মুক্তিযোদ্ধারা না রাজাকার-অলবদর হিসেবে পরিচিত তারা? এ প্রশ্নের মীমাংসা আমার হাতে নয়, সত্যের উৎঘাটনই কেবল এ প্রশ্নের সঠিক উত্তর নির্ধারণ করব।

(মেজর (অবঃ) এম এ জলিল : অরক্ষিত স্বাধীনতাই পরাধীনতা, পৃঃ ৭-৮)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৫

ম্যাসেজ

"এ দেশের পঞ্চমবাহিনী দেশকে বিক্রি করছে, সীমান্তরেখা ইরেজার দিয়ে মুছে ফেলতে চাইছে। কিন্তু আমরা প্রতিবাদ করতে পারছি না। আমাদের সর্বশক্তি যেন হারিয়ে গেছে। আজকে ভাঙা ভাঙা অবস্থায় বিরাজমান জনগণের খণ্ডিত শক্তিসমূহকে জোড়া দিয়ে জনগণের মূলশক্তিকে যদি সুসংহত না করতে পারি, তাহলে এদেশকে গোলাম বানাতে কামান বন্দুকের দরকার পড়বে না। ঘরের শত্রু-বিভীষণরা রাতের অন্ধকারে ডেকে আনবে আমাদের শত্রুপক্ষকে। সকালে উঠেই দেখবেন আপনার হাত-পা গোলামীর শিকলে বাঁধা।

... দালাল চরিত্রের ভীরু-কাপুরুষ নেতা ও নেত্রীর দিকে তাকিয়ে কোন লাভ হবে না। তারা অতীতেও যেমন নিরাশ করেছে, আগামীতেও একইভাবে নিরাশ করবে। এখন এই দেশের ভাগ্যহত মানুষের একমাত্র ভরসা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। এই একটি মাত্র সম্পদই মুসলমানদের ভারতীয় আধিপত্যের কবল থেকে মুক্ত করতে পারে।" (কর্নেল (অবঃ) ফারুক)

পরিশিষ্ট-৬

যে সত্যের মৃত্যু নাই

দুনিয়ার বুকে রণাংগনের পরে সবচাইতে বেঈনসাফী আদালতেই ঘটে চলেছে। বিশ্বের পবিত্র ধর্মপ্রতিষ্ঠাদের থেকে শুরু করে এমন কোন জ্ঞানের সাধক তথা সত্যানুসারী দল নেই, যাদের অপরাধী সেজে এই আদালতের কাঠ-গড়ায় দাঁড়াতে হয়নি। এর বেঈনসাফীর দাস্তান বড়ই লম্বা। ইতিহাস আজও তার মাতম থেকে মুক্তি পায়নি।

আমরা তাতে ঈসার (আ)–এর মত পূন্যাত্মাকেও দেখতে পাই চোরের সাথে একই সারিতে দন্ডায়মান। সক্রেটিসের মত মনীষীকে তাতে এ অপরাধে বিষপানে প্রানদন্ডের আজ্ঞা দিতে দেখি যে, দেশের সব চাইতে খাটি মানুষ ছিলেন তিনি। আমরা সেখানে জ্ঞানের সাধন গ্যালিলিওকেও এ অপরাধে দণ্ড পেতে দেখি যে, তিনি নিজের জ্ঞান ও অভিজ্ঞতালব্ধ সত্যকে ভুয়া আদলতের ভয়ে মিথ্যা বলতে রাজী হননি। (যে সত্যের মৃত্যু নেই, পৃষ্ঠা-৩৭২)

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট-৭

শেখ মুজিবুর রহমান

(ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী ওরিয়ানী ফালাচি)

রোববার সন্ধ্যা ঃ আমি কোলকাতা হয়ে ঢাকার পথে যাত্রা করেছি। সত্যি বলতে কি, ১৮ই ডিসেম্বর মুক্তিবাহিনী তাদের বেয়োনেট দিয়ে যে যজ্ঞ চালিয়েছে তা প্রত্যক্ষ করার পর পৃথিবীতে আমার অন্তিম ইচ্ছা এটাই ছিল যে, এই ঘৃণ্য নগরীতে আমি আর পা ফেলবো না–এরকম সিদ্ধান্ত আমি নিয়েই ফেলেছিলাম। কিন্তু আমার সম্পাদকের ইচ্ছা যে, আমি মুজিবের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করি। ভুট্টো তাকে মুক্তি দেবার পর আমার সম্পাদকের এই সিদ্ধান্ত যথার্থ ছিল। তিনি কি ধরণের মানুষ? আমার সহকর্মীরা স্বীকৃতি দিলো, তিনি মহান ব্যক্তি, সুপারম্যান। তিনিই একমাত্র ব্যক্তি যিনি দেশকে সমস্যামুক্ত করে গণতন্ত্রের পথে পরিচালিত করতে পারেন।

আমার স্মরণ হলো, ১৮ই ডিসেম্বর আমি যখন ঢাকায় ছিলাম, তখন লোকজন বলছিল, "মুজিব থাকলে সেই নির্মম, ভয়ংকর ঘটনা কখনোই ঘটতো না। মুজিব প্রত্যাবর্তন করলে এ ধরনের ঘটনা পুনরাবৃত্তি ঘটবে না" কিন্তু গতকাল মুক্তিবাহিনী কেন আরো ৫০ জন নিরীহ বিহারীকে হত্যা করেছে? 'টাইম' ম্যাগাজিন কেন তাকে নিয়ে বিরাট প্রশ্নবোধক চিহ্ন দিয়ে হেডলাইন করেছে? আমি বিস্মিত হয়েছি যে, এই ব্যক্তিটি ১৯৬৯ সালের নভেম্বরে সাংবাদিক অ্যালডো শানতিনিকে এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন আমার দেশে আমি সবচেয়ে সাহসী এবং নির্ভীক মানুষ, আমি বাংলার বাঘ, দিকপাল...এখানে যুক্তির কোন স্থান নেই...।" আমি বুঝে উঠতে পারিনি, আমার কি ভাবা উচিত।

সোমবার বিকেল ঃ আমি হোটেল ইন্টাকন্টিমেন্টালে এবং আমার দ্বিধাদ্বন্দ্ব দ্বিগুণের অধিক। ঘটনাটা হলো, আমি মুজিবকে দেখেছি। যদিও মাত্র কয়েক মিনিটের জন্য। সাক্ষাৎকার নেয়ার পূর্বে তাকে এক নজর দেখার সুযোগ পেয়েছি। কিন্তু এই কয়েকটা মুহূর্তই আমার চিত্তকে দ্বিধা ও সংশয়ে পূর্ণ করতে যথেষ্ট ছিল? যখন ঢাকা বিমান বন্দরে অবতরণ করি, কার সাথে আমার সাক্ষাত হয়েছিল। তিনি আর কেউ নন, মি. সরকার। আমার শেষবার ঢাকা অবস্থানকালে এই বাঙ্গালি ভদ্রলোক আমার দোঁভাষী ছিলেন। তাঁকে দেখলাম রানওয়ের মাঝখানে। আমি ভাবিনি, কেন? সম্ভবত এর চেয়ে ভালো কিছু তার করার ছিল না। আমাকে দেখামাত্র জানতে চাইলেন যে, আমার জন্যে তিনি কিছু করতে পারেন কিনা? তাকে জানালাম যে, তিনি আমাকে মুজিবের বাড়িতে নিয়ে যেতে পারেন। তিনি সোজা আমাকে নিয়ে রওয়ানা হলেন এবং পনের মিনিটের মধ্যে আমরা একটা গেট দিয়ে প্রবেশ করলাম। গেটে মেশিনগানধারী মুক্তিবাহিনীর কড়া প্রহরা। আমরা রান্নাঘরে প্রবেশ করে দেখলাম মুজিবের স্ত্রী খাচ্ছেন। সাথে খাচ্ছে তার ভাগনে ও মামাত ভাইবোনেরা। একটা গামলায় ভাত-তরকারী মাখিয়ে আঙ্গুল দিয়ে মুখে পুরে দিচ্ছে সবাই। এদেশে খাওয়ার পদ্ধতি এরকমই। মুজিবের স্ত্রী আমাকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালেন।

www.pathagar.com

ঠিক তখনই মুজিব এলেন। সহসা রান্নাঘরের মুখে তার আবির্ভাব হলো। তার পরনে এক ধরনের সাদা পোশাক, যাতে আমার কাছে তাকে মনে হয়েছিল একজন প্রাচীন রোমান হিসেবে। পোশাকের কারণে তাকে দীর্ঘ ও ঋজু মনে হচ্ছিল। তার বয়স একান্ন হলেও তিনি সুপুরুষ। ককেশীয় ধরনের সন্দুর চেহারা। চশমা ও গোঁফে সে চেহারা হয়েছে আরো বুদ্ধিদীপ্ত। যে কারো মনে হবে, তিনি বিপুল জনতাকে নেতৃত্ব দেয়ার যোগ্যতাসম্পন্ন ব্যক্তি। তিনি স্বাস্থ্যের অধিকারী।

আমি সোজা তার কাছে গিয়ে পরিচয় পেশ করলাম এবং আমার উদ্দেশ্যে ব্যক্ত করলাম। মি. সরকার ভূমিতে পতিত হয়ে মুজিবের পদচুম্বন করলেন। আমি মুজিবের হাতটা আমার হাতে নিয়ে বললাম, "এই নগরীতে আপনি ফিরে এসেছেন দেখে আমি আনন্দিত, যে নগরী আশঙ্কা করছিল যে, আপনি আর কোনদিন এখানে ফিরবেন না।" তিনি আমার দিকে তাকালেন একটু উষ্মার সাথে। একটু অবজ্ঞার হাসি হেসে বললেন, "আমার সেক্রেটারীর সাথে কথা বল।"

আমার দ্বিধা ও সন্দেহের কারণ উপলব্ধি করা সহজ। মুজিবকে আমি জেনে এসেছি একজন গণতন্ত্রী ও সমাজতন্ত্রী হিসেবে। যখন আমি দম নিচ্ছিলাম, একজন যুবক আমার কাছে এসে বললো, সে ভাইস সেক্রেটারী। বিনয়ের সাথে সে প্রতিশ্রুতি দিলো, বিকেল চারটার সময় আমি 'সরকারী বাসভবনে' হাজির থাকতে পারলে আমাকে দশ মিনিট সময় দেয়া হবে। তাঁর সাতে যারা সাক্ষাৎ করতে চায় তাদের সাথে সেখানেই তিনি কথা বলেন। বিকেল সাড়ে তিনটায় নগরী ক্লান্ত, নিস্তব্ধ, ঘুমন্ত মধ্যাহ্নের বিশ্রাম নিচ্ছে। রাস্তায় কাঁধে রাইফেল ঝুলানো মুক্তিবাহিনী টহল দিচ্ছে। যুদ্ধ শেষ হয়েছে একমাসেরও বেশি সময় আগে। কিন্তু এখনো তাদের হাতে অস্ত্র আছে। তারা রাতদিন টহল দেয়। এলোপাথাড়ি বাতাসে গুলী ছুঁড়ে এবং মানুষ হত্যা করে। হত্যা না করলে দোকানপাট লুট করে। কেউ তাদের থামাতে পারে না- এমন কি মুজিবও না। সম্ভবত তিনি তাদের থামাতে সক্ষম নন। তিনি সন্তুষ্ট এজন্যে যে, নগরীর প্রাচীর তার পোস্টার সাইজের ছবিতে একাকার। মুজিবকে আমি আগে যেভাবে জেনেছিলাম, তার সাথে আমার দেখা মুজিবকে মিলাতে পারছি না।

সোমবার সন্ধ্যা ঃ আমি যে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছি এটা ছিল একটা দুর্বিপাক। তার মানসিক যোগ্যতা সম্পর্কে আমার সন্দেহ ছিল। এমন কি হতে পারে যে, কারাগার এবং মৃত্যু সম্পর্কে ভীতি আর মস্তিষ্ককে ভীষণভাবে আলোড়িত করেছে? তার ভারসাম্যহীনতাকে আমি আর কোনভাবেই ব্যাখ্যা করতে পারি না। একই সময়ে আমি বলতে চাচ্ছি, কারাগার এবং মৃত্যুর ভয় ইত্যাদি...সম্পর্কে কাহিনীগুলো...আমার কাছে এখনো খুব স্পষ্ট নয়। এটা কি করে হতে পারে যে, তাকে যে রাতে গ্রেফতার করা হলো সে রাতে সকল পর্যায়ের লোককে হত্যা করা হলো? কি করে কি করে এটা হতে পারে যে তাকে কারাগারে এটি প্রকোষ্ট থেকে পলায়ন করতে দেয়া হলো, যেটি তার সমাধি সৌধ হতো? তিনি কি গোপনে ভুট্টোর সাথে ষড়যন্ত্র করেছিলেন? আমি যত তাকে পর্যবেক্ষণ করেছি, তত মনে হয়েছে, তিনি কিছু একটা লুকোচ্ছেন। এমন কি তার মধ্যে যে সর্বাক্ষণিক আক্রমণাত্মক ভাব, সেটাকে আমার মনে হয়েছে আত্মরক্ষার কৌশল বলে।

www.pathagar.com

ঠিক চারটায় আমি সেখানে ছিলাম। ভাইস সেক্রেটারী আমাকে করিডোরে বসতে বললেন, যেখানে কমপক্ষে পঞ্চাশজন লোকে ঠাসাঠাসি ছিল। তিনি অফিসে প্রবশ করে মুজিবকে আমার উপস্থিতি সম্পর্কে জানালেন। আমি একটা ভয়ংকর গর্জন শুনলাম এবং নিরীহ লোকটি কম্পিতভাবে পুনরায় আবির্ভুত হয়ে আমাকে প্রতীক্ষা করতে বললেন। আমি প্রতীক্ষা করলাম-এক ঘণ্টা, দুই ঘন্টা, তিন ঘন্টা, চার ঘন্টা–রাত আটটা যখন বাজলো, তখনো আমি সেই অপরিসর করিডোরে অপেক্ষামান। রাত সাড়ে আটটায় আমাকে প্রবেশ করতে বলা হলো। আমি বিশাল এক কক্ষে প্রবেশ করলাম। একটি সোফা ও দুটো চেয়ার সে কক্ষে। মুজিব সোফার পুরোটায় নিজেকে বিস্তার করেছেন এবং দু'জন মোটা মন্ত্রী চেয়ার দুটো দখল করে বসে আছেন। কেউ দাঁড়ালো না। কেউ আমাকে অভ্যর্থনা জানালো না। কেউ আমার উপস্থিতিকে গ্রাহ্য করলো না। মুজিব আমাকে বসতে বলার সৌজন্য প্রদর্শন না করা পর্যন্ত সুদীর্ঘক্ষণ নীরবতা বিরাজ করছিল। আমি সোফার ক্ষুদ্র প্রান্তে বসে টেপ রেকর্ডার খুলে প্রথম প্রশ্ন করার প্রস্তুতি নিচ্ছি। কিন্তু আমার সে সময়ও ছিল না। মুজিব চিৎকার শুরু করলেন, 'হ্যারি আপ, কুইক, আন্ডারষ্ট্যান্ড? নষ্ট করার মত সময় আমার নেই। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার?...পাকিস্তানীরা ত্রিশ লক্ষ লোক হত্যা করেছে, ইজ দ্যাট ক্লিয়ার–আমি বললাম, "মি. প্রাইম মিনিস্টার ... ।"

মুজিব আবার চিৎকার শুরু করলেন, "ওরা আমার নারীদেরকে তাদের স্বামী ও সন্তানদের সামনে হত্যা করেছে। স্বামীদের হত্যা করেছে তাদের ছেলে ও স্ত্রীর সামনে। মা বাপের সামনে ছেলেকে ভাইবোনের সামনে ভাইবোনকে... "মি. প্রাইম মিনিস্টার .... আমি বলতে চাই... ।"

"তোমার কোন কিছু চাওয়ার অধিকার নেই, ইজ দ্যাট রাইট?

"আমার প্রথম প্রতিক্রিয়া হলো। কিন্তু একটা বিষয় সম্পর্কে আমি আরো কিছু জানতে চাই।" বিষয়টা আমি বুঝতে পারছিলাম না। "মি. প্রাইম মিনিস্টার, গ্রেফতারের সময় কি আপনার উপরে নির্যাতন করা হয়েছিল?

"নো, ম্যাডাম নো। তারা জানতো, ওতে কিছু হবে না। তারা আমার বৈশিষ্ট্য, আমার শক্তি, আমার সম্মান, আমার মূল্য, বীরত্ব সম্পর্কে জানতো, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?"

"তা বুঝলাম। কিন্তু আপনি কি করে বুঝলেন যে তারা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলাবে? ফাঁসিতে ঝুলিয়ে কি মৃত্যুদণ্ড কার্যকর করা হয়?

"নো, নো ডেথ সেন্টেন্স।"

এই পর্যায়ে তাকে দ্বিধাগ্রস্ত মনে হলো এবং তিনি গল্প বলতে শুরু করলেন, "আমি এটা জানতাম। কারণ ১৫ই ডিসেম্বর ওরা আমাকে কবর দেয়ার জন্য একটা গর্ত খনন করে।"

"কোথায় খনন করা হয়েছিল সেটা?"

"আমার সেলের ভিতরে।"

"আমাকে কি বুঝে নিতে হবে যে গর্তটা ছিল আপনার সেলের ভিতরে?"

'ইউ মিস আণ্ডারস্ট্যাণ্ড।"

"আপনার প্রতি কেমন আচরণ করা হয়েছে মি. প্রাইম মিনিস্টার?"

www.pathagar.com

"আমাকে একটা নির্জন প্রকোষ্ঠে রাখা হয়েছিল। এমনকি আমাকে সাক্ষাৎকারের অনুমতি দেয়া হতো না, সংবাদপত্র পাঠ করতে বা চিঠিপত্রও দেয়া হতো না, আণ্ডারস্ট্যাণ্ড?"
"তাহলে আপনি কি করেছেন?"
"আমি অনেক চিন্তা করেছি।"
"আপনি কি পড়েছেন?"
"বই এবং অন্যান্য জিনিস।"
"তাহলে আপনি কিছু পড়েছেন।"
"হ্যাঁ কিছু পড়েছি।"
"কিন্তু আমার ধারণা হয়েছিল, আপনাকে কোনকিছুই পড়তে দেয়া হয়নি।"
"ইউ মিস আণ্ডারষ্টুড।"
"তা বটে মি. প্রাইম মিনিস্টার। কিন্তু এটা কি করে হলো যে, শেষ পর্যন্ত ওরা আপনাকে ফাঁসিতে ঝুলালো না।"
"জেলার আমাকে সেল থেকে পালাতে সহায়তা করেছেন এবং তার বাড়িতে আশ্রয় দিয়েছেন।"
"কেন, তিনি কি কোন নির্দেশ পেয়েছিলেন?"
"আমি জানি না। এ ব্যাপারে তার সাথে আমি কোন কথা বলিনি এবং তিনিও আমার সাথে কিছু বলেননি।"
"নিরবতা সত্ত্বেও কি আপনারা বন্ধুতে পরিণত হয়েছিলেন?"
"হ্যাঁ, আমাদের মধ্যে বহু আলোচনা হয়েছে এবং তিনি সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন যে, আমাকে সাহায্য করতে চান।"
"তাহলে আপনি তার সাথে কথা বলেছেন?"
"হ্যাঁ, আমি তার সাথে কথা বলেছি।"
"আমি ভেবেছিলাম, আপনি কারো সাথেই কথা বলেননি।"
'ইউ মিস আণ্ডারস্টুড।"
"তা হবে মি. প্রাইম মিনিস্টার। যে লোকটি আপনার জীবন রক্ষা করলো আপনি কি তার প্রতি কৃতজ্ঞতা অনুভব করেন না।?" এটা ছিল ভাগ্য আমি ভাগ্য বিশ্বাস করি।
এরপর তিনি ভুট্টো সম্পর্কে কথা বললেন। এ সময় তার কথায় কোন স্ববিরোধিতা ছিল না। বেশ সতর্কতার সাথেই বললেন তার সম্পর্কে। আমাকে মুজিব জানালেন যে, ২৬ শে ডিসেম্বর ভুট্টো তাকে খুঁজতে গিয়েছিলেন। উদ্দেশ্য তাকে রাওয়ালপিণ্ডিতে নেয়া। তার ভাষায়, "ভুট্টো একজন ভদ্রলোকের মতই ব্যবহার করলেন। তিনি সত্যিই ভদ্রলোক।" ভূট্টো তাকে বলেছিলেন যে, একটা যুদ্ধ হয়ে গেছে। অবশ্য মুজিব ব্লাক 'আউট ও যুদ্ধ বিমানের গর্জন থেকে বরাবরই যুদ্ধ সম্পর্কে আঁচ করেছেন। ভূট্টো তার কাছে আরো ব্যাখ্যা করলেন যে, এখন তিনি পাকিস্তানের প্রেসিডেন্ট এবং তার কাছে কিছু প্রস্তাব পেশ করতে চান।
আমি তাকে প্রশ্ন করলাম, "কি প্রস্তাব মি. প্রাইম মিনিস্টার?" তিনি উত্তর দিলেন "হোয়াই শুড আই টেল ইউ? এটা একটা ব্যক্তিগত ব্যাপার। প্রাইভেট অ্যাফেয়ার।"
"আমার কাছে বলার প্রয়োজন নেই মি. প্রাইম মিনিস্টার, আপনি বলবেন ইতিহাসের কাছে।"

www.pathagar.com

মুজিব বললেন, "আমিই ইতিহাস। আমি ভূট্টোকে থামিয়ে বললাম, যদি আমাকে মুক্তি দেয়া না হয়, তাহলে আমি আলাপ করবো না। ভূট্টো অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে উত্তর দিলেন, আপনি মুক্ত যদিও আপনাকে শীঘ্র ছেড়ে দিচ্ছি না। আমাকে আরো দুই বা তিনদিন অপেক্ষা করতে হবে। এরপর ভূট্টো পশ্চিম পাকিস্তান ও বাংলাদেশ সম্পর্কে তার পরিকল্পনা তৈরী করতে শুরু করলেন। কিন্তু আমি অহংকারের সাথেই জানালাম, দেশবাসীর সাথে আলোচনা না করে আমি কোন পরিকল্পনা করতে পারি না।" এই পর্যায়ে তাকে প্রশ্ন করলাম, "তাহলে তো কেই বলতেই পারে যে, আপনাদের আলোচনা খুবই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে হয়েছিল।"

"তা তো বটেই। আমরা পরস্পরকে ভালোভাবে জানি। খুব বন্ধুত্বপূর্ণ আলোচনা ছিল। কিন্তু তা হয়েছিল আমার জানার আগে যে, পাকিস্তানীরা আমার জনগণের বিরুদ্ধে বর্বরোচিত নিপীড়ন করেছে। আমি জানতাম না যে, তারা বর্বরোচিতভাবে আমার মা-বোনকে হত্যা করেছে।

আমি তাকে থামিয়ে বললাম, "আমি জানি মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি জানি।" তিনি গর্জে উঠলেন, "তুমি কিছুই জানো না; আমি তখন জানতাম না যে, তারা আমার স্থপতি, আইনবিদ, ইঞ্জিনিয়ার, বিজ্ঞানী, চিকিৎসক, আমার চাকরকে হত্যা করেছে এবং আমার বাড়ি, জমি, সম্পত্তি ধ্বংস করেছে, আমার...।"

তিনি যখন তার সম্পত্তির অংশে পৌঁছলেন, তার মধ্যে এমন একটা ভাব দেখা গেল, যা থেকে তাকে এই প্রশ্নটা করার প্রয়োজনীয়তা বোধ করলাম যে, তিনি সত্যিই সমাজতন্ত্রী কি না? তিনি উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ...।" তার কণ্ঠে দ্বিধা। তাকে আবার বললাম যে, সমাজতন্ত্র বলতে তিনি কি বুঝেন? তিনি উত্তর দিলেন, "সমাজতন্ত।" তাতে আমরা মনে হলো, সমাজতন্ত্র সম্পর্কে তার যথার্থ ধারণা নেই।

এরপর ১৮ই ডিসেম্বর হত্যাযজ্ঞ সম্পর্কে তার প্রতিক্রিয়া জানতে চাইলে তিনি রাগে ফেটে পরেন। নিচের অংশটুকু আমার টেপ থেকে নেয়া :

"ম্যাসাকার? হোয়াট ম্যাসাকার?"

"ঢাকা স্টেডিয়ামে মুক্তিবাহিনীর দ্বারা সংঘটিত ঘটনাটি।"

"ঢাকা স্টেডিয়ামে কোন ম্যাসাকার হয়নি। তুমি মিথ্যে বলছো।"

"মি. প্রাইম মিনিস্টার, আমি মিথ্যাবাদী নই। সেখানে আরো সাংবাদিক ও পনের হাজার লোকের সাথে আমি হত্যাকাণ্ড প্রত্যক্ষ করেছি। আপনি চাইলে আমি আপানকে তার ছবিও দেখাবো। আমার পত্রিকায় সে ছবি প্রকাশিত হয়েছে।"

"মিথ্যেবাদী, ওরা মুক্তিবাহিনী নয়।"

"মি. প্রাইম মিনিস্টার, দয়া করে 'মিথ্যেবাদী" শব্দটি আর উচ্চারণ করবেন না। তারা মুক্তিবাহিনী। তাদের নেতৃত্ব দিচ্ছিল আবদুল কাদের সিদ্দিকী এবং তারা ইউনির্ফম পরা ছিল।"

"তাহলে হয়তো ওরা রাজাকার ছিল যারা প্রতিরোধের বিরোধিতা করেছিল এবং কাদেরসিদ্দিকী তাদের নিমূল করতে বাধ্য হয়েছে।"

"মি. প্রাইম মিনিস্টার, কেউ প্রমাণ করেনি যে, লোকগুলো রাজাকার ছিল এবং কেউই প্রতিরোধের বিরোধিতা করেনি। তারা ভীতসন্ত্রস্ত ছিল। হাত পা বাঁধা থাকায় তারা নড়াচড়াও করতে পারছিল না।"

www.pathagar.com

"মিথ্যেবাদী।"

"শেষবারে মতো বলছি, আমাকে "মিথ্যেবাদী" বলার অনুমতি আপনাকে দেবো না।"

"আচ্ছা সে অবস্থায় তুমি কি করতে?"

"আমি নিশ্চিত হতাম যে, ওরা রাজাকার ও অপরাধী। ফায়ারিং স্কোয়াডে দিতাম এবং এইভাবেই এই ঘৃণ্য হত্যাকাণ্ড এড়াতাম।"

"ওরা ওভাবে করেনি। হয়তো আমার লোকদের কাছে বুলেট ছিল না।"

"হ্যাঁ তাদের কাছে বুলেট ছিল। প্রচুর বুলেট ছিল। এখানো তাদের কাছে প্রচুর বুলেট রয়েছে। তা দিয়ে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত গুলী ছোঁড়ে। ওরা গাছে, মেঘে, আকাশে, মানুষের প্রতি গুলী ছোঁড়ে শুধু আনন্দ করার জন্য।

এরপর কি ঘটলো : যে দুই মোটা মন্ত্রী ঘুমুচ্ছিলেন গোটা সাক্ষাৎকারের সময়টায়, সহসা তারা 'জেগে উঠলেন আমি বুঝতে পারলাম না মুজিব কি বলে চিৎকার করেছেন। কারণ কথাগুলো ছিল বাংলায়।

সোমবার রাত : গোটা ঢাকা নগরী জেনে গেছে যে মুজিব ও আমার মধ্যে কি ঘটেছে। শমশের ওয়াদুদ নামে একজন লোক ছাড়া আমার পক্ষে আর কেউ নেই। লোকটি মুজিবের বড় বোনের ছেলে। এই যুবক নিউইয়র্ক থেকে এসেছে তার মামার কাছে। তার মতে মুজিব ক্ষমতালোভী এবং নিজের সম্পর্কে অতি উচ্চ ধারণা সম্পন্ন অহংকারী ব্যক্তি। তার মামা খুব মেধাসম্পন্ন নয়। বাইশ বছর বয়সে মুজিব হাইস্কুলে পড়াশুনা শেষ করেছেন। আওয়ামী লীগ সভাপতির সচিব হিসেবে তিনি রাজনীতিতে প্রবেশ করেন। এছাড়া আর কিছু করেননি তিনি। কেউ কল্পনাও করতে পারেনি যে মুজিব একদিন প্রধানমন্ত্রী হবেন। ওয়াদুদের মতে, আত্মীয়স্বজনের সাথে দুর্ব্যবহারের কারণ এটা নয়। আসলে একমাত্র ওয়াদুদের মাকেই মুজিব ভয় করেন। এই দুঃখজনক আচরণের জন্য তিনি পারিবারিকভাবে প্রতিবাদ জানাবেন। সে আরো জানালো যে আমার সাথে যে ব্যবহার করা হয়েছে তা সে তার মাকে জানাবে, যাতে তিনি এ ব্যাপারে মুজিবের সাথে কথা বলেন। সে আমাকে আরো বললো যে, সরকারী দফতরে গিয়ে এ ব্যাপারে আমার প্রতিবাদ করা উচিত এবং প্রেসিডেন্টের সাথে কথা বলা উচিত। কারণ প্রেসিডেন্ট খাঁটি ভদ্রলোক।

মুজিব সম্পর্কে সংগৃহীত তথ্যবলী তার জন্যে বিপর্যকর। ১৯৭১ এর মার্চে পাকিস্তানীদের দ্বারা সংঘটিত হত্যাকাণ্ডের কিছুদিন পূর্বে ইয়াহিয়া খান ও ভূট্টো ঢাকায় এসেছিলেন। ইয়াহিয়া খান যথাশীঘ্র ফিরে যান। কিন্তু ভূট্টো ঢাকায় রয়ে যান। তাকে হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে রাখা হয়। তার অ্যাপার্টমেন্ট ছিল ৯১১-৯১৩।

ইন্টারকন্টিনেন্টালের সর্বোচ্চ তলায় তখন ভূট্টোর ভূমিকা ছিল নিরোর মতো। নগরী যখন জ্বলছিল এবং এলোপাথারি গুলীবর্ষণ চলছিল, ভূট্টো তখন মদপান করছিলেন আর হাসছিলেন। পরদিন সকাল ৭টায় তিনি ঢাকা ত্যাগ করেন। আমি দেখেছি, যারা একসময় পাকিস্তানীদের ভয়ে ভীত ছিল, তারা এখন মুজিবকেই ভয় করে। গণতন্ত্র ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রচুর কথাবার্তা চলে এদেশে। কিন্তু সবসময়ই তা বলা হয় ফিসিফিসিয়ে, ভয়ের সঙ্গে। লোকজন বলাবলি করে যে, এই সংঘাতে মুজিব খুব সামান্যই হারিয়েছেন। তিনি ধনী ব্যক্তি। অত্যন্ত ধনবান। তার প্রত্যাবর্তনের পরদিন

www.pathagar.com

তিনি সাংবাদিকদেরকে হেলিকপ্টার দিয়েছিলেন। কেউ কি জানে কেন? যাতে তারা নিজেরা গিয়ে মুজিবের সম্পত্তির ক্ষয়ক্ষতি অবলোকন করে আসতে পারে। এখনো তিনি সমাজতন্ত্রের কথা বলেন, জাতীয়তাবাদের কথা বলেন। তিনি কি তার জমিজমা, বাড়ি, বিলাসবহুল ভিলা, মার্সিডিজ গাড়ি জাতীয়করণ করবেন?

ভূট্টোর সাথে মুজিবের প্রথম সাক্ষাৎ হয় ১৯৬৫ সালে, যখন তিনি ভারতের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের সীমান্তকে অক্ষরিত রাখার কারণে পশ্চিম পাকিস্তানকে অভিযুক্ত করেন। একজন নেতা হিসেবে তার মূল্য ছিল খুবই কম। তার একমাত্র মেধা ছিল মূর্খ লোকদের উত্তেজিত করে তোলার ক্ষেত্রে। তিনি ছিলেন কথামালার যাদুকর ও মিথ্যের যাদুকর–কিছুদিন আগে এক জনসভায় বক্তৃতাকালে তিনি বলেছিলেন, করাচীর রাস্তা গুলো সোনা দিয়ে মোড়া। তা দিয়ে হাটলে চোখ ধাঁধিয়ে যায়। অর্থনীতির কিছুই বুঝতেন না তিনি। কৃষি ছিল তার কাছে রহস্যের মতো। রাজনীতি ছিল প্রস্তুতিবিহীন। কেউ কি জানে ১৯৭০ এর নির্বাচনে তিনি কেন বিজয়ী হয়েছিলেন? কারণ সব মাওবাদীরা তাকে ভোট দিয়েছিল। সাইক্লোনে মাওবাদীদের অফিস বিধ্বস্ত হয়েছিল এবং তাদের নেতা ভাসানী আওয়ামী লীগের পক্ষে ভোট দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। জনগণকে যদি পুনরায় ভোট দিতে বলা হয়, তাহলে মুজিবের অবস্থা সম্পূর্ণ ভিন্নতর হবে, যদি তিনি বন্দুকের সাহায্যে তার ইচ্ছাকে চাপিয়ে নিতে না চান। সেজন্যেই তিনি মুক্তিবাহিনীকে অস্ত্র সমর্পণের নির্দেশ দিচ্ছেন না এবং আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, রক্তপিপাসু কসাই, যে ঢাকা স্টোডিয়ামে হত্যাযজ্ঞ করেছিল, সেই আবদুল কাদে সিদ্দিকী তার ব্যক্তিগত উপদেষ্টা। ভারতীয়রা তাকে গ্রেফতার করেছিল; কিন্তু মুজিব তাকে মুক্ত করেন।

এখন আমরা গণতন্ত্রের কথায় আসতে পারি। একজন মানুষ কি গণতন্ত্রী হতে পারে, যদি সে বিরোধিতা সহ্য করতে না পারে? কেউ যদি তার সাথে একমত না হয়, তিনি তাকে "রাজাকার" বলেন। বিরোধিতার ফল হতে পারে ভিন্নমত পোষনকারীকে কারাগারে প্রেরণ। তার চরিত্র একজন একনায়কের, অসহায় বাঙ্গালীরা উত্তপ্ত পাত্র থেকে গনগনে অগ্নিকুণ্ডে পতিত হয়েছে। বাঙ্গালী রমণীদের প্রতি সম্মান জানিয়েই বলছি, তাদের সম্পর্কে কথা না বলা উত্তম। তিনি নারীদের পাত্তাই দেন না...।

বাংলাদেশের প্রেসিডেন্ট আমাকে আবার মুজিবের সাথে দেখা করতে বললেন। সব ব্যবস্থা পাকা।

প্রেসিডেন্ট যে প্রচেষ্টা করেছিলেন তা খুব একটা সফল হয়নি। তিনি দুজন কর্মকর্তাকে পাঠিয়েছিলেন, যাতে তার নির্দেশ পালন করা হয়। মুজিবের কাছে একটা হুংকার ছাড়া তারা আর কিছু পায়নি। তবে এবার একটা করিডোরের বদলে একটা কক্ষে অপেক্ষা করার অনুমতি পেলাম। আমি বিকেল ৪টা থেকে রাত ন'টা পর্যন্ত অপেক্ষা করলাম। একজন বয় আমার চায়ের কাপ পূর্ণ করে দিচ্ছিল এবং এভাবে আমি আঠার কাপ চা নিঃশেষ করলাম। উনিশ কাপের সময় আমি চা ফ্লোরে ছুঁড়ে ফেলে হেঁটে বেড়িয়ে এলাম। আমাকে অনুসরণ করে হোটেলে এলো মুজিবের সেক্রেটারী ও ভাইস সেক্রেটারী। তারা বললো, মুজিব অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়েছেন এবং আগামীকাল সকাল সাড়ে সাতটায় আমার সাথে দেখা করতে চান।

www.pathagar.com

পরদিন সকালে ঠিক সাতটায় আমি হাজির হলাম এবং সকাল সাড়ে নটায় মার্সিডিজ যোগে মুজিবের আগমন পর্যন্ত আমাকে অপেক্ষা করতে হলো। একটা কাথাও না বলে তিনি অফিসে প্রবেশ করলেন। আমিও অফিসে ঢুকলাম। আমার দিকে ফিরে তিনি উচ্চারণ করলেন, "গেট আউট"। আমি কক্ষ ত্যাগ করতে উদ্যত। তিনি বললেন, "গেট ইন হিয়ার।" আমি ফিরলাম এবং তখনই তিনজন লোক পোস্টার আকৃতির একটি ছবি নিয়ে এলো দেখে তিনি বললেন, "চমৎকার।" এরপর তিনি বললেন, এই মহিলা সাংবাদিককে দেখাও। আমি 'চমৎকার' শব্দটি উচ্চারণ করলাম। এ ছিল এক মারাত্মক ভুল। তিনি বজ্রের মতো ফেটে পড়লেন। তিনি ক্ষিপ্ত। ছবিটি ফ্লোরে ছুঁড়ে দিয়ে বললেন, "এটা চমৎকার নয়।" আমি কিছু না বুঝে নিঃশ্চুপ থাকলাম।
আমি তার উত্তেজনা হ্রাস করতে সক্ষম হলাম। যেহেতু আমি ভূট্টোর সাথে তার সত্যিকার সম্পর্কটা খুঁজে পেতে চাই, সেজন্য ভূট্টো সম্পর্কে প্রশ্ন করলাম। নামটা বলার মুহূর্তেই তিনি জ্বলে উঠলেন এবং বললেন যে, তিনি শুধুমাত্র বাংলাদেশের ভবিষ্যত সম্পর্কে প্রশ্নের উত্তর দিতে চান। আমি প্রশ্ন করলাম, "বাংলাদেশের সাথে পশ্চিমবঙ্গকে যুক্ত করার সম্ভাবনা আছে কিনা?" খানিকটা দ্বিধান্বিত হয়ে তিনি বললেন, "এ সময়ে, আমার আর কোন আগ্রহ নেই।" এই বক্তব্যে ইন্দিরা গান্ধীকেও বিস্মিত হতে হবে যে, মুজিব কোলকাতা করায়ত্ত করতে চায়। আমি বললাম, তার মানে আপনি বলতে চান, অতীতে আপনার আগ্রহ ছিল এবং ভবিষ্যতে পুনঃবিবেচনা করার সম্ভাবনা আছে।" ধীরে ধীরে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, আমি তাকে একটা ফাঁদে ফেলতে চাচ্ছি। নিজের ভুল সংশোধন করার বদলে তিনি টেবিলে মুষ্টাঘাত করে বলতে শুরু করলেন যে, আমি সাংবাদিক নই বরং সরকারী মন্ত্রী। আমি তাকে প্রশ্ন করছি না দোষারোপ করছি। আমাকে এখনই বের হয়ে যেতে হবে এবং পুনরায় আমি যেন এদেশে পা না দেই।

এই পর্যায়ে আমি নিজের উপর সকল নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে ফেললাম এবং আমার মাঝে উত্তেজনার যে স্তূপ গড়ে উঠেছিল তা বিস্ফোরিত হলো। আমি বললাম যে, তার সবকিছু মেকি, ভুয়া। তার পরণতি হবে খুবই শোচনীয়। যখন তিনি মুখ ব্যাদান করে দাঁড়ালেন আমি দৌড়ে বেরিয়ে এলাম এবং রাস্তায় প্রথম রিকশাটায় চাপলাম। হোটেলে গিয়ে বিল পরিশোধ করলাম। সুটকেসটা হাতে নিয়ে যখন বেরুতে যাচ্ছি, তখন দেখলাম মুক্তিবাহিনী নিচে আমার জন্যে অপেক্ষা করছে। তারা একথা বলতে বলতে আমার কাছে এলো যে, আমি দেশের পিতাকে অপমান করেছি এবং সেজন্য আমাকে চরম মূল্য দিতে হবে। তাদের এই গোলযোগের মধ্যে পাঁচজন অস্ট্রেলিয়ানের সাহায্যে পালাতে সক্ষম হলাম। তারা এয়ারপোর্ট থেকে হোটেলে প্রবেশ করছিল। এয়ারপোর্টে দুজন ভারতীয় কর্মকর্তা আমাকে বিমানে উঠিয়ে নিলেন এবং আমি নিরাপদ হলাম। (২৪শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৭২)।

(ইন্টারভিউ উইথ হিস্টরী ওরিয়ানী ফালাচি
অনুবাদ : আনোয়ার হোসাইন মঞ্জু
পৃষ্ঠা : ৫-১২)

॥ সমাপ্ত ॥

www.pathagar.com

‘যদি বাংলাদেশকে একটি ইসলামী প্রজাতন্ত্র হিসাবে ঘোষণা করা হয় তাহলে ভারতের আশ্চর্য হবার কিছু নেই। যেদিন আমার সৈনিকরা বাংলাদেশকে মুক্ত করে সেদিনই আমি এ কথা উপলব্ধি করি।

বাংলাদেশীদের কখনোই ভারতের প্রতি তেমন ভালবাসা ছিল না। আমি জানতাম ভারতের প্রতি তাদের ভালবাসা অস্থায়ী। অনুপ্রেরণা লাভের জন্য ভারতের দিকে না তাকিয়ে তারা মক্কা ও পাকিস্তানের দিকে দৃষ্টিপাত করবে। আমাদেরকে সত্যাশ্রয়ী হতে হবে। বাংলাদেশীদের প্রতি আমরা সঠিক আচরণ করিনি। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশকে নিজের পায়ে দাঁড়ানোর জন্য আমাদের সব রকমের সাহায্য করা উচিৎ ছিল, কিন্তু আমাদের রাজনীতিবিদরা তা করেননি। তারা বেনিয়ার মতো আচরণ করেছেন।’

ফিল্ড মার্শাল মানেক শ’
(ভারতের সাবেক সেনাবাহিনী প্রধান)
স্টেটস্‌ম্যান, ২৯ এপ্রিল ১৯৮৮